ঐতিহাসিক চিত্র।

(ঐতিহাসিক মাসিক পত্র)

দ্বিতীয় পর্য্যায়।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল,

সম্পাদিত

(১৩১১—১৩১২)

কলিকাতা

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক।

১—১৯২ পৃষ্ঠা, ক'লিকাতা, ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ত্রিদিব প্রেসে, শ্রীকুঞ্জবিহারী দে কর্ত্তৃক; ১৯৩—৪৬৪ পৃষ্ঠা ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা ও ৪৬৫—৫৪৪ পৃষ্ঠা ৭৬ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

শিবাজী।

ঐতিহাসিক চিত্র।

-৩-

সূচনা।

আজ কাল বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে ইতিহাস-আলোচনার স্রোত প্রবাহিত-হইতেছে। কি সাহিত্যজগৎ, কি নাট্যজগৎ সর্ব্বত্রই ইতিহাসের সমাদর দেখা যাইতেছে। বঙ্গবাসিগণ যে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা দেশের শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস যে, ইতিহাস-আলোচনার দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অধঃপতিত জাতির পক্ষে ইতিহাসালোচনাই একমাত্র সান্ত্বনা বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যে যে জাতি অবনতির রসাতলে শায়িত হইয়াও আবার উন্নতির উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই জাতির পক্ষে ইতিহাস-আলোচনা অনেক পরিমাণে বলসঞ্চারের সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ যে যে জাতির অতীত ইতিহাস গৌরব-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, উন্নতিলাভ তাহাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়া উঠে। সুখের বিষয় ভারতের অতীত ইতিহাসের অভাব নাই। পাশ্চাত্য ভাবে লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও অসংখ্য গ্রন্থের পত্রে পত্রে, শিলাগাত্রে ও তাম্রখণ্ডে ভারতের অতীত কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। যে বাঙ্গালী জগতের সমক্ষে হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহারও অতীত কাহিনীর অভাব নাই। বর্ত্তমান সময়ে নানা দিক্ হইতে তাহার অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। তাই এই ঐতিহাসিক যুগে জনসাধারণের বিশেষতঃ ভবিষ্যতের আশাস্থল ছাত্র-

বৃন্দের নিকট ঐতিহাসিক কথাপ্রচারের জন্য 'ঐতিহাসিক চিত্রের' অবতারণা। ঐতিহাসিক চিত্র কেবল নানা স্থান হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ঐতিহাসিক চিত্র যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সে ঐতিহাসিক চিত্র প্রধানতঃ স্বাধীন অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলপ্রদর্শীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ইতিহাস সাধারণের পক্ষে আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ সেরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনার ফল-পাঠকের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় অচিরেই তাহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক চিত্র নানা স্থানের ও নানা প্রকারের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। পূর্ব্বতন চিত্রের সহিত বর্ত্তমান চিত্রের পার্থক্য থাকিলেও চিত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকমহাশয়ের অনুমত্যনুসারে বর্ত্তমান পত্র 'ঐতিহাসিক চিত্র' নাম ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হইল। এই নামগ্রহণের জন্য আমরা চিত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকমহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে সাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের ইহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি পতিত হইলে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখের 'সাহিত্যে' তাহার সুযোগ্য সুধী সম্পাদকমহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রচারের সূচনায় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন, 'জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে।' আজ সেই কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ চড়ায় ঠেকিয়া অক্ষয় বাবুর ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজ বান্‌চাল হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলি,—নিখিল বাবুর নূতন ঐতিহাসিক চিত্র 'ডিঙ্গী এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।'" এক্ষণে এই ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গি ভাসমান হওয়ার পক্ষে সাধারণের অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই ডিঙ্গী প্রধানতঃ ভারতীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্য লইয়া ভাসমান হইবে, কিন্তু সময়ে সময়ে বিদেশীয় পণ্য আনিতেও চেষ্টা করিবে। জাতীয় ইতিহাস-আলোচনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, জগতের উন্নতিশীল জাতিগণের ইতিহাসও প্রকটিত করিতে ঐতিহাসিক চিত্র চেষ্টা করিবে। কারণ কেবল স্বদেশীয় নহে,

বিদেশীয় ইতিহাস-আলোচনাও উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সেই জন্য ঐতিহাসিক চিত্র জাতীয় ও বিজাতীয় উভয়বিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ইতিহাস-আলোচনার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক সংবাদও প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে ভগবানের আশীর্ব্বাদে, সাধারণের অনুগ্রহে ও বঙ্গের সুলেখকগণের সাহায্যে এই ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গী ভাসিয়া যাইতে পারিলে সম্পাদক আপনার ক্ষুদ্র পরিশ্রমকে সফল জ্ঞান করিবেন।

ইতিহাস কি?

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

ইহাই ইতিহাস। বিলাতী হিসাবে ইতিহাস বুঝিতে হইলে অন্য রকমে বুঝিতে হয়। জাতিবিশেষের ইতিহাসে জাতিবিশেষের উন্নতি ও অবনতির পর্য্যায়-বিকাশ বিন্যস্ত থাকিবে। কেমন করিয়া একটি জাতি বর্ব্বরতার ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে, একটি একটি করিয়া সভ্যতার সকল সোপানে উঠিয়াছে, এবং এই উন্নয়ন বা আরোহণ-প্রভাব প্রতিবেশী জাতিবর্গের উপর কিরূপে কাজ করিয়াছে, ইতিহাস তাহারই বিবরণ করিবে। এই হিসাবেই পাশ্চাত্য ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি আছে। ফরাসী গীজো ও রেনান্, ইংরেজ বকল্ ও গ্রীণ ও লেকি এই পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখিবার ভঙ্গি দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরাত বলিয়াই দিয়াছেন যে, আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের ইতিহাস নাই, অথচ পুরাণেতিহাস এই শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যের পত্রে

পত্রে পাওয়া যায়। লোকশিক্ষার জন্য, সদ্ধর্ম্মকথাপ্রচারউদ্দেশ্যে আমাদের পুরাণকারেরা তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১। ইতিহাস-পূর্ব্বানুবৃত্তি। ২। আখ্যয়িকা। ৩। উপাখ্যান। পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার অনুবৃত্তি এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহা শ্রবণ করিয়া লোকে বিনয়, সৌজন্য, সাধুতা, ভক্তি, সদাচার ও কর্ম্মনিষ্ঠা শিখিতে পারে। আধুনিক রাজনীতির মাপকাটি লইয়া হিসাব করিলে দুর্য্যোধন এক জন বড় রাজা; ভারবী তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন, মহাভারতের বনপর্ব্বে তাঁহার যে পরিচয় পাই, তাহাতে দুর্যোধনকে রাজনীতিবিদ্যায় নেপোলিয়ান বোনা-পার্টির উপরেও আসন দিতে ইচ্ছা হয়। কর্ব্বূরকুলপতি রাবণ অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন; অসাধারণ জ্ঞানী, অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ প্রজাপালক এবং অসাধারণ বীর ছিলেন। কিন্তু কি রাবণ, কি দুর্য্যোধন উভয়েই সমাজদ্রোহী ছিলেন। অভিমানী দুর্য্যোধন, নিজের কুলনারী বিবস্ত্রা দ্রৌপদীকে উরু দেখা-ইয়া সমাজদ্রোহিতার পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ রাবণ ভিতরের কথা না বুঝিয়া, তদন্ত না করিয়া, অতিদর্পে অন্ধ হইয়া বনচারী রামের নারী হরণ করিয়াছিলেন। রাজার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সমাজদ্রোহিতা সম্ভব নহে। পুরাণকার এই দুইটী কথা—সমাজধর্ম্মের কথা, অতি বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য হইলেও উহা হিন্দুর দৃষ্টিতে পুরাণেতিহাস।

জাতির কথা বলিতে গেলে, যাদবকুলের কথা মনে পড়ে। যাদবের দর্প দম্ভ, যাদবের তেজ বিক্রম কেবল ভারতের পক্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে যেন অসহ্য হইয়াছিল। যত বড় বুদ্ধিমান তুমি হওনা কেন, যত বড় তেজস্বী ও কর্ম্মী তোমার জাতি হউক না কেন, বিলাস যাহার ভিত্তি, রক্তমাংসের দেহ যাহার ভিত্তি, তাহা কখনই—কিছুতেই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাদবকুলও চিরস্থায়ী হয় নাই। নিজের অহঙ্কারের তেজে নিজেই পুড়িয়া মরিয়াছিল। পুরাণ এই কথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ইতিহাস কথার আবৃত্তি করিতে হইলে হিন্দু একটা কথা কখনও ভুলেন না,

উহা ধরার ভার। তুমি এত বড় হইও না যেন তোমার অস্তিত্ব অন্যের পক্ষে ভারজনক বলিয়া বোধ হয়; যেন তুমি অতি বড় হইয়া আর দশ জনকে—আর হাজার জনকে—আর কোটি জনকে আচ্ছন্ন করিয়া না রাখ। যখন মনুষ্য সমাজের কোন এক শ্রেণী বা কোন এক ব্যক্তি এত বড় হইয়া উঠে, যাহার বৃদ্ধিতে সমাজের সমাঞ্জস্য নষ্ট হয়, তখন মেদিনী ভারাক্রান্ত হন। আদ্যাশক্তির গুহ্য গর্ভ হইতে এক নূতন শক্তি উদ্ভূত হইয়া এই সাম্যনাশিনী-শক্তিকে নষ্ট করে। রাবণ, দুর্য্যোধন, হিরণ্যকশিপু, কংস, শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণ সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াছিলেন—ধরার ভারস্বরূপ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগকে নিশ্চিহ্ন হইয়া জগতের ইতিহাসের পত্র হইতে অপসারিত হইতে হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ অতি দুদ্ধর্ষ হইয়াছিলেন তাই, এক-বিংশতিবার ধরাকে নিক্ষত্রিয় হইতে হইয়াছিল। পুরাণে এমন কত দৃষ্টান্ত আছে। আজ ঐ পূর্ব্বাকাশের কোলে যে শক্তি-সংঘট্টন ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে কি বুঝিব না, মনুষ্য-সমাজের নষ্ট সামঞ্জস্য পুনর্সংস্থাপিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

ইহাই আমাদের ইতিহাস। সমাজধর্ম্ম শিখাইবার পক্ষে ইতিহাসই একমাত্র উপায়। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সুখে বাঁচিয়া থাকাই উচিত, হিন্দুর জীবনে ইহাই মূল মন্ত্র। ব্যক্তিগত হিসাবে সাধনধর্ম্মের দ্বারাই সুখ অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে সমাজধর্ম্মের অনুসরণ দ্বারায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ অর্জ্জিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাই আমাদের চতুর্ব্বর্গ। এই চতুর্ব্বর্গসাধনই জীবনের মুখ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সাধনজনিত সুখই অভীপ্সিত সুখ। এই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধনানুকুল উপদেশ পূর্ব্ববৃত্ত কথার সহিত যাহাতে যুক্ত থাকে, তাহাই ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বুঝিতে হইবে। মহাভারতের শেষে বেদব্যাস বলিয়াছেন "ধর্ম্মাৎ অর্থশ্চ কামশ্চ"; এখানে ধর্ম্ম অর্থে অদৃষ্ট। অতএব আমাদের ইতিহাস কথা বুঝিতে হইলে প্রথমে অদৃষ্টটা বুঝা চাই—অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকা চাই। পুরাণেতিহাস রোচক গল্পের দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে,

অদৃষ্টবশতই অর্থ ও কামের উপভোগ হইয়া থাকে। এ কথা যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে সংসারের সকল বালাই চুকিয়া যায়।

ইউরোপে এক দল বড় ধনী হইয়াছে, আর এক দল অতি দরিদ্র হইয়াছে। ইহার ফলে দরিদ্র ধনীকে বিদ্বেষ করে—হিংসা করে—ধনীকে লুটিয়া খাইবার চেষ্টা মনে-মনে করে। এই ইচ্ছার ফলে সোসিয়লিজম্, কমিউ-নিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি সমাজবিধ্বংসকারী দানব শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। কালে এই শক্তির প্রভাবে ইউরোপের সমাজ নষ্ট হইবে। এক বার যেমন ফরাসী বিপ্লবে ইউরোপের সমাজ ওলট-পালট হইয়াছিল, তেমনি আবার হইবে। কারণ ইউরোপত জানে না—বুঝে না "ধর্ম্মাৎ অর্থশ্চ কামশ্চ",—জানিলে এমন বিপত্তি ঘটিত না। আমাদের ইতিহাস এই কথা শিখায়, এতকাল এই কথা শিখাই-য়াছে, তাই আমরা এত বিপ্লবের মধ্যেও এখনও বাঁচিয়া আছি।

ইউরোপ ইতিহাস শিখায় আগামিগণকে পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে—ধন্ ঐশ্বর্য্য, সামর্থ, বিলাস প্রভৃতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। ইউরোপ অদৃষ্ট মানে না, কেবল কর্ম্ম মানে, তাই কর্ম্মের পর্য্যায় ও পারম্পর্য্য দেখিবার জন্য ইউরোপের সুধিগণ সদা ব্যস্ত। কাজেই আমাদের ইতিহাসের বিবৃতি এবং ইউরোপের ইতিহাসের বিবৃতি, এই উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তবে একটা কথা আছে, আমরা এখন অধঃপতিত—জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট। কোন্ অদৃষ্ট অসৎকর্ম্ম-প্রভাবে আমাদের এমন দশা হইল—কি নূতন পুরুষকার সাধন করিলে পরে মঙ্গলকর অদৃষ্টের সূচনা হইতে পারে, এই দুই বিষয়ের আলোচনা পুর্ব্বানুবৃত্তির সহযোগে করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে—সমাজধর্ম্মের পুষ্টি হইতে পারে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে, ইতিহাস এখন অজ্ঞান-তিমিরান্ধ আমাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা সদৃশ। ইতিহাস চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ; পুরাণেতিহাসের আলোচনা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীপাঁচকড়ি দেবশর্ম্মা।

জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চার ফল।

——:)*(:——

আমরা অতি প্রাচীন জাতি। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর জাতিও খুব প্রাচীন। আমরা সকলেই মনুর বংশে জন্মিয়া মানব হইয়াছি, কিম্বা আদম ও হিভার সন্ততি—এই হিসাবে সাঁওতাল, ভিল, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও বর্ণিওর অসভ্য মানব জাতির এই সকল শাখাই তুল্যরূপ প্রাচীন,—বৈজ্ঞানিক-গণের হিসাবে মর্কটাদি জীব মনুষ্যজাতি অপেক্ষাও প্রাচীন হইয়া পড়ে, এ প্রাচীনত্বের আর তাহা হইলে গৌরব কি থাকে?

আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাচীনত্বের কথা বলিতেছি না,—যে সময় হইতে জাতীয় চিন্তার একটা উন্নতি আরব্ধ হইয়াছে, সেই সময়ের হিসাবে আমরা প্রাচীনত্বের নির্দ্দেশ করিতেছি,—মর্কটজাতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ মানবজাতির আদিপুরুষ হইতে প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু প্রথমোক্ত জীব যে ভাবে শাখা প্রশাখায় বিহার করিয়া গিয়াছে, তাহার বংশধরগণ আজও ঠিক সেই প্রণালীতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে—সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কালের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব কল্পনা মিথ্যা, কালের কোন রেখাই তাহাদের জাতীয় জীবনে পড়ে নাই; যে জাতির জীবনে কালের স্তরবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়, একটা পৌর্ব্বপর্য্য এবং পরম্পরাক্রমে বিকাশের প্রণালী দৃষ্ট হয়—তাহাদের সম্বন্ধেই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত—প্রভৃতিরূপে কালের অসীম রূপ সীমাবদ্ধ হইয়া উঠে।

এই হিসাবে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি আমাদের জাতি অতি প্রাচীন,—এই ভারতবর্ষে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক প্রকার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন,—বেদ তাঁহাদের কীর্ত্তি, ইহার প্রাচীনতম অথচ চিরনবীন পতকা জগতের মস্তকের উর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া ভারতীয় চিন্তাকে জগতের পূজনীয় করিয়া রাখিয়াছে,—হিমালয়ের উচ্চতম শৈলশৃঙ্গের ন্যায় মানবজাতির ইতিহাসে

ইহাই উচ্চতম চিহ্ন, ইহার উৰ্দ্ধে কাহারও দৃষ্টি যায় না; তৎপর বেদান্তের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন তত্ত্বরাশি, মানবজাতি তাহা ঋষিগণের শ্রেষ্ঠতম দান বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছে—এইরূপে ভারতীয় উন্নতির স্তর—সাহিত্যে, দর্শনে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে আকারিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা উত্তরাধিকারসত্ত্বে তাহা হস্তগত করিয়াছি। কিন্তু একজন বিদেশীয় লোকও ত সেই গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কি ভিন্নতা রহিল? প্রভেদ একটা বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিন্তা আমাদের অস্থিমজ্জার ভিতর রহিয়াছে। সেই প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী পাঠে আমাদের চিন্তার যেরূপ উন্মেষ করিবে—আমাদিগের জাতীয় উন্নতির যেরূপ বিকাশ করিবে, অন্যজাতির পক্ষে তাহা অসম্ভব,—প্রত্যেক জাতিরই কোন না কোনরূপ বিশেষত্ব আছে,—সেই বিশেষত্বটুকু তাঁহাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়,—আমাদের উন্নতিকল্পে ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস জানা আবশ্যক, কিন্তু জাতীয় ইতিহাস জানা অপরিহার্য্য,—জাতীয় ইতিহাস আমাদের ভিত্তি গড়িয়া দিবে, নতুবা আমাদের উন্নতির গৃহপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমরা কি—এই জ্ঞানটুকু জাতীয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদান দ্বারা ভাবী ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিদেশী মাল মসলা হইতে সহায়তা লইব, কিন্তু ভিত্তির উপাদান অন্যত্র হইতে সংগ্রহচেষ্টা বৃথা।

আমি যে বহু প্রাচীনকাল হইতে শ্রেষ্ঠতম মহাজনগণের প্রদত্ত ধনরত্নের মালিক,—ইহা ভুলিয়া গেলে আমাকে কৌপিনসার ভিখারী সাজিতে হইবে,—আমার জন্য ঋষিগণ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন বাক্য ও মন যাঁহার সম্মুখীন হইতে যাইয়া ফিরিয়া আসে,—যিনি অবাঙ্‌মানসগোচর, সেই নিখিল বিশ্বের হেতুভূত ব্রহ্মতত্ত্ব বেদান্তকারগণ আমার জন্য এখনও সম্মুখে আনিয়া দিতেছেন, আমার জন্য রামায়ণের অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতার চিত্র বাল্মীকি অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—ব্যাস তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন,—কালিদাস, ভবভূতি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আদর্শ রচনা করিয়াছেন—এই বহুধনরত্ন লইয়া প্রাচীন ইতিহাসের পেটিকা আমার নিকট উন্মোচিত-আবরণ হইয়া প্রতীক্ষা

করিতেছে—আমি ইহাদের উত্তরাধিকারী। এই বিরাট জাতীয় ইতিহাসচর্চ্চায় আমার মনে যে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিবে—আমার যে লুক্কায়িত শক্তির সন্ধান বলিয়া দিবে ও উত্তম উদ্বোধন করিবে—প্রাচীনকালে তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন—তাহা শুনিতে শুনিতে আমিও যে সেইরূপ উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত আদর্শের সন্নিহিত হইতে পারি, সেই ভরসা নবভাবে উজ্জীবিত হইয়া আমার মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিবে—সেরূপ আশা, সেইরূপ প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আমরা আর কিসে পাইব ?

তার পর অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কারণ এবং সেই কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল—স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই ফলাফলের বিচার দ্বারা এবং আমাদের জাতীয় অভাব ও শক্তি কোথায় তাহা আবিষ্কার করিয়া আমরা ভবিষ্যগঠনে আমাদের হস্ত সবল করিয়া লইতে পারিব।

সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস যে সকল শিক্ষা আমাদিগকে প্রদান করিবে, বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ইতিহাসপাঠে আমরা আবার আমাদের প্রকৃতির তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতররূপ পরিচয় পাইব। আমরাও পৃথিবীতে নিতান্ত নগণ্য ছিলাম না, এক সময়ে বাঙ্গালীরা চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সভ্যতাকে নবশ্রী প্রদান করিয়াছিল, এক সময়ে জাবা ও বালিদ্বীপে বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট হইয়া পররাজ্যে হিন্দুসভ্যতা চিহ্নিত করিয়াছিল,—সিংহলে বিজয়কেতু উড্ডীন করিয়াছিল। অল্পদিন হইল ঢাকার মসলিন্ জগতের বিলাসসামগ্রীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিলাতে পর্য্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তখন ম্যানচেষ্টার বিস্ময়পূরিত চক্ষে ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য দর্শনে স্বীয় অপটুত্ব ভাবিয়া ক্ষুব্ধ ও কুণ্ঠিত ছিল,—আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আমাদের দেশের একজন দীনদরিদ্র পল্লীব্রাহ্মণ জগতে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—পৃথিবী সেই অতিসাত্ত্বিক ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণে আজিও সমর্থ হয় নাই,—সুতরাং প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চ্চায় আমাদের জাতীয় শক্তিরই বিশেষভাবে আবিষ্কার হইবে,—আমরা এককালে জগতকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছি,—এই জ্ঞান বদ্ধমূল হইলে আমরা

ভবিষ্যতে উন্নতির শীর্ষস্থানে দাঁড়াইতে পারিব। ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্যুত হইলে আমরা দীনাতিদীন, পরপ্রেক্ষী হইয়া নিজের অযোগ্যতার গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া থাকিব। জার্ম্মানজাতি একসময়ে যখন হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তখন জাতীয় ইতিহাসপাঠে তাহারা পূর্ব্বগৌরবদৃপ্ত হইয়া নবপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়াছেন,—সেই জ্ঞানে আমাদের উদ্যমকে সুপ্রসার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া দিবে,—গঙ্গার স্রোত যখন স্মরণ করে—যে সে হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তখন মহাসাগরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার যোগ্যতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া দ্বিগুণতর বেগে প্রবাহিত হয়। কূপের জল স্বীয় সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না,—কারণ সে প্রথমেও যেখানে ছিল, এখনও সেই খানে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শিবাজী।

—*—

মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া, অবশেষে আসমুদ্র হিমালয় আপনার তীব্র জ্বালা পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহার স্রষ্টা সেই মহাপ্রাণ মহাপুরুষকে বার বার নমস্কার করি। স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পচন্দন প্রদান করা ভারতবাসীমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার ক্ষুদ্রশক্তি তেজঃসম্পন্ন হইয়া মণিমাণিক্যখচিত দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনের জ্যোতিঃকে পরিম্লান করিয়াছিল, তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করিলে ভারতবাসীমাত্রেরই হৃদয় নিঃসন্দেহে শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। বাল্যকাল হইতে গোব্রাহ্মণরক্ষাই যিনি

জীবনের ব্রত স্থির করিয়াছিলেন। গোব্রাহ্মণহিত গোবিন্দভক্ত হিন্দুমাত্রের নিকট তিনি যে পূজনীয়, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যিনি স্ত্রীজাতিকে জগন্মাতার অংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে ভক্তিভরে পূজা করা কি কর্ত্তব্য নহে? যাঁহার অর্জ্জিত বিশাল সাম্রাজ্য শ্রীগুরুর চরণে সমর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ কয় জন দৃষ্ট হইয়া থাকে? পরে যিনি গুরুর আদেশে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে সাম্রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিয়া গুরুরাজ্যের নিদর্শনের জন্য মহারাষ্ট্রীয় পতাকাকে গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় আত্মম্ভরিতাশূন্য আদর্শ পুরুষ যে জগতের ইতিহাসে বিরল, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি যে, সেই মহাপুরুষের চরিত্র ধ্যান ও তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পচন্দন প্রদান করিয়া, "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন কর।

ভারতের স্থানে স্থানে যে এই মহাপুরুষের স্মরণোৎসব হইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে মহাকল্যাণকর বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে ভারতে মহাপুরুষ-গণের স্মরণের জন্য অনেক পর্ব্বানুষ্ঠানের নিয়ম আছে, সে ভারত যে নব নব পর্ব্বের প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় ভারতবাসিগণ এক্ষণে এরূপ অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মহাপুরুষ-গণের জন্য পর্ব্বানুষ্ঠানের কথা দূরে থাকুক, ক্রমে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে আর কেহ শ্রাদ্ধকালে মহাভারতপাঠ শ্রবণ করিতে চাহে না। পণ্যাঙ্গনার মুখনিঃসৃত কীর্ত্তনগানে আনন্দোপ-ভোগ করিয়া থাকে। ভীষ্মাষ্টমীর দিন সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের উদ্দেশে কেহ এক গণ্ডুষ জলমাত্রও প্রদান করে না, এবং এমন কি যাঁহাদিগকে আমরা ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতাম, তাঁহাদের জন্মোৎসব, শ্রীরামনবমী বা জন্মাষ্টমী পর্ব্বও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। যে দিন হইতে ভারতবর্ষের মহাপুরুষপূজা মন্দীভূত বা অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। ভারতবাসী এক্ষণে সেই সকল পর্ব্বে কেবল

আমোদ প্রমোদে সময় কাটাইয়া দেয়। যাঁহাদের উদ্দেশে পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের চরিত্র স্মরণ বা আলোচনা করার অবকাশমাত্র পাইয়া উঠে না। এরূপ অবস্থায় যে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা শিবাজী-উৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা যে কত দূর ধন্যবাদের পাত্র তাহা মুখে প্রকাশ করা যায় না। শিবাজী-উৎসবের ন্যায় সমস্ত পৌরাণিক ও আধুনিক মহাপুরুষগণের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে দেশের পক্ষে অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে।

এক কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, শিবাজী মহারাষ্ট্রের লোক, তাঁহার উৎসব ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনুষ্ঠিত হইবে কেন? আমরা ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যে সমস্ত জাতির ও দেশের পূজার্হ ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কেবল মহারাষ্ট্রের নহে, সমগ্র ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। যখন বেণীমাধবের ধ্বজা ভগ্ন হইয়া, তাহার স্থানে মিনার উত্থিত হইল। যখন বিশ্বেশ্বরের মন্দির মসজেদে পরিণত হইল, যখন গোবিন্দজীর মন্দিরচূড়া চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন সেই মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। যখন হিন্দুগণের প্রতি জিজিয়া কর স্থাপিত হইল, যখন হিন্দুর চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন গোহত্যা হইতে লাগিল, সেই সময়ে সেই মহাপুরুষের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি আপনার আত্মাকে মহারাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের জন্য যাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি কি ভারতবাসীমাত্রেরই পূজনীয় নহেন? আমরা বলি যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাপুরুষের ন্যায় মহাপ্রাণ শিবাজীও সমস্ত ভারতবাসীর পূজার্হ।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগে আমরা শিবাজীর ন্যায় আর কোন মহাপুরুষকে সমগ্র ভারতের জন্য ব্যাকুল হইতে দেখি নাই। অবশ্য রাজপুতানার প্রাতঃ-স্মরণীয় বীরেন্দ্রবর্গ, বিশেষতঃ প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের ন্যায় মহাপুরুষ ভারতবাসীমাত্রেরই যে নমস্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কেবল

আপনাদের স্বপ্রদেশ রক্ষার জন্যই মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছিলেন। একমাত্র শিবাজী সমগ্র ভারতের কল্যাণসংসাধনের জন্য বর্ত্তমান যুগে আপনার চেষ্টাকে সমবেত করিয়াছিলেন। তাই এ বিষয়ে তিনি প্রতাপ ও রাজসিংহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শিবাজী সমস্ত হিন্দুজাতির উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাই ভারতবাসীমাত্রেরই তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যখন সমাজের দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সমাজশক্তির প্রবল ইচ্ছায় ঐশীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে অত্যাচার ও অধঃপতনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। শিবাজীর সময়ে ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দুসমাজের সেইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই শিবাজীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাই তিনি কেবল মহারাষ্ট্রের নহেন, কিন্তু সমস্ত ভারতেরই উদ্ধারকর্ত্তা। অতএব ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা হওয়া কর্ত্তব্য।

এই মহাপুরুষের পূজা-উপলক্ষে আমাদের একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। শিবাজী যদিও মুসল্মানের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মুসল্মান বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি কোরান ও মসজেদের সম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মুসল্মানগণকে সেনা বা সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে তিনি দ্বিধা বিবেচনা করিতেন না। শিবাজী কেবল অত্যাচারের হস্ত হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিকে রক্ষা করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কোন ধর্ম্ম বা জাতি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিনি অস্ত্রধারণে প্রণোদিত হন নাই। সেই অত্যাচারী রাজা হিন্দু হইলেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। অতএব আমরা তাঁহার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া যেন মুসল্মান ভ্রাতৃগণের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করি, এবং মুসল্মান ভ্রাতৃগণেরও নিকট অনুরোধ যেন তাঁহারাও শিবাজীর উদার চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হন। আমাদের বিশ্বাস ভারতে হিন্দু মুসল্মানের একতা স্থাপিত না হইলে তাহার কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত।

আর এক কথা শুনা যায় যে, শিবাজী-উৎসবে রাজবিদ্রোহের সূচনা করে। ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। কোন দেশের মহাপুরুষ-

গণের পূজা আরব্ধ হইলে সে দেশে যদি রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে সে দেশের রসাতলেই যাওয়াই শ্রেয়ঃ। শিবাজী মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া যদি তাঁহার উৎসবে রাজদ্রোহের সূচনা হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা তাহার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। শিবাজী অত্যাচারী মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, আমাদের তাহার প্রয়োজন কি? আমরা যে রাজত্বের আশ্রয়চ্ছায়ায় রহিয়াছি, তাহাতে সেরূপ অত্যাচারের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এরূপ কথা মনে স্থান পাইতেই পারে না। আমরা স্বধর্ম্মের, স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণকারী মহাপুরুষের স্মরণের জন্য উৎসব করিব। সেই পবিত্র উৎসবসময়ে রাজদ্রোহের ন্যায় মহাপাপের কথা মনে আসিলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা সংযত চিত্তে মহাপুরুষগণের চরিত্র স্মরণ, কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব, ও আপনাদিগের চরিত্র-গঠনে সচেষ্ট হইব। মহাপুরুষগণের স্মরণোৎসবের অর্থ আমরা এইরূপই বুঝিয়া থাকি।

তাই বলিতেছি ভারতের প্রতি গৃহে মহাপর্ব্বের ন্যায় শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হউক। জ্যৈষ্ঠা শুক্ল ত্রয়োদশীর দিন ভারতের সর্ব্বত্র মহোৎসবে পরিপূর্ণ হউক। কারণ সেই দিবস সমগ্র হিন্দুজাতির উর্দ্ধারকর্ত্তা অভিষিক্ত হইয়া নব হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেবল সেই উৎসব দিবসে নহে, প্রত্যহ হিন্দুর গৃহে গৃহে শিবাজীমূর্ত্তি পুষ্পচন্দনে অর্চ্চিত হউক, হিন্দুগণ প্রাতঃকালে দেবতার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির, নল রাজার সহিত শিবাজী নাম পাঠ করিতে থাকুন, তাহা হইলে সেই মহাপুরুষের প্রতি প্রকৃত ভক্তি প্রকাশিত হইবে, এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র স্মরণ ও কীর্ত্তনে হিন্দুগণ আপনাদিগের চরিত্র গঠিত করিতে পারিবেন। যদি ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপে মহাপুরুষ-পূজা আরব্ধ হয়, তাহা হইলে অধঃপতিত ভারতবর্ষের মস্তকে পুনর্ব্বার বিধাতার কল্যাণ বর্ষিত হইতে পারে।

ভাস্কো ডা গামা।

কোন দেশের আয়তনের ক্ষুদ্রত্বে তাহার জাতীয় জীবনের ক্ষুদ্রত্ব সূচিত হয় না। ইয়ুরোপখণ্ডে ইংলণ্ড ক্ষুদ্রদেশ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ধনগৌরব, জ্ঞানগৌরব ও বীর্য্যগৌরবে সকল জাতি ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত। এশিয়াখণ্ডে জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ; কিন্তু স্বজাতিপ্রেম ও অত্যদ্ভুত শিল্পোন্নতিতে কেহই তাহার সমতুল্য নহে। এইরূপে ইয়ুরোপে পর্টুগালও একটি ক্ষুদ্রদেশ হইলেও এক সময়ে বাণিজ্য-বিস্তার-লোলুপ পর্টুগীজ নাবিক দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযান দ্বারা যাবতীয় পাশ্চাত্য জাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ভগবানের বিধি দুর্জ্ঞেয়। জাতি বা সাম্রাজ্যবিশেষের উত্থানপতন লোকাতীত নিয়মে সমাহিত হয়। যে রোমের বিপুলবীর্য্যকথা মানবমাত্রকেই রোমাঞ্চিত করে, সে রোম আজি কোথায়? গ্রীক্‌জাতির অলোক-সামান্য জ্ঞানালোকভাতি অলীকস্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে; ভারতের স্বর্ণভূমি আজ কয়লার খনির আশ্রয় স্থান। চারি শতাব্দী পুর্ব্বে যে পর্টুগালের বাণিজ্যতরী তরঙ্গায়িত অর্ণববক্ষে জগতের পথপ্রদর্শক হইবার জন্য গর্ব্বভরে নৃত্য করিত, আজ তাহা কোথায়? জ্ঞান ও চরিত্রবলে যে জাতি যখন যাহার উপযুক্ত হয়, বিশ্ব-বিধাতার বিচিত্র তুলাদণ্ডে তাহার জন্য তদনুযায়ী ব্যবস্থা হয়।

স্পেন ও পর্টুগাল একই উপদ্বীপের অন্তর্ভূত। উভয়দেশে একই জাতির বাস। উভয় দেশ একই সময়ে দুর্জ্জয় মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ বিতাড়িত হইবার পর, পর্টুগালে স্বতন্ত্র রাজ্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে স্বনামধন্য পর্টুগীজনৃপতি প্রথম জ্যন্ ও তৎপুত্র হেন্‌রীর সময়ে পর্টুগীজগণ নাব-বিদ্যায়

বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ক্রমে তাঁহারা আফ্রিকার সন্নিকটবর্ত্তী মদিরা প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার ও অধিকার করেন। অবশেষে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ডিয়াজ্ নামক একব্যক্তি আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হইয়া যাবতীয় নাবিকের পূর্ব্বখ্যাতি নিষ্প্রভ করিয়া দেন। উক্ত স্থান ঝটিকা-সঙ্কুল দেখিয়া তিনি উহার নাম "ঝটিকাময় অন্তরীপ" রাখিয়া আসেন; কিন্তু তদানীন্তন পর্টুগালাধিপতি দ্বিতীয় জ্যন্ উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, "উত্তমাশা অন্তরীপ" রাখেন, কারণ উহার আবিষ্কারে তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইয়াছিল। সে আশা কি?

পূর্ব্বকালে অত্যধিক ধনৈশ্বর্য্যের জন্য ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যজগতে স্বর্ণভূমি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তখন ভারতবাসিগণ ইয়ুরোপের সহিত বাণিজ্য করিতেন। এই বাণিজ্য প্রত্যক্ষভাবে চলিত না। ভারতের অপূর্ব্ব উর্ব্বরক্ষেত্র যে অসংখ্য পণ্য প্রসব করিত, তাহাতে ভারতীয় বণিকগণ স্বদেশীয় তরণী সজ্জিত করিয়া আরব ও মিশর প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতেন, এবং আরব ও মিশরদেশের লোকেরা সেই সকল দ্রব্য লইয়া ইয়ুরোপাঞ্চলে বিক্রয় করিতেন। ক্রমে যখন কালচক্রে এই বাণিজ্য প্রথা মন্দীভূত হইবার কারণ উপস্থিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপীয়দিগের ভারতে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার পিপাসা বলবতী হয়, তখন তাঁহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে উত্তরদিকে অনেক অভিযান বিফল হয়। অবশেষে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস নামক একজন নাবিক স্পেনের সাহায্যে পশ্চিমমুখে গিয়া, আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষের সহজ সমুদ্র-পথ যে পশ্চিমদিক দিয়া নহে, তদ্দারা তাহা প্রমাণিত হইল।

স্পেনের এই আকস্মিক প্রতিপত্তিতে পর্টুগালের দুর্দ্দমনীয় ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল। ডিয়াজের আবিষ্কারে ভারতবর্ষে আসিবার যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কলম্বস ভারতভূমির প্রকৃত সন্ধান পান নাই জানিয়াসেই আশা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল। কিন্তু এ সময়ে পরমোৎসাহী নরপতি দ্বিতীয় জ্যন্ পরলোকগত হইয়াছিলেন। তবে এ অবস্থার সময়েও তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত

হয় নাই, কারণ তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এমানুয়েল স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য সমভাবে যত্নশীল ছিলেন। তিনি ডিয়াজের প্রদর্শিত পথে আরও অগ্রসর হইবার জন্য অনতিবিলম্বে এক বিশিষ্ট অভিযানের আয়োজন করিলেন। কিন্তু কে এই অভিযানের অধ্যক্ষ হইবে?

কর্ম্মকুশল নবভূপতি মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। যে অভিযানের সাফল্যে সভ্যজগতে পর্টুগাল শীর্ষস্থান অধিকার করিবার প্রত্যাশা করিতে পারে, যে অভিযানের অকৃতকার্য্যতায় নবোত্থিত দৃপ্ত স্পেনের বিদ্রূপ-হাস্য-রোলে পর্টুগালের আস্যমণ্ডল কালিমাময় হইয়া যাইবে, সে অভিযানের নেতা কে হইবে? চিন্তাভারাক্রান্ত ডন্‌এমানুয়েল একদিন দিবারম্ভে মহাড়ম্বরে রাজাসনে সমাসীন; কত প্রাচীন মন্ত্রী ও প্রবৃদ্ধ পারিষদ, কত অভিজ্ঞ নাবিক ও ধনাঢ্য বণিক, কত প্রতিভাসম্পন্ন রাজনৈতিক ও গর্ব্বোন্নত যোদ্ধৃপুরুষ ক্রমে ক্রমে সেই বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষে সমবেত হইতেছিলেন। সহসা এক সুন্দর সুগঠিতকলেবর, ত্রিংশবর্ষ দেশীয় পুরুষপুঙ্গব সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রক্তিমাভ কপোলদেশ, সুন্দর শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত মুখমণ্ডল, তেজোদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর মূর্ত্তি, এবং প্রতিভাবিস্ফারিত নয়নের তীক্ষ্ণপ্রভা নরপতির চিত্তাকর্ষণ করিল। তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও কটি-বিলম্বিত অসি অসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার উচ্চবংশ ও যোদ্ধৃজীবনের সাক্ষ্য দিল। এই ভাগ্যবান্ পুরুষ নৃপতির নিকট

অপরিচিত ছিলেন না। ভাস্কো ডা গামার বীর্য্যবত্তা, উচ্চপ্রকৃতি ও স্বদেশপ্রীতি বহুরণক্ষেত্রে ও বহু-বিঘ্নময় সময়ে পরীক্ষিত হইয়াছিল। নৃপতি গামাকে

আদরে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকেই সুসজ্জিত তরণীত্রয় সম্বলিত নবাভিযানের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

ধারাধরের বারিধারা ও নরপতির করুণাধারা একই প্রকার; যাহার উপর বর্ষিত হয়, তাহাকে প্লাবিত না করিয়া ছাড়ে না। ভাস্কো অবিলম্বে অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বকীয় অভিপ্রায়ানুসারে স্বীয় ভ্রাতা পলো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিকলস্ কোয়েলোকে সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। ভাস্কো স্বয়ং "র্‍্যাফেল" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাহাজ খানিতে থাকিলেন, এবং গ্যাব্রিয়েল ও মিগেলে যথাক্রমে পলো ও কোয়েলোকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে মহোৎসাহে ও মহাসমারোহে সেই তরণীমালা লিসবন্ বন্দর পরিত্যাগ করিল। বিদায়কালে অসংখ্য নরনারী অবিরত অশ্রুজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই বিদায়-ঘাটের নাম হইয়াছিল "অশ্রুময় তীর"।

কতদিন ধরিয়া তরণীত্রয় অপরিজ্ঞাত জলধি-পথে চলিল; কোথায় যাইতেছে, কখনও ফিরিবে কি না, কেহ জানিত না। কিন্তু ভাস্কো ডা গামার সাহস অদম্য এবং লক্ষ্য অবিচলিত। যখনই কেহ প্রত্যাগত হইবার অভিপ্রায় জানাইত, তখনই তিনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক তারস্বরে উত্তর করিতেন "হয় ভারত, নয় মরণ—এই উভয়ের একতরই আমার একমাত্র সাধনা।"

কিছুদিন পরে তিনি সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন। সেখান হইতে আরও অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে তাঁহারা এক ভীষণ ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু গামা ঈশ্বরের কৃপা ও মনের সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, অগ্রসর হইলেন। ঝড় থামিল; তিন খানি জাহাজ একত্র হইয়া, আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছিল; তিন জন অধ্যক্ষ আবার স্নেহালিঙ্গন ও আমোদ প্রমোদে কয়েক দিন অতিবাহিত করিলেন। এস্থানে কতকগুলি নগ্নদেহ, কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য অধিবাসীর সহিত দেখা হইল; গামা তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা, কাচখণ্ড ও প্রবালাদি দিয়া বশীভূত করিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কোনও সংবাদ তাহাদিগের নিকট পাইলেন না। কিছুদিন পরে ২০শে নভেম্বর তারিখে

ভাস্কো "উত্তমাশা অন্তরীপ" অতিক্রম করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও ইয়ুরোপীয় নাবিক এ অন্তরীপ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

যখন এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আফ্রিকার পূর্ব্বকূল বাহিয়া চলিলেন, তখন নিকলসের জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহী হয়। ভাস্কো পরুষ বচন ও মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে বশীভূত করেন। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তাঁহারা যে দেশের উপকূলপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, যীশুখৃষ্টের জন্মদিনের স্মরণার্থ ঐ স্থানের নাম রাখিলেন "নাতাল" (Natal) *। দশ এগার দিন পরে তাঁহারা একটি বড় নদী এবং বিস্তৃর্ণ উপসাগরে উপনীত হন। সেই শান্ত, স্বচ্ছ ও সুন্দর নদীর নাম রাখা হইল—"দয়া নদী" † উপরোক্ত উপসাগরেরই বর্ত্তমান নাম "ডেলগোয়া উপসাগর"। এই স্থানেই তরণীগুলির সংস্কার করা হইল ; নিকলসের "মিগেল" নামক জাহাজখানি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া সেই উপদান দ্বারা অপর দুইখানি সুন্দর ভাবে সংস্কৃত হইল। সেস্থান হইতে তাঁহারা জেম্বেজী নদীর মোহানায় পৌছেন। এই স্থানের অধিবাসিবর্গের নিকট তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত দেখিতে পান। তজ্জন্য ভারতবর্ষ নিকটবর্ত্তী বলিয়া আশা হয়।

আরও কয়েকদিন পরে তাঁহারা মোজাম্বিক উপকূলে পৌছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা "জম্বুক" নামক এক প্রকার অর্ণবযান দেখিতে পান। এই স্থানের অধিবাসীরা সকলেই মুসল্মান। গামা তাহাদের অধিপতি সেখের সহিত পরিচয় ও সদ্ভাব সংস্থাপন করেন। এপ্রিল মাসের শেষভাগে তাঁহারা মম্বাজা নামক স্থানে পৌছিলেন। তথাকার মুসল্মান বণিকেরা পর্টুগীজদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই। এজন্য সেস্থানে অধিক অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা মেলিণ্ডা নামক সুন্দর সহরে উপনীত হইলেন। এ স্থানের সৈকতপুলিনসন্নিকটবর্ত্তী ফলফুলসমন্বিত সুন্দর ও সুরম্য উদ্যানাবলী পর্টুগীজ নাবিকদিগের নয়নানন্দবর্দ্ধন করিল। এত দূরদেশে আসিয়া তাঁহারা পুনরায়

* Natal = Pertaining to birth.

† The River of Mercy.

লিসবনের মত দ্বিতীয় সহর নেত্র-পথবর্ত্তী করিতে পারিবেন, এ আশা কখনও করিতে পারেন নাই। মেলিণ্ডাধিপতি নানা উপঢৌকন দিয়া বৈদেশিকদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। ভাস্কো ডা গামাও পর্টুগালের রাজার নামে একখানি সুন্দর তরবারি তাঁহাকে উপহার দিলেন। বাণিজ্য-বায়ুর অপেক্ষায় এই স্থানে পর্টুগীজ্‌দিগকে তিনমাস অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

যাত্রাকালে মেলিণ্ডাধিপতি পর্টুগীজ্‌দিগের দুইখানি জাহাজের জন্য দুইনজ অতি সুদক্ষ কর্ণধার দিয়াছিলেন। তাহাদের একজন পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় এক জাহাজে কার্য্য করিতেন। তিনি Astrolato ও Quadrant প্রভৃতি নক্ষত্রাদির উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার অতি সুন্দররূপে জানিতেন, ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক সামুদ্রিক যন্ত্রের ক্রিয়া জানিতেন, সে সকল যন্ত্র পর্টুগীজগণ কখন স্বপ্নেও দেখেন নাই। ভারতবর্ষীয় নাবিকেরা যে সমুদ্রাভিযানে কত পারদর্শী ছিলেন, এই ঘটনা হইতে তাহা সম্যক্‌ প্রমাণিত হয়।

মেলিণ্ডা হইতে অনুকূল পবনে পক্ষবিস্তার করিয়া পর্টুগীজ তরণীদ্বয় অবিলম্বে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে কালিকটে উপনীত হইল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আরবীয় বণিকেরা কালিকটে আসিয়া ভারতবাসীর সহিত বাণিজ্য করিত। এই ব্যবসায়ে বিপুল অর্থলাভ করিয়া বহুসংখ্যক মুসল্মান তথায় বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিল। এই মুসল্মান বণিকদিগের সহিতই পর্টুগীজ দিগের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে "জামরীণ" বা "সমীরী" উপাধি-ধারী জনৈক হিন্দুরাজা কালিকটের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি ভাস্কোর সহিত সদ্ভাবে সন্ধিস্থাপন করেন এবং পর্টুগীজদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তাহারা প্রবাল, সিন্দূর, পারদ, তাম্র প্রভৃতি স্বদেশজাত দ্রব্য ও অর্থ বিনিময়ে ভারতজাত আদা, মরীচ, দারুচিনি ও অন্যান্য মসলা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দ্রব্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করায় এবং মন্দ দ্রব্য পর্য্যন্ত সমান মূল্যে লইতে স্বীকৃত হওয়ায়, অধিবাসীদিগের যাহার যাহা ছিল, সমস্ত ব্যস্তভাবে বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাতে মুসল্মান বণিকদিগের অত্যন্ত

ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। তাহারা কৌশলে ভাস্কো ডা গামাকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে জামরীণের ভয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। জামরীণ উক্ত বণিকদিগকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন, এবং ভাস্কোর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অবশেষে ভাস্কো ডা গামা প্রয়োজনমত স্বকীয় জাহাজ দুইখানি ভারতপণ্যে পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিবার সময়ে জামরীণ পর্টুগালের নরপতির নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—"আপনার পরিবারভুক্ত উচ্চবংশীয় ভাস্কো ডা গামা আমার রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছেন, আমি (তাঁহার ব্যবহারে) অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। আমার রাজ্য মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা, মরীচ ও বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়। আমি আপনার দেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, ও লোহিত রঙ্ পাইতে চাই।"

আসিবার সময়ে ভাস্কো কানানরে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এ স্থানের রাজা পূর্ব্বেই দৈবজ্ঞ মুখে শুনিয়াছিলেন যে উত্তরকালে ইয়ুরোপীয় শ্বেতকায় জাতি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড অধিকার করিবেন। কানানরের রাজা পর্টুগীজদিগকে সেই শ্বেতকায় জাতি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনে সমুৎসুক হন। পর্টুগীজেরা ঐ স্থানে মহানন্দে কালযাপন করিয়া অঙ্গদ্বীপে* উপনীত হন। এই সময়ে গোয়াধিপতি "সেবায়ো"† নামক এক রাজা ভাস্কোর জাহাজদ্বয় বলপুর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ভাস্কো কৌশলক্রমে এই সংবাদ অবগত হইয়া অঙ্গদ্বীপে গোয়াবাসীদের যে সকল বাণিজ্যতরী ছিল, তৎসকল একদিন রাত্রিযোগে হঠাৎ অধিকার করিয়া লন। তথা হইতে তাঁহারা একমাস কাল মধ্যে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে পুনরায় মেলিণ্ডায় আসিয়া পৌঁছেন। পুর্ব্ববন্ধু মেলিণ্ডাধিপের সহিত পুনরায় আদর অভ্যর্থনা হইল। তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করতঃ পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে তাঁহারা কেপভার্ড দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইস্থানে একটি বিপদময় ঘটনা ঘটে।

* Angediva † Sabayo

কেপভার্ডে ভাস্কোর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পলো গামা মৃত্যুমুখে পতিত হন। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় বিজয়োন্মত্ত ভাস্কোর আনন্দলহরীতে বিষাদের সংমিশ্রণ হইল—তরুণারুণদীপ্ত দিবারম্ভ যেন জলদাবরণে মলিন হইয়া গেল। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভাস্কো মহাসমারোহে লিস্‌বনে পৌছিয়া শত সহস্র উদ্বিগ্ন নয়নের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন।

সেই শুভদিনে পর্টুগালের রাজধানীতে রাজা অপেক্ষাও যেন গামার সম্মান অধিক বলিয়া বোধ হইল। যখন তিনি সানন্দে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন নৃপতি এমানুয়েল আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ভাস্কোকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাকে "ডন্" বা লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ভাস্কোর যশঃপ্রভা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল। আজ যে এশিয়াখণ্ডে পাশ্চাত্য জাতির বিপুল আধিপত্য—তাহার মূল পথপ্রদর্শক—ভাস্কো ডা গামা। প্রাচীন ভারতবর্ষের বহুযুগসংগৃহীত অপরিমিত অর্থভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া যাঁহারা স্বজাতীয়দিগকে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে এই ভাগ্যবান পর্টুগীজ বণিকের নিকট যথেষ্টভাবে ঋণী। রাজা তাঁহাকে অযাচিতভাবে যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তিনি প্রতি বৎসর ভারতাগত যথেষ্ট মসলা বিনা ব্যয়ে পাইবেন, তাহারও আদেশ দিলেন। পর্টুগীজ কবিশিরোমণি কেমিয়ন (Cameon) স্বপ্রণীত "লুসিয়ড" নামক মহাকাব্যে ভাস্কো ডা গামার বীরচরিত্র ও কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন।*

১৫০২ খৃষ্টাব্দে ডন্ ভাস্কো দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন। এবার সোফালা ও মোজাম্বিক দেশের রাজাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু কালিকট্টের জামরীণ আরবীয়দিগের সাহচর্য্যে বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করেন। তখন ভাস্কো কানানর ও কোচীনের নৃপতিদিগের সাহায্যে কালিকট্টের সুন্দর সহর ধ্বংস করিয়া দেন এবং রাজপ্রাসাদ ধুলিসাৎ করেন। আরবীয়দিগের সহযোগে

* কবি কেমিয়ন ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎপ্রণীত লুসিয়ড ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে রচিত হয়।

জামরীণ রণতরী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে অসংখ্য মুসলমান হত হয়, তাহাদের কতকগুলি জাহাজ ধৃত ও লুণ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ভাস্কো ভারতসমুদ্রের "এডমিরাল" বা নৌসেনাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

প্রথমবার ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই ভাস্কো ক্যাথারিণ নাম্নী এক উচ্চবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মে। ভাস্কো পুত্রপরিজনসহ মহাসম্মানে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতেছিলেন। অবশেষে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল, তখন আবার ভারতাভিযানের প্রবৃত্তি তাঁহার মনোমধ্যে জাগ্রত হয়। এসময়ে ভারত-ভূখণ্ডে পর্টুগালের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; গোয়া, অরমাজ প্রভৃতি স্থান অধিকৃত হইয়াছে; পর্টুগীজদিগের বাণিজ্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হইয়াছে। এবার ভাস্কো বৃদ্ধবয়সেও নবীনযুবকের মত উৎসাহশীল হইয়া দুইপুত্র সমভিব্যাহারে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ভারতীয় পর্টুগীজ সাম্রাজ্যসমূহের রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যান। নৃপতি এমানুয়েলের মৃত্যু হওয়াতে এসময় তৃতীয় জ্যন্ পর্টুগাল শাসন করিতে-ছিলেন; এবার ভাস্কো তিন মাস মাত্র ভারতবর্ষে ছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি দুষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক পর্টুগীজ কর্ম্মচারীদিগকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া তত্রত্য শাসনপ্রণালীর আমূল সংস্কার করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে কোচিনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোচিনে তাঁহার সমাধি হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে উক্ত স্থান হইতে তাঁহার অস্থি স্থানান্তরিত করিয়া পর্টুগালের একটি শান্তিময় পবিত্র সমাধিস্থলে সযত্নে সমারোহে রক্ষিত হইয়াছিল। যে ভারতভূমি তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবসান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

জগৎশেঠ

উপক্রমণিকা

"শেঠের বংশের হায় ! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষমুদ্রাসমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শতমুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্রভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি (অন্য কোন্ ছার !)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।"

কবিবর নবীনচন্দ্রের অতুল কল্পনা শেঠগৌরবের যে অমরগীতি চিরস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে সেই গৌরব-গাথা সত্য সত্যই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কেবল বঙ্গবাসী কেন,—সমগ্র ভারতবাসীর নিকটেও শেঠ-বংশের ঐশ্বর্য্যকাহিনী প্রবাদকাহিনীর মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ভারতবর্ষের ময়ূর-সিংহাসন ইতিহাসবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে;—সেই গৌরবোদ্দীপ্ত মোগল-রাজসিংহাসনাধিপতি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইতে পর্ণকুটীরবাসী শাকান্নভোজী দরিদ্র গৃহস্থ পর্য্যন্ত, সকলেই শেঠবংশের ঐশ্বর্য্যকাহিনী আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর করুণাকিরীট-

* জগৎশেঠ পূর্ব্বপ্রকাশিত ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

বিভূষিত হইয়া অদ্বিতীয় ধনকুবেররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যপ্রবাহ দ্বিতীয় জাহ্নবীধারার ন্যায় আসমুদ্র হিমাচল পরিপ্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা যে লোকমুখে প্রবাদকাহিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি ?

এই গৌরবগীতি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দেশান্তরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর ইউরোপখণ্ডেও জগৎশেঠের ঐশ্বর্য্যকাহিনী শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন রথচাইল্ডের কল্যাণে আধুনিক ইংরাজ স্ফীতবক্ষে অযুত-লৌহ-বর্ম্মে ভারত-ভূমিকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছেন ! জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র বন্যাতাড়িত জলপ্রবাহের ন্যায় খরবেগে ইংরাজবণিকের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার সুদূরে—শ্বেতদ্বীপে—বহন করিবার জন্যই প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু ইংরাজবণিকের মস্তকে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর শুভাশীর্ব্বাদ নিপতিত হইবার পূর্ব্বে শেঠ-বংশের ঐশ্বর্য্য-কাহিনী সমস্ত ইউরোপখণ্ডকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের কথা অনেকে কল্পনায় ধারণা করিতে না পারিয়া, অনেক সময়ে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সকল কাহিনীই আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতেন !

সেকালের সমগ্র পরিজ্ঞাত প্রদেশের মধ্যে জগৎশেঠের ন্যায় আর কেহ ধনশালী ছিলেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহগণ মুর্শিদাবাদের শেঠদিগকে "জগৎশেঠ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের ধনভাণ্ডারের সহিত বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত কার্য্যেরই কিছু না কিছু সংস্রব থাকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, "জগৎ-শেঠ" উপাধি তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে। উহা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ "ভূতার্থব্যাহৃতি" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধনসম্পত্তিতে তাঁহারা যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহা-দের ক্ষমতাও অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থ ও ক্ষমতাবলে জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়া

তুলেন। বাদশাহ নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা জমীদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের অজস্র অর্থবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেন। বৈদেশিক ইংরাজ ফরাসিগণ তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব সমস্ত বিষয়েই সেই ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী প্রত্যর্পিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতমাত্রেই নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের মন্ত্রণায় তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের দুইটি বিশাল সমরক্ষেত্র—গিরিয়ায় ও পলাশীতে যে রণক্রীড়ার অভিনয় হইয়াছিল, জগৎশেঠগণ তাহার মূলে না থাকিলে তাহা কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। জগৎশেঠের ক্রোধাগ্নিতেই মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র ও মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব সরফরাজ খাঁ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যান, এবং তাঁহাদের সাহায্যেই গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং মীরজাফর ও মীরকাসীম ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ বা ফকিরী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন, জগৎশেঠগণের ক্রোধঝটিকা সেই তুফানসৃজনের মূল। দুঃখের বিষয়, সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাঁহাদিগকেও অনন্তগর্ভে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যে ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বরীর শান্তিধারায় আসমুদ্র হিমালয় স্নিগ্ধ হইতেছে, জগৎশেঠগণের সাহায্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। একজন ইংরাজ বলিয়াছেন যে "হিন্দু মহাজনের অর্থ ও ইংরেজ সেনাপতির তরবারি, বাঙ্গলায় মোসলমানরাজত্বের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে।"* কেবল্ অর্থ বলিয়া নহে, এজন্য

* "The Rupees of the Hindu Banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahomadan power in Bengal." (Quoted by Hunter.)

তাঁহাদিগকে আত্মবিসর্জ্জনও দিতে হইয়াছে। যে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরীট-প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থবৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা ইংলণ্ডবাসীদিগকে একবার সেই পুরাতন কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

বাস্তবিক জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের মূল ছিলেন। রাজস্ব বিষয়ে জমীদারদিগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্যবিষয়ের তাঁহারাই তত্ত্বাবধান করিতেন, এতদ্ভিন্ন শাসনকার্য্য তাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। রাজ্যের মুদ্রা তাঁহাদের মতানুসারেই মুদ্রিত হইত। শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা ছিল না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদী সংস্থাপিত থাকায়, বাদশাহ নবাব হইতে রাজা মহারাজ ও বণিক্‌মহাজনগণ সেই সমস্ত গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। প্রতিনিয়ত কোটী কোটী অর্থে তাঁহাদের কোষাগার পরিপূর্ণ হইত। তৎকালে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে কেবল মুদ্রা ঢালিয়া দিয়াই স্থতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা বন্ধ করিতে পারিতেন। হিন্দুস্থান অথবা দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের সমান অর্থশালী মহাজন তৎকালে দৃষ্ট হইত না। ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক ছিল না, শেঠদিগের সহিত যাহাদের তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত গদীয়ানই তাঁহাদের প্রতিনিধি অথবা স্ববংশীয় ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, সেই লুণ্ঠিত অর্থ তাঁহাদের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। সেই লুণ্ঠনের পরও তাঁহারা প্রতিবারে দরবারে কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। এক কথায়, তাঁহাদের এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল যে, তাহার বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, অতিরঞ্জনের আভাস প্রদান অথবা কাহিনীর ন্যায় বর্ণনা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাদের অধীনস্থ সহস্র সহস্র লোক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অগাধ ভূসম্পত্তির অধীশ্বর

হইয়া গিয়াছে। * দুঃখের বিষয় সেই জগৎশেঠদিগের আর সে গৌরব নাই। তাঁহাদিগের বিশাল ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। জগৎশেঠদিগের বংশধর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বৃত্তির আশায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইয়া প্রত্যাখ্যাত! যাঁহাদিগের অর্থোপহারে ও আত্মবলিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষাভাণ্ডহস্ত তাঁহাদের বংশধরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ন্যায়পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যয়বাহুল্যের কার্য্য হইত না।

* "Their riches were so great, that no such bankers were seen in Hindustan or Deccan ; nor was there any banker or merchant, that could stand a comparison with them, all over India. It is even certain, that all the bankers of their time in Bengal, were either their factors, or some of their family. Their wealth may be guessed by this only fact. In the first invasion of the Marhattas, and when Moorsheodabad was not yet surrounded by walls, Mir Habib, with a party of their best horses, having found means, to fall upon that city, before Alywerdy qhan could come up, carried from Jagad-Seat's house two crores of rupees, in Arcot coin only ; and this prodigious sum did not affect the two brothers, more than if it had been two trusses of straw. They continued to give afterwards to government, as they had done before, bill of exchange, called dursunnies, of one crore at a time by which words is meant, a draft, which the acceptor is to pay at sight, without any sort of excuse. In short their wealth was such that there is no mentioning it, without seeming to exaggerate, and to deal in extravagant fables. Thousands of their agents and factors, have acquired such fortunes in their service, as have enabled them to purchase large tracts of land, and other astonishing possession." (Seir Mutuqherin Trans. Vol II. pp. 226-227.)

মহারাণী স্বর্ণময়ী।*

মহৎ ব্যক্তির মৃত্যু-উপলক্ষে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য কিম্বা তাঁহাদের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত রাখিবার জন্য কিম্বা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য সভা সমিতি করা পাশ্চাত্য প্রথা হইলেও আমাদের এদেশের পক্ষে যে সম্পূর্ণ নূতন তাহা নহে। আমরাও স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয় স্বজনের পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রতিবৎসর শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকি। আজ যে পুণ্যবতীর গুণকীর্ত্তন করিতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনিও আমাদের আপনার লোক ছিলেন। যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, যিনি পরের দুঃখে কাতর হইয়া আপন পর কিম্বা স্বদেশী বিদেশী, তাঁহার স্বধর্ম্মী কিম্বা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিতে জীবনোৎসর্গ করেন, তিনি পর হইলেও আপনার। তাই মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদের আপনার লোক ছিলেন। কত বিদ্যার্থী তাঁহার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারে কৃতী হইয়াছেন, কত দীন দুঃখী তাঁহার ভাণ্ডার হইতে অন্ন বস্ত্র পাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে, কত কবি গ্রন্থকার তাঁহার অর্থে তাঁহাদিগের স্বরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার উৎসাহে ছাত্র পড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন, কত অসহায়া বিধবা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন, কত বিদ্যালয়নির্ম্মাণ কত চিকিৎসালয়নির্ম্মাণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্বর্ণময়ী পরের জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন; যাহার যখন কোন অভাব হইয়াছে,

* বহরমপুর "Students' Guild" সভায় স্বর্ণময়ী বাৎসরিক উৎসবের বক্তৃতা।

তাঁহার কর্ণগোচর হইলেই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়া সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার ধনাগার যেন সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল, সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হিন্দু, মুসল্মান, জৈন, খৃষ্টান, কে না তাঁহার দয়ার অমৃত ধারায় সিক্ত হইয়াছেন? তাঁহার সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে কোন অসহায় অন্ধ, অতুর, স্থবির ও অক্ষম ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভাবিত না। তাহারা জানিত যে মহারাণীর দ্বারে গিয়া নিত্য মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া আনিলেই তাহাদের জীবনধারণ করা হইবে। আজ আমরা যে সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা এখানকার স্কুল কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যখন গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কলেজের ব্যয় বহন করিতে আর স্বীকার করিলেন না, তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী সে ভার গ্রহণ করিয়া এখানকার বালকগণের উচ্চ-শিক্ষার প্রধান সহায় হইলেন। আবার যখন খৃষ্টান মিশনরিগণ এই খাগড়া মিশনরি স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তখন দেশের লোকে তাঁহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেও মহারাণীর নিকট হইতে তাঁহারা যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মনের ভাব শৈশবাবস্থা হইতেই সেই ভাবে অল্পে অল্পে গঠিত হয়, এবং তাহা সদ্‌গুণ হউক, বা অসদ্‌গুণ হউক অল্পবয়সেই যে তাহার আভাস পাওয়া যায়, ইহা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক নেলসন্‌কে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইয়া যখন তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "নেল্‌সন তুমি এখানে একাকী বসিয়া আছ তোমার ভয় লাগে না।" শিশুবীর ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না; তিনি উত্তর করিলেন "Fear, Grandmama, I never saw fear. What is it?" গল্প শুনিয়াছি, রাণী ভবানী পোষ্যপুত্র লইবার সময় অনেক গুলি অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালককে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে আনাইয়াছিলেন; কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ ছিল, তাহাদের সকলকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া নূতন কাপড় চাদর ও জুতা পরাইয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলে তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। বালকগণ সকলেই আহারান্তে তাড়াতাড়ি কাপড় চাদর ও জুতা

পরিয়া কেহ বা পরিতে পরিতে রাজা হইবার আশায় দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হইলে পর, কেবল একটি বালককে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, যে পুরাতন ভৃত্য তাহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছিল সে বলিল "কি তুমি অন্দরে যাইবে না"? দরিদ্র বালক উত্তর করিল, "আমাকে জুতা পরাইয়া দিবে কে?" তখন সেই ভৃত্য অবাক্ হইয়া বালকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "দেখিতেছি আমার তোমাকেই জুতা পরাইতে হইবে", এই বলিয়া জুতা পরাইয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। ভবানী সেই বালকটিকেই মনোনীত করিলেন। পরে সেই রামকৃষ্ণ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়া এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিষয় বৈভবে কিছুমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি গল্প শুনিয়াছিলাম যে, যখন কুমার কৃষ্ণনাথের বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিতে কাশীমবাজার রাজবাটি হইতে কর্ম্মচারিগণ বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকটি পাত্রী মনোনীত করিয়া কাশীমবাজারে সংবাদ দেওয়ার পর স্বর্ণময়ী পাত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। সেই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহারা যে কয়টি পাত্রীকে দেখিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেখিবার সময় প্রত্যেককে একটি করিয়া মোহর দিয়াছিলেন। ধনী হউক বা দরিদ্র হউক আশীর্ব্বাদী কিম্বা যৌতুকাদির জন্য প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিতে কেহই অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু সেই বালিকাগণের মধ্যে একটি দরিদ্রকন্যা সেই অপরিচিত ব্যক্তিগণের দান গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিতা হইল। কর্ম্মচারিগণের অনেক আদর অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই বালিকা স্বর্ণময়ী সেই মোহর স্বহস্তে লইল না। যিনি দরিদ্রজননী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পরকে অকাতরে দান করিতে হয় তাহাই জানিতেন, পরের নিকট হইতে দান লইতে তো তিনি শিক্ষা করেন নাই। ভগবান্ শুভসম্মিলন ঘটাইয়া দিলেন। স্বর্ণময়ীর সহিত কৃষ্ণনাথের বিবাহ হইল। রাজা কৃষ্ণনাথও সৎকার্য্যে দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। সুশিক্ষিত স্বামীর সংসর্গে থাকিয়া স্বর্ণময়ীর উদার মনোবৃত্তি

আরও বিকাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু বেশী দিন তিনি সাংসারিক সুখভোগ করিতে পাইলেন না, কয়েক বৎসর পরেই স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন। মহারাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী তিন জনেই অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। পরের দুঃখ দূর করিতে যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, যাঁহারা প্রতিনিয়ত পরের ভাবনা চিন্তা করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদের নিজের সাংসারিক সুখসম্ভোগচিন্তায় আকৃষ্ট থাকিবার অবসর কোথায়? তাই বুঝি বিধাতা তাঁহাদিগের পক্ষে এই কঠোর বিধান করিয়াছিলেন। মহারাণীর বিস্তৃত সম্পত্তির মধ্যে তাঁহার প্রধান জমিদারী "বাহিরবন্দ"। কেমন এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই বাহিরবন্দের জমীদারগণের মধ্যে যে তিন জন তাঁহাদের জীবদ্দশায় দানব্রতে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তিনজনেই বাঙ্গালী হিন্দুরমণী—প্রথমে রাণী সত্যবতী, পরে মহারাণী ভবানী, শেষে মহারাণী স্বর্ণময়ী বাহিরবন্দের ভূস্বামিনী ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল অনবরত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরদুঃখমোচন করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী সন ১৩০৪ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৩০৪ সাল বঙ্গবাসীর নিকট কি দুর্বৎসর হইয়াই আসিয়াছিল! ইহা অপেক্ষা দুর্বৎসর আর কখনও হইয়াছে কিনা জানিনা। প্রথমে ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাস ভীষণ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষকে সঙ্গে লইয়া দেখা দিল। কিন্তু বিপদ তো কেবল একটি আসেনা, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এক প্রলয়কারী ভূমিকম্পে বঙ্গদেশ কাঁপিয়া উঠিল। শেষে দুর্ঘটনার উপর দুর্ঘটনা! আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস যাইতে না যাইতে মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্গারোহণ করিলেন! সে সংবাদ শুনিয়া মনে হইল যেন একটি ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। মহারাণীর মৃত্যুর পর একদিন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে কাশীমবাজার রাজবাড়ীর কোন্ কোন্ স্থান ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরের নানাস্থান—যেখানে মহারাণী বাস করিতেন তাহা দেখিয়া শেষে ভূমিকম্পের পরে মহারাণী যে বাংলো ঘরে বাস করিয়াছিলেন তাহাও দেখিলাম। যখন মহারাজা আমাদিগকে এটা এই ঘর, এ ঘরে এই ছিল, ও ঘরে এই

হইত বলিয়া এই সমস্ত আমাদিগকে দেখাইতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল যেন একজন তীর্থের পাণ্ডা তাঁহার অধিকারভুক্ত তীর্থস্থান গৌরবের সহিত আমাদিগকে দেখাইতেছেন। তীর্থদর্শনে চিত্তশুদ্ধি হয়, সে দিন আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। মনে হইল যে, দয়ার জীবনময়ী প্রতিমা এই গৃহে বাস করিতেন, মনে হইল যে, এই গৃহ হইতে করুণার স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, মনে হইল এই বাড়ীতে প্রতি-বৎসর কত ধর্ম্মানুষ্ঠান, কত দেবসেবা, কত ব্রাহ্মণভোজনাদি হইয়াছে, আরও মনে হইল যে, সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর সুখ দুঃখের সহিত যাঁহার জীবনের নিত্যসম্বন্ধ ছিল, সেই ভাগ্যবতীর এই পরিত্যক্ত বাসভবন। এই সকল মনে করিয়া সেদিন যে পবিত্র স্মৃতি লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে কথা কখনও এ জীবনে ভুলিব না।

শ্রীমণিমোহন সেন।

হেষ্টিংসব্যঙ্গ-চিত্র।*

(১)

ক্লাইব কর্ত্তৃক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, যিনি তাহার উপর প্রাচীর উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই ভারতের প্রথম ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিষয় সাধারণে কিছু না কিছু অবগত আছেন। কিরূপে কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহার নাম জাহির হইয়াছিল, কিরূপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া তিনি আপনার প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার

* হেষ্টিংসব্যঙ্গ-চিত্রগুলিতে যে সমস্ত ইংরেজী লিখিত আছে, বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ বা মর্ম্ম প্রচার করিলে প্রকৃত রসবোধের সম্ভাবনা না থাকায়, আমরা মূল ইংরেজীই প্রকাশ করিলাম। তজ্জন্য এই প্রবন্ধটি সাধারণতঃ ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণের জন্য উদ্দিষ্ট হইল। তবে কেবল বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গও এই প্রবন্ধ হইতে চিত্রগুলির মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

জমীদারগণের নিকট হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া, কিরূপে আপনার কুপোষ্য-গণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রীয়, মহীশূরীয়, ও রোহিলাগণের সহিত যুদ্ধে ভারতভূমিকে রুধিরস্নাতা কয়িয়াছিলেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয় বিশদরূপে অবগত আছেন। হেষ্টিংস ভারতে যেরূপ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর মনে অদ্যাপি অঙ্কিত আছে। আজিও ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মনে যে সে সকল প্রাচীন কাহিনীর উদয় হয় না এরূপ নহে, তবে অনেকের মন হইতে তাহা অপসৃত হইয়াও গিয়াছে। এমন কি হেষ্টিংসের জীবনকালেও অনেকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, কেহ কেহ আবার তাঁহাকে প্রশংসাপত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের মনে সে সকল বিষয়ের উদয় অস্তের বিশেষ কোন রূপ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে জাতির জন্য তিনি অত্যাচার ও রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই উদার ইংরেজ জাতি তাঁহার সকল বিষয়কে একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেয় নাই। যদিও হেষ্টিংস কর্ত্তৃক প্রাচ্য দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রাজপুরুষগণ ও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া পরিণামে জনসাধারণেও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা তাঁহার অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য ন্যায়বিচার অবলম্বন করিতে ত্রুটি করে নাই। ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিয়াই বোধ হয়।

ভারত হইতে বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি নিপতিত হয়। ক্রমে তাহাদের কর্ণে তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। কমন্স সভা সেই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন। বার্ক, ফক্স, শেরিডান প্রভৃতি মনিষীগণ সেই সমস্ত

অত্যাচারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারত কাউন্সিলের সুযোগ্য সদস্য ফ্রান্সিস সাহেব তাঁহাদের নিকট হেষ্টিংসের সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন, ও তাহার প্রমাণাদিও উপস্থাপিত করিলেন। তাহার পর কমন্স সভা হইতে লর্ড সভায় হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ আনীত হইল। সেই অভিযোগের বিচারের জন্য ওয়েষ্টমিনষ্টার হলে কিঞ্চিদধিক সপ্তবর্ষ কাল লর্ডগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ ও ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ২৩শে এপ্রিল তাহার রায় প্রকাশিত হয়। যদিও হেষ্টিংস নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি এই সাত বৎসর তাঁহাকে আসামী হইয়া কালযাপন করায় তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়, এবং তিনি সকল বিষয়ে একবাক্যে নির্দ্দোষ বলিয়াও অভিহিত হন নাই।

ওয়েষ্টমিনষ্টার হলে যৎকালে হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়, তৎকালে ইংলণ্ডের জনসাধারণে এবিষয় লইয়া প্রতিনিয়ত আলোচনা করিত। এই আলোচনার ফলে হেষ্টিংস সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বিটিশ মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। জিলরে, সায়ার প্রভৃতি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-চিত্রকরগণও ইহাতে যোগদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তদ্ভিন্ন অন্যান্য চিত্রকরগণ আপনাদের কৌশলপ্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কিরূপ আন্দোলন আলোচনা হইত, ঐ সমস্ত ব্যঙ্গ-চিত্র সুস্পষ্টরূপে তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। ঐ সমস্ত চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণ হেষ্টিংসের অত্যাচার-কাহিনীকে একেবারে অবিশ্বাস করে নাই। কেবল তাহাই নহে, যে সমস্ত রাজপুরুষগণ হেষ্টিংসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্ত চিত্রসমূহেরও বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মহিষী পর্য্যন্তও তাহাদের লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের প্রতি রাজা ও রাণীর সহানুভূতিতে সকলের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, তাঁহারা হেষ্টিংসের ভারতলুণ্ঠিত দ্রব্যের

মধ্য হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা সম্বন্ধে সাধারণে নানারূপ বিশ্বাস করিত বলিয়া ঐরূপ সন্দেহের উৎপত্তি হইয়াছিল। চিত্রকরগণ ঐরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগকে নানারূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত চিত্র রাজাবমাননার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনেকগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত হইয়াও পড়িয়াছিল। সুখের বিষয় তজ্জন্য কাহাকেও রাজকারাগারে স্থান পাইতে হয় নাই। রাজপুরুষগণের মধ্যে চ্যান্সেলার লর্ড থর্লো চিত্রকরগণের হস্তে অনেক প্রকারে চিত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের একজন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই জন্য চিত্রকরগণ তাঁহাকে নানারূপে হেষ্টিংসের সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত চিত্রে হেষ্টিংস অদ্ভুত ভাবে চিত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষসমর্থক কোন কোন ইংরেজ লেখক বলিতে চাহেন যে, ব্যঙ্গ-চিত্র সমূহে হেষ্টিংস নানা প্রকারে চিত্রিত হইলেও চিত্রকরগণ তাঁহাকে শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিতেন। অন্য দিকে ফক্স প্রভৃতি তাঁহার অভিযোগকারিগণ কদর্য্য ও উগ্রভাবে চিত্রিত হইতেন। উক্ত লেখকগণের অভিপ্রায় এই যে, হেষ্টিংস সম্বন্ধে চিত্রকরগণের মনে অনেক বিষয় স্থানলাভ করিলেও, তাঁহারা হেষ্টিংসকে রাক্ষসপ্রকৃতি মনুষ্য বলিয়া ধারণা করেন নাই। ব্যঙ্গ-চিত্র সম্বন্ধে এই রূপ মন্তব্য আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ, কোন কোন চিত্রে হেষ্টিংসকে প্রকৃত রাক্ষস সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহার আস্যকবলে নরমুণ্ড প্রবেশ করানও হইয়াছে, কোন স্থানে হেষ্টিংসকে রক্তসমুদ্রে সন্তরণ করানও হইয়াছে। ইহাতে চিত্রকরগণের মনে হেষ্টিংস সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সমস্ত চিত্রের মধ্যে অনেকগুলিতেই হেষ্টিংসকে ধনলুণ্ঠনকরীরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। অধিক ধন উপার্জ্জন করিয়া ধনেশ্বর হইয়া বসিলে মনুষ্যের যেরূপ ভাব হইতে পারে, চিত্রকরগণ অনেক স্থলে হেষ্টিংসকে সেইরূপ ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রকরগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ হেষ্টিংসের লুণ্ঠিত ধনরাশির উপর নিপতিত হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে হৃষ্টচিত্ত ধনেশ্বরের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে যে

স্থানে তাঁহার অত্যাচারাবলী স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহাকে অনারূপেও চিত্রিত করা হইয়াছে। ফক্স, বার্ক প্রভৃতি হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিকারে যেরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে নানারূপ বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ন্যায্য ক্রোধের জন্য তাঁহারা হেষ্টিংসের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ বা হিংসা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ ভাবে যে চিত্রিত হইবেন ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ হেষ্টিংস যে ভারতে অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত চিত্র তাহাই প্রমাণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। উহারা ইংলণ্ডের তাৎকালিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের নিকট তাহারা আদরের সামগ্রী। সেই জন্য চিত্রগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা তন্মধ্য হইতে কতকগুলি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্লীট ষ্ট্রীটের রিচ নামক একব্যক্তি একখানি চিত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে একখানি শকটে হেষ্টিংস "Governor of Rue-peas" বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। গাড়ী খানি মটরবীজে পরিপূর্ণ। থর্লো শকটচালক হইয়া শকটে বদ্ধ একটি ক্ষুদ্র অশ্বকে চালনা করিতেছেন। থর্লো বলিতেছেন,—"Fine Begum Hastings! A lack a peck!" হেষ্টিংস উত্তর করিতেছেন,—"Truth must come out, there's no denial." বার্ক দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন,—"You'll have a fair trial." চিত্রের নিম্নে কয়েক চরণ কবিতা লিখিত আছে।

১৯৫ নং ষ্ট্রাণ্ডবাসী ডিক্‌সি একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেখানি সেরূপ সুচিত্রিত নহে। তাহাতে হেষ্টিংস একটি রাক্ষসরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি একটি ভারতরমণীর মস্তক চর্ব্বণ ও পাঁচজন ভারতবাসীর দেহ পদদলিত করিতেছেন। চিত্রখানিতে লেখা আছে "The prodigious monster arrived from the East,"

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯ নং হলবোর্ণস্থিত ডফ্‌টি কর্তৃক প্রকাশিত চিত্রে লিখিত আছে,—"Court cards, the best to deal with!" তাহাতে প্রাচ্যপরিচ্ছদধারী হেষ্টিংসের একহস্তে চিঁড়িতনের সাহেবের ন্যায় রাজা ও অপর হস্তে তাহার গোলামের ন্যায় থর্লো বিরাজ করিতেছেন।

১২ ই ফেব্রুয়ারিতে একখানি চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে, "H—st—ngs! ho! rare H—st—gs!" তাহাতে হেষ্টিংস একখানি ঠেলা-গাড়ীস্থিত রাজা ও থর্লোকে চালাইতেছেন। উক্ত চিত্র ব্ল্যাকষ্টোন হইতে উদ্ধৃত "What a man buys he may sell." এই ব্যবহারিক সত্য প্রতিপাদন করিবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল।

উক্ত ফেব্রুয়ারি মাসে হলাণ্ড একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পিট হেষ্টিংসের গাত্র হইতে রক্ত বাহির করিতেছেন। পিট বলিতেছেন,—"Courage my friend, You will feel wonderful benefit from this bleeding." হেষ্টিংস উত্তর করিতেছেন,—"I trust entirely of your skill for my recovery."

১লা মার্চ্চ ডফ্‌টি কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্রে লিখিত আছে,—"Such things may be: a tale for future times." চিত্র খানিতে হেষ্টিংস এক খানি গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে হস্তবদ্ধ হইয়া একটি ফাঁসীকাষ্ঠের নিম্নে অবস্থিতি করিতেছেন। ফক্স ঘাতকের ন্যায় তাঁহার মস্তকে ফাঁসী স্থাপন করিতেছেন, বার্ক পাদরীর ন্যায় নিকটে দণ্ডায়মান আছেন। নর্থ ঘোড়ার মাথা ধরিয়া অবস্থিত। শেরিডান গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে ধাক্কা দিতেছেন। হেষ্টিংস বলিতেছেন,—"Walpole said, every man had his price, but, alas! I never could find out any of your prices." বার্ক বলিতেছেন,—"A poor atonement do you call it, Ned? Egad, it would have been a devil of a job for me if my F—r had made such an atonement for unaccounted methods." নর্থ শেরিডানকে বলিতেছেন,—"Don't you remember Sheri, that my Right Honurable friend often threatened to bring me to this, or the block?"

শেরিডান উত্তর করিতেছেন,—"Psha ! Fred, you know that was only to frighten you from your station, and drive on, or our friend Edmund will stand here preaching all the day !"

উক্ত দিবসে ৩নং পিকাডিলির ফরেস্ "Blood on thnuder ; fording the Red Sea." নামে একখানি চিত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে হেষ্টিংস থর্লোর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া রক্তসমুদ্রের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দুই হস্তে দুইটী বড় থলে; তৎসংলগ্ন কাগজে লেখা আছে ৪০ পাউণ্ড। সমুদ্রের উপরিভাগে হেষ্টিংসের বলিস্থানীয়গণের মুণ্ড ও তাহাদের বিনাশাস্ত্র সকল ভাসিতেছে।

১৮ই মার্চ্চ ডফটি একখানি সুবৃহৎ চিত্র প্রকাশ করেন। তাহার নাম দিয়াছিলেন, "The struggle of a Bengal Butcher and his Imp-pie." উক্ত ছবিতে হেষ্টিংস প্রাচ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে থর্লো ও শয়তান এবং বাম পার্শ্বে বার্ক, ফক্স, শেরিডান ও আরও দুইজন কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার সম্মুখস্থিত একখানি পাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিশাচ নাচিতেছে। বার্ক বলিতেছেন,—"For the sake of injured millions I and my worthy friends and colleagues demand these wretches as victims to public justice !" থর্লো উত্তর দিতেছেন,—"And for the sake of consigned millions I with the assistance of my old friend and colleague here, am resolved to protect these worthy gentlemen."

১৭৮৮ সালের ২৮এ মার্চ্চ জিলরে কর্তৃক অঙ্কিত,—"A dish of mutton chops" নামে একখানি চিত্র ফরেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। চিত্রখানিতে হেষ্টিংস, থর্লো ও পিট একটি ভোজে বসিয়াছেন। বাছুরের ন্যায় অঙ্কিত রাজার মস্তক ভোজের খাদ্যস্থানীয়। ভোক্তারা ক্ষুধার্ত্ত পশুর ন্যায় ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হেংষ্টিস মস্তকটির একটি চক্ষু উৎপাটন করিতেছেন; পিট তাহার জিহ্বাটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন; থর্লো দুইখানি চামচ মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট

করিয়া দিয়াছেন। যে পাত্রের উপর মস্তকটি ন্যস্ত, তাহাতে লিখিত আছে,— "Mal—y—pense," and a Royal crown.

১০ই এপ্রিল অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের বেরী একখানি চিত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে হেষ্টিংস প্রাচ্যপরিচ্ছদধারীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তিনি জনৈক বন্ধুতাসম্পন্ন রাজবংশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। একটি লোক একটি হুক্কা ধরিয়া আছে, হেষ্টিংস সেই হুক্কাটি টানিতেছেন। তাহার ধূমে লেখা আছে, "Articles of Impeachment." হেষ্টিংস বলিতেছেন,—"Old care in a whiff of tobacco I'll smoke." থর্লো তাঁহার মস্তকে একটি রাজছত্র ধারণ করিয়াছেন। এক কোণে একটি ফাঁসীকাষ্ঠে লেখা আছে "For the Governor." তাহার নিকটে ফক্স ও বার্ক দুইটি কুক্কুরের ন্যায় চীৎকার করিতেছেন। ফক্স বার্ককে বলিতেছেন,—"Edmund! I'll finish the law." বার্ক উত্তর করিতেছেন,—"I'll bring the culprit to justice."

২৭এ এপ্রিল জিলরে কর্ত্তৃক অঙ্কিত "The Westminster Hunt" নামে একখানি সুবৃহৎ চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে রাজমস্তকযুক্ত একটি গর্দ্দভ অঙ্কিত করা হইয়াছে। থর্লো জনৈক দক্ষ আরোহীর ন্যায় গর্দ্দভটির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কতকগুলি কুক্কুরের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছেন। গর্দ্দভটি নর্থকে পদদলিত করিয়া যাওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার একখানি পদ বার্কের উপর চাপিয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্সিস, ফক্স, ও শেরিডান কুক্কুরগণ হেষ্টিংসের মস্তকযুক্ত একটি হায়েনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছেন। হায়েনার লেজে লিখিত আছে, "Diamonds and rupees." হেষ্টিংস সেণ্টজেমস প্রাসাদে আশ্রয়ের জন্য ছুটিতেছেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া রোজ ও পিট প্রহরীদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। থর্লো চীৎকার করিতেছেন,— "Back! back!"

প্রাচীজাগরণ।

শত শত বর্ষব্যাপী নিদ্রার আবেশে,
ঢলিয়া পড়িয়াছিল প্রাচী দিগীশ্বরী,
বসুধা-উজল সাজে মৃদু মন্দ হেসে,
গৌরব ছড়া'তেছিল প্রতীচী সুন্দরী।
সহসা প্রাচীর সেই গাঢ় ঘুম-ঘোর,
কেমনে ভাঙ্গিয়া গেল বুঝিতে না পারি,
নিমেষে করিয়া ছিন্ন বদ্ধ অঙ্ক-ডোর,
ক্রোড়ের সন্তানে দেবী ডাকিল ফুকারি'।
অপূর্ব্ব শকতি লভি' কন্দুককামান
লইয়া ক্রীড়ায় মাতে পুত্ররত্ন তার,
প্রতীচীহৃদয়ে যেন উঠিল তুফান,
শুনি' সেই কামানের শব্দ বারম্বার।
অঙ্কস্থিত পুত্রহস্তে কামানপ্রদানে,
আহ্বান করিছে মাতা দূরস্থ সন্তানে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুষ জাপানযুদ্ধ—প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রান্তভাগে জলে ও স্থলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে কিনা বলা যায় না। এই অগ্নি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সহসা ইহার নির্ব্বাণের আশা নাই। চিরশান্ত প্রশান্ত মহাসাগর এই অগ্নির প্রভাবে উত্তপ্ত ও বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে। কতদিনে যে এই অগ্নির উপর শান্তিবারি নিপতিত হইবে তাহা সেই শান্তিময়ই বলিতে পারেন। এ অগ্নি জ্বলিল কেন? রুসিয়ার বিশ্বগ্রাসিনী লালসার সহিত জাপানের নবদীপ্ত উচ্চাশার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় যে এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের আর একটা কথা মনে হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, কেবল রুসিয়ার লালসার সহিত জাপানের উচ্চাশার সংঘর্ষ নহে, কিন্তু প্রতীচ্যের জগদুজ্জ্বলকর মহাশানে প্রাচ্যের মলিনতাময় ছুরিকাখানি ঘৃষ্ট হওয়ায় যেন এই অগ্নির নির্গম হইয়াছে। কথাটা একটু পরিস্কার করিয়া বলা যাউক। যে প্রাচ্য সভ্যতা বহুদিন হইতে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইল? ইহাতে যে কেবল একটি আর একটি কর্ত্তৃক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহা নহে, অধিকন্তু সেই সংঘর্ষণে এমন একটুকু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল যে, তাহার তাপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েরই অনুভবগোচর হইয়া উঠিতেছে। প্রতীচ্যের মধ্যে যে জাতি তাপটি অধিক মাত্রায় অনুভব করিয়াছে, সে অগ্নিটিকে যষ্টির আঘাতে নির্ব্বাপিত করার চেষ্টা করিয়া তাহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে তাই সহজে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছেনা। জাপানের জাতীয় অভ্যুত্থানের

নিকট রুসিয়ার রাজাধিপত্য বারবার নতশির হওয়ায়, রুসিয়া এখন ধূয়া ধরিয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম-যুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এ ধর্ম্ম-যুদ্ধ কি? সেকালে খৃষ্টীয় জগৎ যেমন মুসল্মানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, রুসিয়া কি সেইরূপ আবার খৃষ্টাণগণকে বৌদ্ধের বিরুদ্ধে চালনা করিতেছেন? মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার খৃষ্টীয় গির্জ্জাগুলি ধুলিসাৎ হইয়া তাহাদের স্থানে বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে কি? অথবা কতদিন হইতে পোর্টআর্থার প্যালেষ্টাইনে পরিণত হইয়াছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। রুসিয়া যদি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া খৃষ্টীয় জগৎকে বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে উত্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ধূয়া ধরা সফল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে কে না চেনে? চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানকে বিতাড়িত করিয়া ক্রমশঃ পোর্টআর্থার হইতে সমস্ত মাঞ্চুরিয়ায় যিনি পক্ষ বিস্তারের পর কোরিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখনই জাপান জাল বিছাইয়া এই বকঃ পরমো ধার্ম্মিকঃটিকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফলতঃ রুসিয়ার বকবৃত্তি জগতের সকল জাতির নিকট প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। কাউণ্ট টলষ্টয় রুসিয়ার এই ধর্ম্মভানের বিষয় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অবশ্য তিনি জাপানকেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। কিন্তু জাপান ধর্ম্মের ভান করে নাই, সে আপনার স্বত্ব রক্ষার জন্যই দণ্ডায়মান হইয়াছে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে। রুসিয়া একথাও বলিতেছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন না বলিয়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, জাপান সহসা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু জাপান সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে রুসিয়া জলে ও স্থলে উভয় দিকেই বলবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রুসিয়ার ধর্ম্মের ও শান্তির ভান কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে।

তিব্বত-অভিযান—দুর্ভেদ্য হিমালয় কালবশে সুভেদ্য হইয়া উঠিল। হিমালয়ের কঠিন শুভ্র তুষারাবলীর পরিবর্ত্তে ক্রমে বাষ্পীয় কলের কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি তিব্বতের দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার চিরলুক্কায়িত নির্জ্জন মঠগুলি এক্ষণে লোকলোচনের গোচরীভূত হইবে, ও তাহার পার্শ্বে ইউরোপীয়

বণিক্‌গণের কারখানা স্থাপিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পার্থক্য অনুভব করাইবে। এতকাল যে লাসা নিষিদ্ধ নগরী রূপে জগতের নিকট প্রচারিত ছিল, ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাস হইতে তাহা ইউরোপীয়গণের সুখগম্য হইয়া উঠিল! ইংরেজ তিব্বতে প্রবেশ করিলেন কেন? তিব্বতের সহিত রুসিয়ার একটু গুপ্ত সম্বন্ধের বিষয় ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই অনেকদিন হইতে তিব্বতে বিশেষতঃ লাসায় প্রবেশের জন্য চেষ্টা হইতেছিল। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস লাসার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রধানতঃ সেই পথ অবলম্বন করিয়াই ইংরেজবাহিনী লাসায় প্রবেশ করিয়াছে। শরচ্চন্দ্র দাসের বর্ণনার সহিত অনেক স্থলের অবস্থানের ঐক্য হইতেছে বলিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ প্রকাশও করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বত-অভিযানের মূলে একজন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া আমরা গৌরব করিব কিনা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা জানি এককালে বাঙ্গালী তিব্বতে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন। আবার যদি বাঙ্গালীর দ্বারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের স্রোত তিব্বতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আমরা গৌরব করিতে পারি। কিন্তু সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে রক্তস্রোত বা বিলাসস্রোত প্রবাহিত হইলে আমাদের গৌরব করিবার বিষয় থাকিবে কি? তিব্বতে যাহাতে রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয় তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু স্রোত না বহুক, দৈবদুর্বিপাকে একটু আধটু যেন বৃষ্টি হইতেছে। অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইংরেজ তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের কল্যাণের জন্য তিব্বতে প্রবেশ করিতে হইল বলিয়া, তাহার ব্যয়ভার যে আমাদের স্কন্ধে পড়িল, সে বিষয়টিত উদারহৃদয় ইংরেজজাতি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না। ভারত ব্যতীত ইংলণ্ডের কি ইহাতে কোনই উপকার হইবে না? প্রথমে যে বাণিজ্যব্যপদেশে তিব্বতে প্রবেশ করা হইল, তাহা কি ভারতীয় পণ্যের পশরা নামাইবার জন্য? তাহাতে কি ইংলণ্ডের কোনই অংশ নাই? আমরা বুঝি, তাহার বার আনাই ইংলণ্ডের পণ্যে পরিপুর্ণ থাকিবে। রাজনৈতিক হিসাব ব্যতীত

তিব্বতপ্রবেশে আমাদের অন্য কোনও লাভ আছে কি? একটা কথা মনে হয় যে, আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দুর নির্জ্জন জ্ঞান-গুহা হইতে যদি কিছু লুক্কায়িত রত্নের উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কিন্তু আমাদের মলিনতার ও পাশ্চাত্য বিলাসের সংস্পর্শে সেই জ্ঞান-গুহাসকল অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে?

ক্রুগার ও ট্রান্সভাল—বুয়ার জাতির প্রতিষ্ঠাতা ক্রুগার এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। যাঁহার অদম্য চেষ্টায় ও অসীম উৎসাহে বুয়ারগণ তিন বৎসর ব্যাপিয়া ব্রিটিশকেশরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এতদিনে তাঁহার অবসান ঘটিল। হলণ্ডের রাজ্ঞী তাঁহার মৃত দেহের উপর পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। যিনি একটি জাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি যে সম্মানের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যুদ্ধের শেষভাগে ক্রুগারের ট্রান্সভাল পরিত্যাগ অনেকের নিকট তাঁহার লঘুতার পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অবশ্য আমরাও উক্ত বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারি না। হইতে পারে, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি ট্রান্সভাল ছাড়িয়া ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। তথাপি যিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও একটি জাতিগঠনে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনি যে সকলের নিকট হইতে সম্মান পাইবার যোগ্য ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ট্রান্সভাল এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন। সুখের বিষয়, আমাদের উদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সভালে প্রতিনিধি-শাসন ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। যে বীরজাতি তাঁহাদের সহিত তিন বৎসরের যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, উদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের গুণের যে ন্যায্য পুরস্কার দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু যে ভারতবাসী তাঁহাদিগকে বহুদিন হইতে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রতি তাঁহারা এরূপ বিমুখ কেন বলিতে পারি না।

যবদ্বীপে হিন্দুপ্রভাব—সাহিত্য পরিষদের গত মাসিক অধিবেশনে বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যবদ্বীপে হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি চিত্র প্রদর্শন করেন, তন্মধ্যে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত বরভদ্র মন্দিরের হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণের চিত্র যার পর নাই আনন্দজনক। যবদ্বীপে হিন্দুপ্রভাব সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মত অনুসরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যবদ্বীপে প্রথমে হিন্দু প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, তাহার অনেক পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তথায় বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তার হয়। সে দিবস শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, যবদ্বীপে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, পরে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় লাভ করে। তাঁহার মতে সম্ভবতঃ অশোক রাজার সময়ে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে চীনবাসীদিগের দ্বারা তথায় বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তার হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অনেক পরে তথায় হিন্দু সভ্যতা প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আমরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, নগেন্দ্র বাবু সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন যবদ্বীপে গমন করেন, তখন তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোনরূপ নিদর্শন ছিল না, সমস্তই হিন্দু প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ফা-হিয়ান খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে পরিভ্রমণে বহির্গত হন। যদিও কোন কোন মতে তাঁহার ভ্রমণসময় উহার অনেক পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ফা-হিয়ানের পূর্ব্বে যে তথায় হিন্দু প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হয়। আর বৌদ্ধ সভ্যতাকে উচ্ছেদ করিয়া যখন নূতন হিন্দু সভ্যতা প্রচারিত হয়, তখন হইতেই সমুদ্রযাত্রা হিন্দুর পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যবদ্বীপের হিন্দু প্রাধান্য যে প্রাচীন কালের হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়

শ্রাবণের ভারতীতে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাপ্‌পা রাওয়ের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত বাপ্‌পাদিত্য নামে একটী স্থন্দর ঐতিহাসিক গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভাণ্ডার নামক প্রবন্ধে শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বরাহনগরের প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন।

শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রবন্ধে শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয় দেখাইয়াছেন যে, জাপান প্রভৃতি স্থানে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানগৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রাবণের সাহিত্যে শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত ফিরোজ শাহ তোগোলক সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকটিত করিয়াছেন। বারভুঁইয়া প্রবন্ধে ইশাখাঁর ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

জৈষ্ঠের বান্ধবে শ্রীদেঃ আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ নামক প্রবন্ধে দয়ানন্দের প্রচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরসিকলাল গুপ্ত লিখিত জাপান সম্বন্ধে কএকটি কথা নামক প্রবন্ধে জাপান সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

ইংরেজী

গত জুন মাসের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব ইশা খাঁ সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

এপ্রিল মাসের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় কর্ণেল জেরিনি সায়ামিজ আর্কিওলজি নামক প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম শ্যাম দেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কৌশাম্বী নামক প্রবন্ধে মেজর ভষ্ট ভিন্সেণ্ট স্মিথের নির্ণীত প্রাচীন কৌশাম্বীর স্থান মধ্যপ্রদেশস্থ সতনা ষ্টেশন খণ্ডন করিয়া রেওয়া প্রদেশস্থ গুর্গিকে তাহার স্থলে বসাইয়াছেন।

জুলাই মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় শ্রীশম্ভুচন্দ্র দে নোটিসেস্‌ অব্‌ এমিনেণ্ট জজেস অব দি হাইকোর্ট নামক প্রবন্ধে দেশীয় জজদিগের মধ্যে কেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বিষয়ই উল্লেখ

করিয়াছেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম কি উল্লেখযোগ্য নহে? মহাদেব-রাও বিনায়ক কার্ব ব্রিটিশ সুপ্রিমেসী ইন্ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া নামক প্রবন্ধে ইংরেজ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রীয় শক্তির পরাজয় ও মধ্যভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘ ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি, আর, উইলসন সাহেব দি বিল্ডিং অব দি প্রেজেণ্ট ফোর্ট উইলিয়ম ইন্ ক্যালকাটা নামক প্রবন্ধে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের-নির্ম্মাণ কার্য্য প্রকটিত করিয়াছেন।

আগষ্ট মাসের ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রিকায় কর্ণেল বার আকবর অর ভিক্টোরিয়া নামক প্রবন্ধে আকবরের অপেক্ষা ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের উক্ত পত্রিকার আকবর এ ভিশন নামক প্রবন্ধের উত্তরে ইহা লিখিত।

জুলাই মাসের ইংলিশ হিষ্টোরিক্যাল রিভিউ পত্রে মিসেস আর্মিটেজ দি আর্লী নর্ম্মান কাসল্স অব ইংল্যাণ্ড নামক প্রবন্ধে ইংলণ্ডের প্রাচীন নর্ম্মান কাসল গুলির বিবরণ ক্রমান্বয়ে প্রদান করিয়াছেন। চার্লস ফাষ্ট এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী নামক প্রবন্ধে উইলিয়ম ফষ্টার কিরূপে প্রথম চার্লস ও তাহার মন্ত্রিগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ধারে গোলমরিচ কিনিয়া পুনর্ব্বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

আগষ্ট মাসের নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রে ব্যারন্ সুয়েমাটসু লিখিত জেপান এণ্ড কমেন্সমেণ্ট অব দি ওয়ার উইথ রসিয়া নামক প্রবন্ধে, ফর্টনাইটলি রিভিউ পত্রিকায় আলফ্রেড ষ্টীডের লিখিত জেপান্স য়্যাসপিরেসন এণ্ড ইণ্টারন্যাসনালিজম ও আর, ডি মারমাণ্ডির লিখিত ফ্রেঞ্চ পবলিক ওপিনিয়ন এণ্ড দী রসোজেপানিজ ওয়ার প্রবন্ধদ্বয়ে এবং কণ্টেম্পোরারী রিভিউ পত্রে আইভানভিচের লিখিত রসোজেপানিজ ওয়ার এণ্ড দী ইয়েলো পেরিল নামক প্রবন্ধে বর্ত্তমান রুস-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করা হইয়াছে।

বিবিধ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক সি, আর উইলসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। কাজেই তাঁহার প্রকাশিত আর্লি এনাল্স অব দী ইংলিস নামক গ্রন্থ আপাততঃ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

সামাজিক উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিশোধ নামে এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, হুগলীর পর্টু-গীজ ধ্বংস অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিত।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজ-উদ্দৌলা সম্বন্ধে একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক সৎনামও বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত থোরবোর্ণ সাহেব পাঞ্জাব ইন্ পিস এণ্ড ওয়ার নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজ ও শিখের সম্পর্ক ও সংঘর্ষ লিখিত হইয়াছে।

রণজিৎ সিংহ।

Mohila Press

কাবুলরাজ রত্নপাল।
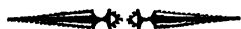
ইউরোপের ধর্ম্মবিধাতা যীশু খৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে হিন্দু সভ্যতা ও প্রাধান্য পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। চীন, জাপান, মিসর, মেক্সিকো, শ্যাম, যাবা প্রভৃতি স্থানে আজিও তাহার জ্বলন্ত চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হিন্দু প্রাধান্য যেমন উত্তালতরঙ্গময় নীলসমুদ্র অতিক্রম করিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেইরূপ আবার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গেও আপনার নিদর্শন অঙ্কিত করিয়াছিল। হিমালয়, হিন্দুকুশের তুষারধবল শৃঙ্গাবলী অতিক্রম করিয়া সেই সভ্যতা গোবী মরুভূমির উত্তপ্ত বক্ষে ও সাইবিরিয়ার শীতল অঙ্কেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাধান্য জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যে দিন প্রাচ্য সভ্যতা ও প্রাধান্যের নিকট সমস্ত জগৎ মস্তক অবনত করিয়াছিল। যখন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিজয়নিশান প্রাচ্য আকাশের নীলিমা চুম্বন করিত, সে সময়ে রোমক ও গ্রীক সভ্যতায় ইউরোপ আলোকিত হইলেও জগতের সমক্ষে প্রাচ্য সভ্যতা অপূর্ব্ব তেজে প্রতিভাত হইত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা অনেক কাল পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাকে পরাজয় করিতে পারে নাই।

পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, ভারতের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাই আফ-গানস্থানে আজিও হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুকুশের

পাদলগ্ন যে স্থান এক্ষণে সুমধুর ফলবৃক্ষের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া আফগান বীর ও রমণীর পদতাড়ন অকাতরে সহ্য করিতেছে, একদিন সেই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধ নরনারীর লীলাভূমি ছিল, এবং এককালে উহা গ্রীক বীরগণেরও আবাস-ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। আজিও হিন্দুকুশ তাহার প্রাচীন অধিবাসীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আজিও কান্দাহার, কাবুল, গান্ধার ও কাম্বোজের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলে। আজিও তথাকার সৌরাষ্ট্র, গুপ্ত, রাজপুত ও কান্যকুব্জ মুদ্রা হিন্দু প্রাধান্যের কথা মনে করাইয়া দেয়। এখনও তাহার অনেক স্থান হিন্দুর নিকট তীর্থ বলিয়া গণ্য, এবং এখনও তাহার অনেক স্থানে হিন্দু, বৌদ্ধের প্রাচীন কীর্ত্তি ধরণীগর্ভে লীন হইয়াও তাহাদিগের নির্ম্মাতৃগণের অস্পষ্ট ছায়া মানসচক্ষের সমক্ষে আনিয়া দিতেছে। তাই বলিতেছি প্রকৃতির যে রম্যকানন এক্ষণে আফগান নরনারীর সাধের আবাসভূমি, এক-কালে তাহা হিন্দুদিগকেও স্নিগ্ধচ্ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিত, ও সুমধুর ফলরসে তাহাদের তৃষ্ণাতুর কণ্ঠকে সরস করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করাইত। ফলতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত আফগানস্থান হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল।

মহাভারত ও বৌদ্ধযুগের পরও অনেক দিন আফগানস্থানে হিন্দুরাজ-গণ রাজত্ব করিতেন। মধ্যে উহা গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক বিজিত হইলে সেল্যুকস প্রভৃতি গ্রীক বীরগণ ইহার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পুনর্ব্বার তথায় হিন্দুরাজত্ব প্রচলিত হয়। যে সময়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণে রত হন, সে সময়ে তিনি কাবুলেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কাবুলে হিন্দু ও তুর্ক রাজা ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর হইতে কাবুল মুসল্মানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে আরব্ধ হয়। খলিফা মুয়াবিয়ার রাজত্ব কালে ৬৬১ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কাবুল প্রথম মুসল্মানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। মুয়াবিয়া আবদর রহমন নামে একজন সেনানীকে কাবুলজয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তদানীন্তন সাহসী ও কার্য্যদক্ষ হিন্দু রাজা আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণকে সমবেত করিয়া মুসল্মানদিগকে বিতাড়িত

করিয়া দেন। এ কথা মুসল্মান লেখকগণ অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর অনেক বার কাবুলের বক্ষে মুসল্মান বীরগণের শাণিত কৃপাণ ঝলসিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কাবুলজয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার নিকটস্থ সিস্তান প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের করায়ত্ত হইলেও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দার পূর্ব্বে সমগ্র আফগানস্থান মুসল্মান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তুর্ক সবক্তগীন কাবুল অধিকার করিয়া গজনীতে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি কাবুলে হিন্দুরাজত্বের লোপ হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কাবুলে রত্নপাল নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অত্যন্ত চতুর ও ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই রত্নপাল কোন্ বংশসম্ভূত তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। ভারতবর্ষের রাজপুতানা বা কান্যকুব্জের রাজগণের সহিত ইঁহার কোন রূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহাও জানা যায় না। যৎকালে রত্নপাল কাবুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেই সময়ে মুসল্মানগণ একবার তাহা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে রক্তপিপাসু হজাজ আবদুল্লা নামে সিস্তানের শাসনকর্ত্তাকে কাবুলবিজয়ে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কাবুল আর একবার আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং কাবুলের রাজা মুসল্মানদিগকে কর দিতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন হইতে হজাজের নিকট কর উপস্থিত না হওয়ায় তিনি কাবুলরাজের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, এবং কাবুলকে একেবারে স্বরাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হন।

আবদুল্লা দুর্দ্ধর্ষ আরব সৈন্য লইয়া কাবুলে উপস্থিত হইলে, রত্নপাল তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরে প্রস্থান করিয়া কৌশলক্রমে সমস্ত পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ অবরোধ করিয়া বসেন, এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তরখণ্ড ও অস্ত্রনিক্ষেপে আরববাহিনীকে যৎপরোনাস্তি উদ্বেজিত করিয়া তুলেন। এই রূপে বিপদগ্রস্ত হইয়া আবদুল্লা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাঁহার চারিদিকের পথ অবরুদ্ধ, অগ্রসর বা প্রত্যাবর্ত্তন কিছুরই উপায় নাই, কারণ সম্মুখ পশ্চাৎ সকলদিকের পথ রত্নপাল

অবরোধ করিয়াছেন। অনেক দিন সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে অবরুদ্ধ থাকায় আবদুল্লার সৈন্য মধ্যে আহার্য্যের দারুণ অভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। একে তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত তৃষ্ণায় কাতর, তাহার পর তাহাদের মস্তকোপরি প্রস্তরখণ্ড ও শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছিল। অবশেষে ক্রমে ক্রমে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজপুতানার রন্ধ্রপথে মহারাণা রাজসিংহ কর্ত্তৃক দাম্ভিক সম্রাট আরংজেবের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রত্নপাল ও আবদুল্লার মধ্যেও সেইরূপ অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। সৈন্যগণের এরূপ দুরবস্থার সময় সন্ধি ভিন্ন আবদুল্লার মনে আর কোনও উপায়ের উদয় হইল না। অগত্যা তিনি আপনাকে ও নিজ সেনাগণকে অনাহার ও শাণিত কৃপাণ হইতে রক্ষা করার জন্য রত্নপালের সহিত সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কাবুলজয় দূরে থাকুক, অবশেষে তিনি কাবুলরাজকে সাত লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া কোন রূপে সে যাত্রা মৃত্যুমুখ হইতে আপনাকে ও আপনার বাহিনীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর হজাজ পুনর্ব্বার কাবুলজয়ে মনোনিবেশ করেন। আবদুল্লার শোচনীয় পরাজয়ে হজাজ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিয়াছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধের জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে। তিনি সেই সুচতুর হিন্দুরাজকে দমন করিবার জন্য পুনর্ব্বার বদ্ধপরিকর হইলেন। এইবার তিনি আবদুল্লা অপেক্ষা জনৈক দক্ষ সেনানীর প্রতি কাবুল-জয়ের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দে তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি আবদর রহমন এক বিপুল আরব বাহিনী লইয়া কাবুলে উপস্থিত হন। আরব সৈন্যগণের পদভরে কাবুল টলমল করিতে লাগিল, তাহাদের শাণিত কৃপাণ ঝলসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রত্নপালও নিতান্ত পশ্চাৎপদ হন নাই। যদিও আরব যোদ্ধৃগণের নিকট তাঁহার সৈন্যগণ স্থানে স্থানে পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা আরবদিগকে কাবুল অধিকার করিতে দেয় নাই। আবদর রহমন কেবল স্থানে স্থানে লুণ্ঠন করিয়াই সিস্তানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবদুল্লার ন্যায় তিনিও কাবুল-অধিকারে সমর্থ হন নাই।

যৎকালে হজাজ শ্রুত হইলেন যে, আবদর রহমন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, কাবুল অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, তখন তিনি আবদর রহমনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। আবদর রহমন হজাজের ক্রোধের বিষয় অবগত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হন। তিনি জানিতেন যে, হজাজ যাহার উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহার পক্ষে জীবনের আশা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার ন্যায় হইয়া উঠে। অগত্যা তিনি হজাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। আবদর রহমন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রত্নপালের সহিত সন্ধি বন্ধন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রত্নপাল আবদর রহমনের সহিত মিলিত হইয়া হজাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে অনেক দিন ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, হজাজ কোন রূপে কাবুলজয়ে সমর্থ হইলেন না। একে রত্নপালকে তিনি পরাজয় করিতে পারেন নাই, তাহার উপর তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি অবদর রমহন তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ায় হজাজের পক্ষে কাবুলজয় একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। তথাপি তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চাশায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে তিনি সহসা ভগ্নোদ্যম হন নাই। তিনি কাবুলজয়ের বিশেষতঃ আবদর রহমনের প্রতি শাস্তি বিধানের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পরে আবদর রহমনের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী কোন এক উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধিত হইলে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে মনোমালিন্যের সূচনা হইল। আবদর রহমনের মনে আশঙ্কা হইল যে, রত্নপাল তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক হজাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন, এবং হজাজ কোন রূপে তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারিলে যে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ মনে করিয়া তিনি হজাজের হস্তে হত হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাকে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। সেই সংকল্প সাধনের জন্য আবদর রহমন একটি উচ্চস্থান হইতে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া চিরদিনের জন্য ধরণীর

ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আবদর রহমনের শোচনীয় পরিণামের পর রত্নপাল আবার কাবুলের একাধিপত্য ভোগ করিতে লাগিলেন। হজাজ আর তাঁহার রাজ্য-আক্রমণে সাহসী হন নাই। রত্নপালের বিবরণ দেখাইয়া দিতেছে যে, হিন্দু মুসল্মানের শাণিত কৃপাণের নিকট প্রথমেই আত্মবলি প্রদান করে নাই।

রণজিৎ সিংহ ও ইংরাজ

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পঞ্জাবে পদার্পণের পর দুই সহস্র বৎসরমধ্যে আর কোন ইউরোপীয় পঞ্জাববিজয়-বাসনায় তৎপ্রদেশে প্রবেশ করেন নাই। খৃষ্টীয় ১৮০৫ অব্দে হোলকারাধীনে পলায়নোম্মুখ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে লর্ড লেক বিপাশাতীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে পাঁচ সহস্র শিখ দিল্লীর যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা কোন রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে সময়ে শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন রূপ বিবরণ প্রকাশিত ছিল না। তাহাদের সম্বন্ধে এই মাত্র জানা ছিল যে, এই অদ্ভুত সম্প্রদায় মুসল্মানবিদ্বেষী ও আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত পোরাসের রাজ্যে বসবাস করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্দ্ধ ভারতের অধিকারী হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থানসমূহকে বাণিজ্যের চক্ষে দেখিতেন এবং কোম্পানীনিযুক্ত উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে সামান্য বেতনভোগী

* Thorburn হইতে অনুবাদ।

পর্য্যন্ত যাহাতে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়—সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্যই রহিয়াছেন এইরূপ মনে করিতেন। অর্থোপার্জ্জন একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় ডিরেক্টারগণ মনে করিতেন যে, সত্বলাভজনক স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান সংক্রান্ত কোন রূপ তথ্যসংগ্রহের আবশ্যক নাই এবং তাহাতে প্রচুর অনাবশ্যক ব্যয়সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত প্রত্যেক গবর্ণর জেনেরালের কাণে এই মন্ত্র দিয়া দিতেন যে, তাঁহারা বণিক্ সম্প্রদায় মাত্র, রাজ্যসংস্থাপনের কোন বাসনা রাখেন না এবং শান্তিরক্ষাই যেন গবর্ণরদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এই মন্ত্রে দীক্ষিত গবর্ণর জেনেরালগণও সাধ্যমত তদনুরূপ কার্য্য করিতেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মর্নিংটন (যিনি পরে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি হন) গবর্ণর জেনেরাল হইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার মনে শান্তিরক্ষার বাসনা থাকিলেও তাঁহার আগমন কাল হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কাল ১৮০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রভুদিগকে যুদ্ধজড়িত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তাহার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই যুদ্ধ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কোষাগার শূন্য এবং ব্যবসায়ে কোনই লাভ হইতেছে না দেখিয়া ডিরেক্টারগণ মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, ভারতীয় অধ্যক্ষ তাঁহাদের আজ্ঞা বিশেষরূপে পালন না করিয়া, নিজের জন্য "মারকুইস" উপাধি সঞ্চয় করিলেন এবং তাঁহাদের যে ব্যবসায়ের এত উন্নতি হইয়াছিল তাহাও উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। তাঁহারা এই অনিষ্টকারীকে গৃহে ফিরাইয়া অপর একজন শীতলমস্তিষ্ক ব্যক্তিকে ভারতে প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারলোলুপ কোন ব্যক্তির আবশ্যক ছিল না। ওয়েলেসলির পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট বহুসম্মাননীয় ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে ভারতে এই সময়ে শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপযুক্ত লোক বিবেচনায় তাঁহাকে ঐ কার্য্যে পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল, তিনিও স্বীকৃত হইলেন। ১৮০৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তিনি তাঁহার প্রভুগণের ঈপ্সিত পথ অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইতে হইতে মৃত্যু তাঁহাকে সরাইয়া লইল।

এই সময়ে লর্ড লেক শতদ্রু নদীর পরপারবাসী শিখদিগের রাজ্যমধ্য দিয়া বিপুল বাহিনী লইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুসরণ করিতেছিলেন। সেই সকল শিখ বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতির সহিত যোগদান করিল। বহুদিন যাবৎ তাহারা গৃহবিবাদে ব্যাপৃত থাকিলেও লাহোরের বালকরাজা রণজিৎ সিংহের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, এবং রণজিৎ সমস্ত শিখের অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে নিজের শাসনাধীনে আনিবেন এই আশঙ্কায়, তাহারা সকলে গৃহবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া মিলিত হইয়াছিল। শিখগণ লর্ড লেককে বলিল যে, রণজিৎ পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী, বহুতর কামান এবং বহুসহস্র ধর্ম্মোন্মত্ত আকালি তাঁহার আয়ত্তমধ্যে পাইয়াছেন, এবং হোলকার যদি সেই সঙ্গে যোগদান করেন, তাহা হইলে শিখ ও ইংরাজ উভয়ের পক্ষেই তাহা বিপদজনক হইবে। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যুদ্ধের নামে নাচিয়া উঠিলেন; তাঁহারা মনে ভাবিলেন যে, তাঁহাদের সুশিক্ষিত ইংরাজ পদাতিকের নিকট অশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ শৈলবিক্ষিপ্ত বীচিমালার ন্যায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। শ্বেতাঙ্গগণের আপন ক্ষমতায় আস্থা ছিল, সিপাহীগণেরও সাহেবে ও সাহেবের কামানে বিশ্বাস কম ছিল না। লর্ড লেক কলিকাতার ও লিডেনহল ষ্ট্রীটের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিয়া সিপাহীদিগকে বলিলেন যে যদি তাহারা সৈন্যগণের আহার্য্যের সংস্থান করে ও তাহাদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের আশঙ্কা দূর করিবেন। এই সময়ে তিনি কোন রূপ যুদ্ধচেষ্টা না করিয়া বিপাশার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষ শিখদিগের মহানগর অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী হইলে রণজিৎ হোলকারের সহিত যুক্ত হইয়া ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু এরূপ অদৃষ্টপরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি গোপনে ইংরাজ শিবির পরিদর্শন করিয়া কোম্পানীর গোলন্দাজগণের প্রভাব, এবং সিপাহী ও ইংরাজ সেনাসমূহের চতুরগতি লক্ষ্য করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। ইহা ব্যতীত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার অন্য কারণও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি মনে মনে সন্দেহ করিলেন যে, শীঘ্রই ইংরাজের লোলুপ দৃষ্টি

যমুনায় পড়িবে ও তাঁহারা ভারতের উত্তরসীমা টানিয়া সেই পর্য্যন্ত আনিতে সচেষ্ট হইবেন। এই সকল চিন্তা করিয়া রণজিৎ হোলকারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে বিপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপনের উপদেশ দিলেন। ব্যাপার সহজেই মিটিয়া গেল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ স্ব স্ব সীমায় ফিরিয়া গেল।

যে সকল রাজন্যবর্গের শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব ছিল, তাঁহাদিগের স্বাধীনতানাশের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য লাহোররাজ ইহাই উপযুক্ত সময় দেখিলেন। ইহার পর দুই বৎসর ধরিয়া তিনি এ চেষ্টার কোন রূপ ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ডিরেক্টারগণের ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দিষ্ট পথের দোহাই দিয়া রণজিতের এই সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

ভারতে শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের পুনর্ব্বার বিশেষ উন্নতি হইল, এবং কোম্পানির ডিরেক্টারগণ ইহাতে সবিশেষ আনন্দিত হইলেন।

এই সময়ে ইংরাজ রাজনীতিবিদ্গণের মনে আধুনিক রুসভীতির পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসীভীতির অধিকার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন যে, যখন নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত ইউরোপ করতলগত করিয়াছেন, এবং ভারতে আসিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনি পৃথিবীর বাল্যাবস্থার বীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় সৈন্যগণের আহার্য্য ও গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহার দিগ্বিজয়ের পুনরভিনয় করিবেন, কারণ সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপ সমর্থ। এই ফরাসীভীতিরূপ দূষিত-বায়ু শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়িল। ডিরেক্টারগণ হইতে তৎকালীন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মিণ্টোকে পর্য্যন্ত তাহা স্পর্শ করিল। মিণ্টো দ্রুতগতিতে পারস্য, আফগনিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের অবস্থা জানিবার জন্য ও তত্তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণকে তাঁহাদের এই শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অনুরোধ করিতে দূতপ্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

চার্লস মেটকাফ নামক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আফিসের কোন পদপ্রাপ্ত এক জন ত্রয়বিংশ বৎসর-বয়স্ক যুবক রণজিতের সভায় এই বিষয়ের দূতস্বরূপে

প্রেরিত হন। রণজিতের নিকট এই দূতের আগমন তত ভাল বোধ হইল না। তাঁহার মতে ইংরাজের নিজের সীমার ভিতর থাকা উচিত; এবং যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় তাঁহাকে ইংরাজের কোন রূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়। রণজিতের এই ফরাসীভীতিতে কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। নেপোলিয়ন ইউরোপের দমনকর্ত্তা হইলেও তিনি কিছু স্বয়ং দেবতা বা দৈবী শক্তির অধিকারী নহেন। তিনি যদি সেনা লইয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ মরু ও পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত স্থানে আসিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে একটি প্রাণীও রহিবে না। রণজিৎ ও তাঁহার সভাসদবর্গের নিকটে ইংরাজের এই কথার উত্থাপন যমুনার অপর পারবর্ত্তী স্থানে হস্তক্ষেপের সূচনার ন্যায় বোধ হইল। মেটকাফ রণজিৎকে মধ্য এসিয়ার রাজন্যবর্গের সহিত অনতিবিলম্বে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মিলিত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন; তবে মেটকাফ নিজে এ বিষয়ের অসম্ভাবনা মনে বুঝিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না।

এই প্রস্তাবে মহারাজ বলিলেন, "ইংরাজ স্বীয় রাজ্যরক্ষার জন্য আমার সাহায্য চাহিলে, যদি আমি স্বীকৃত হই, আশা করি তাঁহারাও আমার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করিতে আমাকে সাহায্যদানে বঞ্চিত করিবেন না।" দূত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "শতদ্রুর পরপারস্থ হিন্দুস্থানে যে সকল শিখরাজ্য আছে, সে সকলের উপর আমার আধিপত্য স্বীকার করিয়া।" "সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার আমার উপর কোন আদেশ নাই। তবে এ বিষয় আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট জানাইব।" এই কয়টি কথা মেটকাফ নিশ্চেষ্টভাবে মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় বলিয়া গেলেন।

এ কথায় রণজিতের বিরক্তি উৎপাদন করিল। তিনি ইংরাজের কার্য্যবিধি জানিতেন। মেটকাফ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে কি ফল হইবে তাহা তিনি অগ্রেই বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন উত্তর আসিতে যখন বিলম্ব হইবে, তখন এই সময়ে নীরবে বসিয়া থাকা অপেক্ষা ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া রাখিলে তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। এই বিবেচনায় আর কালবিলম্ব না করিয়া

রণজিৎ বিবাদী স্থানসমূহে অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। দুই মাস ধরিয়া লুণ্ঠনাদি চলিতে লাগিল। ফরিদকোট ও আম্বালা অধিকৃত হইল। থানেশ্বর ও মালেরকোটলা হইতে কর আদায় করিলেন, এবং পাতিয়ালার রাজার সহিত উষ্ণীষ বদল হইল। এই কার্য্য অন্যের নিকট ভ্রাতৃভাবের সূচক হইলেও তাঁহার নিকট ইহা ভদ্রভাবে নির্য্যাতনের চিহ্নস্বরূপ ছিল।

মেটকাফ রণজিতের নিকট এই সকলের কৈফিয়ৎ চাহিলেন, কিন্তু কোন রূপ আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। আদেশ আসিলে তিনি মহারাজকে জানাইলেন যে, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট শতদ্রুর দক্ষিণপারস্থ শিখদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্রিটিশ সৈন্য লুধিয়ানায় আসিতেছে। রণজিৎ ইহাতে সৈন্যসম্বন্ধে দু একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বে ইংরাজের সীমা যমুনা পর্য্যন্ত ছিল, এখন শতদ্রু পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই বিপাশায় যাইবে। ব্রিটিশের কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।"

বোধ করি কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত নয় মনে করিয়া দূত উপহাস নীরবে সহ্য করিলেন। ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ মহারাজের উত্তেজনায় ঘুর্ণায়মান এক চক্ষু এবং কষ্ট-প্রশমিত ক্রোধে তাঁহার বসন্তরোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের তরঙ্গায়িত ভাবদর্শনে অনুমান হইতেছিল, যেন তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ ধীর অচঞ্চল মানবটিকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কিছু ক্ষণ উভয় যুবকই—(মেটকাফের বয়ঃক্রম তখন ২৩ বৎসর ও রণজিতের ২৮ বৎসর মাত্র,) উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ রণজিৎ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিম্নে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া একটি অশ্বে আরোহণ করিলেন। পরে স্তম্ভিত ইংরাজ যুবকের চক্ষের সম্মুখে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। এইরূপে আত্মসংযম লাভ করিয়া মহা-রাজ নীচের একটি ঘরে প্রত্যাগত হইয়া মন্ত্রীর দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিলাষের প্রতিকূলে কিছু করিবেন না। সন্ধ্যার পর সুরার সাহায্যে অধিকতর সাহসিক হইয়া তিনি ইংরাজের এই প্রস্তাব হইতে—যাহা তাঁহার নিকট অন্যায় আবদার বলিয়া বোধ হইয়াছিল—তাঁহার সম্মতি ফিরাইয়া

লইলেন। ইহাতে শিখ সাধারণতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদসম্ভাবনা বিধায় জাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক, এই রূপ বলিয়া রণজিৎ সময় চাহিলেন।

কিছু দিন পরে অমৃতসরে পুনরায় এই কথা উঠিল এবং বহু সপ্তাহ ধরিয়া তাহার আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই সময়ে একটি ঘটনা আশু সুফল দান করিল, কেবল তাহাই নহে, কিন্তু উক্ত ঘটনা সেই সময় হইতে ত্রিশ বৎসর পরে মহারাজের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ইংরাজের সহিত সৌখ্য-বন্ধনে বদ্ধ করিবার কারণ হইল।

দূতের অনুচরবর্গের মধ্যে যে কয় জন মুসল্মান ছিল, তাহারা মহরমের সময় উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগের মহাত্মা হোসেন ও হাসেনের মৃত্যুৎসবে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদিগের তাজিয়া বহনকালের খেদব্যঞ্জক হাহাকার রব ও বাদ্যে অমৃতসরবাসী আকালিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা এক রব উঠাইল যে, মুসল্মানগণ তাহাদিগের মন্দির অপবিত্র করিতে উদ্যত হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সহরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আকালিগণ অস্ত্রাদি লইয়া ছুটিল; মুষ্টিমেয় মুসল্মানগণের গতিরোধ করিয়া তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গণ্ডগোলের সময় আক্রমণকারিগণ তরবারি আস্ফালন করিয়া জাতীয় রণশব্দ তুলিল। তৎকালে দূতের ছাউনির উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেই সময়ে দূতের শরীররক্ষক দুই দল দেশীয় পদাতিক ও ষোল জন অশ্বারোহী অস্ত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীনের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া আক্রমণকারিগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অশ্বারোহী কয় জন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে দুই এক জন পলাইতে বাকি ছিল তাহাদিগকেও সে স্থান হইতে দূরীভূত করিল।

রণজিৎ এইরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকল গোলোযোগ মিটিবার কিছু পূর্ব্বেই সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সরকারি কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার সাহসী সৈন্যগণকে ঐ অল্পসংখ্যক হিন্দুস্থানী সিপাহী কর্ত্তৃক—যাহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না—ঐ রূপে বিতাড়িত

হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ ভীতও হইয়াছিলেন। তিনি দ্রুতগতিতে দূতের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তদুপলক্ষে হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

সুশাসিত ভাবে নিয়মবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে কিরূপ ফল দর্শে তাহা দেখিয়া মহারাজ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তখন নেপোলিয়নের হুজুক কমিয়া গিয়াছিল। মহারাজ শীঘ্রই ইংরাজের অন্যান্য কথায় সম্মত হইলেন ও শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে তাঁহার সৈন্যগণকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া চিরসৌখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। এ বন্ধন কখন ছিন্ন হয় নাই।

এই ব্যাপারের অবসান সুখপ্রদ হইলেও মেটকাফের পক্ষে তাঁহার অনুচরগণকে শিখদিগের পবিত্র রাজধানীতে তাহাদিগকে এরূপে অবমানিত করিতে দেওয়া কতদূর বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারা যায়। যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসল্মানদিগের পূর্ব্বতন রাজধানী দিল্লীনগরী কোন পবিত্র তীর্থ না হইলেও তথায় শত চেষ্টাসত্ত্বে হিন্দু মুসল্মানের মধ্যে মহরম-উপলক্ষে প্রায়ই রক্তপাত হয়, তখন একশত বর্ষ পূর্ব্বে এই রূপে শিখদিগের পবিত্র মহানগরীতে মহরম উৎসব করা যে বিশেষ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাতে সানুচর মেটকাফের লোপ ও এমন কি শিখ ও ইংরাজে একটি যুদ্ধ ঘটিলেও ঘটিতে পারিত।

যে সময়ের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সকল বিষয়েইমূর্ত্তিপূজক ভারতবাসীর কুসংস্কার দেখিতেন ও দেখিয়া স্বভাবতঃ অভিজাতোচিত ঘৃণায় চক্ষু ফিরাই-তেন, সে সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ শিখগণ যে কত অল্পে বিচলিত হইত, মেটকাফ তাহা যে বুঝিতেন না, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।

জগৎশেঠ।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্ম ও আদি পুরুষ।

প্রকৃতির ভৈরবীমূর্ত্তি মরুস্থলী বা মারবারভূমি রাঠোর বিজয়-পতাকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এককালে সমগ্র রাজস্থানে আপনার গৌরবপ্রভা বিস্তার করিয়াছিল। এই মারবার প্রদেশে নাগর নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। মারবারের রাজধানী যোধপুরের পরই নাগর উক্ত প্রদেশের প্রধান স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। খৃষ্টীয় ১৩৮২ অব্দে নাগর রাঠোরকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ড কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তদবধি উহা যোধপুরের যুবরাজগণের বৃত্তিভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। রাঠোরগণের প্রভুত্বকালে নাগর হইতে বার্ষিক ৭৫ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়ের কথা শ্রুত হওয়া যায়। নাগর অনেক বার মুসল্মানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। মোগলকেশরী আকবর শাহ একবার ইহার বক্ষে বিজয়বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়া বিকানীররাজকে উক্ত নগর সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা পুনর্ব্বার যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত হয়। কাহারও কাহারও মতে এই নাগর হইতে দেবনাগর অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। মারবারের অন্তর্গত এই সুপ্রসিদ্ধ নাগরই বাঙ্গালার শেঠবংশীয়দিগের পূর্ব্বনিবাস। নাগরে বহুকাল হইতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বণিক্‌গণ বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পর জৈনধর্ম্ম কিছু দিনের জন্য ভারতের কোন কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, রাজপুতানার অনেক স্থান জৈনদিগের বাসভূমি হইয়া উঠে। নাগর তন্মধ্যে একটি প্রধান স্থান। বাঙ্গালার শেঠগণ প্রথমতঃ উক্ত জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা জৈনদিগের শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ী বলিয়া গণ্য হইতেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা প্রথমতঃ শেঠগণের পূর্ব্ব ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি।

যৎকালে ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম দিন দিন হীনপ্রভ হইতে লাগিল, সেই সময়ে জৈনধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে আপনার প্রসার-বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালার উপরই ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কিন্তু অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত হওয়ায় তাহার ভিত্তি তাদৃশ সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। সেই জন্য ইহা কেবলই ভারতবর্ষে আবদ্ধ হইয়া থাকে, ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহার স্থান হয় নাই। জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অর্হৎ; ইনি দক্ষিণ কর্ণাটনিবাসী ও বেঙ্কট গিরির অধীশ্বর ছিলেন। অর্হৎনৃপতি ঋষভ-দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য উদাসীনবেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদিগের মতে ঋষভদেব ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা তাঁহাকে প্রথম অর্হৎ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জৈনগণ পরমে-শ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে অর্হৎই পরমেশ্বর। ইঁহাদের পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষজয়ী, ত্রিলোকমান্য ও সত্যবাদী। জৈনমতে ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির পথ। ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধগমন। এই মতে দুইটি মাত্র মূলতত্ত্ব জীব ও অজীব, তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব ও অবোধাত্মক অজীব। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে জীবাজীবেরও ভেদ আছে,—জীব দ্বিবিধ, সংসারী ও মুক্ত। অমনস্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল (শরীর), অস্তিকায় (তত্ত্ব) প্রভৃতি ভেদে অজীব বহুবিধ। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র এই তিনটি মোক্ষের পথ। জৈনেরা এই তিনটিকে রত্নত্রয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। জৈন মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরাও অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জৈনদিগের যে সমস্ত নীতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান নীতির উল্লেখ করা যাইতেছে।

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শৌচ, প্রতিষ্ঠা, গুণগৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, বৰ্দ্ধনী (গাড়ু, ঘটী,) এই পাঁচটি ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে, অর্থাৎ এই সকল স্থানে হিংসা ঘটিবার সম্ভাবনা।

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শৌচ, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখতা এই গুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

পীড়িত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবে।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

এই সমস্ত নীতি যে হিন্দু নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট যে অনেক বিষয়ে ঋণী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

জৈনেরা চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন, ইঁহারা জিন নামে অভিহিত হন। মন্দিরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্তু, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, পার্শ্ব ও মহাবীর এই চতুর্বিংশ জন জৈনদিগের জিন বা তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত। পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈনরাজের পুত্র, ইঁহার মাতার নাম

বামা। বামাদেবী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আদি জিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পার্শ্বদেব গর্ভে অবস্থানকালে বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত যেন তিনি নিজ পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন, এই কথা তিনি মুখেও ব্যক্ত করিতেন। সেই কারণে তাঁহার পিতা তাঁহাকে "পার্শ্ব" বলিয়া অভিহিত করেন। পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল নির্দ্দোষে অতিবাহিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশপ্রদান ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইত। জৈনদিগের চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীরও জৈনধর্ম্মপ্রচারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন। আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় ও পার্শ্বনাথ পর্ব্বত জৈনদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। ইহাদের মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ। জৈনদিগের পূজক ও সাধুদিগকে যতি কহিয়া থাকে। তাঁহারা জৈনধর্ম্মের দার্শনিক মতের বিষয় সম্যক্ অবগত নহেন। ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ, ধর্ম্মের উৎপত্তি কারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্য জীবের সার, যদ্দ্বারা মনুষ্যের উৎকর্ষ-লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম—ইত্যাদি কতিপয় স্থূল নীতিমাত্র ইঁহারা অবগত আছেন। দেবমন্দিরে পাঠ, সাধুদিগের বন্দনা, তীর্থভ্রমণ, পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান ও ইন্দ্রিয়দমন এই পাঁচটি যতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটি জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, অন্য কোন জাতির মধ্যে এ সকল দৃষ্ট হয় না। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈনেরা সাধারণতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, শ্বেতাম্বরেরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত কেশসংস্কার-বিহীন ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া থাকেন। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, কিন্তু দিগম্বরেরা রত। জগৎশেঠগণ পূর্ব্বে উক্ত শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

নাগরবাসী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে হীরানন্দ নামে একজন সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। মারবারিগণ চিরদিন হইতে ব্যবসায়বাণিজ্যে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে জৈনগণই উক্ত কার্য্যে সবিশেষ পটু। ভারতবর্ষের এমন কোন নগর নাই, যেখানে অন্ততঃ দুই চারি জন মারবারী ব্যবসায়ের জন্য বাস না করিতেছেন। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাঁহাদিগের এক একটি উপনিবেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার বড়বাজার ও মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ, বালুচর প্রভৃতি স্থান এই সমস্ত মারবারী বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। মুর্শিদাবাদবাসী মারবারিগণের মধ্যে অধিকাংশই জৈনবণিক, কলিকাতায় অনেক হিন্দু মারবারীও আছেন। ঐ সকল স্থান বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় বাসনিকেতন হওয়ায় তথায় প্রতিনিয়ত উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় মুর্শিদাবাদের জৈন বণিক্‌সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মারবারী বণিক্‌গণ কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশাল সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক জাঞ্জিবার, নেটাল প্রভৃতি আফ্রিকার উপকূলসমূহেও বাণিজ্যার্থে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের এই রূপ সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত আধুনিক নহে, বহু দিন হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। হীরানন্দ সেই জাতির মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করায় নিতান্ত সম্বলহীন হইলেও তাঁহার বাণিজ্যপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ব্যবসায়কার্য্যে উন্নতি লাভ করিবার ইচ্ছায় আপনার যৎকিঞ্চিৎ মূলধন লইয়া ছাতু, ভুট্টা, লঙ্কা ও লবণের আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পর্ব্বত, নদী, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন পাটলীপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তিনি পাটনায় উপস্থিত হন, সে সময় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। বাণিজ্যব্যবসায়ে পাটনা শ্রীশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। মোগল রাজত্বে ভারতবর্ষে যে বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশীয় বণিক্‌সম্প্রদায় ব্যতীত ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণ তৎকালে পাটনায় কুঠী স্থাপন করিয়া সুচারুরূপে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শোণ, গণ্ডক ও গঙ্গা সম্মিলিত হইয়া পাটনাকে বাণিজ্যকার্য্যের উপযুক্ত স্থান করিয়া

তুলিয়াছিল। এই জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, নেপাল ও বাঙ্গালার বাণিজ্যের সহিত চিরদিন হইতে ইহার গাঢ় সম্বন্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তুলা, সর্ষপ, এরণ্ড, নীল, লবণ প্রভৃতির বাণিজ্যের জন্য ইহা চিরবিখ্যাত। হীরানন্দ ব্যবসায়বাণিজ্যে সর্ব্বদা কোলাহলময় পাটনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজ ভাগ্যোদয়ের জন্য যত্নবান হইলেন। পাটনা বাণিজ্যের প্রধান স্থান হওয়ায় তথায় অনেক মহাজনের গদী সংস্থাপিত ছিল; ব্যবসায়িগণ সেই সমস্ত গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা গদীয়ানের কার্য্য করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইতেন। কোন গদীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ হইবে বিবেচনা করিয়া হীরানন্দ সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না! তিনি যে গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে যান, তিনি তাঁহাকে নবাগত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হন। এইরূপে কোন গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে না পারিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সুদূর জন্মভূমি মারবার পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যোদয়ের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া পাটনায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বিন্দুমাত্রও করুণা তাঁহার উপর নিপতিত হইল না। এই রূপ হতাশ অন্তঃকরণে তাঁহাকে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতে হইল। এক দিন বিষণ্ণচিত্তে তিনি নগরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে তিনি একটি নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্তঃকরণ এত দূর চিন্তাকুল ছিল যে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি একটি নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে শ্যামল বৃক্ষরাজি হাস্য করিতেছিল, পাখীগুলি পাখার শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতেছিল, ক্রমে ঝিল্লীরবে অরণ্যানী ঈষৎ মুখরিতা হইয়া উঠিল। প্রকৃতির সেই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে হীরানন্দ ক্রমে অরণ্যের বহুদূরে আসিয়া

পড়িলেন। সহসা এক যাঁতনাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে, তাহাই জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া তিনি তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল, অনুসন্ধানের পর তিনি সেই স্থানের আবিষ্কারে সমর্থ হইলেন। দেখিলেন, তাহা একটি ভগ্ন অট্টালিকা ; সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার কোন প্রকোষ্ঠে একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। হীরানন্দ বৃদ্ধের সেই অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় বৃদ্ধের যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনদীপ ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। হীরানন্দ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সেই মহা-যাত্রা হইতে ফিরাইতে পারিলেন না, অল্পক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ চিরদিনের জন্য চক্ষুঃ মুদিত করিল। মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বৃদ্ধ হীরানন্দকে সঙ্কেত করিয়া গৃহের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যায়। হীরানন্দের সেবায় তুষ্ট হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ যেন বৃদ্ধ ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হীরানন্দ একাকী যথাসাধ্য বৃদ্ধের সৎকার করিয়া পরে গৃহের সেই কোণদেশখননে প্রবৃত্ত হইলেন, খনন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহাকে অপ্-রিমিত ধনের অধিকারী করিয়া গিয়াছে। যতই খনন করেন ততই, তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি সেই সমস্ত অর্থ হস্তগত করিয়া মনে মনে ভাগ্যলক্ষ্মীকে কোটী কোটী প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল অর্থ-রাশি লইয়া হীরানন্দ পাটনায় একটি গদী স্থাপিত করিলেন। এক্ষণে তিনি অন্যান্য গদীয়ানদিগকে আর গণনার মধ্যে আনিতে চাহিলেন না। তিনি অন্যান্য গদীয়ান অপেক্ষা কিছু অল্প সুদে অর্থ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে সমস্ত ব্যবসায়িগণই তাঁহার গদীর কথা অবগত হইল, এবং বহুলোকে তাঁহারই গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল, অল্প দিনের মধ্যে গদীয়ানের কার্য্য করিয়া তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। অর্থ-

লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুসন্তানলাভেরও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হীরানন্দ গোবর্দ্ধন, সদানন্দ, রূপচাঁদ, মুলুকচাঁদ, আমীনচাঁদ, নয়ানচাঁদ ও মাণিকচাঁদ নামে সাতটি পুত্র লাভ করেন। ধনবাই নামে তাঁহার একটি কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। শেঠ উদয়চাঁদ নামক কোন এক যুবকের সহিত তাহার পরিণয় সংঘটিত হয়। হীরানন্দের পুত্র সাতটিই পিতার সুসন্তান হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পিতার ন্যায় কার্য্যপটু ও ব্যবসায়কার্য্যে যৎপরোনাস্তি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইরূপে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ" করিয়া হীরানন্দ মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা নিজ জীবনকে যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে সেই ভাগ্যলক্ষ্মী যেন স্বহস্তে তাঁহাকে আশীর্ম্মাল্য পরাইয়া দিলেন, এই চিন্তায় তিনি যার পর নাই উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার গদীর কার্য্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিল, তখন তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গদী সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দিল্লী, আগ্রা, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সাতটি স্থানে তিনি সাতটি পুত্রের জন্য সাতটি পৃথক গদী সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকার গদীর ভার প্রাপ্ত হন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠগণের উৎপত্তি। এইরূপে সাত পুত্রের দ্বারা গদীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে দেখিয়া হীরানন্দ যথাসময়ে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। উক্ত সাত পুত্রের মধ্যে মাণিকচাঁদের নামই ক্রমশঃ সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

প্রতাপাদিত্য।*

অতঃপর শুন রাজনামা (১) বিবরণ।
পূর্ব্ব পুরুষের কিছু করিব বর্ণন॥
কলিতে প্রতাপাদিত্য নামে নরপতি।
যশোর নগরে (২) ধাম বীর্য্যবন্ত অতি॥
প্রচণ্ড প্রতাপে যথা ছিল দুর্য্যোধন।
ভয়ে যত রাজগণ লইলা শরণ॥

* রাজা বসন্ত রায়ের বংশে জাত ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট সব ডিভিজনের অন্তর্গত খোড়গাছি গ্রামস্থ স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় স্বীয় অমুদ্রিত সারতত্ত্বতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সারতরঙ্গিণী লিখিত হয়। তাঁহার পৌত্র জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই কবিতাটি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

(১) যে সমস্ত পারস্য গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা জানিতে পারিতেছি যে, রাজনামা নামক পারস্যগ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিত আছে। স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় মহাশয় সে গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। গৃহদাহে উক্ত গ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়া যায়, নবকৃষ্ণ বাবুও সে কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা রাজনামা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। ইহার অনুসন্ধান হইলে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ইহার অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। রামরাম বসু মহাশয়ও স্বীয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ-যুক্ত কোন কোন পারস্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ রাজনামাও তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে।

(২) প্রতাপাদিত্যের যশোর যে বর্ত্তমান যশোর জেলার সদর ষ্টেশন হইতে স্বতন্ত্র স্থান ও খুলনা জেলার সাতক্ষীরা সবডিভিজনের অন্তর্গত, তাহা প্রতাপাদিত্য-আন্দোলন হইতে সাধারণে ঝতে পারিয়াছেন।

বরপুত্র ভবানীর বিজয়ী ভুবনে।
যশঃ কীর্ত্তি জগতে বিখ্যাত সর্ব্বজনে॥
নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে (৩) আনি॥
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥
মারহাট্টী সনে (৪) তাহে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর॥
জলেশ্বর পাটনায় (৫) হইল সংগ্রাম।
যিনি মহারাষ্ট্রিগণে রাখিলেক নাম॥
দিল্লী হইতে ক্রমে ক্রমে দ্বাবিংশতি জন (৬)।
আসিলেক আমীরান্ করিবারে রণ॥
ত্বঞ্চি হইল বাদসার হুজুর হইতে।
বাহিনী লস্কর সঙ্গে বাঙ্গলা মারিতে॥
মোগল পাঠান ও চৌহান রাজপুত।
নানাজাতি চলিল যুদ্ধেতে যমদূত॥
অসংখ্য পদাতিসৈন্য সঙ্গে দলবলে।
বেড়িল বাঙ্গলা আসি চতুরঙ্গ দলে॥

(৩) প্রতাপাদিত্য যে উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দজীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রভৃতির গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। উক্ত গোবিন্দজী অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

(৪) সে সময়ে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীন হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত তৎকালীন উড়িষ্যাবাসীদিগেরই যুদ্ধ হইয়াছিল।

(৫) সম্ভবতঃ জলেশ্বর পত্তন।

(৬) প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য যে ২২ জন আমীর প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা অনেক গ্রন্থে আছে। কায়স্থকারিকা, রামরাম বসুর গ্রন্থ প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত ২২ জন হত হইলে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে যে তাঁহাদিগের সমাধি হইয়াছিল, ইহাও শুনা যায় সেই জন্য অদ্যাপি কোন স্থান 'বাইশ ওমরার' কবর বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকত্ব কতটুকু তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

বাওয়ান্ন হাজার ঢালি সঙ্গে সৈন্যদল।
সাজে বঙ্গাধিপতি দ্বিতীয় আখণ্ডল॥
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গে।
সাজিল বাজিল রণবাদ্য নানারঙ্গে॥
গজবাজী আরোহণে হাজারে হাজার।
কাতারে কাতারে চলে যত আসোয়ার॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি কামানের ধ্বনি।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ কাঁপিল মেদিনী॥
দেবীবরপুত্র রাজা কেবা আঁটে তাঁকে।
যুদ্ধে যাঁর সেনাপতি আপনি কালিকে॥
মারি শত্রু ভেট দিলা শমন ভবনে।
অদ্যাবধি আছে সেই চিহ্ন নিদর্শনে॥
নাহি মানে বাদসায় কেবা আঁটে আর।
একছত্রে ভুঞ্জে রাজ্য ত্রিসপ্ত বৎসর (৭)॥

(৭) রায় মহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার পতন হয়, তাহা হইলে রায় মহাশয়ের মতে, ১৫৮৫ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতাদিত্যের রাজত্ব আরম্ভ হইতেছে। যশোহরের কুলাচার্যাগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্য ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁহাদের মতে প্রতাপাদিত্য ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৬৪৭ অব্দে তাঁহার অবসান ঘটে। ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ সাহ জাহানের রাজত্বকালের মধ্যে পড়ে। সুতরাং কুলাচার্য্য মহাশয়দিগের উক্তি যে ভ্রমাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। রায় মহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে রাজত্ব আরম্ভ করিলেও, তিনি সে সময়ে তাদৃশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কারণ প্রথম ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্ফ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গে আগমন করেন। তিনি অন্যান্য ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোন রূপ উল্লেখ করেন নাই। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জেস্যুইট পাদরীগণের পত্রে আমরা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাই। ফলতঃ প্রতাপাদিত্য কোন্ সময় হইতে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা নির্ [illegible] দুঃসাধ্য।

নগর রাজার কত ছিল গড় থানা (৮)।
হস্তি ঘোড়া শকটাদি সৈন্য অগণনা॥
হাতিয়াগড়েতে (৮) রাজহস্তির মকাম।
সেই হৈতে হইল হাতিয়াগড় নাম॥
জগদ্দলে (৯) মেদন্মল্লে (১০) আদি পাটমহলে (১১)।
আছিল সৈন্যের ঠাট সিন্ধুসম বলে॥
কীর্ত্তিযশ তাঁহার কি করিব বর্ণনা।
কতস্থানে কতরূপ কে করে গণনা॥
স্বীয় কর্ম্মদোষে ভবানী বিমুখ হৈল।
রাজা মানসিংহ হস্তে পরাভব পাইল (১২)॥

(৮) হাতিয়াগড় সরকার সাতগাঁর শেষ দক্ষিণ পরগণা ও মূল ২৪ পরগণার অন্যতম। ডায়মণ্ডহারবর হইতে সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। মথুরাপুর প্রভৃতি স্থান হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত। এই সমস্ত স্থান যে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হাতিয়াগড়ের নিকটস্থ সাগরদ্বীপই জেস্যুইট পাদরীগণের লিখিত চাণ্ডিকান বা সায়াণ্ডিকা। স্থানান্তরে এ বিষয় আলোচিত হইবে। কিন্তু হাতিয়াগড়, প্রতাপাদিত্যের হস্তিশালার অবস্থিতির জন্য উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

(৯) মেদন্মল সরকার সাতগাঁয়ের একটি পরগণা ও মূল ২৪ পরগণার অন্যতম। কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে ইহার আরম্ভ। বর্ত্তমান মাতলা রেলওয়ের দুই পার্শ্বে উক্ত পরগণা অবস্থিত। বারুইপুর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। মাতলায় প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল।

(১০) জগদ্দল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত, চন্দননগরের পরপারে অবস্থিত। এইখানে আজিও প্রতাপাদিত্যের গঁড়ের চিহ্ন আছে।

(১১) পাটমহল পরগণায় প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র আসিয়া বাস করেন। ইহা কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যে ইহা সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আইন আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ইহার অবস্থান ছিল।

(১২) জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্ব কালে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ ২য় বার সুবাদার হইয়া আসেন সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে।

রাজ্যলোভে হয়ে মূঢ় নিদারুণ চিত।
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হৈল হত (১৩) ॥
তাঁর খুড়া আছিল বসন্তরায় নামে।
মহারাজা পরমধার্ম্মিক অনুপমে ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মশীল অতি।
যশ অনুরাগে বশ কৈলা বসুমতী ॥
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য নলসম ধীর।
প্রজার পালনে যথা ছিল যুধিষ্ঠির ॥
মানে দুর্য্যোধন দানে কর্ণের সমান।
যোগেতে পরমযোগী ছিলা মহাজন (১৪) ॥
দাউদের বাদসাহী প্রাপ্ত সে কারণ (১৫)।
রাজনামা তাহে সব আছে বিবরণ (১৬) ॥

৺রামগোপাল রায়।

(১৩) রায় মহাশয়ের মতে পিতৃব্যহত্যাই প্রতাপের পতনের কারণ।

(১৪) কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও বসন্তরায় সম্বন্ধে ঐ রূপই বর্ণনা আছে।

(১৫) রায় মহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের উচ্চ চরিত্রের জন্য দায়ূদ বাদসাহী পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(১৬) রায় মহাশয়ের এই সমস্ত বিবরণ সম্ভবতঃ রাজনামা হইতে গৃহীত। রাজনামা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

সজীব বুদ্ধ।

হিমালয়ের সানুপ্রদেশস্থ কোন ক্ষুদ্র নগরের রাজ-সন্ন্যাসীর যে ধর্ম্মমত সমস্ত এসিয়াখণ্ডে জ্ঞান ও শান্তির মহাপ্লাবন আনয়ন করিয়াছিল, আজিও তাহার সজীব ধারা অর্দ্ধ এসিয়ার মানবমণ্ডলীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহার নিকট প্রবল পরাক্রান্ত অশোক, কুবলে খাঁ ও বর্ত্তমান মুটসুহিটো মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব অদ্যাপি যে বিদ্যমান থাকিবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? ফলতঃ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন রূপ নিদর্শন না থাকিলেও তাহার বহির্ভাগে এখনও ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম চীন, জাপান ও শ্যামের রাজধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত। এখনও তিব্বত ও মোঙ্গলিয়ায় ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। এখনও তথাকার সন্ন্যাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইংরেজের তিব্বতপ্রবেশে তিব্বত ও মোঙ্গলিয়ায় যে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, নির্জ্জীব হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও প্রাণহীন হয় নাই। কারণ উদীচ্য বৌদ্ধগণ এখনও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিচলিত হইয়াছেন। আর আমরা স্বধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়া বিলাসের অলস ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছি! কিন্তু তিব্বত ও মোঙ্গলিয়ার বৌদ্ধগণের আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইংরেজ যে সহসা তাহাদের ধর্ম্ম মলিন করিয়া তুলিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অখণ্ডনীয়।

উত্তরপ্রদেশস্থ বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন সজীব, ইহার নেতৃগণও সেই রূপ বুদ্ধের সজীব অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বৌদ্ধগণের নিকট সজীব বুদ্ধ

বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। তিব্বত ও মোঙ্গলিয়ায় এই রূপ অনেক সজীব বুদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে তিব্বতের সজীব বুদ্ধগণ সাধারণতঃ লামা উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু মোঙ্গলিয়ার সাধারণ বৌদ্ধ পুরোহিতগণ লামা বলিয়া অভিহিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নেতৃগণ গিগেন বা সজীব বুদ্ধ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে মোঙ্গলিয়ার রাজধানী উর্গার সজীব বুদ্ধ মোঙ্গল বৌদ্ধগণের সর্ব্বপ্রধান নেতা। এই সজীব বুদ্ধ ইংরেজের তিব্বতপ্রবেশ বৌদ্ধজগতের পক্ষে ঘোরতর অকল্যাণ মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথমে কিরূপে সজীব বুদ্ধ প্রথার উৎপত্তি হইল আমরা তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর হইতে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে তাঁহারা মহাযান ও হীনযান নামে দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ নাগার্জ্জুন হইতে মহাযান পন্থার উৎপত্তি। এই মহাযান পন্থা উত্তর প্রদেশে ও হীনযান পন্থা দক্ষিণ প্রদেশে খ্যাতি লাভ করে। মহাযান সম্প্রদায় ক্রমে প্রাচীন অর্হৎবাদের প্রতি তাদৃশ অনুরক্তি প্রদর্শন না করিয়া বোধিসত্ত্ববাদের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। অর্হৎ-বাদে আত্মোন্নতির দ্বারা দুঃখধ্বংস ও নির্ব্বাণলাভই চরম উদ্দেশ্য। একমাত্র বুদ্ধই এই মত প্রচারে সমর্থ। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞানলাভে সক্ষম না হন, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি বোধিসত্ত্ব মাত্র। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ের নেতৃগণ আত্মোন্নতির দ্বারা নির্ব্বাণলাভের চেষ্টা অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব অবস্থায় জগতের অসংখ্য প্রাণীকে ধর্ম্মের কল্যাণে অভিষিক্ত করা শ্রেয়ঃ মনে করায়, তাঁহাদের মত বোধিসত্ত্ববাদে পরিণত হয়। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণকে বোধিসত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আবার শরীরী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ন্যায় অশরীরী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই অশরীরী বুদ্ধগণ ধ্যানী বুদ্ধনামে খ্যাত। তাঁহাদের মধ্যে অমিতাভ গৌতম বুদ্ধের অশরীরী প্রতিরূপ। অশরীরী বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে অবলো-কিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি প্রধান।

মহাযান পন্থা অনেক দিন হইতে তিব্বতে প্রবেশ লাভ করিলেও ইহা সামান্য আকারে বিদ্যমান ছিল। লাসা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা স্রংসান গম্পোর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। উক্ত রাজা স্বীয় মন্ত্রী থুনি সামভটাকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুবাদের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সামভটাই তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহাদের কর্ত্তৃক তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হওয়ায় গম্পো অবলোকিতেশ্বরের ও সামভটা মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন। এই সময় হইতে তিব্বতে সজীব-বুদ্ধবাদের প্রচার আরম্ভ হয়। গম্পো রাজার পরে আবার তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের হীনাবস্থা ঘটে। অর্দ্ধশতাব্দী পরে রাজা কার সংসান আবার ভাবতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া ইহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর আবার ইহা মন্দীভূত হইতে আরব্ধ হয়। অবশেষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত অতীশ তিব্বতে গমন করিয়া মহাযান প্রথার প্রাধান্য বিস্তার করেন। ইহার পর হইতে ক্রমে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইতে আরব্ধ হয়, এবং নানা স্থানে মঠ স্থাপিত হইয়া লামাগণের আবাসভূমি হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গিস খাঁর পৌত্র পরাক্রান্ত কুবলে খাঁ যৎকালে চীন সাম্রাজ্যের একাধিপত্য ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি তিব্বতের লামা কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎসূত্রে তিনি শাক্য মঠের লামাকে বৌদ্ধ মঠসমূহের নেতা ও তিব্বতের অধিপতি বলিয়া প্রচার করেন। এই সময় হইতে তিব্বতের সহিত চীন সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সংকপা নামে তিব্বতের প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সংকপা সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হইলেও শাক্য লামাগণের নেতৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রচারের জন্য তিনি অমি-তাভের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন, এবং শাক্য লামাগণ অবলোকিতে-শ্বরের অবতার রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে শাক্য লামা ও সংকপার উত্তরা-ধিকারিগণ দালাইলামা ও পঞ্চসেন লামা বলিয়া বিখ্যাত হন। খৃষ্টীয় পঞ্চ-

দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সম্রাটগণ তিব্বতের এই দুই লামাকে নেতারূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পন্তসেন লামা অমিতাভের অবতার হওয়ায় দালাই লামা অপেক্ষা অধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু দালাই লামা আবার তিব্বতের অধিপতি হওয়ায় তিনি অন্যভাবে সর্ব্বপ্রধান। সেই জন্য পন্তসেন লামাকে গৌরবান্বিত গুরু ও দালাই লামাকে গৌরবান্বিত রাজা বলে। এক্ষণে দালাই লামা ক্ষমতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তিনি তিব্বত রাজ্যের ও তাহার অধীনস্থ মঠসমূহের অধিপতি। এই দুই জন লামার অন্যতরের দেহাবসান ঘটিলে, জীবতি লামা মৃত লামার স্থানে লোক বসাইয়া থাকেন। জীবিত লামা মৃত লামার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জাত তিব্বতীয় বালকগণের মধ্যে তিন জনকে মনোনীত করিয়া পরে স্ফুর্ত্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে এক জনকে লামা স্থির করেন। বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের একই আত্মা চিরদিন হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা ঐরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। তিব্বতের প্রধান লামাগণের ও চীন রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পন্তসেন লামা ও দালাই লামার ন্যায় তাঁহাদের নিম্ন পদস্থ অন্যান্য লামাগণও অশরীরী বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। এই রূপে তিব্বতে ও মোঙ্গলিয়ায় অনেক সজীব বুদ্ধ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। মোঙ্গলিয়ার সজীব বুদ্ধগণের মধ্যে উর্গার সজীব বুদ্ধই প্রধান। পঞ্চবিংশ সহস্র লামা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

উত্তর বৌদ্ধ জগতের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে দালাই লামাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত বৌদ্ধগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। তিব্বত, মোঙ্গলিয়া ও চীনের বৌদ্ধগণ দালাই লামাকে আপনাদিগের ধর্ম্মের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন। কেবল জাপান দালাই লামার প্রাধান্য স্বীকার করেন না। দালাই লামার পর উর্গার সজীব বুদ্ধ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। তিব্বত, চীন ও মোঙ্গলিয়ার বৌদ্ধযাত্রিগণ উর্গার সজীব বুদ্ধকে দেখিবার জন্য প্রতিনিয়ত গমন করিয়া থাকেন, মোঙ্গলিয়ার পঞ্চবিংশ সহস্র লামা তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং দালাই লামার ন্যায় সজীব বুদ্ধেরও ক্ষমতা

অসীম। সজীব বুদ্ধ ও লামাগণ জগতের শান্তির জন্য প্রতিবৎসর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শান্তির পক্ষপাতী হওয়ায় মোঙ্গলিয়া প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধের বিকট হুঙ্কার শুনা যায় না। এই সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চেষ্টায় জঙ্গিস খাঁ ও কুবলে খাঁর বিরাট্ বাহিনীর বংশধরগণ ধীর কৃষকের ন্যায় গোবী-মরুভূমির পার্শ্বদেশে হলকর্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা এক দিন এসিয়ার ত্রিচতুর্থাংশ ভূখণ্ড ও অর্দ্ধ ইউরোপে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, সজীব বুদ্ধ ও তাঁহার লামাগণের শান্তির প্রার্থনায় আজ তাহারা মরুভূমির বক্ষে শস্যোৎপাদনে ব্যাপৃত। সজীব বুদ্ধ মোঙ্গলিয়ার ধর্ম্মজগতের নেতা হইলেও তিনি চীন রাজ্যেরও শান্তিবিধাতা। তাই আজ চীন জগতের চক্ষে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘোষিত! যাহারা এককালে অর্দ্ধ এসিয়ার প্রভু ছিল, আজ তাহারা এরূপ অপদার্থ কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপদার্থ নহে। শান্তিময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা কেবল নিজ রাজ্যে নহে, কিন্তু সমস্ত জগতে শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী। তাই মোঙ্গল ও চীনবাসিগণ কেবল কৃষি ও শিল্প লইয়াই জীবন যাপন করিতেছে। নতুবা জঙ্গিস খাঁ ও কুবলে খাঁর যোদ্ধৃবর্গের বংশধরগণ অস্ত্রধারণ করিলে এসিয়াখণ্ডে যে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতে পারে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয় এই শান্ত জাতি এক্ষণে কিছু অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের তিব্বতপ্রবেশই এই অধীরতার কারণ।

রুসিয়ার গ্রাস হইতে তিব্বতকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের বাণিজ্যব্যপদেশও আছে। কিন্তু তিব্বতীয় ও মোঙ্গলগণ ইহাকে তাহাদের ধর্ম্মের অবমাননা বলিয়া মনে করিতেছে। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া যাহারা নিরাপদে শান্তি ভোগ করিতেছিল, ইয়ংহজব্যাণ্ড অভিযানে আজ তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তিব্বত হইতে অনেক যাত্রী মোঙ্গলিয়ায় গমন করিয়া ইংরেজের তিব্বতপ্রবেশের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। দলে দলে লামাগণ উর্গার সজীব বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, সেই পঞ্চবিংশ সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উর্গায় উপস্থিত হইয়া সজীব বুদ্ধের মন্দিরে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের অবমাননা হইল

মনে করিয়া তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা প্রতিবৎসর জগতে শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন, আজ তাঁহারা বিচলিত। তিব্বত, চীন এমন কি ভারতবর্ষ ও সাইবিরিয়া হইতে বৌদ্ধগণ সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য দলে দলে উর্গায় উপস্থিত হইতেছেন। এরূপ অধীরতা যে এসিয়ার পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও সজীব বুদ্ধ ও লামাগণ শান্তির পক্ষপাতী। ভরসা করি, ইংরেজও শান্তি ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগের আশঙ্কা দূর করিবেন। একে মাঞ্চুরিয়ায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর তিব্বত ও মোঙ্গলিয়ার পর্ব্বত ও মরু রুধিরস্নাত হইলে, এসিয়া-খণ্ডে যে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সহসা যে এইরূপ মহাপ্রলয়ের সূচনা করিবেন, ইহা আমরা কদাচ মনে করি না। ভগবান করুন, যেন এসিয়ার শান্তি বিনষ্ট না হয়।

মনুষ্যের ইতিহাস

বর্ত্তমান অতীতের সন্তান এবং ভবিষ্যতের জনয়িতা। সুতরাং বর্ত্তমানের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে অতীততত্ত্ব অবগত হইতে হয়। ইতিহাস সেই অনাদি ভূতের জীবনচরিত। উত্তরাধিকারিতার নিয়মে জনকের অনেক-গুণ স্থান ও কালের সহিত সন্তানে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমেরিকার দার্শনিক পণ্ডিত এমার্সন বলেন, মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরু-ষের জীবনচরিতই ইতিহাস।* পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের সামান্য

* "Of the works of this mind history is the record."

ভগ্নাংশ মাত্র সেই রূপ পৃথিবীবাসী প্রত্যেক মনুষ্যই সমগ্র মানবসমষ্টিরূপ বিরাট্‌-পুরুষের এক একটী ভগ্নাংশ। বসুন্ধরার বিশাল বক্ষঃস্থল এই বিরাট্‌পুরুষের লীলানিকেতন। ইনি যুগযুগান্তরে দেশদেশান্তরে যে লীলা করিয়াছেন, অতীত-ক্ষী ইতিহাস আজি অভিব্যক্তির উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া বিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকিত মানবজাতিকে উচ্চকণ্ঠে সেই কথা বিজ্ঞাপন করিতেছে।

ঐতিহাসিক যুগের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্য সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। অন্ত মানবজাতির আদিমতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। এ বিষয়ের অনেক বিবরণ আমরা "বিশ্বকোষে" মানবতত্ত্ব শব্দে লিখিয়াছি। বিবর্ত্তবাদী প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সমস্বরে বলিতেছেন, মনুষ্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইলেও মাতৃরূপা বসুন্ধরার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ভূতধাত্রী ধরিত্রীর গর্ভরূপ অক্ষয়-চিত্রশালিকায় পুরাতন জীবজগতের চিত্রাবলী সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বসুন্ধরাকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া সেই অপূর্ব্ব অতীত চিত্রশালা লোক-লোচনের সমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, ভূস্তরের প্রস্তরী-ভূত জীবকঙ্কালে অতিকায় মৎস্য কূর্ম্মের প্রকাণ্ড শরীর অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তথায় বরাহ কিম্বা সিংহশার্দ্দূলের পদচিহ্নমাত্র নাই। তৎপর-বর্ত্তী ভূস্তরে সহস্র সহস্র বাসুকি কিম্বা অনন্তের বিরাট্‌ শরীর সর্ব্বংসহার যত্নে ধরিত্রীগর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তখনও ভূপৃষ্ঠে মনুষ্যশিশু ভূমিষ্ঠ হয় নাই। হায় মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সমস্ত জীব ধরীত্রীর অঙ্কে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, ভূতধাত্রী মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব প্রেরণায় পাষাণহৃদয়ে তাহাদিগের চিত্রাবলী (ফটোগ্রাফ্‌) অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্য তখনও উৎপৎস্যমান কালের গর্ভে নিহিত।

ওয়ালেস্‌ সাহেব অভিব্যক্তিবাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—মনুষ্য বিবর্ত্তবাদের উচ্চসোপানে সমাসীন হইলেও কোন অদৃশ্যমান ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন জীবের সহোদর, কোন কশ্যপকল্প প্রজাপতিসন্ততির অধস্তন বংশধর। যে ঔরসে উরঙ্গম ও বিহঙ্গম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, হয়ত মানব সেই সর্প ও বৈনতেয়গণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

যাহা হউক রিগালোঁ, ফক্‌নার, প্রেষ্টউইচ্, গডউইন অষ্টিন্, ইভান্‌স প্রভৃতি ভূতাত্ত্বিকগণ অক্লান্তপরিশ্রমে বসুন্ধরার চিত্রশালা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বল্গা-হরিণ ও গুহাভল্লূকের পরবর্ত্তী যুগে এবং ম্যামথ বা অতিকায় হস্তিজাতির সমকালিক চিত্রশালায় প্রাথমিক মনুষ্যজাতির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্য বৈনতেয়গণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা না হইলেও হস্তিগণের সহোদর একথা পাশ্চাত্যালোকে স্বীকার করা যাইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বুধগণ আশঙ্কিত হৃদয়ে বলিতেছেন, মনুষ্য বানরের অভিব্যক্ত মূর্ত্তি না হইলেও স্বতন্ত্র নূতন জীব এবং জীবজগতের অর্ব্বাচীনতম জাতি।

যে যুগে গণ্ডশৈলসঙ্কুলা তুষারময়ী প্রবাহিণী সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড লইয়া দিগদিগন্তে ধাবিত হইত, পৃথিবীর সেই প্রাথমিক হিমপ্রলয়যুগে মনুষ্য-শিশু ধরিত্রীর অঙ্কে ক্রীড়া করিয়াছিল। সে যে কত কালের কথা তাহা কে বলিবে!

কিছুকাল পূর্ব্বে অর্ব্বাচীন ইংরাজদিগের বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্যের ভূততত্ত্ব অন্ধকারগুহায় নিহিত। অকস্মাৎ ইংলণ্ডের পাদ্রিপ্রবর প্রধান ধর্ম্মযাজক আসার (Usher.) প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মবলে গণনা করিলেন যে, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ অব্দে সাগরাম্বরা শৈলকাননালঙ্কৃত মনুষ্যাধ্যুষিতা বসুন্ধরা যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন। কিন্তু পাদ্রিপ্রবরের সেই সিদ্ধান্ত এক্ষণে কমনীয় কল্পনাকক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। ভূতত্ত্বের প্রামাণিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে বলিতেছেন,—পৃথিবীর সৃষ্টি যে, কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা অনুমানের অনধিগম্য। তাঁহারা জননী ভূতধাত্রীর বয়স গণনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ মনুষ্যশিশুর বয়সেরও কোন "গাছ পাথর" পাইলেন না। কিন্তু কেহ কেহ ভীত ভীত ভাবে সেই অনুমানানধিগম্য কালকে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

বিশ্বব্যাপী বিরাট্ জ্ঞানযজ্ঞের হোমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যে দিন

হইতে সে জ্ঞানাগ্নির প্রথম সমাধান হইয়াছে, সেই দিনই ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা। ইংরাজের আদিপুরুষ আদম নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোজনে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, গ্রীসের প্রমথিয়াস্ (প্রমথেশ?) স্বর্গ হইতে সেই অগ্নি অপহরণ করিয়া নির্দ্দয়রূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুর যজ্ঞাগ্নি তপোবনের মধ্যে অরণিসংযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিজ্ঞান আপনার বিবিধ বাহু বিস্তার করিয়া সেই জ্ঞানযজ্ঞের পবিত্র হোমানলে আহুতি দিতেছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। হবির্গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইতেছে। কে বলিবে কত দিনে সেই হোমানলে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইবে! কোন্ ভাগ্যবান্ ঋত্বিক্ সেই যজ্ঞের হোতা হইবেন! মানবজাতি কতদিনে ললাটে সেই যজ্ঞতিলক ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত হইবেন!

বিধাতার বিচিত্র বিধান বিজ্ঞানবাদীর বাহ্য পরীক্ষায় বহুদূরে বিদ্যমান থাকিলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষ মানব সর্ব্বদাই সেই সামীপ্যলাভে সমুৎসুক। ফলাফল উৎপৎস্যমান কালের গর্ভে নিহিত। ইতিহাসের সংকীর্ণ পরিধি বহুবিস্তীর্ণ হইয়াছে। বিজ্ঞান এবং দর্শনের আলোকে আলোকিত হইয়া ইতিহাস নীরব-ভাষায় মনুষ্যসভ্যতার অভিব্যক্তি ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক দিন রাজমহিষীর প্রণয়-কাহিনীই ইতিহাসের লেখ্য ছিল, আজি মনুষ্যতত্ত্ব বিবৃত করাই ইতিহাসের উচ্চ লক্ষ্য হইয়াছে। বারান্তরে এই ইতিহাসের উপাদান ও শিক্ষা সম্বন্ধে বলিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
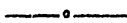
হেষ্টিংসব্যঙ্গ-চিত্র।

(২)

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে "J. S." এই নিদর্শনযুক্ত একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হয়। উহা জিলরের অঙ্কিত বলিয়া কথিত হইলেও যে সায়ার কর্তৃক চিত্রিত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। চিত্রখানির নাম দেওয়া হইয়াছিল,—"The Princes Bow, alias the Bow Begum." চিত্রে অযোধ্যার বেগম উপবেশন করিয়া আছেন। বার্ক, ফক্স ও শেরিডান অবনত মস্তকে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। যে আসনে বেগম উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাহার নিম্ন হইতে ফ্রান্সিস বলিতেছেন,—"I am at the bottom of this." আসনের উপরে একখানি চিত্র বিলম্বিত আছে। উক্ত চিত্রে অঙ্কিত একটি পর্ব্বতের পাদদেশস্থ গহ্বর হইতে একটি মূষিক বাহির হইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে,—"Purturiunt montes, nascitur ridiculus mus,"

ঐ চিত্রপ্রকাশের ৬ দিন পরে উহার একটি উত্তর বাহির হয়। সে চিত্রে পূর্ব্বোক্ত চিত্রের বিষয়টীকে অন্যরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত উত্তরটি যে জিলরের তুলিকাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই চিত্র খানির নাম—"The Bow to the throne, alias the Begging Bow." এই চিত্রে প্রাচ্যপরিচ্ছদধারী হেষ্টিংস সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাপরিপূর্ণ থলে হস্তে লইয়া থর্লো ও পিটকে প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা আগ্রহসহকারে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। হেষ্টিংস বলিতেছেন,—"Dear Gentlemen! This is too little; your modesty really distresses me!" পাদাধারের সম্মুখে ইংলণ্ডের রাণী জানু নত করিয়া হেষ্টিংসের পাদুকার অগ্রভাগ চুম্বন করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে ২ লক্ষ পাউণ্ড লিখিত একটি থলে রহিয়াছে। বাম বগলে একটি বাক্স। রাইট, এভান্স

প্রভৃতি জিলরের ব্যঙ্গ-চিত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মতে এই বাক্সে বারাণসীর নবাবের* প্রেরিত প্রসিদ্ধ হীরক ছিল। কিন্তু "B" ও "E" এই প্রথম ও শেষ অক্ষরের দ্বারা "Bute"কেও বুঝায়। সিংহাসনের পশ্চাতে ইংলণ্ডেশ্বর জানু নত করিয়া মুদ্রাপরিপূর্ণ সিংহাসন হইতে মুদ্রা বাহির করিতেছেন; ও বলিতেছেন,—"I am at the bottom of it !" হেষ্টিংসের পশ্চাদ্ভাগে একটি সুবৃহৎ মুদ্রাধারে ৪০লক্ষ পাউণ্ড লিখিত আছে। মুদ্রাধারের দুইটি হস্ত বিস্তৃত হইয়া তাহা হইতে অজস্র অর্থবৃষ্টি হইতেছে এবং তাহা নিম্নস্থ তিনটি অবনত-জানু ভক্তের উপর পড়িতেছে। চিত্র খানির নীচে লিখিত আছে,—"Out of it came not a little tiny mouse, but a mountain of delight," থর্লো ও পিটের পশ্চাতে হেষ্টিংসের অনুগ্রহপ্রার্থী অনেকগুলি লোকের হ্যাট ও হস্ত অঙ্কিত আছে, এবং একটি বিস্তৃত ফীতা হইতে গার্টার, ষ্টার ও ব্যাজ অব দি বাথ ঝুলিতেছে।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ২রা মে জিলরের অঙ্কিত "Market day" নামে এক খানি চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে লর্ডগণের আত্মবিক্রয় প্রদর্শিত হই-য়াছে। থর্লো জনৈক গো-ক্রেতার ন্যায় তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটি মুদ্রাধার ধারণ করিয়া লর্ডগণের মস্তকযুক্ত এক দল গোর নিকট দণ্ডায়মান; তিনি যেন সেই দলটিকে কিনিয়াছেন। চিত্রের অস্পষ্ট স্থানে কতকগুলি গো বার্ক ফক্স ও শেরিডান প্রভৃতির উপবেশনের প্রহরী-মঞ্চটি উল্টাইয়া দিতেছে। উপরি-ভাগে একটি বারাণ্ডায় বসিয়া পিট ও ডণ্ডাস পাইপ টানিতেছেন ও বিয়ারের পাত্র ধরিয়া আছেন। তাঁহারা নীচের দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না। হেষ্টিংস একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজমস্তকযুক্ত ও হস্তপদবদ্ধ একটি গোবৎস বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

৬৬ নং ড্রুয়ারি লেনস্থিত উইলিয়ম হলাণ্ড কর্ত্তৃক জিলরের অঙ্কিত "The Political Banditti assaulting the Saviour of India," নামে এক খানি সুন্দর ও সুবৃহৎ চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হেষ্টিংস

* সম্ভবতঃ কাশীর রাজা অথবা অযোধ্যার নবাব।

বার্ক, নর্থ ও ফক্স কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছেন। বার্ক বিশালমুখযুক্ত একটি বন্দুকহস্তে হেষ্টিংসের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার স্কন্ধে "Charges" লিখিত একটি ছোট থলে ঝুলিতেছে। তাঁহার শরীরের কতক অংশ বর্ম্মাবৃত। হেষ্টিংস একটি প্রাচ্য ধনীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া—"Shield of Honour" লিখিত একখানি ঢালের দ্বারা আবৃত, তিনি বার্কের বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত গুলি সেই ঢালের দ্বারা রক্ষা করিতেছেন। "Saved to the Company" ও "Eastern Gems for the British Crown" লিখিত দুইটী থলে—"Territories acquired by W. Hastings" লিখিত একটি চোঙ্গার সহিত উষ্ট্রের গলায় ঝুলিতেছে। উষ্ট্রের পশ্চাদ্‌ভাগে—"Lacks of Rupees added to the Revenue" ও "Rupees ditto" লিখিত দুইটি থলে আছে। নর্থ পশ্চাৎ হইতে প্রথমোল্লিখিত থলেটি পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি একটি শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম পরিধান ও এক খানি ক্ষুদ্র তরবারি ধারণ করিয়া আছেন। তাহার কোষে লিখিত আছে,—"American Subjugation." ফক্স এক খানি ছোরা দ্বারা হেষ্টিংসের পৃষ্ঠে আঘাত করার চেষ্টা করিতেছেন।

১৬ই মে "State Jugglars" নামে ফরেস কর্ত্তৃক একখানি চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে হেষ্টিংস দুই পার্শ্বে থর্লো ও পিটকে লইয়া একটি মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখ হইতে অজস্র মুদ্রা বাহির হইতেছে। তাহা কুড়াইবার জন্য নিম্নস্থ লোকেরা ধাকাধাকি করিতেছে। থলোর মুখ হইতে আগুণ ও পিটের মুখ হইতে ফীতা বাহির হইতেছে। চিত্রের অস্পষ্ট স্থানে ফক্স বার্কের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া হ্যাট বাড়াইয়া কতকগুলি মুদ্রা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। উপরে রাজা ও রাণী এক খানি নাগরদোলায় বসিয়া আছেন। চিত্রের নিম্নে কয়েক পংক্তি কবিতা আছে।

১৭ই মে "The Trial" নামে এক খানি চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে "H. H." এই নিদর্শন মাত্র ছিল। উক্ত চিত্রে থর্লো বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ফক্স শাইলকের ন্যায় একখানি ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান। তিনি বলিতেছেন,—"My deeds upon my head, I crave

the law!" ফক্সের পশ্চাতে বার্ক শেরিডান প্রভৃতি অবস্থিত। থর্লোর বাম পার্শ্বে আইন জনৈক ব্যবহারজীবীর ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি পশ্চাতে দণ্ডায়মান প্রাচ্যপরিচ্ছদধারী হেষ্টিংসকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহার বামহস্তে একটি ভারী টাকার থলে। হেষ্টিংস বলিতেছেন,—"He seeks my life, his reason will I know."

১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ২০এ মে "Opposition Coaches" নামে এক খানি চিত্র ফরেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহাতে চিত্রকরের কোন রূপ নিদর্শন না থাকিলেও উহা যে জিলরের অঙ্কিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিত্র খানির মধ্যস্থানস্থিত একটি নিদর্শন-স্তম্ভ হইতে দুই খানি চারি ঘোটকযুক্ত শকট চলিয়াছে। স্তম্ভটির বামদিকে—"To the Slough of Despond"এবং দক্ষিণদিকে —"To the Temple of Honour" লিখিত আছে। পার্লামেণ্টীয় শকটখানি বামপার্শ্ব দিয়া একটি পাহাড় হইতে নিম্নস্থ একটি কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে পড়িতেছে, তাহার দরজায় লিখিত আছে—"Licensed by act of Parliament, Pro Bono Publico" বার্ক শকট খানি চালাইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে ফক্স একটি বিশাল মুখযুক্ত বন্দুক লইয়া উপবিষ্ট। ঘোটকগুলির মস্তক মনুষ্যের ন্যায়। শকটের মধ্যে চারি জন লোক উপবিষ্ট। শকটের পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি জড়ান কাগজপূর্ণ একটি ঝুড়ি, তাহার গায়ে লিখিত আছে,—"Magna-charta," "Bill of Rights" ও "Impeachment of W. Hastings." রাজকীয় শকট খানি থর্লো কর্ত্তৃক চালিত হইয়া একটি খাড়াই পাহাড়ে উঠিতেছে। ঘোটক চারিটির মুখ ডণ্ডাস, আর্ডেন, গ্রেনভিল ও সিডনির ন্যায়। শকটের ছাদে রাণী দক্ষিণহস্তস্থিত একটি ঝুড়িতে একটি হংস ও বামহস্তস্থিত একটি ঝুড়িতে কতকগুলি স্বর্ণ ডিম্ব লইয়া উপবিষ্ট। শকটের মধ্যে প্রধান আসনে হেষ্টিংস ও তাঁহার সম্মুখস্থ আসনে একটি বলিষ্ঠ মহিলা বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তক রাজমুকুটভূষিত। উক্ত মহিলা হেষ্টিংসপত্নী ব্যতীত আর কেহ নহেন। ভৃত্যগণের আসনের পশ্চাতে রাজা একটি বন্দুক হস্তে উপবিষ্ট। পার্লিয়ামেণ্ট শকটের নীচে লিখিত আছে, "O Liberty!

O Virtue! O my Country!" রাজকীয় শকটের দরজায় রাজবংশের নিদর্শন ও "Licensed by Royal Authority" লেখা রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে কয়েক পংক্তি কবিতাও লিখিত আছে। ইহার পর ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে আর কোন চিত্র-প্রকাশের উল্লেখ দেখা যায় না।

তাহার পর ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে লিষ্টার স্কোয়ারের কাসলষ্ট্রীটস্থিত এট্‌কেন এক খানি চিত্র প্রকাশ করেন। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "Cooling the Brain, or the little Major shaving the shaver." এই চিত্রে বার্ক একটি উন্মত্তের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছেন, এবং হেষ্টিংসের পার্লিয়ামেণ্ট এজেণ্ট মেজর স্কট তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিতেছেন। তাহার নিকটে একটি ফাঁসীকাষ্ঠে একটি নরকঙ্কাল গলদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। ফাঁসীকাষ্ঠের উপর লিখিত আছে—"Nundocomar." হেষ্টিংস ৪০ লক্ষ পাউণ্ড লিখিত একটি থলে লইয়া সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে যাইতেছেন ও তথায় অভ্যর্থিত হইতেছেন। বার্ক বলিতেছেন,—"Ha! miscreant, plunderer, murderer of Nuncomar, where wilt thou hide thy head now?" নীচে কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিত আছে।

অতঃপর আর কোন চিত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। সর্ব্বশেষে হেষ্টিংস নিষ্কৃতি লাভ করিলে এক খানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ৮ই মে উক্ত চিত্রখানির প্রকাশ হয়। উক্ত অব্দের ২৩এ এপ্রিল হেষ্টিংস নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার অত্যল্প দিন পরেই চিত্রখানি প্রকাশিত হয়। চিত্রখানি "The last Scene of the Managers' farce" নামে অভিহিত হইয়াছিল। চিত্র খানিতে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভের উপর হেষ্টিংসের অর্দ্ধদেহ অবস্থিত। তাহা হইতে একটি উজ্জ্বল আলোক বাহির হইতেছে। স্তম্ভটিতে এইরূপ লিখিত আছে, "Virtus repulsœ nescia sordidœ incontameninatis fidget honoribus." চিত্রখানিতে গাঢ় ধূম নির্গত হইতেছে দেখা যায়। ধূমের উপরিভাগে লর্ড লফবরো ও লর্ড থর্লো চ্যান্সেলারদ্বয়ের প্রতিকৃতি। প্রথমোক্ত বলিতেছেন,—"Black, upon my honour!" শেষোক্ত

বলিতেছেন,—"Not black, upon my honour!" দক্ষিণ পার্শ্বে মঞ্চের সন্নিহিত একটি আসনে ফক্স ও অন্যান্য ম্যানেজারগণ আসীন। ফক্সের হাতে একখানি দর্পণ, তদ্দ্বারা দ্রব্যগুলি বৃহত্তর আকারের বোধ হয়। পার্শ্বে একটি শম্বুকের গমনচিহ্ন অঙ্কিত, তাহাতে লিখিত আছে—"1787-1795." নিকটে এক খানি কটাহে কতকগুলি দ্রব্য রহিয়াছে, সেগুলি ম্যানেজারগণ কর্ত্তৃক মিশ্রিত কতকগুলি উপকরণ, তদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যাতীত কোন চরিত্রকে কালিমামণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধান অভিনেতা বার্ক প্রহসন খানি অনাদৃত হইতেছে দেখিয়া মঞ্চ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি পশ্চাদ্‌ভাগস্থ দ্বার দিয়া প্রেতভূমি বা কোন অদৃশ্য স্থানে প্রস্থান করিতেছেন, তথায় ম্যানেজারেরা সকলেই মঞ্চ ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। ফ্রান্সিস রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎ হইতে প্রম্পটারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

এই সমস্ত চিত্রে যদিও অনেক স্থলে কমন্স সভার সভ্যদিগকে ক্রোধপূর্ণ প্রতিকৃতিতে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তথাপি হেষ্টিংসকে কিরূপ ভাবে চিত্রকরগণ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সকলেই অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণও নানারূপে চিত্রিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, তৎকালে ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের আন্দোলন কালবশে নীরবতা প্রাপ্ত হইলেও উক্ত ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হেষ্টিংসের পক্ষসমর্থকগণ যতই কেন বলুন না, উক্ত চিত্রগুলি যে তাঁহার অবিচার, অত্যাচারের জ্বলন্ত প্রমাণ সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রুস-জাপান যুদ্ধ—রুস-জাপান যুদ্ধের আজিও নিবৃত্তি হয় নাই। নব-বলদৃপ্ত জাপান আজিও যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছে। তাহাদের তরুণারুণাঙ্কিত বিজয়-নিশান এখনও প্রাচ্য আকাশে উত্থিত হইয়া সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি লিওয়াংএর যুদ্ধে জাপান যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। কিন্তু যুদ্ধনীতিবিশারদ পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলিতেছেন যে, উক্ত যুদ্ধে জাপানসেনাপতি অপেক্ষা রুসসেনাপতি কুরুপ্যাটকিনই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যদিও লিওয়াংএ রুস সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের পলায়নে অদ্ভুত যুদ্ধনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। জাপানের উচিত ছিল যে, ঐ যুদ্ধে রুসিয়ার ধ্বংস সম্পাদন করা, এবং রুসিয়া যখন লিওয়াং হইতে হটিয়া মুকডেনে ছাউনি করিয়াছেন, ও জাপানকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন লিওয়াংএর যুদ্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় বলা যায় না। তাহা না হউক, কিন্তু ঐ যুদ্ধে জাপানের কি অপরিসীম ক্ষমতা প্রদর্শিত হয় নাই? রুসভল্লুক শরবিদ্ধ না হউক, তাহাকে যখন গহ্বর অন্বেষণ করিতে হইয়াছে, তখন আর পরাজয়ের বাকি রহিল কি? যাহা হউক, মুকডেনের যুদ্ধে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে।

তিব্বত-অভিযান—তিব্বত-অভিযানের কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইয়ং হজব্যাণ্ড সদলবলে ভারতাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। শুনিতেছি, তিব্বতের সহিত সন্ধি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিব্বতের কর্ত্তা দালাই লামা ত নিরুদ্দেশ। তবে তাঁহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণ নাকি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহা

কি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে? আবার শুনিতেছি, চীন আম্বান বা প্রতিনিধি নাকি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। চীন সম্রাটও সন্ধির সমস্ত সর্ত্তে রাজি নহেন; সন্ধির প্রস্তাবে নাকি তিব্বতের উপর তাঁহার যে ক্ষমতা আছে, তাহার সংকোচের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। রুসিয়াও নাকি আপত্তি করিতেছেন। বৈদশিকগণের সহিত তিব্বতের সংস্রব পরিত্যাগপ্রস্তাবে তাঁহাদের আপত্তি। আবার মোঙ্গলিয়ার লামাগণ ও তাঁহাদের নেতা সজীব বুদ্ধ নাকি ইহাতে অসম্মত। মোঙ্গলগণ শীত ঋতুর পর ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। এই সমস্ত সত্য হইলে সন্ধিতে কিরূপ সুফল দাঁড়াইবে তাহা বুঝা কঠিন। ইংরেজ সহসা যে পশ্চাৎপদ হইবেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তাহা হইলে এসিয়াখণ্ডে যে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদেরও নিস্তার নাই! কারণ এই যুদ্ধের ব্যয় আমাদেরই স্কন্ধে পড়িবে। অতএব যাহাতে এই সমরানল প্রজ্জ্বলিত না হয়, সে বিষয়ে সকলের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

শিবাজী-উৎসব—গত ৩১এ ভাদ্র কলিকাতা টাউনহলে ভারতপূজ্য শিবাজীর উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এবার উৎসব-সমিতির যত্নে শিবাজী-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, রাজপুত, নেপালী, শিখ, মাড়বারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জনগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা গত মাসের ঐতিহাসিক চিত্রে এই শিবাজী-উৎসব সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়াছি। সুখের বিষয় এবার সেই মহাপুরুষের পূজা অত্যন্ত আগ্রহসহকারেই সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা প্রতি বৎসরই এইরূপ ভাবে উক্ত মহাপুরুষের উৎসব দেখিতে চাহি। কেবল শিবাজীর বলিয়া নহে, ভারতের সমস্ত মহাপুরুষের পূজা এই রূপে আরম্ভ হউক, আবার ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠুক, এবং ধীর, শান্ত ও পবিত্র ভাবে ভারতবাসিগণ আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়া জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল তেজে প্রতিভাত হইতে থাকুক, তাহাদের মোহনিদ্রা ঘুচিয়া যাউক, আলস্য,

ঔদাস্য দূরে পরিহার করিয়া আবার তাহারা জাতিপদবাচ্য হউক। এ বৎসরের বিরাট্ অধিবেশনের জন্য আমরা উৎসব-সমিতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উৎসবসভায় অনেক মহাত্মা বাঙ্গলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ও ওজস্বিনী ভাষায় শিবাজীর গুণগরিমা ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী কবিতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এরূপ কবিতা অনেক দিন বঙ্গ-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করে নাই। ভাবে, ছন্দে ও ভাষায় প্রাণ নাচাইয়া তুলে। আমরা কবির শেষ উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজি!
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে!"

রবীন্দ্রনাথের এই মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান কি কোন দিন ফলিবেনা?

বৈশালী—সাহিত্যপরিষদের আশ্বিন মাসের অধিবেশনে আর্কেওলজিক্যাল সার্ভেয়ার শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৈশালী সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধে রাখাল বাবু অত্যন্ত গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈশালী, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বী বৌদ্ধগণের নিকট তীর্থরূপে পরিচিত ছিল। তন্মধ্যে বৈশালীতে বুদ্ধদেবের অনেক কীর্ত্তি ও দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবেশন ঘটিয়াছিল। রাখাল বাবু সেই সমস্ত বিশেষ রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কনিংহাম প্রভৃতির মতানুসারে মজঃফরপুরের নিকটস্থ বেসাড়কে বৈশালী স্থির করিয়াছেন, এবং ১৯০৩ সালে সুপ্রসিদ্ধ

ব্লচ সাহেবের সহিত তথায় গমন করিয়া অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৪ ফুট মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত একটি প্রস্তরগৃহ হইতে ৭ শত মৃন্মোহরই উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে অধিকাংশ মোহরই গুপ্ত সম্রাটগণের বলিয়া স্থির হইয়াছে। রাখাল বাবু তাহাদের মধ্যে কোন কোনটীর ছায়াচিত্রও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বৈশালীর স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মত আছে, উজ্জয়িনী, প্রয়াগ প্রভৃতি এককালে বৈশালী বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু তিনি কনিংহামের বেসাড়কেই বৈশালী বলিতে চাহেন। তিনি উক্ত মৃন্মোহরগুলির মৌলিকতায় সন্দেহ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধদেবের উক্তি-অনুসারে হরিদ্বারের নিকটস্থ বিশালা বদরীকে বৈশালী বুঝায়, বেসাড়কে বুঝায় না। বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও বেসাড়ের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনানুসারে বৈশালীতে হিন্দু ও জৈনগণেরও অনেক চিহ্ন ছিল, কিন্তু বেসাড়ে তাহা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি মৃন্মোহরগুলির প্রতি সন্দেহ করেন নাই। রাখালদাস বাবু প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন যে, ২৪ ফুট মৃত্তিকার নিম্নে প্রস্তরগৃহ হইতে যে সকল মোহর তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করার কারণ থাকিতে পারে না। তিনি হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনানুযায়ী পাটলী-পুত্র বা হাজীপুর হইতে বৈশালী বা বেসাড়ের দূরত্বের ও অশোকস্তূপ ও স্তম্ভাদির অবস্থানের ঐক্য প্রদর্শন করিয়া বেসাড়কেই বৈশালী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সে দিবস পূজ্যপাদ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেনের সহিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তিনি মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি হইতে যেরূপ অবগত হইয়াছেন, তাহাতে পঞ্চানন বাবুর নির্দ্দিষ্ট বিশালা বদরীই বৈশালী বলিয়া স্থির হয়। আমরা বলি, বৈশালীর স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন। যদিও কনিংহাম প্রভৃতি হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণানুসারে বেসাড়কেই বৈশালী স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,

তথাপি বৌদ্ধ গ্রন্থাদির বর্ণনানুসারে যখন অন্যরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, তখন সে সম্বন্ধে যে বিশেষ রূপ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান করিলে আরও সুখের বিষয় হয়।

সমালোচনা।

প্রতাপ সিংহ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ প্রণীত। এই নাটকোপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে যাঁহারা কঠোর ইতিহাসচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। ইতিপূর্ব্বে সতীশ বাবু মাসিক পত্রাদিতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ "ভারত-প্রতিভা" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত করিয়া ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে রচিত হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, সতীশ বাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। প্রধানতঃ টডের রাজস্থান অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত, কিন্তু তিনি অন্যান্য ইতিহাসেরও আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদর্শনেরই চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। ছাত্রগণের পাঠ্যের বিশেষ উপযোগী। এই গ্রন্থ আমরা বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের হস্তে দেখিতে ইচ্ছা করি। প্রতাপ সিংহের এক খানি হাফটোন চিত্রে গ্রন্থ খানির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

ভাদ্রের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্র বাবুর সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ স্বদেশী সমাজ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ আমাদের ভবিষ্য সমাজগঠনের জন্য আকুল আহ্বান।

ভাদ্রের ভারতীতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কাবুলীওয়ালা প্রবন্ধে কাবুলীগণের একটি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত রাজা রাজবল্লভকর্ত্তৃক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাদ্রের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ভারত চন্দ্রের যুগ নামক প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন।

ভাদ্রের বঙ্গভাষায় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রবন্ধে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিলাভ প্রবন্ধে শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ত্রিপুরা জেলার মেহেরবাসী সর্ব্বানন্দ ঠাকুর নামে কোন মহাত্মার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

ইংরেজী।

জুলাই মাসের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ন্যালে এ নিউ হিষ্টোরিক্যাল ফ্রাগমেণ্ট ফ্রম নিনেভি নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এফ্, জি, পিঞ্চেস্ লিভারপুলের জন কুইনের নিকট হইতে সংগৃহীত কতকগুলি দগ্ধ মৃত্তিকার ফলক হইতে আসিরিয়া ও বাবিলন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আবিষ্কার করিরাছেন।

সেপ্টেম্বর মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ন্যালে শ্রীযুক্ত আর, বার্ণ মোগল বাদসাহদিগের স্থাপিত টাঁকশাল সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অন সম্ আর্কেওলজিক্যাল রিমেন্স ইন্ দি ডিষ্ট্রিকট অব রাজসাহী নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়ালি বাঘা ও কুশম্বার জুম্মা মসজিদের বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ দত্ত হাতোয়া রাজ প্রবন্ধে হাতোয়া রাজ, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজত্বকাল ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

উক্ত মাসের ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি এ রোহিল্লাস টেল অব দি মিউটিনি নামক প্রবন্ধে সিপাহী বিদ্রোহকালে রামনগরের একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসের নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রে ব্যারন সুয়েমাটস্থর লিখিত হাউ রসিয়া ব্রট অন ওয়ার নামক প্রবন্ধে, কণ্টেম্পরারি রিভিউ পত্রে ও, এল্ জবেকার লিখিত রেড ক্রশ সোসাইটি ইন্ জেপান নামক প্রবন্ধে, এবং ফর্টনাইটলি রিভিউ পত্রে আলফ্রেড ষ্টীডের লিখিত জেপান এণ্ড রসিয়া জার্ম্মানি এণ্ড গ্রেট ব্রিটেন প্রবন্ধে রুস-জাপান যুদ্ধের ও তাহার আনুষঙ্গিক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে।

বিবিধ।

অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য ইউনিভার্ষিটী ইনষ্টিটিউট হইতে আয়োজন হইতেছে। সুখের কথা বটে।

জয়পুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নুরনগরের রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রনাথ রায়ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

সার ডবলিউ লী ওয়ার্ণার মার্কুইস অব ডালহৌসীর এক খানি জীবনচরিত দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

সীতারামের ধর্ম্মপ্রাণতা।

উপন্যাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য লইয়া ইতিহাস গঠিত; আর সত্যের সামান্য অস্থিমজ্জার উপরে কল্পনার উন্মেষে ও কৃত্রিম ঘটনাবলীর সমাবেশে উপন্যাস সম্পোষিত হয়। কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা কোমলশ্যামল তৃণাচ্ছাদিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; যে পথ আছে, তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্যাসের পথ বহুসংখ্যক; লেখক ও পাঠকের রুচি অনুসারে উপন্যাসের পথ ইচ্ছামত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়।

ইতিহাসকে অতি সহজেই উপন্যাস করা যায়; ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্যাস হইয়া পড়ে। কিন্তু উপন্যাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা যায় না। আমাদের দেশে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামে একজাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের নায়ক নায়িকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, দুই একটি প্রধান প্রধান ঘটনাও সত্যানুবর্ত্তী হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার ও পত্রপল্লব অধিকাংশই ঔপন্যাসিক ও কাল্পনিক। এ জাতীয় গ্রন্থদ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। সুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্ত্তা কাল্পনিক কথা বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে।

বঙ্কিম বাবুর "সীতারাম" একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ পুস্তকে

কয়েকটি নাম ধাম ব্যতীত আর সকলই প্রায় ঔপন্যাসিক। বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" কিন্তু সে ভূমিকার কথা ভূমিকাতেই আছে; লোকে তাহা শুনে না বা মানে না। "একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান, সুতরাং লক্ষ্যবিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।"*

যশোহর জেলায় মাগুরা সব্ ডিভিসনের অন্তর্গত মহম্মদপুর নামক স্থানে স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। এখনও তথায় তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জাজ্জ্বল্যমান ভাবে বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু কিছুদিন মাগুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্ত্তি-রাজি দেখিবার জন্য মহম্মদপুরে যান এবং তথাকার শ্রীরাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক গল্পপর কর্ম্মকুশল ব্যক্তির নিকট হইতে সীতারাম সম্বন্ধে অনেক গল্প গুজব শুনিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিন মধ্যেই "সীতারাম" উপন্যাস প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিকতা লইয়া বিচার না করিলে, "সীতারাম" পুস্তক যে সাহিত্যজগতে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উপন্যাস হইতে সীতারামের মহত্ত্ব, বীরত্ব, সাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, সীতারাম অত্যন্ত বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও নারীগতপ্রাণ ছিলেন। "সীতারামী সুখ" বলিয়া একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে; প্রধানতঃ সেই প্রবাদ বাক্যের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে বিগ্রহের মধুর ইতিহাস লোকে সাগ্রহে পাঠ করিতে করিতে অবাস্তবের দিকে এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে, সীতারামের অন্য যাবতীয় গুণ তাঁহার ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সীতারামের বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয়সেবা থাকিতে পারে; কোন্ রাজার ছিল না? তবে ইন্দ্রিয়সেবা তাঁহার চরিত্রের

* সাহিত্য, ১৩০২। কার্ত্তিক (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

বিশেষত্ব নহে। সীতারামচরিত্রের যদি কোন বিশেষত্ব থাকে,—তাহা দেব-সেবা এবং পরসেবা। এ প্রস্তাবে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

সীতারাম উচ্চরাঢ়ীয় কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কুনিয়া গ্রামে। কয়েক পুরুষ পরে রাম-রাম দাস নামক এক ব্যক্তি নবাব সরকার হইতে “খাস বিশ্বাস” উপাধিলাভ করিয়া কুনিয়া হইতে কান্দির নিকটবর্ত্তী গিধিনাতে আসিয়া বাস করেন। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র রাজসরকার হইতে “রায়” উপাধিতে ভূষিত হন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীনে একটি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন। উদয়নারায়ণ অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; দেবদেবীর নামানুসারে তিনি দুই পুত্রের নাম সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ রাখেন। ইঁহাদের উভয় ভ্রাতাই শৈশব হইতে ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উত্তরকালে সীতারাম যখন ভুজবলে রাজ্যাধিকার করিয়া রাজাসনে সমাসীন হন, তখন তিনি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ চতুর্দ্দশবর্ষকাল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। এই রাজত্ব কালের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেবসেবা এবং লোকসেবার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

একটি দৈব ঘটনায় সীতারামের সৌভাগ্য সূচিত হয়। বর্ত্তমান মহম্মদপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উদয়নারায়ণের কয়েকখানি তালুক ও জমা ছিল। সে সময় এ সকল স্থানে লোকের বসতি ছিল না; কোন স্থানে বিস্তৃত জলা-ভূমি, কোথায়ও বিচিত্র অরণ্যানী এবং কোথাও সুবিন্যস্ত শ্যামল শস্যক্ষেত্র শোভা পাইত। একদা সীতারাম এই স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে ভূগর্ভপ্রোথিত একখানি লৌহশলাকায় তাঁহার অশ্বের ক্ষুর বিক্ষত হইয়া যায়। সীতারাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন তথায় একখানি ত্রিশূলের অগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছে। তখন তাঁহার আদেশে ঐ স্থান খনন করা হইলে

দেখা গেল যে, ঐ স্থানে একটি প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। মন্দিরা মধ্যে সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা যাহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহার সৌভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। কয়েক বৎসর পরে যখন সীতারাম আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন উপরোক্ত যে স্থলে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সৌভাগ্যবিধাতাকে নিশ্চল ভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে মন্দিরটি দ্বিতল এবং অষ্টকোণাকৃতি। উহার গাত্রে একখানি শিলা খণ্ডে লিখিত ছিল—

লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্॥

অর্থাৎ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে (১৬২৬ শকে) সীতারাম পিতৃপূর্ণ্যার্থে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ নহেন, সীতারাম অন্যান্য অনেক দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের পার্শ্বে একটি পরম সুন্দর বহুকারুকার্য্য খচিত বিচিত্র মন্দিরে কৃষ্ণজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। যখন দিঘাপাতিয়ারাজের পূর্ব্বপুরুষ দয়ারাম বাহাদুর সীতারামের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কৃষ্ণজী বিগ্রহকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান। আজিও দিঘাপাতিয়া রাজবাটীতে সে অপহৃত বিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে। আর সে অপূর্ব্ব মন্দির লতাপাতা বিমণ্ডিত হইয়া বিষণ্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সীতারাম কর্ত্তৃক দশভূজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সকল মন্দির অপেক্ষা অদূরবর্ত্তী কানাইনগর গ্রামে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে তিনি হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের স্থাপনার জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা অধিকতর সুন্দর এবং বিচিত্র শিল্পকার্য্য সমন্বিত। উক্ত মন্দিরের গোলাকার ফলকে লিখিত আছে ঃ—

বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রৈঃ পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভব কুলকমলোদ্ভাসকোতূ ভানুল্যঃ।

ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তং রুচির রুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ ॥*

ইহা হইতে বুঝা যায় যে "ভক্তিমান্" সীতারাম রায় এই বিচিত্র কৃষ্ণগৃহ নির্ম্মাণ করেন। এখানে "ভক্তিমান্" এই বিশেষণটি সীতারামের নামে অতি সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে তাঁহার বীরত্বের কথা নাই, রাজত্বের কথা নাই, এখানে আছে শুধু তাঁহার ভক্তির কথা। তিনি ভক্তিগুণেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কানাইনগরের মন্দির অতি মনোহর। কিন্তু মন্দিরের শিল্পকার্য্যাদির বর্ণনা করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কানাইনগর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বুড়াশিবের এক ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবশ্য শিবলিঙ্গের পূজা সে মন্দিরে হয় না; নিকটবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক পূজাদির কার্য্য সমাহিত হইতেছে। সীতারামের রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দোলমঞ্চ এখনও প্রকাণ্ড মনুমেণ্টের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবভক্ত সীতারাম এই সকল বিগ্রহের প্রত্যেকের সেবাদির জন্য কয়েক খানি করিয়া গ্রাম বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

রাজা সীতারাম ৪৪ পরগণার অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেই সম্পত্তি নাটোরের রাজার করায়ত্ত হয়। পরে যখন সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের অবহেলায় উক্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হয়, তখন নলদি, সাতৈর, দিঘাপাতিয়া ও নড়াইল প্রভৃতি স্থানের স্বনামধন্য ভূম্যধিকারিগণ উহা ক্রয় করেন। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইতে পারে না, এজন্য সীতারামের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সম্পত্তিগুলি নাটোররাজার হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সম্ভবতঃ

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় উক্ত ফলক লিপি খানি স্বয়ং না দেখিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকটির কয়েক স্থানে ভ্রান্ত পাঠ যোজনা করিয়াছেন। আমরা স্বচক্ষে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া অবিকল এস্থলে প্রদান করিলাম।

উপরোক্ত প্রকারে নীলামবিক্রয়ের সময়ে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সম্পত্তিগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি গ্রাম দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০৲ টাকা; এতন্মধ্যে দেব সেবার জন্য ২৩০০ টাকা এবং চাকরাণ, সরঞ্জাম ও মোকদ্দামা প্রভৃতি খরচ জন্য মোট ৪২০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট ১৫০০৲ টাকা সরকারের লাভ থাকে।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীই এই সকল দেববিগ্রহের সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আজিও তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। রাণী ভবানীর সময়েই তাঁহার কন্যা তারাসুন্দরী সীতারামের প্রাসাদের সন্নিকটে রামচন্দ্র বিগ্রহ ও কানাইনগরে বলরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে নিম্নলিখিত পাঁচ স্থানে দেবসেবার বন্দোবস্ত আছে; প্রত্যেক স্থলের আনুমানিক ব্যয় প্রদত্ত হইল।

১।	লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের বাটী	মোট বার্ষিক খরচ	১০৩৩৲
২।	দশভূজার বাটী		
৩।	রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটী	"	৬৫১৲
৪।	কানাইনগরের হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের বাটী		৫৯৮৲
৫।	গোপাল বুড়াশিবের বাটী	"	৩৬৲
		মোট খরচ	২৩১৮৲

বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক হিন্দুপর্ব্বে এই সকল দেব মন্দিরে রীতিমত উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রাজা সীতারামের সময়ে যে সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, রাণী ভবানীর সুব্যবস্থায় এখনও সেই সব উৎসব হয়; তবে সে জাকজমক, ব্যয়বাহুল্য এবং বিরাট কাণ্ডকারখানা আর নাই। এখনও সেই বনাচ্ছাদিত নির্জ্জন প্রদেশে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর রোলে প্রাতঃ সন্ধ্যায় অমৃতবর্ষণ করিয়া থাকে। শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রারাম-সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে যিনি নিস্তব্ধ ঊষায় এই সকল দেবালয়ের মঙ্গল আরতির মধুর নিনাদ শুনিয়া নেত্র উন্মীলন করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তিনিই জানেন তখন তাঁহার হৃদয়ে

কি অপূর্ব্ব ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় এবং তিনি কিরূপ উৎকট আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া পড়েন। তখন দূরাগত বংশীধ্বনিবৎ সীতারামের কীর্ত্তিকাহিনীর দূরস্মৃতি তাহাকে আত্মবিহ্বল করিয়া তুলে এবং সেই ভক্তিপ্রবণ বিখ্যাত নৃপতির এক বিরাট চিত্র তাহার মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না; সীতারামের ধর্ম্মোৎসবের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানে পুরা-ণোক্ত যাবতীয় লীলার যথোপযুক্ত অভিনয় হইত। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হন। তীর্থস্থানের মধ্যে বৃন্দাবন যেরূপ বৈষ্ণবহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করি য়াছে, এমন আর কিছুই নহে। সীতারাম রাজধানীর সন্নিকটে যে স্থানে গুপ্ত বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম যদুপতিনগর বা কানাই-নগর। সেই স্থানেই কৃষ্ণরাধার যুগলরূপ বর্ত্তমান। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে দিবা রাত্র অষ্টপ্রহর সমভাবে হরিনামানুকীর্ত্তন হইত। পূর্ব্ব-পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত অট্টা-লিকার দুইটি প্রকোষ্ঠে দুইদল “কীর্ত্তনওয়ালা” বেতন ভোগী হইয়া বাস করিত; তাহাদের একদল বিশ্রাম করিবার সময় অন্যদল গান গাহিত। মন্দির প্রাঙ্গণ দিবানিশি ভক্তমণ্ডলীর প্রেমোচ্ছ্বাস কলরোলে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন বৃন্দাবনে গোপগণের বসতি ছিল; সীতারামের নববৃন্দাবনেও গোপগণের বসতি হইল। যে পাড়ায় তাহারা বাস করিত, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও সে স্থানে দুই তিন ঘর গোপের বাস আছে; কানাইনগরের হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবক গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিত না; এখনও সেই নিয়ম চলিতেছে। কানাইনগরের চতুঃপার্শ্বে যে সকল গ্রাম আছে, তাহাদের নাম শ্যামনগর, রাধানগর, মথুরানগর প্রভৃতি। কানাইনগরের বিগ্রহগণের সেবার বৃত্তিস্বরূপ যে তিনখানি গ্রাম উৎসৃষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেকৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর ও বলরামপুর। ইহার অনতিদূরে অপূর্ব্ব জলাশয় কৃষ্ণসাগর এখনও শোভা পাইতেছে; উহাই কালীয়হ্রদ বলিয়া কল্পিত হইত। কানাইনগরের মন্দির হইতে রাজধানীর বাজার পর্য্যন্ত এক মাইল ব্যাপী এক প্রকাণ্ড পরিখা

খনিত হইয়াছিল। উহা এখনও স্বচ্ছ সুপেয় সলিলপূর্ণ তড়াগসম বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, ইহাই ছিল যমুনা নদী। রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাকে রথোৎসবে ও অন্যান্য পর্ব্বে উক্ত পরিখার তীরবর্ত্তী প্রশস্ত পথে রথারোহণে লইয়া যাওয়া হইত এবং পরে তিনি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী তরণীতে কল্পিত কালন্দী পার হইয়া কানাইনগরে গিয়া কিছু দিন বাস করিতেন। প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও এই সকল পূরাণসম্মত আনন্দলীলা সীতারামের পরম ভক্ত প্রজাবর্গকে সর্ব্বদা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল উৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে ভক্তপ্রাণ পরম হিন্দু বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। যিনি সর্ব্বদা সন্ধ্যাবন্দনা, জপতপঃ ও পর্ব্বোৎসবে কালাতিপাত করিতেন, দেবতাব্রাহ্মণের প্রতি যাঁহার অপার ভক্তি ছিল, প্রজাসাধারণের দুঃখ দূরীকরণের জন্য যিনি অজস্র অর্থ বর্ষণ করিতেন, যাঁহার কীর্ত্তিচিহ্নসকল বহু শতাব্দী পরে এখনও নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি কিরূপে বিলাসবিভ্রাটে ইন্দ্রিয়সেবায় ঘৃণিত কামুকের মত কাল যাপন করিতেন, তাহা খুঁজিয়া পাই না। সীতারামের যে ঔপন্যাসিক ইতিবৃত্ত আমরা পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই অলীক। প্রকৃত ইতিহাসের মর্য্যাদা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সীতারামের প্রকৃত চরিত্রও একদিন গল্প গুজবের তামসাবরণ হইতে মেঘবিনির্ম্মুক্ত শশিসম সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের একটি অঙ্গবিশেষ। ব্রাহ্মণের প্রতি সীতারামের অচলা ভক্তি ছিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সীতারাম স্বয়ং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী নামক এক প্রবীণ, শাস্ত্রপারদর্শী এবং পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ মহম্মদপুরাঞ্চলে আগমন করেন। তিনি কায়স্থের দানগ্রহণ বা কায়স্থকে দীক্ষাদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। সীতারাম নানা কৌশলে অবশেষে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গুরুদেবকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন; এ তথ্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও সমর্থিত হইয়াছে। পাঠক জানেন, চন্দ্রচূড়ের প্রতি সীতারামের ভক্তি কত প্রগাঢ় ছিল। কথিত আছে, গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের

তুষ্টিসাধনের জন্যই তিনি কানাইনগরে হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্থানের শীলোৎকীর্ণ "কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ"—কথা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে। কেবল গুরুদেবের প্রতি নহে, সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার প্রবল ভক্তি ছিল। সীতারামের মৃত্যুর পরও বহুদিন পর্য্যন্ত মহম্মদপুর একটি অতি সমৃদ্ধ ও লোকবহুল জনপদ ছিল। যশোহর জেলার মধ্যে ইহা এক সময়ে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এক সময়ে যশোহর জেলার কেন্দ্রস্থলটি স্থানান্তরিত করিয়া মহম্মদপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১২৪৪ সালে মহম্মদপুরে এক ভীষণ মড়ক হয়। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশ কলেরা ও ম্যালেরিয়া নামক যে দুই ভীষণ ব্যাধির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের উভয়ের জন্মস্থান যশোহর জেলায়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গায় কলেরা প্রথম দেখা দেয় এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হয়। এই ভীষণ ম্যালেরিয়া মড়কে মহম্মদপুর উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান মহম্মদপুর যে ব্যাঘ্রবরাহসেবিত ভীষণ জঙ্গলে আবৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার কারণ এই মড়ক। মহম্মদপুরের যখন সুদিন ছিল, তখন সেই স্থান ও নিকটবর্ত্তী বহুজনপদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতি লইয়া "রাজ-সমাজ" নামক একটি সমাজ গঠিত হইয়াছিল। আজিও রাজ-সমাজ নাম আছে; কিন্তু তাহার অন্তর্গত অধিবাসীর সংখ্যা ৩০।৩২ ঘর মাত্র। এই রাজ-সমাজের অন্তর্গত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ সকলেই রাজা সীতারামের নিকট হইতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই সেই পূর্ব্ব সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্ভোগ করিতেছেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ভূমি বৃত্তিদান সীতারামের পুণ্যকীর্ত্তি সমূহের অন্যতম।

সীতারাম কখনও কোন ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার বা ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিতেন না। ব্রাহ্মণের বাক্য তিনি সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিতেন। কেহ কখনও সীতারামের কোপানলে পড়িলে, সে যদি জনৈক ব্রাহ্মণকে সম্মুখে লইয়া উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সীতারাম তাহার কিছুই করিতে পারিতেন

না। এই জন্য কেহ কোন বিপদে পড়িলে, তিনি ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুরোধ করাইতেন। সীতারাম যখন প্রসিদ্ধ রামসাগর দীর্ঘিকা খনন করিবার আজ্ঞা দেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাহার সেনাপতি মেনাহাতি তীর নিক্ষেপ করিলে, ঐ তীর যতদূর গিয়া পড়িবে, ততদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘিকা খনিত হইবে। সেরূপ হইলে দেওয়ান মহাশয়ের হর্ম্ম্যবাটিকাও দীর্ঘিকাতলে পতিত হইত। এজন্য দেওয়ান মহাশয় একদা প্রাতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে সম্মুখে লইয়া সীতারাম যেখানে প্রাতে আহ্নিক করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের কাহারও কাহারও জমি উক্ত সীমার মধ্যে পড়িয়াছিল। ঐ সকল ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সীতারামেরই প্রদত্ত। পুনরায় উহা দীর্ঘিকা খননের জন্য গ্রহণ করিলে দত্তাপহারী হইতে হয়। সুতরাং সীতারাম ব্রাহ্মণগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাহাদের জমি বাদ দিয়া দীর্ঘিকা খনিত হইল। সীতারামের নিকট কোন দুঃসংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে তাহাও ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রদত্ত হইত। এরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণভক্ত ব্যক্তির প্রতি ঘৃণিত চরিত্রের আরোপ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি বৈদেশিকগণ সীতারামকে অত্যাচারী জমিদার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে গো ব্রাহ্মণ বা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এমন কি তিনি শত্রুর প্রতিও কোন অস্বাভাবিক অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না। তাঁহার সেনাপতি কর্ত্তৃক পরমশত্রু আবু তোরাব নিহত হইলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ যেরূপ কপটাচার দ্বারা গুপ্তভাবে তাঁহার সেনাপতিকে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি কখনও যুদ্ধে সেরূপ কপটাচার প্রদর্শন করেন নাই। সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিতে করিতেই তিনি শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে ধর্ম্মনাশ বা সম্মানহানির ভয়ে অঙ্গুরীয়কমধ্যস্থ বিষ লেহন করিয়া জীবনান্ত করেন।

উপন্যাসে দেখিতে পাই, সীতারাম চিত্তবিশ্রামেই অধিকাংশ সময় রমণীরূপ

সুধাপানে অতিবাহিত করিতেন, রাজকার্য্যে প্রায়ই মনোভিনিবেশ করিতেন না। এ কথা কতদূর সত্য বুঝিতে পারা যায় না। মহম্মদপুরের সন্নিকটে চিত্তবিশ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে বটে; কিন্তু সে গ্রামে ভদ্রলোকের বসতি নাই, পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন নাই। এই স্থানের দক্ষিণ দিয়া এক সময়ে ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত হইত; স্নিগ্ধশীকরসেবী মলয় মারুতের মধুর হিল্লোল ঐ স্থানকে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানরূপে পরিণত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম চিত্তবিশ্রাম। এক্ষণে সে ছত্রাবতী নদী নাই। মধুমতী একমাইল দূরে পড়িয়াছে। এক্ষণে চিত্তবিশ্রামের কোনও বিশেষত্ব নাই। লোকে বলে তথায় সীতারামের এক আনন্দকুটীর ছিল, সে কথা বিচিত্র নহে। চিত্তবিশ্রামের মত আরাম-নিবাস্ কোন্ রাজারই বা না আছে? সীতারামের বিলাসিতার দ্বিতীয় নিদর্শন "সুখ-সাগর" নামক সরোবর। এই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপোপরি এক দ্বিতল গৃহে রাজা সীতারাম রায় গ্রীষ্মকালে সপরিবারে বাস করিতেন বলিয়া কথিত হয়। একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে ইহা বিলাসিতার চরম সীমা নহে।

সীতারাম অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তিনি রাজ্যাধিকার করিলে তাহারা মুসল্মানদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিল। সীতারাম সর্ব্বতোভাবে তাহাদের মঙ্গলবিধানে যত্ন-পর ছিলেন। "জলদুর্ভিক্ষ" নামক যে নূতন ব্যাধি বঙ্গদেশকে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। সীতারাম তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের সমস্ত স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সীতারাম কি পুণ্যবলে রাজত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি একদা তাঁহার গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। গুরুদেব বহুবিধ আচার ও প্রক্রিয়া দ্বারা নির্দ্ধারিত করেন যে "জলদান পুণ্যফলে সীতারাম রাজপদ লাভ করেন।" তদবধি সীতারাম অবিরত চেষ্টা করিয়া নানাস্থানে বহু জলাশয় খনন করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা প্রায় ২২০০ শত খনক বা কোদালী ছিল। সর্ব্বত্রই জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সীতারামের শুভাগমন বা শুভদৃষ্টি বিজ্ঞাপিত করিত। প্রবাদ আছে তিনি প্রতিদিন নূতন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেন।

তিনি যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন এখনও তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া তৎপ্রদেশের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। সীতারামের "রামসাগর" নামক দীর্ঘিকার মত সুপেয় সলিলপূর্ণ প্রকাণ্ড জলাশয় যশোর জেলায় আর নাই। কৃষ্ণসাগরের জলের মত স্বচ্ছ সলিল অতীব বিরল মহম্মদপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে এই রূপ কত জলাশয় আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মহম্মদপুর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে বলেশ্বরপুরে এবং ৬ ক্রোশ দূরে লস্করপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে; বাঁশগ্রাম বগুড়ায়ও দীঘিকা এবং গড় আছে। মহম্মদপুর হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্যামগঞ্জে সীতারামের পুত্র শ্যামসুন্দর রায়ের প্রাসাদ ছিল তথায় এবং অদূরবর্ত্তী দিগনগরে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। সূর্য্যকুণ্ড গ্রামের "দাসের পুকুর" এখনও সীতারামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এই স্থানে তাঁহার ভগিনীপতি রঘুনাথ দাসের নিবাস ছিল। যাহারা রামসাগর প্রভৃতি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন তড়াগের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর করিয়াছেন, সীতারামের জলদান পুণ্যের প্রবাদবাক্য তাহাদের নিকট নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে। যে পরম কারুণিক প্রবীণ নৃপতি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও প্রজাবর্গের উদ্দেশে এই সকল সৎকীর্ত্তি রাখিয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায় সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

জগৎশেঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাণিকচাঁদ।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা, বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় মহামারীতে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে, বঙ্গসিংহাসন টাঁড়া, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবস্থল ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিম্নবঙ্গ নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ, মগপ্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রবে বঙ্গভূমি জলে স্থলে সর্ব্বত্রই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে উড়িষ্যার পাঠানদিগের অত্যাচারও মিশ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইয়োরোপীয়গণ সেই সময়ে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গদেশকে একরূপ আপনাদের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শেষপ্রান্তে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে অবাধ বাণিজ্যের সুখভোগ করিতেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় দমন করিবার জন্য ঢাকা রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইল খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ইচ্ছায়, ঢাকায় মসনদ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সা সুজা পুনর্ব্বার রাজমহলে মসনদ লইয়া আসেন। সম্রাট সাজাহাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে আরঙ্গজেব সা সুজাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লাকে প্রেরণ করেন, মীরজুম্লা সা সুজাকে রাজমহল হইতে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে,

পরে আরাকাণ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তথায় সা সুজার মৃত্যু হইলে, মীরজুম্লা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গেই অবস্থান করিতে থাকেন, এবং আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি আক্রমণের পর অবশেষে ঢাকায় আসিয়া তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়। তাঁহার পরেই সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আবার আরাকাণী ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় তিনি ঢাকাতেই রাজধানী পুনঃস্থাপিত করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং মুর্শিদাবাদই বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার শেষ মুসল্মান রাজধানী।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যৎকালে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ইহার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকা বিশেষ রূপ উন্নতি লাভ করে। রাজস্ব, বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য ঢাকা নগরীতে প্রতিনিয়ত অর্থের প্রয়োজন হইত, সেই জন্য হীরানন্দ ইহাতে একটি গদী স্থাপিত করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ সেই গদীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মাণিকচাঁদ অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তিনি দিন দিন ঢাকার গদীর উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি বাণিজ্যস্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসমান থাকায় ঢাকার গদী শেঠদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে উন্নতি লাভ করে। এমন কি দিল্লী, আগরার গদী অপেক্ষা ইহারই প্রসিদ্ধি রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। যৎকালে মাণিকচাঁদ ঢাকায় গদীয়ানের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্মান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের যথেষ্ট পরিচয় হয়। অনেক সময়ে নবাবকে শেঠদিগের গদী হইতে অর্থাদি লইতে হইত বলিয়া এই পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। রাজস্ব বিষয়ের সমস্ত ভার দেওয়ানের প্রতি ন্যস্ত থাকায় মাণিকচাঁদের সহিত অল্প দিনের মধ্যেই পরিচয় হইল। কেবল পরিচয় বলিয়া

নহে, ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ একটু সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল। তৎকালে দেওয়ানের ক্ষমতাও অসীম ছিল, সুতরাং দেওয়ান মুর্শিদের উৎসাহে ও সাহায্যে মাণিকচাঁদের যে দিন দিন উন্নতি লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিকই দেওয়ানের জন্য তাঁহার উন্নতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মোগল বাদশাহদিগের সময় হইতে বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হয়, সম্রাট আরঙ্গজেব উক্ত রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য দেওয়ানের পদ সৃষ্টি করেন। তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নবাবের হস্ত হইতে কতক ক্ষমতা লইয়া আর একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে অর্পণ করিলে, উভয়েরই ক্ষমতা কতকটা সুসংযত হইবে। একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিলে ভবিষ্যতে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে পারিত। সেই সময় হইতে নাজিম ও দেওয়ান এই দুই পৃথক্ পদের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ ও শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ভার নাজিমের উপর অর্পিত হইত। তিনিই সাধারণতঃ নবাব বা সুবাদার নামে অভিহিত হইতেন। দেওয়ান রাজস্বসংগ্রহ, তাহার বন্দোবস্ত ও সেইরূপ অন্যান্য কার্য্য এবং কোষাধ্যক্ষেরও কার্য্য করিতেন। তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অর্থাদির ব্যয় হইত, এমন কি, নাজিমকে পর্য্যন্তও দেওয়ানের নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, দেওয়ানেরও ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, অথচ এক জনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন না। মুর্শিদ কুলি খাঁর পূর্ব্বে বাঙ্গলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই রাজস্ব সংগৃহীত হইত, অথচ বাঙ্গলা চিরদিনই স্বর্ণপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলার রাজস্ব অনেক অসদুপায়ে ব্যয়িত হইত, এবং উহার অনেক ভূমি জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইতে পারিত না। বাঙ্গলার রাজস্বের ক্রমেই লাঘব দেখিয়া বাদশাহ আরঙ্গজেব ইহার সুবন্দোবস্তের জন্য কার্য্যদক্ষ মুর্শিদ কুলিকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত, একজন পারসীক সওদাগর তাঁহাকে দাসরূপে ক্রয় করিয়া পারস্যে লইয়া যান, ও তথায় মুসল্মান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া বেরা-

রের দেওয়ানের অধীন কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আয়, ব্যয়, হিসাব, নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানের কথা রাষ্ট হইয়া পড়ে। বাদশাহ আরঙ্গজেব সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মুর্শিদ কুলির কার্য্যদক্ষতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে হায়দরাবাদে দেওয়ানী পদ প্রদান করেন, পরে তথা হইতে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বাদশাহ আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্মান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্টিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলি ঢাকায় আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকারে নিজের পরিচিত লোক সকল পাঠাইয়া দিলেন। জায়গীর ভূমি সকল বাঙ্গলা হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে উড়িষ্যা প্রদেশের ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তে বাঙ্গলা হইতে কোটী টাকার রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় আয়ব্যয়াদির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় দেওয়ান মুর্শিদ কুলিকে অনেক সময়ে প্রয়োজনানুসারে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত আদান প্রদানব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়। দেওয়ান রাজস্ববন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং যাহাতে মাণিকচাঁদের গদীর উন্নতিসাধন হয় সে বিষয়েও দেওয়ানের মনোযোগের অভাব ছিল না। এইরূপে দেওয়ানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় লোকে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিতই আদান প্রদান করিতে যত্নবান হইল। কি জমিদার, কি ব্যাবসায়ী সকলেই মাকিচাঁদের গদীতে কারবার আরম্ভ করিলেন, কাজেই দিন দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাট আরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; তাঁহার কার্য্যদক্ষতাই ইহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ বাঙ্গলার এইরূপ সুবন্দোবস্তে তিনি মুর্শিদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মুর্শিদের প্রতি সম্রাট আরঙ্গজেবের এরূপ প্রীতি নবাব আজিম ওশ্মানের ভাল লাগিত না। তিনি সম্রাটবংশধর, কাজেই দেওয়ানের এরূপ ক্ষমতাবিস্তার তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজ্যের সমস্ত আয় ব্যয় মুর্শিদের ন্যায় দেওয়ানের

হস্তে অর্পিত হওয়ায়, তাঁহার বিলাস বিশ্রামেরও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সমস্ত কারণে তিনি মুর্শিদকে অপদস্থ করিতে যত্নবান হইলেন, কেবল তাহাই নহে, তাঁহার প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হইল। নবাবের অধীন একজন সেনাপতি আপনাদিগের বেতন আদায় করিবার ছলে দেওয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য নবাবের নিকট অনুমতি চাহে। নবাব গোপনে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। প্রকাশ্যে দেওয়ানের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিলে পাছে সম্রাট বিরক্ত হন, এই জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত সেনাপতি আপনার দলবল লইয়া পথিমধ্যে দেওয়ানকে আক্রমণ করে, কিন্তু সে সময়ে দেওয়ান এরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সমস্তই আজিম ওশ্মানের সম্মতিতে হইয়াছে ইহা বুঝিতে দেওয়ানের বিলম্ব হইল না। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নবাবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। নবাব আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য উক্ত সেনাপতিকে আহ্বান করাইয়া দেওয়ানের সম্মুখেই তাহার প্রতি অনেক তীব্র শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন। দেওয়ান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অবিলম্বে তাহাদের সমস্ত প্রাপ্য পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং নবাবের প্রতি যার পর নাই বিরক্ত হইলেন।

নবাব আজিম ওশ্মানের সহিত এইরূপ মনোবিবাদ ঘটায় দেওয়ান মুর্শিদ কুলি ঢাকায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত ঘটনাই সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। পরে আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, অধীন কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। দেওয়ানের সহিত তাঁহার অধীন দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী আসিতে প্রস্তুত হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকেও সেই সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ সাহস প্রদান করিলেন যে, যতদিন বঙ্গরাজ্যের কোন না কোন ভার তাঁহার উপর অর্পিত থাকিবে, ততদিন যাহাতে শেঠ মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদীয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন হন, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি থাকিবে। মাণিক-

চাঁদ মুর্শিদ কুলির দ্বারা যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, ঢাকা হইতে দেওয়ানী বিভাগ স্থানান্তরিত হইলে তথায় আর গদীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কষ্টকর হইবে, এবং তাঁহার প্রতি যদি দেওয়ানের অনুগ্রহদৃষ্টি থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি মুকসুদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুকসুদাবাদের নিকটস্থ বঙ্গের প্রধান বন্দর কাশিমবাজার দিন দিন বাণিজ্যে শ্রীশালী হইয়া উঠিতেছিল। মুকসুদাবাদে গমন করিলে প্রধান প্রধান বণিক্-সম্প্রদায়ের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারিবে।—ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি দেওয়ানের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যদিও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ব্যবসায় উঠাইয়া লইয়া গেলে প্রথমতঃ কিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়, তথাপি ভবিষ্যতে যদি সে বিষয়ের অপরিসীম উন্নতি সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে সেরূপ আপাতক্ষতি সহ্য করিতে বিচক্ষণমাত্রেই কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পরিশেষে শেঠ মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মুকসুদাবাদে আসার পর হইতে শেঠদিগের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর চরম সীমায় উপনীত হইতে আরম্ভ হয়।

মুর্শিদ কুলি মুকসুদাবাদকে বাঙ্গলার মধ্যস্থলে ও ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বলিয়া দেওয়ানীর উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভাগীরথী বাঙ্গলার বাণিজ্যকার্য্য-পরিচালনের একমাত্র প্রধান উপায় ছিল। কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্দর ইহারই তীরে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়গণ নানা প্রকার বাণিজ্য অতি চতুরতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে মুকসুদাবাদের ন্যায় স্থানই উপযুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা তৎকালে ইহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, এবং আরাকাণী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রব সে সময়ে শান্ত হইয়াছিল; সুতরাং সে সময় পূর্ব্ববঙ্গে থাকার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষতঃ সে সমস্ত বিষয়ের সহিত নাজিমেরই সম্বন্ধ ছিল, দেওয়ানের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না।

বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে মুকস্থদাবাদের ন্যায় স্থানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য, কারণ মুকস্থদাবাদ হইতে উভয় প্রদেশে যাতায়াতের স্থগম পথ বিদ্যমান ছিল। এই সকল কারণে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী, শেঠ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুকস্থদাবাদে উপস্থিত হইলেন। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান কেল্লার মধ্যেই তিনি নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার নিকট মহিমাপুর নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহিমাপুর মুর্শিদাবাদ হইতে এক ক্রোশের কিছু অধিক উত্তরে অবস্থিত। আজিও তথায় শেঠভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিমাপুরে গদী স্থাপন করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলেন। দেওয়ানের সাহায্যে ও উৎসাহে তাঁহার গদী অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

মুর্শিদ কুলি খাঁ মুকস্থদাবাদে আগমন করিলে, সম্রাট আরঙ্গজেব দেওয়ানের সহিত পৌত্র আজিম ওশ্মানের মনোবিবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিহারে রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। নবাব আজিম ওশ্মান স্বীয় পুত্র ফরখ্ শেরকে ঢাকায় প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া বিহারে উপস্থিত হন ও পাটনায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি পাটনা আজিমাবাদ নামে অভিহিত হয়। এদিকে দেওয়ান রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত হিসাবপত্র লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দেওয়ান মুর্শিদের রাজস্ববৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন মুর্শিদ কুলি সম্মানসূচক উপাধি ও খেলাতাদিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গলায় আগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। মুকস্থদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বীয় নামানুসারে ইহাকে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করেন, তদবধি মুকস্থদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদে

অবস্থিতি করিয়া মুর্শিদ কুলি জাফর খাঁ রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের ক্রমোন্নতি-সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি ঐ সম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিলে, তিনি প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কারণ, মুর্শিদাবাদ তৎকালে দেওয়ানী বিভাগের মুখ্য স্থান হওয়ায় সর্ব্বদাই মুদ্রাদির আবশ্যক হইত। টাঁকশাল স্থাপিত হইলে অন্য স্থান হইতে মুদ্রাদির আনয়নে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না মনে করিয়া দেওয়ান মুর্শিদ মাণিক-চাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদের গদীরও উন্নতি হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সেই পরামর্শানুসারে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মহিমা-পুরের পরপারে গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল স্থাপিত হইল; স্বয়ং শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। শেঠদিগের গদীর পরপারে টাঁকশাল স্থাপিত হওয়ায় মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহার পরিদর্শনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মুসল্মান রাজত্বের সামান্যমাত্রও অস্তিত্ব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত শেঠদিগের সহিত ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধই ছিল। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ আপনাদের সুবিধার জন্য এই টাঁকশাল হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর আদেশে বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশিমবাজারের কুঠী সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু নবাব ইব্রাহিম খাঁর আদেশে যদিও ইংরাজগণ বাঙ্গলায় পুনঃপ্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন, তথাপি কাশিমবাজারে তাঁহারা রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল স্থাপিত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার কাশিম-বাজারের কুঠী সুদৃঢ় করিয়া উৎসাহ সহকারে কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ, এই টাঁকশালের জন্য কাশিমবাজার প্রদেশস্থ ব্যবসায়িগণের বিশেষরূপ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে লণ্ডন কোম্পানী ও ইংলিশ কোম্পানী নামে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ কোম্পানী মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামে একটি মাত্র কোম্পানীতে পরিণত হওয়ায় ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের আরও সুবিধা

ঘটে। কোম্পানী আপনাদিগের সুবিধার জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁকে ২৫ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ড হইতে আনিত অমুদ্রিত রৌপ্যসমূহ মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে মুদ্রাকারে পরিণত করাইয়া লওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। টাঁকশালের কর্ম্মচারিগণের আদেশে, ইংরাজেরা সপ্তাহে তিন দিন আপনাদের মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। ইংরাজদিগের জন্য মুদ্রিত মুদ্রা সকলও সরকারী মুদ্রার ন্যায়ই ব্যবহৃত হইত। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা আপনাদিগের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাতেও প্রথমতঃ দিল্লীর বাদসাহের নাম অঙ্কিত থাকিত। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা কলিকাতায় আপনাদিগের টাঁকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ টাকশালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অসু-বিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেঠেরা সেই সময়ে সামান্য রূপ বাটা দিয়া মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে আপনাদের জন্য মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। দেশমধ্যে মুদ্রা প্রচলনের ভার তাঁহাদেরই প্রতি অর্পিত হওয়ায় ইংরাজদিগের প্রথমতঃ নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, নবাব মীর কাশিমের সিংহাসনারোহণের পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে কলিকাতা টাঁকশালের সমস্ত অসুবিধাই দূর হয়, এবং ইংরাজেরা সকল প্রকার সুবিধা লাভ করেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের অধঃপতন উপস্থিত হয়, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার অন্তর্ধান ঘটে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার মুর্শিদাবাদে টাকশাল-স্থাপনা হয়। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রাদেশিক টাঁকশাল উঠিয়া গেলেও মুর্শিদাবাদ-টাকশালের কার্য্য একেবারে রহিত হয় নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের কালেক্টার টাঁকশালের সমস্ত উপকরণাদি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন ও টাঁকশাল-গৃহ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হয়।* নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর স্থাপিত টাঁকশালের ও ইংরাজ কোম্পা-নীর টাঁকশালের স্থান বিভিন্ন। মুর্শিদ কুলি খাঁর স্থাপিত টাকশাল মহিমা-পুরের পরপারে স্থাপিত ছিল, অদ্যাপি তাহার যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

* **Hunter's Statistical Accounts of Murshidabad p. 174.**

জগৎ শেঠদিগের ভগ্নাবশিষ্ট বাসভবনের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উক্ত টাঁকশালের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যেরূপ অবগত হওয়া যায় তাহাতে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বোধ হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব হিসাবে মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল হইতে ৩০৪১০৩৲ টাকা আয়ের কথা উল্লিখিত আছে। আজিও মুর্শিদবাদ-টাঁকশালের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে শাহ আলম বাদসাহের নামাঙ্কিত যে সমস্ত মোহর দৃষ্ট হয়, সেগুলি মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেওয়ান মুর্শিদ কুলি বাঙ্গলা রাজস্বের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা হইতে ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হইত। * এই রাজস্ব সম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদ দেওয়ান মুর্শিদ কুলিকে অনেক সাহায্য করায় তিনি বাদশাহের অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে বাঙ্গলার পেস্কার রূপে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলার যাবতীয় জমিদার অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ মাণিকচাঁদের নিকট আপনাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। মাণিকচাঁদ তাহা সরকারে পেশ করিতেন রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁ পুণ্যাহের সূচনা করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নব বর্ষের প্রথমে শুভ পুণ্যাহে বর্ত্তমান বর্ষের কতক রাজস্ব প্রদান করিয়া জমিদারগণ সনন্দ বাহাল করাইয়া লইতেন। রাজস্ব বিষয়ে মাণিকচাঁদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় ঘটে, সময়ে সময়ে যখন জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইতেন, তখন তাঁহারা শেঠ মাণিকচাঁদকে তাঁহার গদী হইতে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিতে বলিতেন। পরে যথারীতি সুদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের দেয় অর্থের পরিশোধ করিতেন। এইরূপে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জমিদারের সহিত মাণিকচাঁদের কারবার চলিতে লাগিল। তৎকালে বাঙ্গলা হইতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের এইরূপ ব্যবস্থা

* রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে ৩ কোটি ৩ লক্ষ লিখিত আছে। ফারসী সে শব্দে ৩ ও সী, ৩০। সে ও সীর গোলযোগ হইয়া থাকিবে।

ছিল।—সমস্ত মুদ্রা বাক্সবন্দী হইয়া দুই শতেরও অধিক গো শকটে স্থাপিত হইয়া উপযুক্ত প্রহরী ও একজন নায়েব খাজাঞ্চীর সহিত প্রেরিত হইত। সেই সঙ্গে বাদশাহ ও অমাত্যবর্গের জন্য নানা উপঢৌকন পাঠাইবারও ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত শকট ও প্রহরী বিহার পর্য্যন্ত পঁহুছিত, পরে তথা হইতে নূতন শকট ও প্রহরীর দ্বারা সেই সমস্ত রাজস্ব এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইত, তথা হইতে আবার নূতন শকট ও প্রহরীর সাহায্যে একেবারে দিল্লী গিয়া উপস্থিত হইত। ইহাতে সময়ে সময়ে অসুবিধা ঘটায়, দেওয়ান মুর্শিদ কুলি শেঠ মাণিকচাঁদের পরামর্শ ক্রমে তাঁহাদের দিল্লীর গদীতে হুণ্ডি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, এবং সেই হুণ্ডি অনুসারে দিল্লীর শেঠ গদীয়ানগণ বাঙ্গলার সমস্ত রাজস্ব সম্রাট দরবারে উপস্থিত করিতেন। এদিকে মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার গদীতে সমস্ত রাজস্ব জমা করিয়া লইতেন। এইরূপে বাঙ্গলার জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীতে পঁহুছান পর্য্যন্ত সমস্তই মাণিকচাঁদকে করিতে হইত। সেই জন্য বাঙ্গলার রাজস্বের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মুর্শিদ কুলি খাঁর এই সমস্ত বন্দোবস্তের সময় দিল্লীতে বাদশাহ-পরিবর্ত্তন ও নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবের দেহত্যাগ ঘটিলে তাঁহার পুত্রগণ গৃহবিবাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজিম বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। নবাব আজিম ওশ্মানের পিতা বাহাদুর শাহের সময়েও মুর্শিদ কুলি তিন প্রদেশের দেওয়ানী এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী পদেই নিযুক্ত ছিলেন। বাহাদুর শাহের পরে জাহাঙ্গর শাহ, অবশেষে ফরক্ শের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট ফরক্ শেরের নিকট হইতে মুর্শিদ দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদেরই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি নবাব মুর্শিদ কুলি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। নবাব মুর্শিদ কুলি দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদই প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গলার শাসন ও বন্দোবস্তে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। যদিও নায়েব নাজিমীর সময় হইতেই তিনি অনেকটা স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। এই সময় হইতে তিনি নির্ভয়ে কার্য্য আরম্ভ করেন। নবাব নিজে উচ্চ পদ পাইয়া মাণিকচাঁদকেও সম্মানিত করিয়া তুলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে লোকে তাঁহাদিগকে শেঠ বলিত, তথাপি বাদশাহ-দরবার হইতে তাঁহারা উহার কোন সনন্দ বা ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হন নাই। বাদশাহ ফরক্ শের ইঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত বাদশাহেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যৎকালে বাদশাহ ফরক্ শের সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় সৈন্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শেঠেরা যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাদশাহ নিজেও মাণিকচাঁদকে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। পিতা আজিম ওশ্মানের ঢাকায় অবস্থিতিকালে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত সম্রাটের প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর ফরক্ শের অনেক দিন বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কারণে তিনি মাণিকচাঁদকে উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। মাণিকচাঁদকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া ও নবাব মুর্শিদের অনুরোধ ক্রমে বাদশাহ ফরক্ শের ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১২২৭) মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথারীতি ফার্ম্মাণ প্রদান করেন। শেঠ মাণিকচাঁদের উক্ত ফার্ম্মাণ অদ্যাপি জগৎশেঠদিগের নিকট বিদ্যমান আছে।

মুর্শিদ কুলি খাঁ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হওয়া অবধি বাঙ্গলার রাজস্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়ায় অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করিতে বাধ্য হন। নবাব হইয়া তিনি ইহার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবিষয়ে শেঠ মাণিকচাঁদ তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বাঙ্গলার জমিদার সম্প্রদায়ের হস্তে তৎকালে রাজস্ব-আদায়ের ভার ছিল, কিন্তু তাহারা অনেক সময়ে সমস্ত রাজস্বপ্রদানে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের ভার কাড়িয়া লইয়া কতকগুলি আমিনের হস্তে তাহা প্রদান করেন। এই আমিনী প্রথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রচলিত করিতেছিলেন। উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুই চারি জন জমিদারের হস্তেও তাহার ভার অর্পিত হইয়াছিল

এই সকল জমিদারদিগের মধ্যে নাটোর বা রাজসাহীর, বর্দ্ধমানের, দিনাজপুরের, নদীয়ার ও বিষ্ণুপুরের রাজারাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন বীরভূমের জমিদারেরও উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর কতকটা স্বাধীন ভাবেও কার্য্য করিতেন। ত্রিপুরা ও কুচবিহারের স্বাধীন রাজাদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে করদরূপে গণ্য করা হয়। যে সকল জমিদারদিগের রাজস্ব আদায় হইত না, তাঁহারা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইতেন; এবং তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করাও হইত। কয়েক জন লোকের প্রতি এই উৎপীড়নের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নাজীর আমেদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ প্রধান। রেজা খাঁ নবাবের স্বসম্পর্কীয় হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা অসীম হইয়া উঠে। তিনি দুর্গন্ধময় নানা আবর্জ্জনাপূর্ণ এক নরককুণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে জমিদারদিগকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং হিন্দুদিগকে উপহাস করিবার জন্য তাহার "বৈকুণ্ঠ" আখ্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইত, জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে নানকর, বনকর ও জলকর নামে কতকগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইত। কোন স্থানে তাহাদের পরিবর্ত্তে জমি দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। অনেক উৎপীড়িত জমিদার মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় কাল কাটা-ইতে বাধ্য হন, নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া উৎপীড়নকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দণ্ডবিধান করিয়া-ছিলেন।

রাজস্ব ও শাসন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য নবাব মুর্শিদ কুলি সমস্ত বাঙ্গলা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। রাজা তোডরমল্লের সময়ে সমস্ত বাঙ্গলা ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এক্ষণে তাহা ১৩ চাকলায় ৩৪ সরকারে ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ১৪,২৮৮১৮৬৲ টাকা মোট জমা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ১৩ চাকলার মধ্যে হিজলী ও বন্দর বালেশ্বর উড়িষ্যা হইতে গৃহীত হয়। সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা এই পাঁচটি গঙ্গা বা পদ্মার পশ্চিম, এবং আকবরনগর (রাজমহল,) ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম), এই ছয়টি পদ্মার উত্তর

ও পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য যে কাগজ বা হিসাব প্রস্তুত হয় তাহার নাম "জমা কামেল তুমার"। উক্ত আসল জমা ব্যতীত মুর্শিদ কুলি খাঁ ২॥ লক্ষ টাকার উপর আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়াছিলেন।* ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর উক্ত বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু সেই বৎসরই শেঠ মাণিকচাঁদ পরলোকগত হন। তিনি মুর্শিদ কুলিকে এই বন্দোবস্তে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের প্রতি অত্যাচার, উৎপীড়ন তাঁহার কতদূর অনুমোদিত ছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত পরামর্শের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ঐ সমস্ত উৎপীড়ন, অত্যাচার, নবাবের তাদৃশ অনুমোদিত না হইলেও তাঁহার কর্ম্মচারীরা যে তাহাতে বিশেষরূপ তৎপর ছিল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত নবাব মুর্শিদ কুলির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর অনুরোধক্রমে যেমন বাদশাহ ফরক্ শের মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, আবার এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, মুর্শিদের নবাবিপ্রাপ্তির জন্য নজর, উপঢৌকনাদি প্রদানে যে সমস্ত অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, শেঠ মাণিকচাঁদ অকাতরে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, নিজের পরিবারের মধ্যে আর কাহাকেও সেরূপ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের জন্য শেঠ মাণিকচাঁদকে নবাবের কোষাধ্যক্ষেরও কার্য্য করিতে হইত। সরকারী ও নবাবের নিজ অর্থ সমস্তই তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিত। এইরূপ দেখা যায় যে, শেঠ মাণিকচাঁদের নিকট নবাবের নিজের পাঁচ কোটি (কোন কোন মতে ৭ কোটি) টাকা গচ্ছিত ছিল। এই টাকা প্রত্যর্পিত না হওয়ায় শেঠবংশীয়দের সহিত মুর্শিদ কুলির দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁর মনোবিবাদ ঘটে বলিয়া শেঠ বংশীয়েরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

* Grant's Analysis of Bengal Finance.

এই রূপে মুর্শিদ কুলির রাজস্ব বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ও নিজের গদীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তিনি নিজ ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনবাই নাম্নী তাঁহার এক ভগিনীর সহিত বারাণসীর শেঠ উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, ফতেচাঁদ তাঁহাদেরই কনিষ্ঠ পুত্র। এই ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহিমাপুরের পরপারে "দয়াবাগ" নামে মনোহর উদ্যানে শেঠ মাণিকচাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই উদ্যানটি শোভা বিস্তার করিয়া ভাগীরথীতীর আলোকিত করিত। কয়েক বৎসর হইল, সেই উদ্যানের সহিত স্মৃতিস্তম্ভটিকেও ভাগীরথী গর্ভস্থ করিয়াছেন। মাণিকচাঁদের নির্ম্মিত মহিমাপুরের বাটীরও অধিকাংশ তাঁহার গর্ভস্থ। যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ আজিও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। তাঁহার বিশেষ যত্নের সামগ্রী মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালেরও বিশেষ চিহ্ন নাই। যাহা কিছু আছে, দুই এক বৎসর পরে তাহাও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

দান-সাগর।

"যে সাক্ষাদবনীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিকং।
যদ্বক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগিরঃ
তেভ্যো নির্ভরভক্তিসম্ভ্রম-নমন্মৌলি দ্বিজেভ্যো নমঃ॥"

বাঙ্গলার ইতিহাসের যে যুগ মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার ইতিহাস সংকলন করিবার উপযুক্ত উপকরণও নিতান্ত

অপ্রচুর। যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই; বরং তর্ককোলাহল উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে!

যে সকল পুরাতন গ্রন্থে এই যুগের ইতিহাস সংকলনের উপকরণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে "দান-সাগরের" নাম সুধী-সমাজে সুপরিচিত। স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের" স্থানে স্থানে "দানসাগর" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করায়, এই গ্রন্থ যে বঙ্গদেশে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঘুনন্দনের কৃপায় "দানসাগরের" নাম বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত থাকিতেও, মূল গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও যে সকল হস্তলিখিত "দানসাগর" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও পাঠান্তর এবং ভ্রমপ্রমাদের অভাব নাই। কলিকাতার সাহিত্যসভা "দানসাগর" মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া ইতিহাস পাঠকগণের ধন্যবাদের পাত্র হইলেও, এরূপ কার্য্যের ভার যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত করা উচিত ছিল। "দানসাগর" সুবৃহৎ গ্রন্থ; স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

"দানসাগর" গ্রন্থ গৌড়াধিপতি স্বনামখ্যাত রাজাধিরাজ বল্লালসেনদেবের সঙ্কলিত বলিয়া সুপরিচিত। যে যুগে বৌদ্ধপ্রতাপ তিরোহিত হইবার পর, ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহা সেই যুগের গ্রন্থ বলিয়া, নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার হইয়া রহিয়াছে।

বৌদ্ধাধিকার তিরোহিত হইবার অত্যল্প কাল পরেই, আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তজ্জন্য আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার যথোপযুক্ত অবসরের অভাবে, সে ভার দাক্ষিণাত্যের উপরেই নিপতিত হয়। ব্যাকরণের উন্নতিসাধন করিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া, বেদভাষ্যের প্রচার করাইয়া, দাক্ষিণাত্য অদ্যাপি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার মূল কারণ বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। অনেকের বিশ্বাস,—দাক্ষিণাত্যনিবাসী স্বনামখ্যাত সায়নাচার্য্যের পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের ভাষ্য-

রচনার কোনরূপ চেষ্টা কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্য যথার্থই সমধিক গৌরবলাভের যোগ্য হইলেও, বঙ্গভূমির পক্ষেও গৌরবের অভাব নাই। যে যুগে বঙ্গভূমি এই গৌরবলাভের আয়োজন করিয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, গৌড়াধিপতি আদিশূরনামক নরপতি তাহার যুগপ্রবর্ত্তক রূপে সমাদরলাভের অধিকারী। তৎপূর্ব্বে বঙ্গভূমি সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্মের অনুরক্ত পালবংশাবতংস বৌদ্ধ নরপালগণের শাসনপ্রতাপে বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

আদিশূর যে বিখ্যাত রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজের কুলপঞ্জিকায় তাহা "সুরবংশ" নামে সুপরিচিত। আদিশূর "সুরবংশসিংহ" বলিয়াই উল্লিখিত।* বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত পালনরপালগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রের অমরার ন্যায় তাঁহার গৌড়রাজ্য শাসন করিবার কথা অদ্যাপি বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজের কুলজ্ঞগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আদিশূরের পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধপ্রতাপ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধ নরপালগণও শৈবপ্রজাবর্গের স্বধর্ম্মপালনের উৎসাহদানের জন্য ভূমিদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।† আদিশূরের সময় হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ঋষিকল্প শিক্ষাগুরু। "দানসাগরের" প্রথম শ্লোকে তাঁহাদিগের বংশধরগণের চরণেই গ্রন্থকর্ত্তার নমস্কার বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহারা যে সকল শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাকে স্বদেশে চিরস্থায়ী করিবার আশায় "দানসাসর" রচিত হইয়াছিল; এবং গ্রন্থরক্ষার ভারও সনির্ব্বন্ধে ব্রাহ্মণের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল।

* তত্রাদিশূরঃ সুরবংশসিংহো
বিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য
যথা সুরেন্দ্র স্ত্রিদিবং শশাস॥"

† ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

গৌড়াধিপতি প্রবলপ্রতাপ রাজাধিরাজ শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সমুচিত বিনয়াবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি শিষ্ট শিষ্যের ন্যায় ব্রাহ্মণচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম বিজ্ঞাপন করিয়া, "ভবজলধিমহাসেতুবন্ধস্বরূপ" এই মঙ্গলালয় মহাগ্রন্থ সযত্নে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত করিবার আশায় ব্রাহ্মণগণকেই আত্মনিবেদন করিয়া গিয়াছেন।* যাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বিবিধ জ্ঞানার্জ্জনে বল্লালসেনদেব এরূপ গ্রন্থ সংকলনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ ভট্ট।† তিনি সাংখ্যদর্শনের বৃত্তিকার। অনিরুদ্ধ সে কালের ব্রাহ্মণ ;—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও সৎপ্রতিগ্রহরূপ ষট্‌কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কার্য্যে

* ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য ক্ষিতিবলয়মিলন্মৌলি-বন্দ্যা দ্বিজেন্দ্রাঃ
শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ স্থিরবিনয়নিবদ্ধাঞ্জলি র্যাচতে বঃ।
কালে কালে ভবদ্ভিঃ কৃতসুকৃতলবৈঃ পালনীয়ো মমায়ং
সামান্যঃ পুণ্যভাজাং ভবজলধি-মহাসেতুবন্ধো নিবন্ধঃ॥

† বেদার্থ-স্মৃতি-সৎকথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জলধীবিলাসনয়নঃ সারস্বতত্র্যম্বকঃ।
ষট্‌কর্ম্মার্থবদার্য্যশীলনিলয়ঃ প্রখ্যাত-সত্যব্রতো
জম্ভারেরিব গীষ্পতি র্নৃপতে র্যস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥

অনিরুদ্ধ ভট্ট এই বর্ণনা অনুসারে বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন। তিনি বেদার্থ-ব্যাখ্যাদিদ্বারা "বরেন্দ্রীতলে" শ্লাঘ্য, এবং সর্ব্বত্র সত্যব্রত বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। বল্লালসেনদেব "দানসাগরের" আরম্ভে আর একটি শ্লোকে এই শিক্ষাগুরুর নিকট সকল "পুরাণ-স্মৃতিসার" অধ্যয়ন করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বল্লালসেনদেবের পিতা বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইবার কথাও "দানসাগরেই" উল্লিখিত আছে। রাজসাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ীথানার অধিকার মধ্যে কোনস্থলে এই রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিজয়সেনদেবের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবালয়ের প্রস্তরফলক তথা হইতে আনীত হইয়া কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটি" নামক সুবিখ্যাত সভায় সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় উমাপতিধর নামক সুকবি সেই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণপরম্পরার আলোচনা করিলে, বরেন্দ্রভূমিকেই বল্লালসেনদেবের শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তিনি কালে গৌড়েশ্বর হইলেও, বাল্যে পিতৃরাজধানী বরেন্দ্রভূমিতেই শিক্ষালাভ করিয়া থাকিবেন।

অনভ্যস্ত। তিনি নিয়ত সত্যব্রত হইয়া, জ্ঞানে ও চরিত্রবলে ব্রাহ্মণের মহোচ্চ-পদবীর গৌরব রক্ষা করিয়া, দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। ইহাই সে কালের ব্রাহ্মণের একমাত্র অহঙ্কারের বিষয় ছিল। তখনও বিষয়া-ন্তরে কৃতিত্বলাভের জন্য ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মচ্যুত হন নাই। সমাজের সে অবস্থাকে সজীব বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। সজীব না হইলে, সমাজ তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন করিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। স্বধর্ম্মানুরক্ত গৌড়াধিপতিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেও, তাহাকে রাজশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁহারা ব্রাহ্মণশাসনমাত্র অবলম্বন করিয়াই ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বল্লালসেনদেব সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কতকগুলি গ্রন্থমাত্র রচনা করিয়াই কেহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার জন্য জনসমাজের সম্মুখে আদর্শ সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণই সেই আদর্শ পুরুষ হইয়া, বৌদ্ধবিপ্লব-বিধ্বস্ত বঙ্গভূমির উদ্ধার সাধন করেন। স্বধর্ম্মা-নুরক্ত রাজার প্রবল প্রতাপ ও প্রচুর উৎসাহ তাহার পথ সহজ করিয়া দিয়া-ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা পুরাতনগ্রন্থনিবদ্ধ হইয়া কালপরাজয় করিবার শক্তিলাভ করিলেও, বহু গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া, বহু গ্রন্থ রূপান্তরিত হইয়া, এবং প্রয়োজনাভাবে বহু গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনালোচিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনচেষ্টাকে আয়াসসাধ্য বৃহদ্ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিল। সাহিত্য সেই অভাব দূর করিয়া, প্রকৃত শাস্ত্র ও তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জনসমা-জের নিকট প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল শাস্ত্রব্যাখ্যা-শিক্ষকমণ্ডলীর আদর্শ চরিত্রের কার্য্যকলাপের দৃষ্টান্ত দ্বারাই সমধিক বলশালী হইয়া জনসমাজের আচারসংস্কারে সমর্থ হইয়াছিল। আপাততঃ যে সকল বিধিনিষেধের কঠোর ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত বাহ্যাড়ম্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, তাহারই মধ্যে জনসমা-

জের অশেষ কল্যাণসাধক সদুদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই পথেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনে চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বল্লালসেনদেব যখন ব্রাহ্মণসমাজের কৌলীন্যমর্য্যাদা নিরূপণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র পরিবারে বিভক্ত হইয়া রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমির নানা স্থানে বাস করিয়া বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজের কুলশাস্ত্রগ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের ও তাঁহাদের পূজনীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের শিক্ষা ও আদর্শ বল্লালসেনদেবের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। আদিশূরের পর এবং বিজয়সেনদেবের পূর্ব্বে বঙ্গভূমির কিয়দংশে কিছুকালের জন্য পালনরপালবর্গের শাসনক্ষমতা পুনঃসংস্থাপিত হইলেও, ব্রাহ্মণের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। নারায়ণপালের স্বনামখ্যাত প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গুরব মিশ্রের "গরুড়স্তম্ভলিপি" অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমিতে বর্ত্তমান থাকিয়া, সে কথার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পাল এবং সেনবংশীয় নরপালগণ যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মন্ত্রণা কৌশলেই পরিচালিত হইতেন, তাহার নানা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। "দানসাগর" তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

সময়-প্রকাশে "দানসাগরের" রচনাকাল যে ভাবে নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই ঐতিহাসিক-সমাজের প্রধান অবলম্বন। তদনুসারে "দানসাগর" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। এই যুগের বৈয়াকরণ ও কবিদিগের মধ্যে সুললিতপদবিন্যাসনিপুণ জয়দেব, উমাপতিধর, মুরারি মিশ্র প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। তাঁহারা বঙ্গদেশে সংস্কৃতশিক্ষার পুনঃপ্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ," মুরারি মিশ্রের "অনর্ঘরাঘব" এবং উমাপতির "রাজপ্রশস্তি" মাত্রই এক্ষণে বর্ত্তমান। তজ্জন্য কেহ কেহ এই সকল স্বনামখ্যাত বঙ্গীয় সুধীগণকে কবি বলিয়াই সমাদর করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রের প্রচারে ও শিক্ষাদানে স্বদেশের

জ্ঞানোন্নতিসাধনের জন্যও ইঁহাদের নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার প্রমাণপরম্পরা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বল্লালসেনদেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে এইরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল।

বল্লালসেনদেব স্বধর্ম্মরক্ষার্থ তিন খানি সুবৃহৎ গ্রন্থের সংকলন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের নাম, (১) প্রতিষ্ঠাসাগর, (২) আচারসাগর, (৩) দানসাগর। এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে "দানসাগর" সকলের শেষে রচিত হইয়াছিল; কারণ "দানসাগরে" অপর গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থ সংকলনার্থ বল্লালসেনদেবকে কিরূপ বিপুল অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, "দানসাগরে" তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ প্রচলিত গ্রন্থ অবলম্বনে "দানসাগর" সংকলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া, কোন্ কোন্ সুপরিচিত গ্রন্থ কি কি কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, বল্লালসেনদেব সে কথার উল্লেখ করিয়া একদিকে সরল সত্যনিষ্ঠা অন্যদিকে সত্যপ্রচারে অকুতোভয়তার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পরিত্যক্ত গ্রন্থের এখন আবার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহা হইতে নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচিত হইয়া থাকে। "দানসাগরের" এই সকল বিবরণ বিস্তৃত হইলেও আদ্যন্ত উদ্ধৃত হইবার উপযুক্ত। এ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন-সময়ে কোন কোন্ গ্রন্থ বিকৃত ও অপ্রামাণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহা না জানিয়া, সকল গ্রন্থের প্রতি সমান সমাদর প্রদর্শন করিলে, অনেক সময়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বামনপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, এবং কূর্ম্মপুরাণকে বল্লালসেনদেব পুরাণ অর্থাৎ "মহাপুরাণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আদিপুরাণ, শাম্বপুরাণ, কালিকাপুরাণ, নন্দীপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ "উপপুরাণ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মনু, বশিষ্ঠ, সম্বর্ত্ত, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, কাত্যায়ন, জাবাল, দানবৃহস্পতি, বৃদ্ধবশিষ্ঠ,

হারীত, পুলস্ত্য, বিষ্ণু, শতাতপ, যম, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, বৌধায়ন, অঙ্গিরা, দানব্যাস, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত ও ছন্দোগ-পরিশিষ্ট, "স্মৃতিসংহিতা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর এবং গোপথ-ব্রাহ্মণও "দানসাগরে" উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ড ও নারদীয়পুরাণ "দানসাগরে" গৃহীত হয় নাই। এই তিন খানি পুরাণে তৎকালে দানবিষয়ক বিধিনিষেধের উল্লেখ না থাকায়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লিঙ্গপুরাণের দানবিষয়ক উক্তি মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত থাকায়, লিঙ্গপুরাণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ সযত্নে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু পাষণ্ড কর্তৃক প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া, বিষ্ণু ও শিবপুরাণ উপেক্ষিত হইয়াছে। বিষ্ণুরহস্য ও শিবরহস্য এই দুই খানি গ্রন্থ সংগ্রহ পুস্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বল্লালসেনের সময়ে পুরাণগুলি নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু-শ্রমে পুরাতনের সহিত নূতনের তুলনা করিয়া বল্লালসেন লিখিয়া গিয়াছেন,—স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্র, রেবা ও অবন্তি কথায় পরিপূর্ণ তিনটি খণ্ড অধিক হইয়া উঠিয়াছে। গরুড়, ব্রহ্ম, অগ্নি, ত্রয়োবিংশতিসহস্র শ্লোকাত্মক বিষ্ণু ও ষট্‌সহস্র শ্লোকাত্মক লিঙ্গপুরাণ বল্লালসেনের সময়ে প্রচলিত ছিল। এই সকল পুরাণ সম্বন্ধে বল্লালসেন বড় তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

"মৃষা বংশানুচরিতৈঃ কোষব্যাকরণাদিভিঃ।
অসঙ্গতকথাবন্ধ পরস্পরবিরোধতঃ॥
তন্মীনকেতনাদীনাং ভণ্ডপাষণ্ডলিঙ্গিণাং।
লোকবঞ্চনমালোক্য সর্ব্বমেবাবধারিতম্॥"

এই সকল পুরাণ অলীক বংশানুচরিতকীর্ত্তনে, অভিধান ব্যাকরণের সার-সংগ্রহে, নানা অসঙ্গত ও পরস্পর বিরোধযুক্ত কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভণ্ড পাষণ্ড বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকঞ্চুকধারী "লিঙ্গিগণ" লোকবঞ্চনার জন্য এই সকল করিয়াছে দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের অবধারণা করা হইয়াছে। বল্লালসেনের এই উক্তি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। আধুনিক অধ্যাপক-

গণ এরূপ সত্যনিষ্ঠ হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সৎসাহস হারাইয়া, উপহার-দাতা সংবাদপত্র সম্পাদকগণের অর্থানুকুল্যে এই সকল গ্রন্থকে প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া, মুদ্রন ও বিতরণের সহায়তা সাধন করিয়া, সমাজ-সংস্কারের পথে সযত্নে কণ্টক রোপন করিতেছেন। দেবীপুরাণ সম্বন্ধে বল্লালসেনের মত অধিকতর সুব্যক্ত।

"পাষণ্ডশাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবদ্ধমত্র।"

সে কালের যত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থেই নানাপ্রকার "অদল বদলের" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন বলিয়া সে সকল গ্রন্থ সমুচিত সমাদরের সামগ্রী হইলেও, নূতন সংস্করণকালে এই সকল বিষয়ের বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। বল্লালসেনদেব তজ্জন্যই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধাধিকার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণের পুরাতন পদমর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; জনসাধারণ অভিনব ধর্ম্মানুরাগে উদ্ধত হইয়া, নবপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে, যাঁহারা ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজের সম্মুখে ব্রাহ্মণের সাধনলব্ধ পুণ্য-জীবনের আদর্শ অপেক্ষা জন্মগত প্রাধান্যসংস্থাপনের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা জনসমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার ভিত্তি পুরাতন ভিত্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। বল্লালসেনদেবের সময়েই তাহার সূচনা হইয়াছিল। অতিরিক্ত দ্বিজভক্তি তাঁহাকে এ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া থাকিবে। তিনি "দানসাগরে" ব্রাহ্মণপ্রশংসা প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেখানে যাহা কিছু সঙ্গত বা অসঙ্গত "ব্রাহ্মণ-প্রশংসা" শ্লোক প্রাপ্ত হওরা যায়, বল্লালসেনদেব তাহা উদ্ধৃত করিয়া, স্বমত সমর্থনের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ দেশে ব্রাহ্মণের প্রভাব এইরূপে কুলক্রমাগত পদমর্য্যাদায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। ব্যক্তিগত

করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা নির্ণীত হইলেও, কালে তাহার উদ্দেশ্য লুপ্ত হইয়া, তাহাও কুলক্রমাগত পদমর্য্যাদায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে।

"দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥"

"পরাশর সংহিতার" এই অত্যধিক "ব্রাহ্মণ-প্রশংসা" পুরাতন শাস্ত্র ও সদাচারের সুপরিচিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া, জনসমাজের নিকট ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই "ভূদেবরূপে" উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়ছিল। বল্লাল-সেনদেবের "দানসাগরেও" এই মতের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ॥"

"দানসাগর" গ্রন্থ সুবৃহৎ। তজ্জন্যই ইহার নাম "দানসাগর"। ইহার অধ্যায় গুলির নাম "আবর্ত্ত"। আবর্ত্তের সংখ্যা ৭৫; দানের সংখ্যা ১৩৭৪ প্রকার। তথাপি ইহাতে জলাশয় ও দেবমন্দির দানের উল্লেখ নাই। তাহা বিস্তৃতভাবে "প্রতিষ্ঠা সাগর" নামক গ্রন্থে স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

"বিচ্ছিন্ন পঞ্চ-সপ্তত্যা-বর্ত্তৈরেবং পৃথক্কৃতৈঃ।
নানামুনি-প্রবচনামৃত-নির্য্যাসরাশিভিঃ॥
চতুঃসপ্ততিসংযুক্ত-ত্রয়োদশশতং মিতৈঃ।
দানং নিরূপ্য যত্নেন নানাগম-সমাহৃতৈঃ॥
বিদ্বৎ-সভা-কমলিনী-রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লালসেনেন কৃতোঽয়ং দানসাগরঃ॥"

এই গ্রন্থে বল্লালসেনদেব আপনাকে নরপতি বলিয়াই আত্মপরিচয় শেষ করেন নাই; বংশাবলীও উল্লিখিত রহিয়াছে। সেনরাজবংশের জাতিনির্ণয়-তর্ক সম্প্রতি অভিনব প্রতাপে বৈদ্য-কায়স্থের কলহকোলাহলে বঙ্গভূমি আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। "দান-সাগরে" সেনরাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বল্লালসেনদেব চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপাল বলিয়াই উল্লিখিত।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকবর্গ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেছেন বলিয়া, "দানসাগরোক্ত" সেনরাজবংশাবলী উদ্ধৃত হইল।

"ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্ধোঃ শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্বৃত্তস্বচ্ছরত্নোজ্জ্বলপুরুষগণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বন্ধো মুক্তাসরশ্রী নিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥"

গ্রন্থারম্ভে ব্রাহ্মণনমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণের পরেই সেনবংশের এই পরিচয়-শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে সেনবংশ "ক্ষত্রচরিত্রচর্য্যামর্য্যাদাগোত্রশৈল" বলিয়া উল্লিখিত; এবং তাহা যে বিশ্বৈকবন্ধু-ইন্দু-সম্পর্কীয় অর্থাৎ চন্দ্রবংশোদ্ভূত তাহাও কৌশলে সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

"তত্রালঙ্কৃত-সৎপথঃ স্থিরঘন চ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্বর্গস্থ নৈসর্গিকৈঃ
উদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি॥"

তত্র সেই সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপালকুলে,—হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি "দানসাগর" সংকলনকর্ত্তা বল্লালসেনের পিতামহ। পিতার নাম বিজয়সেনদেব।

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে।
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্॥"

এই বিজয়সেনদেবের "বিজয়নগর" নামক গ্রাম অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমিতে (রাজসাহী প্রদেশে) বর্ত্তমান; তাহার অধিকাংশ স্থানই কৃষকের হলকর্ষণে সমতল হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে; এবং বহু-সংখ্যক জলাশয় পূর্ব্ব সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ ইতস্ততঃ বর্ত্তমান থাকিয়া, নিরক্ষর কৃষক সমাজে কত অলৌকিক জনশ্রুতি রচনা করিতেছে। একটি স্থান অদ্যাপি "রাজবাড়ী" ও একটি স্থান "দেওপাড়া" নামে খ্যাত। "দেওপাড়ার" সরোবর সন্নিকটে রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট মেটকাফ মহোদয় এক অনতি বৃহৎ প্রস্তরফলক

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহাতেও সেনরাজবংশের বিবরণ লিখিত আছে। এই প্রশস্তি স্বনামখ্যাত কবিকুলচূড়ামণি উমাপতিধরের রচনাগৌরবে সমলঙ্কৃত হইয়া, নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতেছে। বিজয়সেনের "প্রশস্তি" বল্লালসেনের "দানসাগর", হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব", লক্ষ্মণসেন ও তদাত্মজগণের বিবিধ "তাম্রশাসন শ্লোক," এই বিখ্যাত রাজবংশকে "চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন" বলিয়াই কীর্ত্তন করিতেছে। এই বংশ কর্ণাট প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে উপনীত হইবার প্রমাণ কোন কোন প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সময়ে এই রাজবংশ ধীরে ধীরে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গে অধিকার বিস্তার করিয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন কার্য্যে বৌদ্ধ-বিপ্লববিধ্বস্ত বঙ্গভূমির গ্রাম নগরে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠায় পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের সমুন্নতি সাধিত করাইয়া, জ্ঞান-গৌরবে বাঙ্গালীর নাম ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সুপরিচিত হইবার সূত্রপাত করিতেছিল, সে সময় বাঙ্গালার ইতিহাসের সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ কল্যাণ-যুগ। এই যুগের ইতিহাস না থাকিলেও ইতিহাস সংকলনের উপযোগী যে সকল উপ-করণরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার যথোপযুক্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। বল্লালসেনের "দানসাগর" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে; হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" বটতলার বিকৃত কলেবরে অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে; "সদুক্তিকর্ণামৃত" অদ্যাপি মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দর্শন করে নাই। প্রশস্তিনিচয় সুসংস্কৃত হইয়া একত্র পুনর্মুদ্রিত হইবার প্রয়োজন থাকিতেও, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকগণ তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। এই সকল উপকরণ সুধীসমাজে সম্যক্‌রূপে প্রচারিত ও সমালোচিত হইলে, বাঙ্গলার ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল পুণ্যযুগের নানাতথ্য পুনরায় বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত হইতে পারিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রণজিৎ সিংহ ও ইংরাজ।

(২)

মেটকাফের প্রত্যাবর্ত্তনের পর রণজিৎ সৈন্যসংস্কারে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বহুসংখ্যক আফগান, গুরুখা ও হিন্দুস্থানী-দিগকে সৈন্য নিযুক্ত করিলেন এবং কোম্পানির কর্ম্ম পরিত্যাগের পর অনেক সিপাহী রণজিতের সৈন্যভুক্ত হইয়া অন্যান্য সৈন্যগণের শিক্ষাভার পাইল। রণজিতের রাজত্বের শেষকালে তাঁহার যে সকল কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী অধ্যক্ষ ও সেনাপতি ছিল তাহারা অধিকংশই ইউরোপীয়, কেহ ফরাসী, কেহ ইটালীয়, কেহ বা ওলন্দাজ।

রণজিৎ যে সকল উচ্ছৃঙ্খল অশ্বারোহীর সাহায্যে লাহোরের বালকরাজ হইতে পঞ্জাবের মহারাজ হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে ইংরাজী প্রথায় শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন ব্যবস্থা সেই সকল খালসাগণের মনঃপূত হইল না। চিরদিন উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটাইয়া এখন নিয়মের শৃঙ্খলা তাহাদের বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত বিদেশীয় লোকের প্রতি-পত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যে শিখদিগের প্রাধান্যের হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু রণজিৎ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলেন। সম্ভবতঃ মেটকাফ ব্যতিরেকে আর কেহ কখনও তাঁহার ইছার গতি ফিরাইতে পারে নাই। খালসাগৌরব বিস্তার করিয়া একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে তিনিই একমাত্র সক্ষম এই বিশ্বাস তাঁহাতে এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার সৈন্যগণকে ইংরাজী প্রথায় শিক্ষিত করিবার ইচ্ছায় কেহ বাধা দিবে এরূপ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার এই শিক্ষিত সৈন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর ছয় বৎসর অরাজকতার অবসানে

গৃহবিবাদ ও সেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতাসত্ত্বেও ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি কম্পিত করিয়াছিল।

এই সময়ে যখন তাঁহার সৈন্য সংস্কার চলিতেছে, রণজিৎ তাঁহার রাজনৈতিক চাতুর্য্য ও সৈন্যগণের মুসল্মান-বিদ্বেষের সাহায্যে মুল্‌তান, কাশ্মীর, দেরাজাত, ও পেশোয়ার এই কয়টি মোগলসাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাত্যক্ত স্থানগুলি করায়ত্ত করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তিনি একটি বিস্তৃত রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লাভ অপেক্ষা স্বকীয় চাতুর্য্য ও ক্ষমতার বাহ্যাড়ম্বরই তাঁহার এই উন্নতির কারণ।

এ স্থলে কোহিনুর বৃত্তান্তটি তাঁহার চতুর প্রথার উদাহরণ-স্বরূপ বিবৃত করা যাউক।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে যখন কাবুলরাজ শাহসুজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া অপর একটি রাজ্যের অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন, তখন রণজিৎ তাঁহার সহিত কোন সংস্পর্শেই আসেন নাই। কিন্তু পরে যখন তিনি শুনিলেন যে, এই শাহসুজাই প্রসিদ্ধ কোহিনুরের অধিকারী, তখন তিনি সুজাকে কাশ্মীর অধিকার করাইয়া দিবেন এরূপ বলিলেন এবং এই নিঃস্বার্থ উপকারের পরিবর্ত্তে কোহিনুর প্রদত্ত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে এরূপও ইঙ্গিতে জানাইলেন। শাহসুজা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া তিনি একটি জায়গীর ও পঞ্জাবের একটি নিষ্কর সম্পত্তি তাঁহাকে দিবেন বলিলেন ও ভবিষ্যতে কাবুল পুনরাধিকারের চেষ্টায় তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এরূপ ভরসাও দিলেন। এ ফাঁদেও শাহসুজা পড়িলেন না দেখিয়া তখন রণজিৎ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শাহসুজা খালসাধিপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এরূপ মর্ম্মে জাল পত্রাদি প্রকাশ্য দরবারে পঠিত হইল এবং শীঘ্র এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে বলিয়া শাহকে নজরবন্দীরূপে রাখা হইল এবং তাঁহাকে জানান হইল যে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে গোবিন্দগড়ের দুর্গে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। পরে শাহকে বলা হইল যে, যদি তিনি কোহিনুরটি রণজিৎকে দেন তাহা হইলে উহা তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে। ইহাতে শাহ জানাইলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই হীরকটি বন্ধক দিয়াছেন।

তৎপরে তাঁহাকে অনাহারে কষ্ট দেওয়া হইতে লাগিল। তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বাটীতে কাহারও যাহাতে গতায়াত না হয় এরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন শাহের পরিবারবর্গের সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল, তখন শাহ রণজিতের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইলেন। তখন যাহাতে রণজিতের বাসনা পূর্ণ হয় এবং শাহেরও বিশেষ অপমানের কারণ না হয়, এমন বন্দোবস্ত করা হইল। রণজিৎ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং পরস্পরের সৌজন্যপ্রকাশের পর বন্ধুতার প্রমাণস্বরূপ রণজিৎ আপন উষ্ণীষ শাহকে দিয়া তাঁহার কোহিনুরসংযুক্ত উষ্ণীষ গ্রহণ করিলেন। এতদুপলক্ষে শাহসুজাকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, মণি মুক্তা হীরকাদি ভিক্ষুকের জন্য নহে রাজন্যবর্গের নিমিত্তই। কোহিনুর সবলে তাঁহার নিকট হইতে গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি উহা তাঁহার সুহৃৎ রণজিৎকে উপহার দিলেন। তৎপরিবর্ত্তে এক খণ্ড পীতবর্ণের মসলিনের টুকরা ও একটি জায়গীর পাইবার ভরসা মাত্র করিলেন। এই ঘটনায় শাহের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার কিছু নিদর্শন নাই বটে, কিন্তু তিনি প্রথম সুযোগেই গুপ্তভাবে লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রিটিশরাজের পেন্সন গ্রহণ করিয়া লুধিয়ানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকারের পর এই কোহিনুর জন লরেন্সের নিকট রক্ষিত হয়। তিনি তাঁহার ওয়েষ্টকোটের পকেটে উহা রাখিয়া দেন এবং পরে অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার ভৃত্যের হস্তে দেন। পরে Punjab Board of Administration র উপর কোহিনুরটি মহারাণীর নিকট ইংলণ্ডে পাঠাইবার হুকুম আসিলে, লরেন্স উহা রাজকোষে (treasnry) আছে এইরূপ বিবেচনায় বলিলেন, "বেশ পাঠাইয়া দেওয়া হউক"। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা হেনরি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সেটি জনের নিকটই আছে। তখন জনের সে কথা স্মরণ হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা কোথায় রাখিয়াছেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারায় ভয়ানক চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। পরে ভৃত্যকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "ও সেই কাচের টুকরাটি? সে

আমি কোন বাক্সে রাখিয়াছি।” পরে অনেক অনুসন্ধানের পর একটি ভগ্ন টিনের বাক্সের ভিতর তাহাকে পাওয়া গেল। এই কোহিনুর ঘটনা হইতে রণজিৎ অপরকে কি প্রণালীতে পেষণ করিতেন, তাহা অবগত হওয়া যায়। ক্রমশঃ চাতুর্য্য, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ করা হইত, এবং অবশেষে বাহ্যিক ভাব রক্ষা করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র অভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। এ সকল বিষয়ে এরূপ নিষ্ঠুরচিত্ত হইলেও তিনি অনেক সময়ে দেশীয় সংস্কারাদি না মানিয়া চলিতে পরিতেন না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় যখন শতদ্রু পার হইবেন, তখন তিনি কোন রূপ বিশ্বাসঘাতকতা হইবে এরূপ মনে আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া শিখ “গ্রন্থ” দেখিয়া গবর্ণর জেনারেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কি রূপ ফল হইবে তাহা বলিতে বলিলেন। তাঁহারা ফল শুভ হইবে বলাতেও তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি উহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ জানিতে চাহিলেন। উহাতে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, অপনি দুইটি ফল লইয়া একটি রাজা ও অপরটী রাজপুরুষের নিমিত্ত উপহার দিবেন এবং যদি দুইটীই তৎক্ষণাৎ সাদরে গৃহীত হয়, তাহা হইলেই ফল শুভ বুঝিবেন। তিনিও দুইটী ফল হস্তে করিয়া ৪০০০ অশ্বারোহী শরীররক্ষকের সহিত চলিলেন। যখন গবর্ণর জেনারেলের হস্তী তাঁহার নিকট আসিল, তিনি ফল দুইটী সম্মুখে ধরিলেন এবং সে দুইটীই সহাস্যমুখে গবর্ণর জেনারেল গ্রহণ করায়, রণজিতের চিন্তা দূর হইল এবং তিনি সাহস করিয়া বেণ্টিঙ্কের সহিত এক আসনে বসিয়া পথ দিয়া চলিলেন এবং সমস্তই পূর্ব্বকথিতমত শুভ হইল।

শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুষ-জাপান যুদ্ধ—এসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তের ভীষণ সমরানল আজিও আপনার জ্বালাময়ী শিখা বিস্তার করিয়া বিশ্বদাহের জন্য অগ্রসর হইতেছে। রুসিয়া ও জাপান কেহই পশ্চাৎপদ হইতে ইচ্ছুক হইতেছেন না। লিওয়াংএর যুদ্ধের পর সাহুতে এক বিরাট্ সমরের অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রুসিয়া জাপানের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। জাপান ও আপনার বিজয়গৌরব রক্ষার জন্য বারম্বার বিজয়লক্ষ্মীর নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, এবারও বিজয়লক্ষ্মী জাপানের মস্তকেই আশীর্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। যদিচ সাহুর যুদ্ধও যুদ্ধনীতিবিশারদগণের নিকট চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তথাপি ইহাতে জাপানের গৌরব উজ্জ্বল-তর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই যুদ্ধে রুসিয়ার পক্ষে ষষ্টি সহস্রেরও অধিক হতাহত হইয়াছে। জাপানেরও প্রায় পঞ্চাদশ সহস্র বীর সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে ও আহত হইয়াছে। আর্থার বন্দর অধিকার করার জন্যও জাপান যারপর নাই চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমাগত গোলানিক্ষেপে আর্থার বন্দরের গৃহরাজি ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু রুসীয় বীর ষ্টসেল আজিও বিপক্ষের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। জাপান ইহার অনেক-গুলি দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অল্প দিনের মধ্যেই আর্থার বন্দর জাপানের হস্তগত হইবে। এই ভীষণ সমরানলে আহুতি প্রদানের জন্য রুসিয়া আপনার সুপ্রসিদ্ধ বল্টিক বাহিনীকে প্রেরণ করিয়াছেন। নীল সমুদ্রের তরঙ্গ-লহরীকে বিক্ষোভিত করিয়া বল্টিক বাহিনী সদর্পে প্রশান্ত মহাসাগর অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বারম্ভে ইহা এক বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়াছে। উত্তর সমুদ্রে ইংরাজের কয়েক খানি ক্ষুদ্র মৎস্য-তরীর উপর গোলানিক্ষেপে তাহাদের

দুই এক খানিকে রসাতলশায়ী করিয়াছে। এই ব্যাপারে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে একটি ছোট রকম যুদ্ধ বাধিবার উপক্রমও হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। রুসীয় নৌবীরগণ মৎস্যতরীর সহিত জাপানের টর্পেডো তরী দেখিয়া নাকি গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোধ হয় সহজেই ইহার যবনিকা পতন হইবে। যে জাপানের প্রত্যেক নরনারী স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে অগ্রসর, দুঃখের বিষয়, একজন জাপানী নৌসেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা সেই উজ্জ্বল স্বদেশপ্রীতিতে এক বিন্দু কালিমা নিক্ষেপ করিয়াছে। রুসিয়ার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া উক্ত নৌসেনাপতি বিপক্ষের পথ একটু সুগম করিয়া দিয়াছিল। জাপান এই বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

তিব্বত-অভিযান—তিব্বত-অভিযান শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার জের আজিও মিটে নাই। ইয়ংহজব্যাণ্ড, ম্যাকডনেল সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এই অভিযানে সম্যক্ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিব্বতের সহিত সন্ধি একটি প্রহসন বলিয়াই বোধ হয়। এই সন্ধিতে চীনের পক্ষ হইতে কেহই স্বাক্ষর করেন নাই। চীন সন্ধির সর্ত্ত সংশোধন করিতে বলিতেছেন। অন্যান্য ইউরোপীয়গণও ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সন্ধির সর্ত্ত সংশোধিত হইবে বলিয়া আশাও দিতেছেন। যদি সন্ধির সর্ত্তই উল্টাইতে হয়, তবে এরূপ সন্ধির কি প্রয়োজন ছিল বুঝিতে পারি না। দেখা যাউক, সন্ধি আবার কিরূপ আকার ধারণ করে। দালাই লামা এক্ষণে মোঙ্গলিয়ার উর্গার কোন মঠে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার রক্ষার জন্য চীন হইতে রক্ষী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন উহা দালাই লামার সম্মান, আবার কেহ বলিতেছেন যে, দালাই লামাকে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্যই তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। চীন যে দালাই লামার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে সমস্ত উত্তর বৌদ্ধজগতে

একটি ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। তিব্বত-অভিযানে কোন কোন বাঙ্গালী বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইঁহা-দের মধ্যে বাবু ফণীন্দ্রনাথ মল্লিকই অধিক প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ডাক বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী। মল্লিক মহাশয় আহত সৈনিকের হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করিয়া তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ-বিভাগ হইতে তাঁহার প্রশংসা বাহির হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে সকল বাঙ্গালী তিব্বত-অভিযানে গমন করিয়াছিলেন, সকলেই শিখ, গুরখা সৈনিকের ন্যায় আপনাদিগের অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য ইংলিশম্যান পত্র বাঙ্গালীদিগের প্রশংসা করিাছেন। ইংলিশম্যানের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিয়া আমরাও সুখী হইয়াছি। তবে ইংলিশম্যান ও তাঁহার ন্যায় অন্যান্য আধুনিক ইংলিশম্যান বঙ্গালীকে উপহাস ও করুণার চক্ষে দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রথম পরিব্রাজক রাল্‌ফ ফিচ্‌ হইতে পলাশী বিজেতা লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীকে ভাল রূপেই জানিতেন। পলাশীর যুদ্ধেও বাঙ্গলী সেনাপতির অধীন নবাবের অনেক সৈন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কোম্পানীর রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনার বাহুবলের পরিচয় দিয়ছে। জানি না, বিধাতার কোন্ ইচ্ছায় বাঙ্গালী এক্ষণে কাপুরুষের জাতি বলিয়া উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—ইহাকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না বলিয়া শিরশ্ছেদ বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ এক্ষণে ইহার যেরূপ আন্দোলন বলিতেছে, তাহাতে বঙ্গের প্রধান প্রধান স্থান বঙ্গরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। যদিও এখনও পর্য্যন্ত সরকারী সংবাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি পাইওনিয়র প্রমুখ প্রধান পত্রিকা সমূহ যেরূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন তাহাতে রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এই তিন বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি সুবৃহৎ প্রদেশের গঠন করিবে। প্রকাশ্যে এই কথা শুনা যাইতেছে, বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার অধীন সুবৃহৎ প্রদেশের শাসন ভার সম্যক্ রূপে পরিচালন করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য তাঁহার শ্রমলাঘ-

বের জন্য আর একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজন। বেশ কথা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করিয়া বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে কোন কোনটি বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে কি দোষ হয়? যে সমস্ত প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিলেইত ভাল হয়। বাস্তবিক যদি বঙ্গের ছোটলাটের শ্রমলাঘবের জন্য অন্য একটি প্রদেশ গঠনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে যে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে এক ভাষা প্রচলিত, একই জাতির বাস, একই আচার ব্যবহার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে দ্বিখণ্ড করার কি প্রয়োজন? বঙ্গের ছোটলাটের এত কি পরিশ্রম তাহা আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বুঝিতে পারি না। ভাল তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ড করা কেন? অন্যান্য প্রদেশ সরাইয়া লইলে কি হয় না? লর্ড কর্জ্জনের কি উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারি না। তবে আমাদের বিবেচনা হয় তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় একটা উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সীমান্তে কেবল রুসিয়ার নহে কিন্তু চীন, জাপানেরও কথাটা ভাবিয়া দেখা হইয়াছে। চীনের কথা বলিলাম, কারণ জাপান চীনকে সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কাজেই ভবিষ্যতে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে কিরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ ইহা চিন্তা করিয়া লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এই প্রদেশ গঠনে ব্যগ্র হইয়াছেন। সুতরাং কেবল আসামে একটি প্রদেশ গঠিত হয় না, তাই বঙ্গের শিরশ্ছেদের আয়োজন হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঙ্গলা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাই বা মন্দ কি? তবে আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলার বিভাগ করা গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য একটি নূতন সীমান্ত প্রদেশের গঠন। আমাদের মনে যাহা হয় আমরা তাহাই ব্যক্ত করিতে পারি। নতুবা লর্ড কর্জ্জনের রাজনীতি বুঝিবার ক্ষমতা লইয়া কয়টি মস্তিষ্ক আমাদের দেশে জন্মিয়াছে? যে উদ্দেশ্যে হউক, বঙ্গের শিরশ্ছেদ হইলে এই কবন্ধ দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

আশ্বিনের ভারতীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিতোরের পদ্মিনী সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী লিখিয়াছেন। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে বাঙ্গলার কয়েকটি জেলার কোন কোন স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এবার রবীন্দ্রনাথের সেই মর্ম্মস্পর্শী কবিতা শিবাজী-উৎসব ভারতীর অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছে। আলবার্ট মেলিন হইতে বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত আজিকার ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য প্রবন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

আশ্বিনের বঙ্গদর্শনেও রবীন্দ্রনাথের শিবাজী-উৎসব প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ভারতীতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য বঙ্গদর্শন একটু কটাক্ষও করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিয়ের লোটি হইতে অনূদিত ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্টে অনেকগুলি নূতন কথা আছে।

আশ্বিনের সাহিত্যে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভারতচন্দ্রের যুগে অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে।

কাশীমবাজারের মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নব প্রকাশিত উপাসনা নামক পত্রিকায় বুকর ওয়াশিংটন নামে একটি নিগ্রোর বিষয় লিখিত হইয়াছে।

ইংরেজী।

অক্টোবর মাসের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে রবার্ট সেয়েলের লিখিত রোমান কয়েন্স ফাউণ্ড ইন্ ইণ্ডিয়া প্রবন্ধে ভারত হইতে আবিষ্কৃত রোমক মুদ্রার সাহায্যে রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধের আরম্ভ ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধির সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। আর, হর্ণলি লিখিত সম প্রব্লেম্স অব এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া প্রবন্ধে গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের পুরাতত্ত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। জি, পি, টেট লিখিত কয়েন্স এণ্ড সীল্স কলেক্টেড্ ইন্ সিষ্টান প্রবন্ধে সিস্তানে আবিষ্কৃত অনেক গুলি মুসল্মান মোহর ও মুদ্রার কথা লিখিত হইয়াছে।

অক্টোবর মাসের ইংলিশ হিষ্টোরিক্যাল রিভিউ পত্রে এফ্, হোভারফিল্ড লিখিত লাষ্ট ডেজ অব সিলচেষ্টার প্রবন্ধে কালেভা আট্রিবেটম্ নামক একটি প্রাচীন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উইলিয়ম মিলার লিখিত গ্রীক অণ্ডার দি টর্কস্ প্রবন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে। পি, ওমানের লিখিত ফ্রেঞ্চ লসেস্ ইন দি ওয়াটর্লু ক্যাম্পেন প্রবন্ধে ওয়াটর্লু যুদ্ধে ফরাসীদিগের ক্ষতির একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

অক্টোবর মাসের এসিয়াটিক কোয়ার্টর্লি রিভিউ পত্রে এইচ্, ই, এইচ, পার্কার লিখিত

হাউ দি টিবেটিয়ান্স গ্র প্রবন্ধে তিব্বত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

অক্টোবর মাসের কলিকাতা রিভিউতে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দি আর্ট কলচার অব দি এরিয়ান্স নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

নবেম্বর মাসের ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রে এস্, ঝাভেরি লিখিত সোশ্যাল রিফারম্ ইন্ গুজরাট প্রবন্ধে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নরসিংমেটা কর্ত্তৃক সমাজসংস্কারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রেভারেণ্ড, এস্, ম্যাকনিক্যাল রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র দে লিখিত বেঙ্গল অণ্ডার দি ইংলিশ প্রবন্ধে অনেক গুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

কলিকাতা রিভিউ, এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট, ফর্টনাইটলি রিভিউ ও নাইন্টিন্‌থ সেঞ্চুরি পত্রে রুস-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে নানারূপ আলোচনা করা হইয়াছে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত ষ্টীফেন হুইলার দিল্লী দরবারের বিবরণ সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে কেবল ২৫০ খানি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কোম্পানী বাহাদুর লিখিতেছেন, সাহিত্য পত্রে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মোহনলাল নামে একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতেছেন। গ্রন্থে ইতিহাসের গৌরবরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী লিখিতেছেন। গ্রন্থখানি সত্বর প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থখানি দেখিতে অনেকে উৎসুক আছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাসিংহ নামে এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীয় বিদ্রোহ লইয়া গ্রন্থ খানি লিখিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নব সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা দিয়াছে।

তিব্বত হইতে বস্তা বস্তা পুঁথি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের ও নানা প্রকার অদ্ভুত আকৃতির চিত্রও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে।

যোধাবাই

যোধবাই ও যোধাবাই
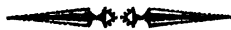
মোগলকেশরী ভারতসম্রাট আকবর বাদসাহের উদার রাজনীতি চিরদিনের জন্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাই তিনি অদ্যাবধি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" নামে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। হিন্দু মুসল্মানকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তিনি ভারতে যে কল্যাণ-যুগের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার কথা চিরদিনই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জলভাবে লিখিত থাকিবে। তিনি নিজে মুসল্মান হইয়াও যুগযুগান্তরব্যাপী হিন্দু-গৌরবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুর আচার, ব্যবহার, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহার উদার হৃদয়ে এক প্রবল আন্দোলন তুলিয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, হিন্দুর বীরত্বেও তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুর মহাশ্মশান বিশাল ভারতবর্ষে একমাত্র রাজপুত জাতি জীবিত ছিল, চারিপাশের শ্মশানভস্মকে ফুৎকারে উড়াইয়া সেই মহাপ্রাণ জাতি তাণ্ডবনৃত্যে দিল্লীর সিংহাসন বিচলিত করিতেছিল। মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ হইতে ইব্রাহিম লোদী পর্য্যন্ত কত কত পাঠান বংশের উত্থান-পতন হইল, কিন্তু সেই শিশোদীয়, কুশাবহ ও রাঠোর বংশ অবিচলিত ভাবে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া ভারতে হিন্দুর যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছিল। এমন কি, মোগলবীর বাবর যখন পাণিপথ ক্ষেত্রে কোন মুসল্মান বীরকে নিজের সমকক্ষ দেখিতে পাইলেন না, সেই সময়ে এক জন রাজপুতের অসি তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্য অধিকারের পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল, সেই রাজপুত বীর ইতিহাসে সঙ্গরাণা বা সংগ্রাম সিংহ নামে অভি-হিত। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুচতুর আকবর একবার ভারতের

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তিনি যেমন অনেক স্থানে মুসল্মান বীরদিগকে সজীব দেখিলেন, তেমনই রাজপুতনার মরুভূমিতেও কয়েক জন হিন্দুবীরের প্রতি তাহার চক্ষু নিপতিত হইল, তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় রাজপুতানায়ও আপনার প্রাধান্যবিস্তারে সমৎসুক হইলেন। কিন্তু রাজপুতানাকে দিল্লী-সাম্রাজ্য ভুক্ত না করিয়া তিনি তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিপতিদিগকে আপনার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের রাজত্ব অক্ষুণ্ন রহিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দিল্লীশ্বরের পতাকামূলে সমবেত হইতে হইল। কুশাবহবীর বিহারী মল্ল, ভগবানদাস, মানসিংহ; রাঠোরবীর রাইসিংহ মোগল-সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, রাঠোররাজ মালদেব প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া-ছিলেন, শেষে দিল্লীশ্বরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহ ভারতসম্রাটের পতাকামূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল একমাত্র শিশোদীয় বংশ এই আহ্বানে যোগদান না করিয়া রাজস্থানের পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধের চিতোর ভারতসম্রাটের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা অরণ্যে, পর্ব্বতে, পরিভ্রমণ করিয়া শিশোদীয় বংশের গৌরব রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই আজিও শিশোদীয়কুলপাবন প্রতাপ সিংহের নাম রাজস্থানের প্রতিপল্লীতে গীত হইয়া থাকে। এইরূপে রাজপুতদিগকে আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিয়া আকবর সাহ তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক বন্ধনেও বদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে উদার হওয়ায় এবং সম্পূর্ণ মুসল্মান প্রথাসম্মত না থাকায়, রাজপুতগণ মোগল বংশের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে স্বীয় রাজনীতিবলে আকবর সাহ হিন্দু মুসল্মানকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

আকবর সাহ নিজে মাড়ওয়ারের রাজবংশ হইতে একটি রাজপুত-কন্যাকে আপনার বেগমস্বরূপে গ্রহণ করেন। মাড়ওয়ারের যে রাজকন্যা তাঁহার সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, তিনিই ইতিহাসে যোধবাই নামে পরিচিত।

যোধবাই মাড়ওয়াররাজ মালদেবের কন্যা ও উদয় সিংহের ভগিনী। এই যোধবাইএর সহিত সেলিম বা জাহাঙ্গীরের পরিণীতা বিকানীর রাজকন্যা যোধাবাইকে অভিন্ন প্রতিপাদন করিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাধারণের সে ভ্রম অপনীত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় রাজপুতানায়ও আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য আকবর সাহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিকানীর ও অম্বর সহজে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু মাড়ওয়ার প্রথমে দিল্লীশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করিতে সম্মত হয় নাই, মাড়ওয়াররাজ মালদেব রাজপুতানার একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি সেরসাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনচ্যুত হুমায়ুনকে তিনি স্বরাজ্যে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করেন। আকবর সাহের মনে যে সে বিষয়ের উদয় হয় নাই এমন নহে। সেই জন্য মালদেবের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। মালদেবও সে সময়ে জরাভারপ্রপীড়িত হইয়া শিথিলোদ্যম হওয়ায় যদিও দিল্লীশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি মাড়ওয়ারের পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সেই জন্য তিনি অন্যান্য রাজপুতবীরের ন্যায় দিল্লীশ্বরের আহ্বানে তাঁহার পতকামূলে উপস্থিত হন নাই। অবশেষে তিনি ভারতসম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রসেনকে বাদসাহের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আজমীরে পাঠাইয়া দেন।* কিন্তু বাদসাহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরঞ্চ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কারণ, বাদসাহ আশা করিয়াছিলেন, মাড়ওয়াররাজ নিজেই বাদসাহশিবিরে উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

* মেওয়ারের বিবরণে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উদয় সিংহের প্রেরণের কথা আছে। কিন্তু মাড়ওয়ারের বিবরণে ও ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীন আহম্মদের গ্রন্থে চন্দ্রসেনের প্রেরণের কথাই দৃষ্ট হয়। উদয় সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মেওয়ারের বিবরণে তাঁহার কথা লিখিত হইয়াছে।

মালদেবের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আকবর বিকানীরের যুবরাজ রাই-সিংহকে বিকানীর ও যোধপুর উভয়ের সনন্দ প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। চন্দ্রসেন পিতার ন্যায় মাড়ওয়ারের গৌরব রক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার ও তাঁহাদের পিতৃদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। উদয় সিংহ নিজেই আকবরের পতাকামূলে উপস্থিত হইয়া হাজারী মন্সবদারী নিযুক্ত হইলেন, এবং সসৈন্যে মাড়ওয়ারে উপস্থিত হইয়া যোধপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। মালদেব বৃদ্ধ বয়সে অনেক শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াও পুত্রের হস্ত হইতে যোধপুর রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পুত্রের নিকট হইতে অবশেষে পরাজয় লাভ করিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে উদয় সিংহ বাদসাহের নিকট হইতে "মোটা রাজা" উপাধি লাভ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মালদেবের দেহাবসান ঘটিল।

উদয় সিংহ আকবরের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করায় আকবর মাড়ওয়ারের রাজত্ব তাঁহাকেই প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মালদেবের মৃত্যুর পর চন্দ্রসেন ভ্রাতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত হইতে হয়। ১৬২৫ সম্বৎ বা ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে মালদেবের মৃত্যু সংঘটিত হয়।* কেহ কেহ সেই সময় হইতে উদয় সিংহের সিংহাসনে আরোহণের কাল নির্ণয় করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রসেনের পরাজয় হইতে তাহা স্থির করেন। উদয় সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারত সম্রাটের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন; এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহলাভের জন্য স্বীয় ভগিনী† যোধবাইকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

* টডের রাজস্থানের দ্বিতীয় খণ্ডে মাড়ওয়ারের বিবরণের এক স্থানে সম্বৎ ১৬৭১ বা ১৬১৫ খৃঃ অব্দে মালদেবের মৃত্যু হয় বলিয়া লিখিত আছে। তাহা ভ্রম। কারণ, উদয় সিংহের মৃত্যু ১৬৫১ সম্বৎ বা ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে ঘটে, এবং ১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। ইহাদের পরে কদাচ মালদেবের মৃত্যু ঘটিতে পারে না।

† মেওয়ারের বৃত্তান্তে যোধবাইকে উদয় সিংহের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে মাড়ওয়ারের বিবরণ অপেক্ষা মেওয়ারের বিবরণকে বিশ্বাস করা যায় না।

এই ঘটনায় যদিও সমগ্র রাজস্থানে তাঁহার দুর্নাম রটনা হইয়াছিল, তথাপি তিনি বাদসাহের অনুগ্রহলাভ করিয়া অবশেষে সমস্ত মাড়ওয়ারের একাধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাদসাহ যোধবাইকে প্রণয়িনীস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের সমস্ত বিধি প্রতিপালন করিতেন না, বরঞ্চ কোন কোন হিন্দু আচার ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি হিন্দু সাধারণের ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন বা তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। সেই উদার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আকবর যোধবাইকে তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রতিপালন বা অনুষ্ঠানের কোন বাধাই প্রদান করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার প্রাসাদাভ্যন্তরে যোধবাই মহালে তিনি তাঁহার হিন্দুবেগমের অনুমোদিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আগরার প্রাসাদাভ্যন্তরে যোধবাই মহালে হিন্দুর বাসোপযোগী গৃহাদির নিদর্শন বিদ্যমান আছে। সেই সমস্ত যোধবাইএর স্বধর্ম্মানুরক্তি ও আকবরের উদার মতের দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্যাপি লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে। যাঁহারা আগরার কেল্লা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই যোধবাইএর সহিত সেলিমের পরিণীতা যোধাবাইএর অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আবার কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস আছে যে, আকবরের পরিণীতা যোধবাই সেলিমের জননী। কিন্তু এই বিশ্বাস অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত বিষয়ে কিরূপ সন্দেহ আছে, আমরা প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ কর্ণেল টড এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মেওয়ারের বিবরণে যোধবাইএর টিপ্পনীতে তাঁহাকে সাজাহানের মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এই

* The magnificent tomb of Jodbai, The mother of Shah Jehan, is at Secondra, near Agra, not far from that in which Akber's remains are deposited." Tod Vol I. P. 231,

নির্দ্দেশে টড দুইটি ভ্রম করিয়াছেন, প্রথমে জাহাঙ্গীরের স্থলে সাজাহান পরে যোধবাইকে তাঁহার মাতা বলিয়াছেন। এই সাজাহানকে জাহাঙ্গীর সংশোধন করিয়া অনেকে যোধবাইকে তাঁহার মাতা স্থির করিয়া থাকেন। ম্যালেসনের আকবরে ও শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের নব প্রকাশিত মোগল বংশেও এই রূপ উল্লেখ দৃষ্ট হইল। কিন্তু মেওয়ার বা মাড়ওয়ারের বিবরণে জাহাঙ্গীর যে যোধবাইএর পুত্র তাহার কোন রূপ উল্লেখ নাই। অথচ এই সমস্ত বিবরণে অন্যান্য রাজপুত কন্যার সহিত বিবাহিত বাদসাহবংশীয়দিগের হিন্দু বেগমের গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণের বিষয়ের উল্লেখ আছে, অথচ এ বিষয়ে কোন রূপ প্রসঙ্গই নাই। টড তাঁহার প্রথম প্রকাশিত মেওয়ারের বিবরণে ভ্রম করিলেও পর-প্রকাশিত মাড়ওয়ারের বিবরণে কোন কথাই বলেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর ফেরিস্তা সুস্পষ্টরূপে সেলিমের জন্মের কথা লিখিয়াছেন। ফেরিস্তার বিবরণে জানা যায় যে, সেলিম আকবরের প্রিয়তমা সুল্‌তানার * গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাদসাহের সন্তানেরা শৈশবাবস্থায় অকালে প্রাণত্যাগ করায়, সেখ সেলিমের কৃপায় তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ও জীবিত থাকায় তিনি পরিশেষে সেলিম নামে অভিহিত হন। † সুতরাং ফেরিস্তার উক্তি অনুসারে

* সুল্‌তানা রাকিয়া বেগম ও সুল্‌তানা সালিমা বেগম নামে আকবরের দুই বাদসাহ-বংশীয়া বেগম ছিলেন। জাহাঙ্গীর কাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তাহা আমরা অদ্যাপি জ্ঞাত নহি।

† From that city (Agra) he went to visit Sheck Selim Chisti in the village of S kri: he questioned him according to the cerimonies, and was told, it is said, that he would soon have an issue that would live and prosper ; all the children which were born to him before that time dying in their infancy, soon after, the favourite Sultana became pregnant and upon the 17th of Rabbi-ıl-awil in the year 977, she was brought to bed of a son, who was named Sultan Selim. (Dow's Ferista Vol II. P. 257.)

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেলিম বাদসাহের প্রিয়তমা সুল্‌তানার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বাদসাহবংশীয়া বেগম ছিলেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ সুল্‌তানা নামে অভিহিত হইতেন। যোধবাই সুল্‌তানাপদবাচ্য হন নাই বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে আরও একটি গোলযোগ আছে। ফেরিস্তার উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, সেলিম ৯৭৭ হিজরী বা ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজাম উদ্দীন আহম্মদেরও সেই মত। * রাজস্থানের ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয়, সেই অব্দেই মালদেবের মৃত্যু হয়, উদয় সিংহ তখনও পর্য্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন কিনা তাহাও সুচারুরূপে জানা যায় না। তাহার পর তিনি যোধবাইকে আকবরের হস্তে সমর্পণ করেন। মালদেবের জীবনকালে যোধবাই যে আকবরের সহিত পরিণীতা হন নাই, রাজস্থানে তাহারও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। † সুতরাং ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে সেলিমের জন্ম হইলে, যোধবাইএর গর্ভে তাঁহার জন্ম

ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীন আহম্মদের মতে সেলিম সেখ সেলিমের বাটীতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মোরাদও সেখ সেলিমের বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন। মোরাদের মাতার নাম জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে আছে। যোধবাই যেরূপ হিন্দু আচার প্রতিপালন করিতেন ও তাঁহার জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র মহাল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার সেখ সেলিমের বাটীতে অবস্থান করা সম্ভবপর নহে। আবার জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে লিখিত আছে যে, জাহাঙ্গীরের জন্মের পর আকবর সেই শিশুকে লইয়া সেখ সেলিমের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন।

* On wednesday, 18th Rabi-u-awwl, 977H, and the fourteenth year of the reign when seven hours of the day had passed, the exalted prince Sultan Salim Mirza was born in the house of Shaikh Salim Chisti. (Nizam-u-d-din Ahamad's Tabukat-i-Akbari. Elliot's History of India Vol V. P. 334.)

† "Maldeo, though he submitted to acknowledge the suprimacy of the emperor, was at last spared the degradation of seeing a daughter of his blood bestowed upon the opponent of his faith ; he died soon after the title was conferred on his son, which sealed the indipendence of Maroo." Tod Vol II. P. 29.

হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাইসের অনূদিত জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীর মতে তিনি ৯৭৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৭৮ হিজরীতে সেলিমের জন্ম হইলে যোধবাইএর গর্ভে তাঁহার জন্ম হওয়া অসম্ভব হয় না। কিন্তু নিজাম উদ্দীন আহম্মদ সেলিমের জন্মের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ৯৭৭ অর্থ করিয়াছেন। * ৯৭৭ হিজরী প্রকৃত হইলে আত্ম-জীবনীর অনুবাদ যথার্থ হয় নাই অনুমান করিতে হয়। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীর জন্মের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ তিনি স্বীয় জননীর নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীন আহম্মদ প্রভৃতির গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেলিমের ও মোরাদের জন্মের পর আকবর আজমীর হইতে নাগরে উপস্থিত হইলে, যোধপুরের যুবরাজ চন্দ্রসেন তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, আবার সেলিমের জন্মের পর যোধবাইএর বিবাহ স্থির হয়। ফলতঃ ইহা সন্দেহপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়।

এক্ষণে আমরা যোধাবাইএর বিবরণ প্রদান করিতেছি। যোধাবাই বিকানীররাজ রাইসিংহের কন্যা। এই বিকানীরের রাজবংশও রাঠোরকুলসম্ভূত ও মাড়ওয়ারের একটি শাখা। রাইসিংহ আকবরের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে অপরিসীম শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমেদাবাদের শাসনকর্ত্তা মির্জা মহম্মদ হোসেনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিয়া তিনি যার পর নাই

* "The date of the birth fs found in the words Shah-i al i Timur. Khawaja Hussain composed an ode, of which the last line contained the date of the Emperor's accession, and the second the date of the prince's birth. The Khawaja received a present of two lacs of tankas for this ode." ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীনের মতে সুলতান মোরাদ ৯৭৮ হিজরীর ৩রা মহরম জন্মগ্রহণ করেন। নিজাম উদ্দীন এই উপলক্ষে মৌলান কাসিম আরসালানের একটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার প্রথমার্দ্ধে সেলিমের ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোরাদের জন্মের উল্লেখ আছে ৯৭৮ হিজরীর ৩রা মহরম মোরাদের জন্ম হইলে, তাহার পর সেলিমের জন্ম হওয়া অসম্ভব হয়। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীর মাস তারিখের সহিত ফেরিস্তার উক্তির ঐক্য আছে। সেই জন্য আত্ম-জীবনীর অনুবাদ সন্দেহপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। প্রাইস উক্ত তারিখকে ইংরেজী ১৫৭০ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্ট বলিতে চাহেন।

গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত যুবরাজ সেলিমের বিবাহ প্রদান করেন। রাইসিংহের সেই কন্যাই সুবিখ্যাত যোধাবাই। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী ও ফেরিস্তায়, বিকানীর ও অম্বর প্রভৃতির বিবরণে এই বিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যোধাবাই সেলিম বা সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী মেহের উন্নিসা বা নুরজাহানের রূপস্রোতে ভাসমান হইয়াও জাহাঙ্গীর যোধাবাই-এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। এমন কি তিনি অনেক বিষয়ে যোধাবাইএর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করিতেন না। এক সময়ে যোধাবাইএর অনুরোধে জাহাঙ্গীর মির্জা জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। * এতদ্ভিন্ন অনেক সময়ে তিনি যোধাবাইএর পরামর্শে চালিত হইতেন। যতদিন পর্য্যন্ত মেহেরউন্নিসা আগরার প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত বাদসাহ যোধাবাইএরই প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য বেগমেরা তাঁহাকে এরূপ বশীভূত করিতে পারেন নাই। যোধাবাই ব্যতীত তাঁহার আরও রাজপুতনী বেগম ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যোধাবাইএর ন্যায় বাদশাহের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। ভুবনজ্যোতিঃ মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীরের প্রণয়িনী হইয়া যোধাবাইএর প্রতি

* "At the instigation of the celebrated Jodabae (daughter of Rai Sing of Bikanir) the Rajputni wife of Jehangir, Joysing, grandson of Jaggut sing (brother of Maun,) was raised to the throne of Amber, to the no small jealousy says the chronicle of the favourite queen, Noorjehan." (Tod Vol II pp 354-55)

জয়সিংহকে সিংহাসন প্রদানসম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিবৃত্তে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে। বাদসাহের অন্তঃপুরে একটি বারাণ্ডায় জাহাঙ্গীর ও যোধাবাই ছিলেন। জয়সিংহ নিম্নে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাদসাহ অল্পবয়স্ক রাজপুতকে সেলাম করিয়া অম্বররাজ বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাঁহাকে যোধাবাইকে সেলাম করিতে বলেন। রাজপুতানার নিয়মানুসারে জয়সিংহ যোধাবাইকে সেলাম করিতে পারিতেন না, সেই জন্য তিনি তাহা করিতে অস্বীকৃত হন। তিনি বাদসাহকে উত্তর করেন যে, আপনার অন্তঃপুরের অন্য যে কোন মহিলাকে সেলাম করিতে পারি, কিন্তু যোধাবাইকে কদাচ পারিব না। যোধাবাই এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি তোমাকে অম্বরের রাজত্ব প্রদান করিলাম।

অনুরাগেরই শৈথিল্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মেহেরউন্নিসাকে পাইয়া বাদসাহ যোধাবাইকে কেন সমস্ত জগৎই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তথাপি তিনি যোধাবাইর প্রতি পূর্ব্বানুরাগ একেবারে বিস্মৃত হন নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শও গ্রহণ করিতেন। জয়সিংহকে অম্বরের রাজত্ব প্রদান করা তাহার সমর্থন করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যোধাবাই ব্যতীত জাহাঙ্গীরের আরও রাজপুতনী বেগম ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন অম্বররাজ বিহারী মল্লের কন্যা ও দ্বিতীয় জন মাড়ওয়ারের মোটা রাজা উদয় সিংহের কন্যা। বিহারী মল্ল সুপ্রসিদ্ধ মানসিংহের পিতামহ। বিহারী মল্লের কন্যার গর্ভে খসরুর জন্ম হয়। খসরুর সহিত আকবরের উজীর আজিম খাঁর কন্যার পরিণয় সংঘটিত হইয়াছিল। আকবরের মৃত্যুকালে মানসিংহ ও আজিম সেলিমের পরিবর্ত্তে তৎপুত্র খসরুকে সিংহাসন প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সেলিমই আকবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করেন। সেলিমের অন্যতম বেগম মাড়ওয়ার রাজকন্যা জগৎগোস্বামীর (?) গর্ভে কুমার খড়মের জন্ম হয়।* এই খড়মই ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভ করিয়া সাজাহান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদসাহের তক্ত লইয়া জাহাঙ্গীরের কুমারদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু কুমার খড়মই পরিশেষে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

* খসরুর মাতাকে টড প্রভৃতি বিহারীমল্লের পুত্র ভগবান দাসের কন্যা ও খড়মের মাতাকে অম্বরের অন্য রাজকন্যা ও যোধাবাইকে জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র পার্বিজের মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অনেক স্থলে বিহারীমল্লের কন্যা আকবরের বেগম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী পাঠে এই সমস্ত ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"The first of the Rajpoot chieftains who became attached to the government of my father Akbar was Bharmul, the grandfather of this Rajah Maun Sing, and preeminent in his tribe for courage, fidelity, and truth. As a mark of distinguished favour, my father placed the daughter of Raja Bharmul in his own palace, and finally espoused her to me, It was by this princess I had my son Khassrou

আমরা যোধবাই ও যোধাবাইএর যে বিবরণ প্রদান করিলাম, উহা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, ইঁহারা দুই জনে অভিন্ন নহেন, কিন্তু স্বতন্ত্র। দুঃখের বিষয় অনেকের মনে ইঁহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে। এমন কি কোন কোন ঐতিহাসিক লেখকও এই রূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার রঙ্গমহাল নামক গ্রন্থে হীরক বলয় প্রবন্ধে যোধাবাইকে উদ্দেশ করিয়া মেহের উন্নিসার দ্বারা বলাইয়াছেন "আপনি যোধপুরের পবিত্র কুলভূতা দিল্লীশ্বরের পাটরাণী।" কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে যোধাবাই যোধপুরের রাজকন্যা নহেন, তিনি বিকানীরের রাঠোর কুলে উদ্ভূত হন। যোধবাইই যোধপুরের রাঠোরবংশসম্ভূতা। তবে যোধপুর ও বিকানীর একই বংশের শাখা বটে, তথাপি তাহারা পরিশেষে যে বিভিন্ন বংশে

* * * Next to her, by Sauheb Jamaul, the niece of Zeyne Khaun Khoukah, I had a son born at Kabul, on whom my father bestowed the name of Parveiz. * * * and by the daughter of Moutah Rajah (Jaggat Gossaeine) was born my son Khourroum. মোটারাজা যে উদয় সিংহ তাহাও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে। "Next by Jaggat Gossaeine, the daughter of Rajah Oudi Sing," (Price's Memoirs of the Emperor Jahanguir. pp 19-20) আকবর উদয় সিংহের ভগিনী যোধবাইকে ও জাহাঙ্গীর তাঁহার কন্যা জগৎগোস্বামীকে বিবাহ করেন। ইহাই গোলযোগ করিয়া টড মেওয়ারের বিবরণে যোধবাইকে উদয় সিংহের কন্যা ও সাজাহানের মাতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিহারীমল্ল আকবরকে তাঁহার কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সহিত সেলিমের বিবাহ হয়, ও খসরু তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ডৌ সাহেবের ফেরিস্তার অনুবাদে দৃষ্ট হয় যে, বিহারীমল্লের কন্যাকে অকেবর বিবাহ করিয়াছিলেন। নিজাম উদ্দীনের অনুবাদে ইলিয়ট উক্ত কন্যার সহিত আকবরের বিবাহের কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে বাদসাহের অন্তঃপুরবাসিনী হইতে হইয়াছিল এই রূপ লিখিত আছে। নিজাম উদ্দীনের উক্তি আত্ম-জীবনীর উক্তির সহিত ঐক্য হইতেছে। ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীনের মতে আকবর বিকানীরের রাই সিংহের ভগিনী ও কল্যাণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার বিকানীরের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, রাই সিংহ বাদসাহের শ্যালীপতি ছিলেন। উভয়ে যশল্মীরের রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা ও নিজাম উদ্দীন ৯৬৯ হিজরীতে বিহারীমল্লের বশ্যতা স্বীকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে বাদসাহকে তাঁহার কন্যা প্রদানের কথা বলিয়াছেন। সে সময়ে বিহারীমল্লের কন্যাপ্রদান হইলে উক্ত কন্যার বয়স সেলিম অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। সম্ভবতঃ বিহারীমল্ল সেই সময়ে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরে কন্যা প্রদান করেন।

পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যোধাবাইকে যোধপুরের পবিত্র কুলে উদ্ভূত বলিলে তাহাকে ভ্রম বলিতেই হইবে। এই বিষয়ে টডও নিজে এক স্থানে একটু গোলযোগ বাধাইয়াছেন। টড তাঁহার রাজস্থানের বিবরণের একস্থানে বলিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুল্‌তান পার্বিজ মাড়ওয়ারের কোন রাজকন্যার গর্ভজাত, এবং দ্বিতীয়পুত্র খড়ম অম্বরের এক রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। * টডের এ উক্তি মূলে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, পার্বিজ কোন হিন্দু বেগমের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং খড়মের মাতা যোধপুররাজ উদয় সিংহের কন্যা। সম্ভবতঃ টডের এই উক্তি হইতে অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। টড যোধাবাইকে পার্বিজের মাতা ও বিকানীরকে মাড়ওয়ারের একটি শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যোধাবাইকে পার্বিজের মাতা না বলিয়া কেবল মাড়ওয়ারের রাজকন্যা বলিলে তাদৃশ ভ্রম হয় না। কারণ, বিকানীর মাড়ওয়ারেরই একটি শাখা। সে যাহা হউক, টডও যে এ বিষয়ে ভ্রম করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহারা যোধাবাইকে যোধপুরের রাজকন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে সাধারণে যোধবাই ও যোধাবাইএর স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভরসা করি, অতঃপর আর তাঁহাদের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইবে না। †

* "Sultan Purvez, the eldest son and heir of Jehangir, was the issue of a princess of Marwar, while the second son Khoorum, as his name imports was the son of a Cuchwaha princess of Amber," (Tod Vol II P. 42.)

† আগরা প্রভৃতি স্থানে যোধবাই বা যোধাবাইএর নামে একখানি চিত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। চিত্রে তাঁহার নিকট একটি শিশু অঙ্কিত আছে। চিত্র খানি যোধবাইএর হইলে প্রবাদানুসারে শিশুটি সেলিম ও যোধাবাইএর হইলে পার্বিজ হওয়া সম্ভব। অথচ এই প্রবাদের প্রথমটি যে সন্দেহপূর্ণ ও দ্বিতীয়টি ভ্রমাত্মক তাহা মূল প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের কৌতুহলের জন্য সেই তথাকথিত যোধবাই বা যোধাবাইএর চিত্র খানি প্রদর্শন করিলাম।

ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব।

"দীপবৎ দ্যোতয়তি যো ভূ-ভূর্ব্বঃ-স্ব-র্জগত্রয়ীং।
সবিতু স্তং বয়ং ভর্গ মপবর্গ-করং স্তমঃ ॥"

এই ব্রাহ্মণোচিত নমস্কার-শ্লোকে মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" নামক যে সুবিখ্যাত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভূমির ইতিহাস-সংকলনোপযোগী বিবিধ উপাদেয় উপকরণরাশির আধার হইয়া, সুধী-সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকিলেও, বটতলা ভিন্ন অন্য কোন সুসংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। ভ্রম-প্রমাদে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিরতিশয় দুষ্পাঠ্য হইলেও, হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বই" যজুর্ব্বেদান্তর্গত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাগ্রন্থ বলিয়া সুপরিচিত। ইহাতে গাত্রোত্থান, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমগ্র নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। তাহাতে সেকালের সামাজিক রীতিনীতি ও সদাচার-পদ্ধতির সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হলায়ুধের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত হইলেও, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভট্টনারায়ণ-বংশোৎপন্ন বলিয়া নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইতেছেন। ভট্টনারায়ণ সাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। হলায়ুধ বাৎসগোত্রীয়। তথাপি সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় প্রধান পুরুষগণের উৎসাহে তাঁহাদের যে বংশ-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হলায়ুধও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে

হলায়ুধ স্বয়ং যে বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এই সকল পুস্তকে তাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই। হলায়ুধ কোন্ বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রামাণ্য।

"বংশো বাৎস্যমুনে র্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান্ পরজ্যোতিষঃ॥"

এই শ্লোকে হলায়ুধ আত্মবংশের পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রথমেই বাৎস্যমুনির বংশের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। (মুনেরিব) মুনির পক্ষে বংশ বা বেণু যেমন বিশ্রামভূমি হইয়া থাকে, বাৎস্যমুনির বংশ সেইরূপ সদাচারের বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। সে বংশে পরমজ্যোতির্ম্ময় বাৎস্য মুনির অন্ববায়ে, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন। হলায়ুধ সেই ধনঞ্জয়ের স্বনামধন্য সুযোগ্য পুত্র। ধনঞ্জয় কাহার ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, সে কথা লিখিত হয় নাই; তৎকালে অতি-প্রসিদ্ধিবশতই তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধনঞ্জয় কিরূপ কার্য্যে কিরূপভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া হলায়ুধ সে কালের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণশ্রেষ্ঠ সমাজ-শিক্ষকের মহজ্জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র সুচিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

"বাঞ্ছাতিক্রমসম্ভবেহপি বিভবে জ্যোতির্জটালান্ মণীন্
হিত্বা যস্য জগত্রয়স্য মহসো জাগর্ত্তি কোষঃ কুশঃ।
অপ্যেতস্য বিলঙ্ঘ্য শৈলসদৃশপ্রাক্দ্বারবদ্ধান্ দ্বিপান্
দূরোদ্দণ্ডিত-যজ্ঞযূপবৃষভোৎকর্ষেণ হর্ষোহভবৎ॥"

ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের বিষয়-বিভবের অভাব ছিল না; বরং আশাতিরিক্ত ধনলাভে তাঁহার কোষাগার "জ্যোতির্জটাযুক্ত" অগণ্য মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সে সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায়, তাঁহার পক্ষে কুশকাশই কোষরূপে প্রতিভাত হইত। শৈলশিখরতুল্য সমুন্নত পূর্ব্বাভিমুখ গৃহদ্বারে যে সকল হস্তী নিয়ত নিবদ্ধ থাকিয়া, ধনঞ্জয়ের ঐশ্বর্য্য ও প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিত, তিনি তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া সুদূর-নিবদ্ধ যজ্ঞযূপ বৃষভের উৎকর্ষেই নিয়ত হর্ষলাভ করিতেন। অনাসক্ত স্বধার্ম্মানুরক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের

কীর্ত্তিকলাপ সুরাধিপতির সভামণ্ডপে কীর্ত্তন করিবার সময়ে সুরযুবতীবৃন্দের লোচন সকল আন্তরিক প্রমোদাতিশয্যে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। এই মহাপুরুষের ঔরসে এবং উজ্জ্বলাদেবীর গর্ভে পশুপতি, ঈশান এবং হলায়ুধ নামক তিনটি পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভ্রাতাই বিবিধশাস্ত্র-বিশারদ সুপণ্ডিত হইয়া, চরিত্রবলে সেকালের বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসমাজের* শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট ও বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলনে লোকসমাজের পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দেশের ইতিহাস থাকিলে, কবিকল্পনা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, ইঁহাদের পুণ্যনামে কোনরূপ কলঙ্কলেপন করিতে সাহস করিত না। ইতিহাসের অভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় উপন্যাস-গঠন-কৌশল হলায়ুধকে জ্যেষ্ঠ ও পশুপতিকে কনিষ্ঠ কল্পনা করিয়া, পশুপতির যে চিত্র "মৃণালিনীর" উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছে, তাহা রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হইবার সময়ে আধুনিক অধঃপতিত বঙ্গবাসীর নিকটেও পুনঃ পুনঃ ধিক্কৃত হইয়া থাকে! হায়! পশুপতি;—হায়! বঙ্গ সাহিত্য; হায়! হায়! স্বদেশের শিক্ষিত-সমাজের সমুন্নত সাহিত্যরুচি!

* ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রতঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকৃত্যে ব্যধাৎ
ঈশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিক-বিধৌ জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্।
তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তুত্য নানা শ্রুতীঃ
সন্ধ্যাদি-দ্বিজকর্ম্ম-মন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যা পরং খ্যাপিতা॥"

অগ্রতঃ প্রথমং পশুপতিশর্ম্মা, হলায়ুধস্য ভ্রাতা, শ্রাদ্ধাদিকৃত্যে ব্যধাৎ। ঈশান-নামা চ এতস্যৈবাপরো জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজাহ্নিককর্ম্মণি পদ্ধতিং কৃতবান্। তেন হেতুনা, আবশ্যকেতিকর্ত্তব্যতা-বোধক-পদ্ধত্যো র্ভ্রাতৃভ্যাং কৃতত্বেন অমুনা হলায়ুধেন ফলস্তুতিবোধিকাঃ শ্রুতীঃ উপন্যস্য সন্ধ্যাদিমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যা কেবলং কৃতা, ন কাচিৎ পদ্ধতিরিতি ভাবঃ॥ "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" হলায়ুধের লিখিত পশুপতি ও ঈশান সম্বন্ধীয় এই কথা এখন বিস্মৃত হইলেও, পণ্ডিত সমাজে "পশুপতি-পদ্ধতির" পরিচয় এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক বঙ্গ-বিজয়-কাহিনী "আরব্যোপন্যাসের" অত্যুজ্জ্বল অলীক কাহিনী অপেক্ষাও বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহা আদৌ সত্য কিনা, তাহার তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা অতি অল্পদিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অস্বীকার না করিয়া, তাহার কোনরূপ গুপ্তকারণ কল্পনা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, "মৃণালিনীর" উপাখ্যানে পশুপতির অবতারণায় রাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেনদেবকে অকর্ম্মণ্য

"লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণ-ক্ষ্মাপতেঃ
আবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহামাত্যতা।
শব্দব্রহ্ম-করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥"

ধনঞ্জয় হইতে জন্মলাভ ও শ্রীলক্ষ্মণ-ক্ষ্মাপতি হইতে নিজ-বয়সোচিত মহামাত্য পদবীলাভ করিয়া, বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ হলায়ুধ সমূহ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া, আর কোন সাংসারিক অভ্যুন্নতির প্রার্থনা করিতেন না। তথাপি বাল্যকাল হইতেই নানা সম্পৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু-বিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহস্তনুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেনদেবনৃপতি র্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥"

অখিল-ক্ষ্মাপাল-নারায়ণ লক্ষ্মণসেনদেব হলায়ুধকে বাল্যে রাজপণ্ডিতপদ যৌবনে মহামাত্যতা ও যৌবনশেষযোগ্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়া, প্রতিভার সমুচিত সমাদর করিয়াছিলেন। হলায়ুধ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, "মণীষিতাধিক পুরস্কারোত্তরাং সম্পদং" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এত ঐশ্বর্য্য অন্য লোকের পক্ষে চিত্তবিকার উপস্থিত করিতে পারিত। কিন্তু হলায়ুধের কর্ণারোপিত রাজদত্ত হেমকুণ্ডলবিন্যস্ত নীলাশ্ম-রশ্মিচ্ছটা কেবল তাঁহার কৃষ্ণাজিনকেই অধিকতর কৃষ্ণাভ করিয়া দিত; গৃহিণীর রত্নকঙ্কন-রণৎকারও তাঁহার যজ্ঞগৃহের মন্ত্রবাচন-কোলাহলকেই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিত। ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত কৃষ্ণাজিনাদি তাঁহার গৃহকে যুগপৎ সম্ভোগ-সংযমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সজ্জীভূত করিত।

অযোগ্য-ভূপতি ও তদীয় প্রধান মন্ত্রী পশুপতিকে নরকুলাঙ্গার রূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পনা নিরঙ্কুশ। কবি-কাহিনী অধিকতর মুখরোচক। তাহাই জনসমাজে ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। সত্যানুরোধ প্রবল থাকিলে, বঙ্গসাহিত্য এই সকল ঐতিহাসিক চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে প্রবৃত্ত হইত না।

"পাত্রং দারুময়ং কচিৎ বিজয়তে, হৈমং ক চিদ্ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং, কৃষ্ণাজিনং কাপি চ।
ধূমঃ কাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো, ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূৎ
অগ্নেঃ কর্ম্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্ত্তি যন্মন্দিরে॥"

এইরূপে নিয়ত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, হলায়ুধ অবসর সময়ে স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় (১) মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, (২) বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব, (৩) শৈব-সর্ব্বস্ব, ও (৪) পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব নামক বিস্তৃত গ্রন্থসংকলন করিয়া, অবশেষে "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা পুস্তক; ইহা সন্ধ্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবশ্যপাঠ্য বেদমন্ত্রাদির সুলিখিত ভাষ্যগ্রন্থ। হলায়ুধের পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের এরূপ ভাষ্য প্রচলিত ছিল না। উত্তরকালে সায়নাচার্য্য ভাষ্য রচনা করিবার সময়ে, হলায়ুধের মন্ত্র-ব্যাখ্যার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

"আসন্ বা কতি, সন্তি বা কতি ন কিং ক্ষ্মামণ্ডলে পণ্ডিতাঃ ?
ব্যাখ্যাতো নহি কেনচিৎ যুগপদাচার্য্যেণ বেদঃ পরম্।
অস্পষ্টং তদপীত্যনেন বিদুষা বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্ম্ম-মন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যানমেতৎ কৃতম্॥"

ভূমণ্ডলে কত না পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, এখনই বা কত না পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন। কত আচার্য্যই না যুগপৎ বেদব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এত ব্যাখ্যা থাকিতেও, বেদার্থ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া, সুপণ্ডিত হলায়ুধ সন্ধ্যাদিমন্ত্রের ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য নানা ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। হলায়ুধের সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ পুরুষের বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কি রাঢ়ী, কি বারেন্দ্র, সকলেই বেদার্থজ্ঞানবিরহিত হইয়া, কেবল কর্ম্ম-মীমাংসাদ্বারায় যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতেন! হলায়ুধ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, বেদমন্ত্রের আবৃত্তিমাত্রই যথেষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তাহা যে অধঃপতনের পূর্ব্বসূচনা, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই,

হলায়ুধ বেদার্থব্যাখ্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার আশায় "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমেই সে কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে।

"তত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহ-শ্রদ্ধাদীনা মল্পত্বাৎ, উৎকল-পাশ্চাত্যাদিভির্ব্বেদাধ্যয়ন মাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রৈ স্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেক-বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতা-বিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রাত্মক-বেদার্থজ্ঞানং মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব যৎ প্রয়োজনং। যতস্তৎ পরিজ্ঞান এব শুভফলং, তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে॥"

হলায়ুধ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সযত্নে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, বেদার্থজ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন প্রদর্শনের চেষ্টায়, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে নানারূপে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রার্থব্যাখ্যা যেমন সরল, সেইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি কিরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার ব্যাখ্যাই তাহার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। তাহা পাঠ করিতে করিতে হলায়ুধের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও তাঁহার মন্ত্রব্যাখ্যার উদারমতের পরিচয় প্রাপ্ত হইবামাত্র, তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাবনতমস্তকে প্রণিপাত করিতে হয়। তাঁহার "গায়ত্রী ব্যাখ্যা" ও "পুরুষ-সূক্ত ব্যাখ্যা" পৃথক্ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার যোগ্য।

হলায়ুধের কোন "পদ্ধতি" রচনা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরং "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কোন "পদ্ধতি" রচনা করেন নাই।* কিন্তু হলায়ুধ বিরচিত "কর্ম্মোপদেশিনী" নামে একখানি পদ্ধতি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তাহার আরম্ভ এই রূপ।

"দৃষ্ট্বা পারস্করং সূত্রং স্মৃতিমালোক্য সর্ব্বশঃ।
ব্যাসস্য বচনং দৃষ্ট্বা মুনীনাং সংহিতাং তথা।
যুক্ত্যা চ স্বয়মালোক্য বৃদ্ধানাং সর্ব্বসম্মতা।
হলায়ুধেন রচিতা সম্যক্ কর্ম্মোপদেশিনী॥"

* অভিধান-চিন্তামণি নামক একখানি অভিধানও হলায়ুধ-বিরচিত বলিয়া সুপরিচিত।

এই গ্রন্থে সমগ্র কর্ম্মোপদেশ থাকিলেও, ইহার প্রত্যেক প্রকরণ-শেষে হলায়ুধের কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথচ "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের" প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যার আরম্ভে বা শেষে আত্ম-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা

(আরম্ভে)

"হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্র-ধর্ম্মাগারাধিকারিণা।
এতৎ পুরুষ-সূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে॥"

(শেষে)

"ইত্যাবসথিক-ধর্ম্মাধ্যক্ষ -শ্রীহলায়ুধকৃতৌ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে
সহস্রশীর্ষা ব্যাখ্যা॥"

হলায়ুধ পরিণত বয়সে "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" রচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে রাজপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, লক্ষ্মণসেনদেবের যে সকল তাম্রশাসন লিখিত হইত, তাহার কবিতাবলী হলায়ুধের রচিত বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। লক্ষ্মণসেনদেবের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাবনার অন্তর্গত মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ব্যতীত, অন্যান্য শাসনগুলির রচনাকাল লক্ষ্মণ শাসনাব্দের সপ্তম সংবৎসরের মধ্যে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন খানির রচনাকাল অপাঠ্য হইয়াছে বলিয়া, তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। এই সকল তাম্রশাসন একত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম সংবৎসর পর্য্যন্ত যে সকল শাসন-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার কবিতাবলী পৃথক্ নহে; প্রথম হইতে সমস্ত শাসনে একই কবিতাবলী উৎকীর্ণ রহিয়াছে; কেবল কদাচিৎ সংখ্যায় একটি শ্লোকের ইতর বিশেষ আছে। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের শ্লোকাবলী তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, রচনারীতিও সবিশেষ পার্থক্য প্রকাশ করে। প্রথমোক্ত শাসনগুলির কবিতাবলীর রচনালালিত্য হলায়ুধের রচনালালিত্যের অনুরূপ;—কাব্য-সৌন্দর্য্যে সমুজ্জল, রসমাধুর্য্যে মধুময়। তিনি যে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন, সে কথার সহিত লক্ষ্মণ-সেনদেবের প্রথম

শাসন-সময়ের এই সকল শাসনলিপির কবিতাবলীর সবিশেষ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। মহামাত্যপদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে হলায়ুধের প্রতি কিরূপ কার্য্যভার সমর্পিত ছিল, তাহার প্রমাণ না থাকিলেও, কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে লক্ষ্মণ-সেনদেব নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া, নানা দিগ্দেশে অসিহস্তে ধাবমান। তখন মহামাত্যই তাঁহার পরামর্শ দাতা, পিতৃরাজ্য শাসনের সহকারী, এবং সংগ্রাম-নির্জ্জিত অভিনব রাজ্যে সুশাসন বিস্তৃত করিবার প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এই রূপে বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায়, সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সর্ব্বোচ্চপদবীর যোগ্য হইয়া, হলায়ুধ বার্দ্ধক্যে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কিরূপে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার সদ্গুণাবলী শিলাপটে উৎকীর্ণ হইয়া এবং কবি-নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়া, গ্রামে নগরে নানা স্থানে গৃহে গৃহে নিদর্শনরূপে রক্ষিত হইবার কথা "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" লিখিত আছে। তাহা আবিষ্কৃত হইলে, নানা ঐতিহাসিক-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

হলায়ুধের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে পুনরায় সংস্কৃত-শিক্ষার সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্র-ভূমি পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত ছিল। পাণিনীয় ব্যাকরণই অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমির একমাত্র অবলম্বন; কিন্তু অল্পদিন হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। "রাজ-তরঙ্গিণী" পাঠে বোধ হয়—জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাসের সময়ে গৌড়মণ্ডলে "মহাভাষ্যের" পঠন পাঠন পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত ছিল। কশ্মীরে তাহা লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, জয়াপীড়ের চেষ্টায় তাহা এ দেশ হইতেই কশ্মীরে পুনরায় সমানীত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের এই শিক্ষা-গৌরব বৌদ্ধাধিকারের শেষ দশায় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। তখন বেদার্থজ্ঞানের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণসমাজ আবৃত্তিমাত্রেই পরিতুষ্ট হইতেন। অথচ পাণিনি-ব্যাকরণের বহুসংখ্যক বৈদিক সূত্র অধ্যয়ন করিয়া অকারণে বালকগণ পরিশ্রান্ত হইত। লক্ষ্মণ-সেনদেব এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবকে বৈদিক-সূত্র-বিবর্জ্জিত পাণিনি-সূত্রের

এক সংক্ষিপ্ত বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। তাহাই "লঘুবৃত্তি" নামে পরিচিত হইয়া, অদ্যাপি বরেন্দ্রদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হইত। হলায়ুধ বেদ-মন্ত্রের সে সকল ব্যাখ্যা "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশার্থ পাণিনি-সূত্রই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি যে বৈদিক সূত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, এই সকল ব্যাখ্যাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। হলায়ুধের আত্মপরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও, তিনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণেরই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের মন্ত্রব্যাখ্যার সুপরিচিত গ্রন্থ। এই কারণেও হলায়ুধকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিবার পক্ষে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তিনি যে ভট্টনারায়ণ-বংশীয় ঠাকুর-উপাধিধারী পাথুরিয়াঘাটার স্বনামখ্যাত মহারাজ শ্রীস্তার যতীন্দ্রমোহনের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া, পাশ্চাত্য অধ্যাপকবর্গ "পুরুষ-সূক্তের" সমালোচনাচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদ হইতে কিরূপে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং কিরূপেই বা উত্তর-কালে জাতিভেদের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল বন্ধন যাতনা সহ্য করিতেছে, তাহা "পুরুষ-সূক্তে" বিশদীকৃত হইতে পারে।* এই পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া, ইংরাজভক্ত সুশিক্ষিত ভারতবাসী অনেক সময়ে স্বদেশের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তজ্জন্য "পুরুষ-সূক্তের" হলায়ুধ কৃত সংস্কৃত-ব্যাখ্যা ও পাশ্চাত্য বিবিধ অধ্যাপকের ইংরাজী ব্যাখ্যা তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্থলে প্রথম "কাণ্ডিকা" মাত্রই উদ্ধৃত করিব।

* **It will serve to illustrate the gradual sliding of Hindu monotheism into pantheism, and the first fore-shadowing of the institution of caste, which for so many centuries has held India in bondage.— Indian Wisdom. P. 24.**

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বত স্পৃত্বা-ত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্॥"

The embodied Spirit has a thousand heads,
A thousand eyes, a thousand feet around
On every side enveloping the earth,
Yet filling space no longer than a span.

"অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং" বলিতে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া পুরুষ অবস্থান করিতেছেন,—এই রূপ বুঝিয়া, সহস্রশীর্ষার সহিত তাহার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে! "অত্যতিষ্ঠৎ" বলিতে পূর্ণ করা বা অধিকার করা বুঝিয়াই, অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ এই হাস্যোদ্দীপক অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মিউর "অত্যতিষ্ঠৎ" বুঝিতে বুঝিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, "ভূমিং" বলিতে মৃত্তিকা বুঝিয়া, আরও হাস্যোদ্দীপক অনুবাদের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"He overpassed the earth by a space of ten fingers."

বলা বাহুল্য "অত্যতিষ্ঠৎ" একটি শব্দ নহে; অতি এবং অতিষ্ঠৎ এই দুই শব্দের সন্ধিযুক্ত একপদ রূপে প্রতিভাত মাত্র। "অতি" উপসর্গ হইয়াও, বৈদিক রচনারীতি অনুসারে ধাত্বর্থ-বিজ্ঞাপনে সমর্থ; তাহার অর্থ "অতিক্রম করিয়া।" তাহা সকর্ম্মক বলিয়া কর্ম্মের আকাঙ্খা রাখে। "দশাঙ্গুলং" সেই কর্ম্মপদ। "ভূমি" শব্দের অর্থ "প্রাণিদেহ"। সহস্রশীর্ষা পুরুষ যদিও সকল দেহেই বর্ত্তমান, তথাপি তিনি নাভিদেশ হইতে দশাঙ্গুল অতিক্রম করিলে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই মানব-হৃদয়েই অবস্থিত বলিয়া অনুভূত। ইহাই ব্যাখ্যা। হলায়ুধ তাহা কিরূপ সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যঃ পুরুষো নাভেরূর্দ্ধং দশাঙ্গুলং অতিক্রম্য (অর্থবশাৎ হৃদ্‌পদ্মমধ্যে জ্ঞানরূপো) অতিষ্ঠৎ, স সহস্রশীর্ষাঃ। সহস্রশব্দো অসংখ্যাতবচনঃ; তেন

অসংখ্যাত শিরাঃ। কিম্ভূত? সহস্রাক্ষঃ। অক্ষশব্দোঽত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়োপলক্ষকঃ; তানি চ ষট্। সহস্রপাৎ। পাদ শব্দোঽপি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষকঃ॥ তানি চ পঞ্চ। এতেন ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তি-প্রাণিনাং যানি শিরাংসি, বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি,—তানি সর্ব্বানি অস্য, ইত্যর্থঃ। এতেন অসৌ সহস্রশিরাঃ, সহস্রাক্ষঃ, সহস্রপাৎ॥ কিং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ? ভূমিং সর্ব্বতঃ পৃত্বা (ব্যাপ্য)। ভূমিশব্দঃ ভূমাখ্য-প্রাণিদেহবচনঃ॥ ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনঃ পার্থিবদেহান্ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ॥ অনেন চ সহস্রশীর্ষত্বাদিনা যদ্ব্যাপকত্বম্ উপক্রান্তং, তদেব স্ফুটীকৃতম্॥ সর্ব্বদেহিনাং হৃদয়স্থং বিজ্ঞানরূপং সহস্রশীর্ষত্বাদি স্বরূপোৎকীর্ত্তনেনাভিমুখীকৃত্য সংযচ্ছমানায়াং পূজায়াং সান্নিধ্যং কল্পয়তু, ইতি বাক্যার্থঃ॥ অত্র নাভেঃ ঊর্দ্ধং দশাঙ্গুলম্ অতিক্রম্য হৃদয়ং ভবতি, ইতি সকল-লোকানুভব-সিদ্ধমেব, তত্র চ পুরুষস্তিষ্ঠতি, ইতি॥"

এই ব্যাখ্যা কি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকবর্গের সিদ্ধান্তের পক্ষ-সমর্থন করে? অনির্ব্বচনীয়কে বচনমাত্র অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে হইলে, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই বলিয়া, প্রাচ্য-সাহিত্য এই ভাবেই তাহার আভাস প্রদানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যাবিলোপে অর্থ-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

বিদেশী ভারতের ইতিহাস রচনা করেন—আমরা "যে তিমিরে সে তিমিরে" বলিয়া সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার পত্রিকার "বিবিধ স্তম্ভে" গদ্যে পদ্যে বিবিধ ভাবে বেদনা ব্যক্ত করিয়া, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখকগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন। এই রূপে সম্পাদকবর্গ ও বন্ধুবর্গের উৎকট উত্তেজনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কোন কোন লেখক ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন; কোন কোন লেখক সেই মহাজনপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে নানা পুস্তক হইতে ব্যতিব্যস্তভাবে বিবরণ-সংকলন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ধীরভাবে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া, ইতিহাসের উপকরণ সংকলন ও তাহার সন্ধান প্রদান করাই বর্ত্তমান যুগের লেখকবর্গের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাতে অবহেলা করিয়া, ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে,

সে ইতিহাসে ভারতবর্ষের প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইবার আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে।

হলায়ুধ যেরূপ সদাচার-সম্পন্ন, উদারচিত্ত, জ্ঞানানুরক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন সেরূপ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান-যুগে দুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর্য্যজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এখন কোন্ অতলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে! এখন কেবল বহ্যাড়ম্বরের আতিশয্য! হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে" এই বাহ্যাড়ম্বর অতিক্রম করিয়া, যথার্থ আর্য্যজীবনলাভের যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে সমাজ-সংস্কার সাধিত করিলে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ এখনও স্বদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের" আদ্যন্ত কেবল জ্ঞানানুশীলনের বিবিধ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম, বেদোহি "বৃষ" উচ্যতে।
যস্ত বিপ্রস্ত তেনালং স বৈ "বৃষল" উচ্যতে॥"

শূদ্রকে "বৃষল" বলে না। বেদের নাম "বৃষ"। যে বিপ্র তাহাতে অব্যুৎপন্ন, তিনিই "বৃষল" বলিয়া কথিত হইবার প্রকৃত যোগ্য পাত্র। এই "যম-সংহিতার" বচন উদ্ধৃত করিয়া, হলায়ুধ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হন নাই; বেদার্থতাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া, বিবিধ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বেদ হইতে কিরূপ উদার শিক্ষালাভ করা যায়, তাহারও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অনুদার সংকীর্ণ ব্যাখ্যা লোকসমাজে প্রচলিত হইয়া, হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের" সমীচীন ব্যাখ্যাকে ক্রমে ব্যর্থ করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজকে পদস্খলিত হইবার প্রশ্রয়দান করিয়াছে। হলায়ুধ যে সময়ের লোক, তখনও এ দেশে জীবনগত পুণ্যকর্ম্মই লোকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তখনও অর্থভাণ্ডার পদমর্য্যাদার পরিচয়স্থল বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ক্রমে ক্রমে সে পুরাতন আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াই, বঙ্গভূমির সামাজিকবর্গের নৈতিক জীবনের অধোগতি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের সামাজিক ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে, হলায়ুধের গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলিত পদ্ধতির একত্র সমালোচনা করা আবশ্যক।

লক্ষ্মণসেনদেব দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। হলায়ুধের গ্রন্থই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। লক্ষ্মণসেনের বিবিধ রাজকার্য্যে হলায়ুধের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অতিবাহিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে হলায়ুধ বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিতে না পারিলেও, বল্লাল-বিরচিত "দানসাগরের" রচনাকাল অবলম্বন করিয়া, হলায়ুধের আবির্ভাব কালের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। "সময়-প্রকাশের" নির্দ্দেশ অনুসারে "দানসাগর" রচিত হইবার কাল—"শশি নবদশমিতে শকবর্ষে"। তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। হলায়ুধের গ্রন্থে রচনাকাল নির্ণয় করিবার উপযুক্ত কোন প্রমাণ উল্লিখিত নাই। কেবল "ব্রাহ্মণ স্বর্ব্বস্ব" যে হলায়ুধের পরিণত জীবনের সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং গ্রন্থরচনাকালে তিনি যে লক্ষ্মণসেনদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাই জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ কোন্ স্থানে রচিত হইয়াছিল, তাহারও কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তবে অনুমান মূলে ইহাকে লক্ষ্মণাবতী-নগরে রচিত হওয়া বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। কারণ, লক্ষ্মণসেনদেব তদীয় রাজ্যাব্দের সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্তও শ্রীবিক্রমপুরে বাস করিবার কথা তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর কোনও সময়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" রচিত হইবার সময়ে লক্ষ্মণসেনদেব গৌড়েশ্বর হইয়া থাকিলে, এই গ্রন্থ লক্ষ্মণাবতীর অভিনব রাজধানীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করিতে হয়। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের" একস্থলে হলায়ুধ আপনাকে "গৌড়েন্দ্রধর্ম্মাগারাধিকারী" বলিয়া বর্ণনা করিয়া, এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

জগৎশেঠ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

মাণিকচাঁদের পরলোকগমনের পর ফতেচাঁদ দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মহিমাপুরের গদীর ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দিল্লীর গদীতে কার্য্য করিতেন, এবং উক্ত গদীর কর্ত্তা স্বরূপই ছিলেন! মাণিকচাঁদ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করায়, তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, দিল্লীর গদী অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের গদীই অধিক শ্রীবৃদ্ধিশালী ছিল। হীরানন্দ আপনার সাত পুত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গদী স্থাপন করিয়া দেন, কিন্তু মাণিকচাঁদের অধ্যবসায় ও যত্নে বাঙ্গালার গদীই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর বিশেষ অনুগ্রহই যে মুর্শিদাবাদ-গদীর শ্রীবৃদ্ধির কারণ ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ মুর্শিদাবাদের গদী শেঠদিগের সমস্ত গদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে ফতেচাঁদ কদাচ দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদ আসিতেন না। মাণিকচাঁদ তাঁহাকে দত্তক পুত্র মনোনীত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর গদীর কর্ত্তা হইয়াও, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে কদাচ মুর্শিদাবাদে আসিতেন না। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, দিল্লী অবস্থানকালে ফতেচাঁদের সহিত বাদশাহ ও আমীর ওমরাহগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং গদীতে তাঁহারা প্রায়শঃ কারবার-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। ফতেচাঁদ বুদ্ধিমান, চতুর ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া মাণিকচাঁদ তাঁহাকেই পুত্র ও স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। পূর্ব্বাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের

ভ্রাতুষ্পুত্র; কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি মাণিকচাঁদের ভাগিনেয়। মাণিকচাঁদের ভাগিনী ধনবাইএর সহিত শেঠ উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, উদয়চাঁদ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন, ফতেচাঁদ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। একথা কতদূর সত্য বলিতে পারা যায় না। রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ফতেচাঁদ বারাণসীর বিখ্যাত মহাজন নগরশেঠের ভাগিনেয়। মাণিক-চাঁদের সাত ভ্রাতার মধ্যে কাহারও নাম নগরশেঠ ছিল না, তবে তাঁহাদের আদি নিবাস নাগর হওয়ায়, যদি তাঁহারা নাগর বা নগরশেঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ফতেচাঁদের পক্ষে মাণিকচাদের ভাগিনেয় হওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারে। নগরশেঠ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম হইলে উক্ত সম্বন্ধের প্রমাণ ঘটিয়া উঠে না। তবে হীরানন্দের সাত পুত্রের মধ্যে যদি কাহারও অপর নাম নগরশেঠ থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি ভাগিনেয় এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ তিনি ভাগিনেয় বলি-য়াই উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

মুর্শিদাবাদে আসিবার পূর্ব্বে ফতেচাঁদ যে সময়ে দিল্লীর গদীতে কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে তিনি শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। রিয়াজ-উস্ সালাতীনে লিখিত আছে যে, তৎকালে ফরকশায়ার দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অর্থাভাব হওয়ায় বারানসীর বিখ্যাত মহাজন নগরশেঠ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুপকার-স্বরূপ বাদসাহ ফরকশায়ার নগরশেঠের ভাগিনেয় ও গোমস্তা ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান ও বাঙ্গালার রাজস্বের পেস্কারী পদে নিযুক্ত করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতীনের উক্ত বিবরণ যথার্থ বলিয়া প্রতীতি হয় না। ফতেচাঁদের ফার্ম্মান বা সনন্দে দেখা যায় যে, ফরকশায়ার তাঁহাকে শেঠ উপাধি মাত্রই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট মহম্মদশাহ তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে আসার পর জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে

মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয় কিন্তু ১৭২০ খৃঃঅব্দে ফরকৃশায়ার এ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। ১৭২৪ খৃঃঅব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লী প্রথমবার গমন করিলে সম্রাট মহম্মদ শাহ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভুষিত করিয়া তৎসঙ্গে "একটি বহুমূল্য খেলাত, জগৎশেঠ নামাঙ্কিত মণিময় মোহর ও শিরোপা সম্মানচিহ্নস্বরূপ প্রদান করেন।" তৎকালে মুর্শিদাবাদের গদীর নাম এরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, জগতে তাহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় গদী ছিলনা বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করিত; সেই জন্য ফতেচাঁদ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজন হওয়ায়, বাদশাহ তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি শেঠ উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার উভয় উপাধিরই ফার্ম্মান বা সনন্দ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ফতেচাঁদের গদী মুর্শিদাবাদে অবস্থিত থাকিলেও ভারতের নানা স্থানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহগণও মুর্শিদাবাদের গদীর সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে ক্রটি করিতেন না। এইরূপে দিল্লীর দরবারে ফতেচাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হয়। যৎকালে তিনি দিল্লীতে ছিলেন, সেই সময় হইতে সম্রাট মহম্মদশাহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহার পর মুর্শিদাবাদের গদীর সহিত বাঙ্গালার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহগণের আরও গুরুতর সম্বন্ধ হওয়ায় বাদশাহ মহম্মদশাহ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদের শেঠবংশীয়দিগকে ভারতের শীর্ষ-স্থানীয় করিয়া গিয়াছেন।

মাণিকচাঁদের ন্যায় নবাব মুর্শিদকুলী ফতেচাঁদকেও যারপরনাই স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। মাণিকচাঁদের সময় মুর্শিদাবাদের গদীর প্রতি তাঁহার যেরূপ কৃপা দৃষ্টি ছিল, বর্ত্তমান সময়েও তাহায় অভাব হইল না। ফতেচাঁদ নিজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তাহাতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহলাভ করায় মুর্শিদাবাদের গদীর দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ে মাণিকচাঁদের সময়ে শেঠদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, ফতেচাঁদের সময়েও সেইরূপ বন্দোবস্ত স্থির থাকিত। নবাব সরকারেও দিন দিন ফতেচাঁদের

প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন সকলের সহিতই তাঁহার পরিচয় হইল, ফতেচাঁদ পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীর দরবারে পরিচিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদীর অধ্যক্ষ হওয়ায় বাদসাহের দরবারে তাঁহার সম্মান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বাদশাহের নিকট তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিয়াছিল নিম্নলিখিত গল্প হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ চিরদিনই কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া ভারতে বিখ্যাত ছিলেন। সেই জন্য বাদশাহ দরবারে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। কিন্তু জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাদসাহ মহম্মদ শাহের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠেন, এই রূপ কথিত আছে যে, এক সময়ে সম্রাট কোন কারণে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ফতেচাঁদকেই উক্ত পদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাদশাহ আপনার মনের ভাব ফতেচাঁদের নিকট ব্যক্ত করিলে, ফতেচাঁদ বাদশাহকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা পরিপূর্ণ হৃদয়ে উত্তর করিলেন যে,—"শেঠেরা বহুদিন হইতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ পাত্র হইয়া আসিতেছে, তাঁহারই অনুগ্রহ-কণা লাভ করিয়া স্বর্গীয় শেঠ মাণিকচাঁদ বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়াছিলেন, এবং একমাত্র তাঁহারই অনুকম্পায় বাদশাহ দরবারে শেঠবংশের অচিন্তনীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছে, যাঁহার অনুগ্রহে আমরা মহানুভব শাহান্‌শাহা বাদশাহগণের প্রসাদভাজন হইয়াছি, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত দর্শন করা একেত আমাদের পক্ষে অসীম কষ্টকর, তাহার পর আবার যদি সেই সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিপালিত আমরা উপবিষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের সমান অকৃতজ্ঞ জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যাইবে না। যে সিংহাসনে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উপবিষ্ট হইয়াছেন, সে সিংহাসনের উপযুক্ত আমি কদাচ হইতে পারি না। বরঞ্চ উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলে আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। বাদশাহের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিলাম বলিয়া বাদশাহ আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। অধিকন্তু আমার এই নিবেদন যে, বাদশাহের যে প্রসাদবলে নবাব মুর্শিদকুলী

মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, সেই প্রসাদের লাঘব না করিলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে।” বাদশাহ জগৎশেঠের এই কৃতজ্ঞতা ও ঔদার্য্যময় উত্তরে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে ক্ষমা করিয়া এইরূপ সম্মান বা আদেশ-পত্র প্রচার করিলেন যে, এক মাত্র ফতেচাঁদের আবেদনে মুর্শিদাবাদের নবাব বাদশাহের অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হইলেন। অতঃপর বাঙ্গালার রাজত্ব সম্বন্ধে নবাব জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিবেন।

নবাব মুর্শিদকুলী ফতেচাঁদের এইরূপ ব্যবহারে যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক হইবে না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে অনেক কার্য্য করিতেন, এক্ষণে বাদশাহের আদেশ পাইয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে সকল সময়েই জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহের দরবারে ও নবাব সরকারে শেঠদিগের এইরূপ প্রতিপত্তি হওয়ায়, বাঙ্গালার সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে গৌরবের চক্ষে দেখিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের পরই শেঠেরা সম্মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। উক্ত আদেশ পত্র প্রচারের পর বাদশাহ দরবার হইতে জগৎশেঠ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পোষাক পরিচ্ছদাদি পাইতে লাগিলেন। দিল্লী হইতে বাঙ্গালার নাজিমের ন্যায় জগৎশেঠেরাও এক একটী খেলাত উপহার প্রাপ্ত হইতেন। নবাব মুর্শিদকুলী যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিনই ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সরফারজকে ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর সরফরাজ নবাব হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলীর জামাতা ও সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সুজাউদ্দীন মহাম্মদ খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদকুলী জামাতার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহার কন্যা স্বামীর নিকট না থাকিয়া পিতার নিকটেই থাকিতেন। রাজনৈতিক অনেক

বিষয়ে শ্বশুর জামাতায় ঐক্য হইত না। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদকুলী খাঁ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জামাতাকে বিরক্তির চক্ষে দেখিতেন। মুর্শিদকুলী এই সমস্ত কারণে জামাতাকে সিংহাসন দিবার ইচ্ছা না করিয়া দৌহিত্র সরফ-জারকে মুর্শিদাবাদের নবাব মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু দৌহিত্রের চরিত্র যেরূপ ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, তাহাতে তিনি কি করিয়া দৌহিত্রকে মনোনীত করিয়া যান বুঝা যায় না। বোধ হয় মুর্শিদকুলীর জীবনকালে তাঁহার দৌহি-ত্রের চরিত্র স্ফুটতর হয় নাই। মুর্শিদকুলী সরফরাজের জন্য মুর্শিদাবাদের সিংহাসনদানের চেষ্টা করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর সরফরাজ উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর হইতে দিল্লীর দরবারে সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কাজেই মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছা ও চেষ্টাসত্ত্বেও সরফরাজ বাঙ্গালার নবাবী প্রাপ্ত হন নাই। সুজাউদ্দীনের উড়িষ্যায় অবস্থানকালে আলীবর্দ্দি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা হাজী মহম্মদ সুজার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহারা সুজার কোন আত্মীয়ের সন্তান। সুজা উভয় ভ্রাতার পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য্য করিতেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে আলীবর্দ্দীই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহাদেরই পরামর্শক্রমে সুজা দিল্লী-দরবার হইতে সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন।

সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর উড়িষ্যা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে সরফরাজ পিতার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। জগৎশেঠ ফতে-চাঁদ ও অন্যান্য অমাত্যবর্গ তাঁহাকে পিতার বশ্যতাস্বীকারের পরামর্শ দিয়া-ছিলেন। সরফরাজ যদি সেই পরামর্শানুসারে কার্য্য না করিতেন তাহা হইলে পিতাপুত্রের গৃহবিবাদে বাঙ্গালায় এক অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। ফতে-চাঁদ প্রভৃতি এ বিষয়ে যে সৎপরামর্শই দিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুজাউদ্দীন পুত্রের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিলেন, এবং রায় আলমচাঁদ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই রায় আলমচাঁদ পরে রায়রাঁইয়া উপাধি পাইয়া

রাজস্ব বিষয়ে প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত হন। যাহাতে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য সুজাউদ্দীন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত করিলেন। হাজী আহম্মদ, আলীবর্দ্দী খাঁ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও রায়রাঁইয়া আলমচাঁদ ইহার সভ্য নিযুক্ত হইলেন। নবাব তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিলেন। হাজী আহম্মদ সাধারণতঃ উজীরের কার্য্য করিতেন। আলীবর্দ্দীর প্রতি যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ভার ছিল, আর রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যই রায়রাঁইয়া ও জগৎশেঠ করিতেন। আলমচাঁদই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্ববিষয়ে প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। আলমচাঁদেব পূর্ব্বে এ বিষয়ের কোন পৃথক্ পদ ছিল না। ইহার পূর্ব্বে কোন কোন কর্ম্মচারী রাজস্ব বিষয়েরও কার্য্য করিতেন, কিন্তু এই সময় হইতে উক্ত স্বতন্ত্র পদের সৃষ্টি হয়; কোম্পানীর সময় পর্য্যন্ত এই স্বতন্ত্র পদটি প্রচলিত ছিল। রাজস্বসচিব বা দেওয়ানেরা প্রায় সকলেই রায়রাঁইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহাবাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। জগৎশেঠ পূর্ব্বের ন্যায় পেস্কারের কার্য্য করিতেন। জমীদারেরা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের দ্বারা নবাব দরবারে রাজস্ব দাখিল করিতেন, এবং তাঁহারাই প্রধান কোষাধ্যক্ষের কার্য্যও করিতেন। সরকারী প্রায় সমস্ত টাকাই তাঁহাদের নিকট জমা থাকিত। আবার তাঁহাদের দ্বারাই দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরিত হইত। ফলতঃ রাজস্ববিষয়ে রায়রাঁইয়া ও জগৎশেঠ এই দুই জনই কর্ত্তৃস্বরূপ ছিলেন। রাজস্ববিষয়ে আরও অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন, তন্মধ্যে কাননগোগণই প্রধান, ইঁহাদের নিকট জমা, জমীর কাগজ পত্র, হিসাব, নিকাসাদি সমস্তই থাকিত। সদরে দুইজন কাননগো ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম কাননগোগণ বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই বঙ্গাধিকারিগণ এককালে রাজস্ববিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। মন্ত্রিসভার সভ্যগণের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ পৃথক হইলেও, রাজ্যশাসনসম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কার্য্যই তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া করিতেন, এবং নবাব তাঁহাদের পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিতেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গা-

লার অনেক জমিদারকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারও করিয়াছিল। নবাব মুর্শিদের চেষ্টায় বাঙ্গালার অনেক রাজস্ববৃদ্ধি হয়। নবাব সুজাউদ্দীন যাহাতে রাজস্বের আরও বৃদ্ধি হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি মন্ত্রিসভার বিশে· ষতঃ তাহার রাজস্ব বিভাগের সচিবদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর অনুসৃত পথ হইতে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। সুজাউদ্দীন জমীদার- দিগকে আর কারারুদ্ধ রাখা সঙ্গত মনে না করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং সাধুভাবে তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। জমীদারদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্দ্দোষ ছিলেন, নবাব বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহা- দিগকে অব্যাহতি দিতে আদেশ দিলেন। যাঁহাদিগকে তিনি কথঞ্চিৎ দোষী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগকে সম্মুখে আনাইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন, যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কর প্রদানে আর ত্রুটি না করেন। পরে তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ ভুমির কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে যত্নবান হন, এবং ভবিষ্যতে, তাঁহাদিগকে আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না বলিয়া অভয় প্রদানও করিলেন। নবাব জমীদারদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেরূপ কষ্টভোগ করিয়াছেন, প্রজাদিগকে যেন সেরূপ কষ্ট না দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি জমীদারদিগকে নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে খেলাত প্রদান করিয়া স্বস্ব স্থানে যাইবার জন্য অনু- মতি প্রদান করিলেন। সুজাউদ্দীন জমীদারদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার চরিত্র যে কতদূর উচ্চ ও উদার তাহা বেশ বুঝা যায়, বিশেষতঃ নিরীহ দরিদ্র প্রজাদিগের প্রতি জমীদারদিগকে অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তিনি যে আদর্শ রাজার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উপায়ে জমীদারদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বে কর আদায় করা হইয়াছে জমী- দারেরাও নিরীহ প্রজাদিগের নিকট হইতে ঠিক সেই উপায়েই কর আদায় করি- বেন। বিশেষতঃ নবাবসরকারে যে সমস্ত জমীদারের কর অদত্ত রহিয়াছে

তাঁহারা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্রটি করিবেন না। সেই জন্য তিনি জমীদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন যে, মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবলই অত্যাচারী ছিলেন, ও অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেন, তাঁহাদের এই সমস্ত বিষয়গুলি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

জমীদারদিগের সহিত এইরূপ সুবন্দোবস্ত করায়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় অপেক্ষা সুজাউদ্দীনের সময় রাজস্ববৃদ্ধি হইল, নবাব মুর্শিদকুলী দিল্লীতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাইতেন, সুজাউদ্দীন তাহার স্থলে দেড় কোটি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। জমীদারেরা জগৎশেঠের নিকট স্বীয় স্বীয় দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন, পরে আবার তাঁহার দ্বারা দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরিত হইত। সুজাউদ্দীনের সাধুব্যবহারে প্রীত হইয়া জমীদারেরা প্রাণপণে রাজস্ব প্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালার রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় দিল্লীতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব প্রেরিত হইতে লাগিল।

সুজাউদ্দীন ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিসভার প্রতি প্রায় সমস্ত কার্য্যের ভার নিক্ষেপ করিয়া, নিজে কথঞ্চিৎ বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠেন। ফারাবাগ নামক তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ফারাবাগ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের পর পারে। সুজাউদ্দীনের ন্যায় দয়ালু সুবিচারক উদার নবাব বাঙ্গালার নবাবদিগের মধ্যে দুর্লভ। একমাত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই তাঁহার দোষ ছিল, উক্ত দোষ না থাকিলে, আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। মুর্শিদকুলীর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি বিহার প্রদেশ শাসনের ভার অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু সুজাউদ্দীনের নিকট বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভার অর্পিত হয়। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার সুজাউদ্দীনের প্রতি বিহার শাসনের ভার অর্পিত হইলে, তথায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি পাঠাইবার আবশ্যক হওয়ায়, নবাব মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে তথায় পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দী মন্ত্রিসভার একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ প্রভৃতির তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ জন্মে। ফতেচাঁদ প্রভৃতির পরামর্শানুসারে নবাব

আলিবর্দ্দীকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দীর গমনের পর ফতেচাঁদ প্রভৃতির প্রতি রাজ্যশাসনের ভার আরও গুরুতররূপে নিপতিত হয়।

ফতেচাঁদ মন্ত্রিসভায় থাকিয়া যেরূপ রাজ্যশাসন কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, সেইরূপ তাঁহার নিজের গদীর প্রতি যত্নেরও ত্রুটি ছিল না। রাজ্যশাসনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার গদীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজা, জমীদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারিদের ত কথাই নাই, ব্যবসায়ী, মহাজন, সকলেই পূর্ব্বে যেমন মহিমাপুরের গদী হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিতেন, এখনও সেইরূপ ভাবেই কারবার চলিতে লাগিল। এই সময় ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, ও অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কলিকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগের প্রধান প্রধান স্থান, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সেই সকল স্থানের ব্যবসায়িগণ জগৎশেঠের সহিত কারবারসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, যেমন যেমন সেই সমস্ত স্থানের উন্নতি হইতে লাগিল, জগৎশেঠগণও দিন দিন সেইরূপ ধনকুবের হইয়া উঠিতে লাগিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের এইরূপ উন্নতির সময় ১৭৯৩ অব্দে নবাব সুজাউদ্দীন পরলোক গমন করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সরফরাজ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। যদিও তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে সরফরাজকে জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবার উপদেশ দিয়া যান, কিন্তু তিনি অধিক দিন পিতার সে উপদেশ পালন করেন নাই, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহিত মনোমালিন্য ঘটাতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। আমরা পর অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব।

ঐতিহাসিক সত্য

বা

ইতিহাসের শিক্ষা।

আমেরিকার অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক হিন্দুহৃদয় এমার্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধে ইতিহাসকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উচ্চপদবীতে অধিরূঢ় করিয়া বলিতেছেন—বিশ্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষের সহিত লীলাময়ী প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ই ইতিহাসের লক্ষ্য। পরিবর্ত্ত ও বিবর্ত্তই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বিচিত্র বিধান। মনুষ্যের অতীত সাক্ষী ইতিহাস একবাক্যে নির্ব্বিবাদে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ করিতেছে। অভিব্যক্তিবাদিগণ বলিতেছেন, মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের উত্তরোত্তর উন্নতিই ইতিহাসের উচ্চ লক্ষ্য। তাঁহারা পুরাবৃত্তোল্লিখিত কালের পারম্পর্য্য ও পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক স্পেন্সার প্রদর্শিত প্রলোভনীয় পার্থিব স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর উন্নতির আশা করিতেছেন। তাঁহাদের মতে পরিবর্ত্তের অনন্ত আবর্ত্তেই পুরাবৃত্তের পরিপুষ্টি। জীবসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মনুষ্যের উন্নতির অভিব্যক্তি কোথায় পূর্ণচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, ইতিহাস তাহা বলিতে অসমর্থ। তবে ইতিহাস সর্ব্বদর্শী সিদ্ধযোগীর ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই নীরব ভাষায় এই কথা ঘোষণা করিতেছে যে, অনন্ত উন্নতিই মানব জাতির নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি। হাক্সলী এবং হেল্মহোল্ৎজের ন্যায় প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক বুধগণ বিশ্ববিধান (Cosmic process) বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন, জড়জগতে বা মনুষ্যেতর জীবজগতে পরিবর্ত্তের আবর্ত্ত বা বিবর্ত্তের স্রোতঃ সর্ব্বদা উন্নতির উচ্চ সোপানে অগ্রসর নহে। নীহারিকাবাদিগণের মতে নীলাম্বরলম্বিনী তারাতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর দুগ্ধাবর্ত্তে বা ছায়াপথে পুঞ্জীভূত

ফেনায়মান বিশ্ববাম্পে সৃষ্টি বুদ্বুদের আবির্ভাব হইলেও এখনও সেই অজ্ঞেয় তত্ত্ব পরিছিন্ন মনুষ্যবুদ্ধির অজ্ঞাত রহিয়াছে। সুতরাং অল্পশ্রুত আমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিতে পারি মানবজাতির উন্নতির ভিত্তিশিলাই কেবল পরিবর্ত্ত ও বিবর্ত্তে নিহিত।

বৈজ্ঞানিক মতে জড় জীবের জ্যেষ্ঠ। ইতঃপূর্ব্বে প্রতীচ্য বিজ্ঞানে জড় ও জীবের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীরেখায় সীমাবদ্ধ ছিল। ভগবদ্ভক্ত বিশ্বপ্রাণ আর্য্য-ঋষি অলৌকিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রাণ প্রবাহের মধুরলীলা দেখিতে পাইতেন। বঙ্গের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় "প্রাণের পরিধি" প্রসারিত করিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। জড়ের ব্যাপ্তি মন্দীভূত হইতেছে। প্রাণ পরিধির স্পর্শরেখা এক্ষণে কোথায় বিশ্রামলাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে। যাহা হউক তথা কথিত জড়জগতে পরিবর্ত্ত প্রবাহের বিরাম নাই। অদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গে, সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গে, অটবীর অভ্যন্তরে, বসুন্ধরার স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তের প্রবাল প্রবাহ প্রধাবিত। পঞ্চভূতের বিরাট্ তাণ্ডবে পৃথিবী প্রকম্পিত। বিজ্ঞান পঞ্চভূতকে পঞ্চদশ গুণ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন—কিন্তু ভৌতিক বিপ্লব ব্যাহত করিতে কাহারও সাধ্য আছে কি? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহপূর্ণ দুর্ভেদ্য অরণ্যানী ভূস্তরে প্রোথিত থাকিয়া যুগ যুগান্তের পরে পুঞ্জীভূত প্রস্তরাঙ্গারে পরিণত হইতেছে, তরঙ্গচঞ্চল ফেনায়মান নীরনিধির মধ্যস্থলে দেখিতে দেখিতে কাননকুন্তলা বসুধার মনোমোহন দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে, সহস্র সহস্র সুবর্ণ সৌধমালিনী স্বর্ণ লঙ্কার সমৃদ্ধ রাজধানী অকস্মাৎ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে, অগ্নি শৈলের উন্মত্ত ক্রীড়ার অগ্ন্যুদ্গমে কত লোকসঙ্কুল নগরসমূহ প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, মহাসমুদ্রের ভৈরব উচ্ছ্বাসে শত শত বিলাসবৈভব সমৃদ্ধনগরভূষিত নাগজাতির লীলানিকেতন পাতাল ভবনের (আমেরিকার) প্রাচীনতন সভ্যতা বিনাশের সহিত বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মহাভূতের কোন বিকার আছে কি? সমুদ্র ও পর্ব্বত, পাবক ও পবন অক্ষুণ্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

সপ্তপাতালের অন্যতম অতল সমীপবর্ত্তিনী অতলান্তিকা (আটলান্টি[illegible]

লোক ভয়ঙ্কর প্রলয়প্লাবনে সহস্র সহস্র সৌধ সমাকীর্ণা মন্দিরমালামণ্ডিতা মৃগ, পক্ষী মনুষ্যাধ্যুষিতা মহীরাবণের মহীয়সী রাজধানীকে অতলস্পর্শ লবণ জলধির কুক্ষিগত করিয়াছিল—আজিও সেই অতলান্তিকা "আটলান্টিক" নামে পরিচিত হইলেও তাহার পূর্ব্ব গৌরব সমভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—আজিও তাহার পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাজী ফেনায়মান অট্টহাস্যে মনুষ্যের ক্ষণস্থায়িনী সভ্যতাকে উপহাস করিয়া কল্লোল কোলাহলের উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে—মনুষ্য তোমার বাহ্য বিজ্ঞান বৈভবসমৃদ্ধ প্রভাবের গৌরব করিও না। আমি ইচ্ছা করিলে তোমার লীলা নিকেতন বাস ভবনকে মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রাস করিতে পারি।"

শুভ্রাভ্রমণ্ডিত সমুচ্ছ্রিতশিরঃ পর্ব্বত অভ্রভঙ্গে বলিতেছে, "মনুষ্য তুমি ভক্তিভূমি ভারতবর্ষে অগস্ত্যের দ্বারা গুরুভক্ত বিন্ধ্যকে অবনত করিয়াছ—গোত্রভিদের বজ্রাঘাতে পর্ব্বতপক্ষ ছিন্ন করিয়াছ। হিমাদ্রিনন্দন মৈনাক অপমান ভয়ে অম্ভোনিধির শরণাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কর্কটাচলের মর্ম্ম বেদনার উষ্ণ-নিঃশ্বাসে যে ভৈরব অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল তাহাতে কুমধ্য সান্নিধ্যে অবস্থিত রাবণ রাজধানী স্বর্ণলঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য লবণাম্বুরাশির কুক্ষিগত হইয়াছে—তদবধি আজিও যবদ্বীপে রাবণাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গে উষ্ণনিঃশ্বাস নিবৃত্ত হইল না। সেই চির প্রজ্জ্বলিত রাবণের চিতানলে যে, কি অভিনব কাণ্ড সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ভীষণ বিসুবিয়সের উষ্ণশ্বাসে ইটালীবাসী শঙ্কিত হইতেছে। ভূধর চঞ্চল হইলে বসুন্ধরা বিচলিতা হইবেন। তখন তুমি বিজ্ঞানের বিপুল বৈভবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।" পাবক ও পবনের ভৈরব-ক্রীড়া কে নিবারণ করিতে পারে? সৃষ্টির প্রথম হইতে তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছে। সেই বিশ্ববিধান বা নিয়তির কোন পরিবর্ত্ত নাই। সেই সনাতন সত্যধর্ম্ম শৈলযুগ হইতে সভ্যতার সুবর্ণযুগ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই সমভাবে বিদ্যমান। ভূতসাক্ষী ইতিহাস সেই পুরাতন তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। জড় জগতের উন্নতি কিম্বা অবনতি নাই। অব্যক্ত জড় সৃষ্টি বিশ্ববিধানের অপূর্ব্ব নিয়মে, নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের অদ্ভুত কৌশলে মনুষ্যে অভিব্যক্ত হইতেছে। সর্ব্বত্রই প্রাণসমুদ্রের লীলাতরঙ্গ। জড়ই ক্রমবিকাশের

সোপানমালায় জীবের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। রেণুকণা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রাণের প্রকাশ পরিলক্ষিত। জড় জগতে বিশ্ববিধানের কোন ব্যভিচার নাই। অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডিত নিরভ্র নীলাম্বরনিভ রঙ্গালয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ কত কোটিকল্প কল্পান্ত হইতে লীলা করিতেছেন। কিন্তু সেই লীলারঙ্গে কোন তালভঙ্গ নাই। পৃথিবীও সেই সনাতন বিশ্ববিধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনন্ত অন্তরীক্ষে স্বীয় গণ্ডীবদ্ধ কক্ষায় কত কল্পকোটি কাল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাহা মনুষ্য অজ্ঞাত। সৌদামিনী সীমন্তিনী কাদম্বিনী চিরদিনই প্রেমের তরঙ্গে শৈলশৃঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে। এক দিন কল্পনাকৌতুকী আদি কবি সরোবরবিলাসিনী শতদলশোভিনী কমলিনীর সহিত দিনমণির বিবাহ দিয়াছিলেন,—চিরবিরহিণী কমলিনীর দুঃখে ভ্রমর গুঞ্জরণ আজিও নিবৃত্ত হইল না। জড় প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিশ্ববিধান বা নিয়তির ঐক্য বিরাজমান। নববসন্তের প্রাথমিক উৎসবে চ্যুতাঙ্কুরাস্বাদে কষায়কণ্ঠ পুংস্কোকিলের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কুহুধ্বনিতে বা নৈদাঘ নিশীথে সন্তপ্তহৃদয় পাপিয়ার বিলাপসঙ্গীতে কোন তালভঙ্গ বা স্বরবিকৃতি নাই। জীবজগতেও বিশ্ববিধানের চিরন্তনী রীতি বিদ্যমান। আর্য্য ঋষির তপোবনেই কেবল প্রকৃতির গতি পরাহত হইত। কিন্তু নিসর্গের উদ্যানে ভেক ভুজঙ্গ, অহি নকুল অথবা শশ শার্দ্দূলের স্বভাববৈরতার কোন পরিবর্ত্তই দৃষ্টি গোচর হয় না। নব শৈলযুগে বন্য হরিণ কিম্বা গুহা ভল্লূকের যে প্রকৃতি ছিল, যুগযুগান্ত পরে আজিও তাহাদের সেই প্রকৃতিই বিদ্যমান আছে। সহস্র শতাব্দীর পবিবর্ত্ত ও নৈসর্গিক বিপ্লবের ভয়াবহ আবর্ত্তেও বন্য হরিণের প্রকৃতিতে কোন বিকাশ অভিব্যক্ত বা বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হয় নাই। মৎস্য কূর্ম্ম আদিযুগেও সে লীলা করিয়াছিল তাহাদের অযুততম অধস্তন বংশধর আজিও সেই প্রাচীন লীলার ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছে। মনুষ্যের স্থূল চক্ষুতে তাহার কোন পরিবর্ত্ত নাই। জীবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে তাহার মুক্তাবিনিন্দিশিশিরমণ্ডিত দূর্ব্বাদল উন্নতশীর্ষ বংশদণ্ডের উদ্ভিজ্জীবনের বিকাশ শৃঙ্খলায় প্রাথমিক প্ররোহ হইলেও নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের কি

অদ্ভুত অজ্ঞেয় কৌশলে আজি উচ্চ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের সৃষ্টিকল্পনা প্রতিভার অদ্ভুত পরিচায়ক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরীক্ষায় তাহার কতদূর প্রতিপত্তি তাহা ভবিষ্যমাণ জীবতত্ত্বজ্ঞ বুধগণের দ্বারা নির্ণীত হইবে। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে "ঘাস এবং বাঁশ" চিরদিনই স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। কে সেই বিস্তীর্ণ ব্যবধানের পরিমাণ করিবে। পরিণতিও অভিব্যক্তির নিয়মাবলী, বিশ্বসৃষ্টির ঐক্যরহস্যের মূলমন্ত্র হইলেও বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, ভেক, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবজগতে তাহার কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। যুগযুগান্তে জড় ও জীবের যে যৎসামান্য পরিবর্ত্ত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, মনুষ্যের উন্নতির সহিত তাহার কোন মুখ্য সম্পর্ক নাই। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তৎসমন্ধে কোন কথা বলিব না।

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্ত ও বিবর্ত্তের অনন্ত আবর্ত্তে মনুষ্যের উন্নতির উচ্চসীমা কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা-লোকিত মনুষ্য সেই জ্ঞানসমৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ পুরাতত্ত্বের নিকট কি শিক্ষালাভ করিতে পারে। (ক্রমশঃ—)

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

রণজিৎসিংহ ও ইংরাজ

(৩)

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহিত রণজিতের প্রথম সাক্ষাতের সময় কোনই কার্য্যাদি হয় নাই বটে—কিন্তু এই সাক্ষাতের প্রচুর ফল হইয়াছিল। ইংরাজের নিকট তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই এই বিশ্বাস লইয়া রণজিৎ লাহোরে প্রত্যা-বৃত্ত হইলেন এবং ইহাও বুঝিলেন যে ইংরাজের সৈন্যবল বিশেষতঃ কামান ইত্যাদি—স্বকীয় সৈন্যবল অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের

নেতাগণ ইহা বুঝিলেন যে যদি কোন দিন এই মহারাজার অহঙ্কারদৃপ্ত সৈন্যগণ অদম্য ইংরাজ সিপাহীর সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হয় তাহা হইলে বেশ কিছুদিন যুদ্ধ চলিবে।

এই সাক্ষাতের ফলে সিন্ধুদেশে মহারাজের হস্তক্ষেপের পূর্ব্বেই ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন গবর্ণর জেনারেল ইহাই স্থির করিলেন। ইংরাজের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস ছিল যে সিন্ধুনদে ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা আছে কিন্তু এপর্য্যন্ত সে ব্যবসায়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। রণজিৎ সিন্ধুদেশ সুরক্ষিত নহে জানিয়া উহার রক্ষক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বুঝিলেন যে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করিতে আর অধিক বিলম্ব করা চলিবে না।

মহারাজকে শঙ্কিত না করিয়া কিরূপে সিন্ধুদেশ পরিদর্শন ও তত্রস্থ আমীর গণের সহিত ব্যবসায় খুলিতে পারা যায় এই সমস্যা অতি সহজেই পূরণ হইল। বম্বে হইতে একজন কর্ম্মচারীর সহিত সিন্ধুনদের পথ দিয়া রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নিকট হইতে উপঢৌকনস্বরূপ অনেকগুলি বিলাতী গাড়ীর ঘোড়া পঞ্জাবরাজের নিকট প্রেরিত হইল।

রণজিৎ অশিক্ষিত হইলেও তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই তিনি অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয়কেই ভাল করিয়া জানিতেন। ইংরাজের এই ব্যবস্থা তাঁহার চক্ষে ধূলি দিতে পারে নাই। তিনি স্বয়ং যেরূপ ছিলেন অপরকেও সেই রূপ দেখিতেন। "কোম্পানি" শব্দে তিনি কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আপনাদিগের উপকারার্থ দলবদ্ধ হইয়া ভারতে আসিয়াছেন এইরূপই বুঝিতেন। এক জন ব্যক্তিই হউক কি কোম্পানিই হউক তাঁহার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উভয়েরই স্বার্থ-সিদ্ধি একমাত্র উদ্দেশ্য। নৈতিক বন্ধন কিম্বা আদর্শ এ সকল তাঁহার চিন্তাধিগম্য ছিল না। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি কোন্ এক ফরাসি সেনাপতি কর্ত্তৃক যাহার নাম তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন—ভারত আক্রমণ আশঙ্কা রটাইয়া কিরূপে তাঁহার নিকট একটি প্রদেশ লইয়াছেন তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল। এখনও তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে কতকগুলি আমীন ও সুচতুর কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে

এই উপঢৌকন প্রেরণ একটি ব্যবসায় বিষয়ক সন্ধি ও আনুসঙ্গিক সিন্ধুদেশাধিকারের সূত্রপাত মাত্র। তাঁহার ন্যায় ইংরাজকেও এই সুচতুর প্রথায় কার্য্য করিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাতে বাধা দিতে অপারগ হওয়ায়—ঐ অবস্থা হইতে নিজের যতটুকু সুবিধা সম্ভব করিয়া লইলেন; কয়েক বৎসর পরে আফগান যুদ্ধে মত দেওয়ার ও পরে তাহাতে যোগদান করারও তাঁহার ঐরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

তৎকালীন রাজনৈতিকগণ গবর্ণর জেনারেলকে লুধিয়ানার পেন্সেনভোগীর পৃষ্ঠপোষক হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রধান নায়ক করিয়া তুলিলেন। রণজিৎসিংহও ক্রমশঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ যুদ্ধে যোগ দিলেন। তবে তিনি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধে ইংরাজের প্রচুর ক্ষতি ও এমন কি ইংরাজের পরাজয় পর্য্যন্ত হইতে পারে। তিনি স্বয়ং অনেক দিন হইতে আফগানিস্থানের দিকে আপনার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশোয়ার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন এবং তৎকাল হইতে একরূপ অনিশ্চিতভাবে ঐ উপত্যকা অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে পঞ্জাবসমস্ত হইতে একটি মাত্র নদী পার হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিতে যদি বহু অর্থ ও সেনার আবশ্যক হয় তাহা হইলে সমস্ত পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া ৫০ ক্রোশ গিরিসঙ্কুল স্থানের ভিতর দিয়া উদ্দিষ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে ব্রিটিশদিগের সমস্ত সৈন্য ও সম্ভবতঃ তাহাদিগের সাম্রাজ্যেরও অবসান হইতে পারে। এই রূপ চিন্তার ফলে তিনি জানিলেন যে যেরূপ ফলই হউক না কেন তাঁহার সহায় ইংরাজ অবশেষে ক্ষতিগ্রস্থ ও তিনি স্বয়ং লাভবান্ হইবেন। রণজিৎ ইংরাজের সহায়স্বরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে আপনার কুঙ্কুমসিক্ত হস্তচিহ্ন দিলেন! ইহাতে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে অর্থ ব্যয়াদির জন্য ইংরাজ দায়ী ও ইংরাজের আশ্রিত শা শুজা ও সহায় রণজিৎ ইহার সুফলভোগী হইবেন।

সৈন্যদিগের আফগান যাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে ফিরোজপুরে গবর্ণর জেনারেল তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ও সহায় রণজিৎকে অভ্যর্থনা করেন, তদুপলক্ষে

এক মহোৎসব হয়। ওরূপে সুসজ্জিতইংরাজসেনাপরিবৃত লর্ড অকলাণ্ডের সহিত পঞ্জাববিজয়ী সেনাসমূহের নায়ক রণজিতের সাক্ষাত ও আনুসঙ্গিক আনন্দের আড়ম্বর একটি যুদ্ধ বিজয়ের পর শোভা পাইত বটে কিন্তু একটি অজ্ঞাত পার্ব্বত্য প্রদেশে দুঃসাহসিকের ন্যায় যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে ইহা দৃষ্টিকটু হইয়াছিল।

লর্ড অকল্যাণ্ড মনে ভাবিয়াছিলেন যে ফিরোজপুরে যেরূপ প্রচুর আহারের সংস্থান, অল্লায়াসে যানাদিলাভ ও উজ্জ্বল তপনচ্ছটা পাইলেন সেই রূপ কাবুলের সম্রাটকে পুনঃরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পথিমধ্যে সমস্ত স্থানেই পাইবেন।

এই রূপে সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ে আনন্দ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিল। গবর্ণর জেনারেলও শা শুজাকে সিংহাসনে নিশ্চিত বসাইবেন জানিয়া অনুচর বর্গসহ লাহোরে যাইয়া মহারাজের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং পানকালে তাঁহাদিগের বিজয়সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিলেন। রণজিৎ যুদ্ধ, শীকার কিম্বা অর্থপেষণ ক্রিয়ায় ব্যস্ত না থাকিলে প্রায়ই আনন্দে মত্ত থাকিতেন। এই সময়ে তাহার সান্ধ্যসভা উল্লেখ যোগ্য। উহাতে সুরার যথেচ্ছ ব্যবহার হইত, এবং কিছুক্ষণ পরে মহারাজ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ও নর্ত্তকীগণ সকলেই পশুত্বে পরিণতি লাভ করিত। ঐ সময়ে মহারাজ যাহাকে অধিক সম্মানিত করিতে ইচ্ছুক হইতেন তাহার মুখে স্বহস্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মদিরায় মুক্তাচূর্ণ দিয়া ধরিতেন। এ দিবস মহারাজ গবর্ণর জেনারেলকে ঐ সম্মানে সম্মানিত করিলেন। লর্ড অকলাণ্ড উহা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা নাই বটে, তবে গমনকালে তাঁহাদের বিদায় গ্রহণ একটি ইতিহাসের উল্লিখিত ঘটনা। রণজিৎ সুরোন্মত্ত হইয়া একটি কৌচের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই এবং গবর্ণর জেনারেল তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, এ দৃশ্য বড় মন্দ হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীবোবিসত্ত্ব সেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুস-জাপানের যুদ্ধ—রুস-জাপান যুদ্ধ কখনও মন্দীভূত কখনও বা প্রজ্জ্বলিতভাবে আজিও সুদূর প্রাচ্যে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। সাহুর যুদ্ধের পর মুকডেনের নিকট একটি ভয়ানক যুদ্ধ হইবে বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতেছে। এই যুদ্ধের উপর এই ভয়াবহ সমরের অনেক বিষয় নির্ভর করিতেছে। ক্রমাগত পরাজিত হইয়া রুস-ভল্লুক আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। জাপানকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাহার সমস্ত চেষ্টা সমবেত করিতে ভল্লুক প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এখনও জাপানের পাশ্চাতে থাকিয়া তাহাকে অভয়-বাণী প্রদান করিতেছেন! মুকডেনের নিকট যাহাই হউক আর্থার বন্দরের অবস্থা অতি শোচনীয়। বীরবর ষ্টসেল আর তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না। রুসবীরগণ ক্রমে ক্রমে ধরাশায়ী হইতেছে। তথাপি তাহারা অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু বলদৃপ্ত জাপান আর্থার বন্দর হস্তগত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহাতে আর্থার বন্দরের পতন অনিবার্য্য। ষ্টসেলের শত চেষ্টা জাপানের মহাশক্তির প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। অল্পদিনের মধ্যে আর্থার বন্দরে যে জাপানের বিজয় নিশান উত্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত পৃথিবী সেই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। আর্থার বন্দরের পতন হইলে মুকডেনের নিকট আবার আর এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন হইবে। জাপান ও রুসিয়া উভয়েই তথন বদ্ধ-পরিকর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করার জন্য প্রয়াস পাইবে। সকলেই সেই যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এ দিকে বল্টিক-বাহিনীও ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহার পঁহুছিবার পর্ব্বে আর্থার বন্দরের পতন

হইলে তাহার আগমন অনাবশ্যক হইয়া উঠিবে। উত্তর সমুদ্রের সেই মৎস্য-তরী নিমজ্জন ব্যাপারের অনুসন্ধান সমানভাবে চলিতেছে। কমিশনে তাহার রহস্যভেদ হওয়ার চেষ্টা হইতেছে। পৃথিবীর সকল জাতি এই অনুসন্ধানের ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল—সাহিত্য পরিষদের গত ২৫শে অগ্রহায়ণের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। আমরা বলিয়াছিলাম যে, শঙ্করাচার্য্যের অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভাব সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা অকাট্য নহে। স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ এই মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মঠচতুষ্টয়ের গুরু পরম্পরার তালিকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বারকার শারদামঠের তালিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টের জন্মের ৪৬৯ অব্দ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যান্য মঠের তালিকায়ও তিনি খৃষ্ট জন্মের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। আমরা বঙ্গে আগত দ্বারকার মঠাধিপ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট তাঁহাদের মঠের গুরু পরম্পরার তালিকা দেখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ উক্ত মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং জগদ্‌গুরুর প্রদর্শিত তালিকা কিছু নহে বলিয়া উড়াইয়া দেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থে শঙ্করের সমসাময়িক মণ্ডণ মিশ্রের উল্লেখ আছে। অতএব শঙ্কর ৭৮৮ হইতে ৮১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হীরেন্দ্র বাবু পুনরায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুরী মঠের শঙ্করাচার্য্যের নিকট শঙ্করের খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে আবির্ভূত হওয়ার কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুরেশ্বরাচার্য্যকে সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন বলায়, সেই সহস্র বৎসর বাদ দিলে শঙ্করের অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভাবই স্থির হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও আপনাকে শঙ্করের খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হওয়ার পক্ষপাতী বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি

বলেন কেবল গুরু পরম্পরাকেই আশ্রয় করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য গুরু-তর প্রমাণ চাই। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছিলাম। এই গুরু পরম্পরার সহিত নেপালের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রণীত পার্ব্ব-তীয় বংশাবলী গ্রন্থেরও ঐক্য আছে। তাহাতে যে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের নেপাল গমনের কথা আছে, তাহার সহিত দ্বারকামঠের গুরু পরম্পরা লিখিত সময়ের ঐক্য হয়। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দেশের যে সমস্ত জ্বলন্ত প্রমাণ থাকিবে, তাহা উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহোদয়েরা যাহা বলিবেন, অথবা তাঁহাদের রুচিকর আমাদের দেশের প্রচলিত প্রমাণ গুলিকে মানিয়া লইতে হইবে, ইহার যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধর্ম্ম-কার্ত্তির গ্রন্থের দোহাই দিয়া জগদ্‌গুরুর প্রদর্শিত তালিকাকে কিছুই নয় বলিয়া যে উড়াইতে চাহেন ইহা তাঁহার অতি সাহস বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। সংসারত্যাগী দণ্ডী, সন্ন্যাসীর রক্ষিত প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইতে বিদ্যাভূষণ মহা-শয় অনায়াসে পারেন, কিন্তু সকলের সেরূপ সাহস হয় না। হীরেন্দ্র বাবু যে সুরেশ্বরাচার্য্যের সহস্র বৎসরের অবস্থিতির কথা বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তর আমরা সাহিত্যে পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তাহা অনাবশ্যক মনে করি-তেছি। হীরেন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, কিন্তু তাহার প্রিয় থিওসফি সম্প্রদায়ের নেত্রী মাদাম ব্লাভাট্স্কি শঙ্করকে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে আবির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ অকাট্য নাই হউক, কিন্তু ফুৎকারে উড়াইবার নহে।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

কার্ত্তিকের ভারতীতে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখিত আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসে বিক্রমপুর সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণ্ণশচন্দ্র রায় স্বদেশী সমাজ ব্যাধি ও চিকিৎসার পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রামায়ণের রচনাকালের সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার আরঙ্গজীবের আদি লীলা প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর বিজয়নগরের ইতিবৃত্তে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কল্যানী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি পৌররাতত্ত্বিক কাহিনী।

কার্ত্তিকের বান্ধবে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসগুপ্ত আদিম চট্টগ্রাম প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন।

কার্ত্তিকের বঙ্গভাষায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুর লিখিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রবন্ধে মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

কার্ত্তিকের উপাসনায় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী নামক প্রবন্ধে তাৎকালিক বঙ্গদেশের ধর্ম্ম, রাজনীতি, বাণিজ্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইংরেজী।

সেপ্টেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পত্রে ভিন্‌সেণ্টস্মিথ সাহেব বুন্দেলখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত বাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

ডিসেম্বর মাসের ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রে রেভারেণ্ড হল মদুরা মিসনের জেসুইট পাদরী রবার্ট-ডি নবিলি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র দের লিখিত বেঙ্গল অণ্ডার দি ইংলিশ প্রবন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা অছে।

নবেম্বর মাসের রিভিউ-অব্ রিভিউ পত্রে

কানেডার গবর্ণর জেনেরাল আরল গ্রে-র চরিত্র সমালোচনা করা হইয়াছে। কোন প্রবন্ধে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার বর্ত্তমান গোলোযোগ বিষয়েরও আলোচনা করা হইয়াছে।

ডিসেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান এডুকেশন পত্রে নোটেবল হাউসেস ইন্ ইণ্ডিয়া প্রবন্ধে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে যে বাটিতে ছিলেন, তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মীরকাশিম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জেনেরাল সার জন গর্ডনের লিখিত দি শিখস্ নামে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে শিখদিগের বিবরণ আছে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ইণ্ডিয়া ইন্ দি ভিক্টোরিয়ান এজ্ নামে এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে ভারত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ই, বি হোভেনএর এহ্যাণ্ড বুক্ টু আগরা এণ্ড দি টাজ নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা;

৯১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,—ত্রিদিব প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
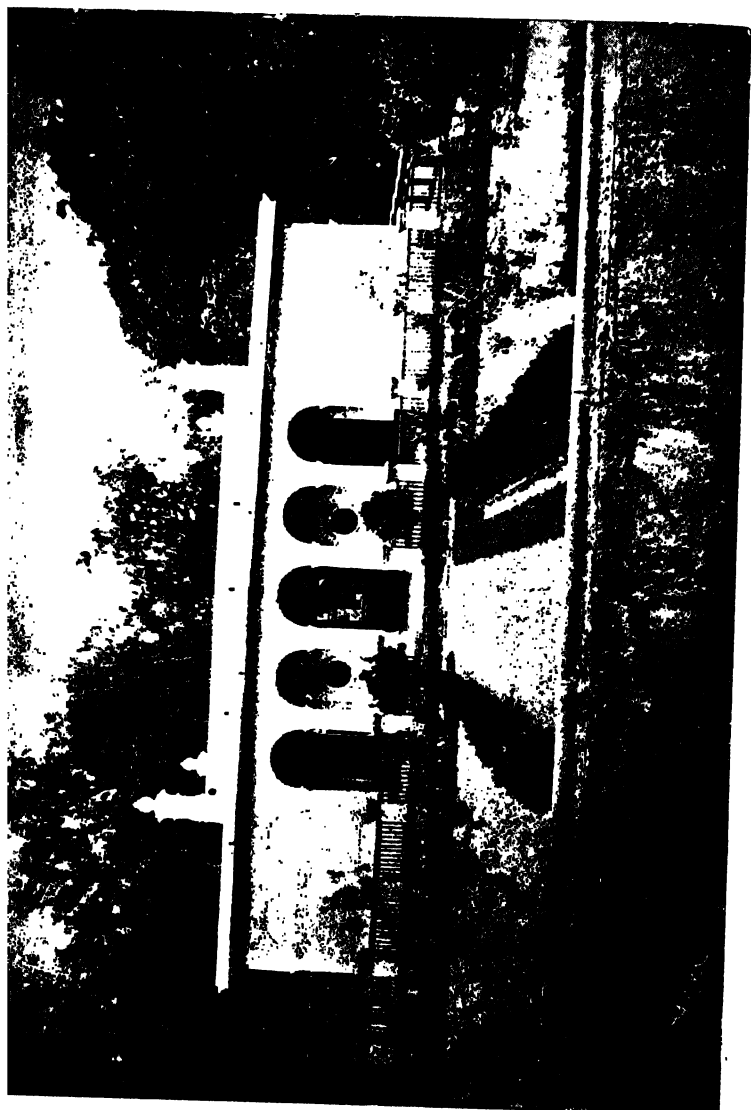
রাণী দুর্গাবতী।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারত-অদৃষ্টের পরীক্ষা-স্থল পাণিপথ-ক্ষেত্রে পাঠান-নিশান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলে, মোগলের বিজয়-বার্ত্তা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দিল্লীর পাঠানত্যক্ত রাজসিংহাসন মোগলের অঙ্গস্পর্শে এক অপূর্ব্ব গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মোগলবিতাড়িত পাঠানগণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় অন্বেষণে ধাবমান হয়, তাহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত স্বাধীন হিন্দু ও পাঠান রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মোগলের বিজয়িনী শক্তির বিস্তার প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এইরূপ সংঘর্ষে অতিবাহিত হইয়া যায়। রাজপুত-বীর সংগ্রামসিংহের অসি-ঝনৎকারে, আফ-গানকুলতিলক সেরসাহের সমর-কৌশলে শান্তিদেবী মোগল শিবির ও প্রাসাদ হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাবরসাহের রণক্লান্তি ও হুমায়ুনের পলায়নকষ্ট মোগল-লক্ষ্মীকে নির্ব্বিবাদে দিল্লীর রাজ-নিকেতনে অবস্থিতি করিতে দেয় নাই। অবশেষে খৃষ্টীয় ১৫৫৬ অব্দে পুনর্ব্বার পাণিপথ-ক্ষেত্রে মোগলের বিজয়-নিশান ভারতাকাশ আলোকিত করিয়া অনুকূল বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইল। পাঠানের যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট শক্তি মন্ত্রমুগ্ধ ফণিনীর ন্যায় বসুন্ধরাবক্ষে শয়িত হইয়া পড়িল। দিল্লীর রাজসিংহাসন আপনার বক্ষ বিস্তার করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবরসাহকে তথায় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিল। এইরূপে পাঠান শক্তিকে অভিভূত করিয়া মোগলের বিশ্বব্যাপিনী শক্তি ভারতে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

পাঠান-শক্তি অভিভূত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহা একেবারে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হয় নাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালা, মালব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে তাহা আপনার স্বাভাবিকী ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকবরসাহের চক্ষু সেই সেই দিকে যে নিপতিত হয় নাই, এমন নহে। ক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা সেই শক্তিকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিল। স্বাধীন পাঠান রাজ্যের ন্যায় সে সময়ে ভারতের কোন কোন স্থানে হিন্দুরাজ্যও অবস্থিত ছিল। রাজপুতানার ইতিবৃত্তের কথা কে না অবগত আছে? তদ্ভিন্ন ভারতের কোন কোন হিন্দুরাজ্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিল। রক্ত-পিপাসু দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্যের পদতাড়নায় সেই সকল স্থান কখনও বিদলিত হয় নাই, তাহাদিগের রণহুঙ্কারে সেই সেই স্থানের শান্তপল্লীবাসিগণের কর্ণ কখনও বধিরীকৃত হয় নাই, এবং তাহাদের দেহ পাঠানের শাণিত কৃপাণের পিপাসা মিটাইয়া কখনও ধরিত্রীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। দিগ্বিজয়ী পাঠান সম্রাটগণের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া তাহারা স্বাধীন হিন্দুনরপতিগণের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। কিন্তু আকবরসাহের দূরদৃষ্টি হইতে তাহারা নিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

এই সকল রাজ্যের মধ্যে বিন্ধ্যাচলের পাদসংলগ্ন গোঁড়ওয়ানা রাজ্য অন্যতম। পূর্ব্বে ঝারখণ্ড বা ছোটনাগপুরের রতনপুর, পশ্চিমে মালবের রাইসিন, উত্তরে পান্না ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত সার্দ্ধশত ক্রোশ দীর্ঘ ও অশীতি ক্রোশ প্রস্থ * প্রদেশ বহুকাল হইতে শান্তি ও স্বাধীনতার লীলাভূমিরূপে বিরাজ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা নর্ম্মদার স্বচ্ছসলিলরাশির

* গোঁড়ওয়ানার চতুঃসীমাসম্বন্ধে মুসলমান লেখকগণের উক্তির কিছু কিছু ইতর বিশেষ আছে। আমরা উপরে আবুল ফজেলের আকবরনামার বর্ণনা প্রদান করিলাম। ডৌ সাহেবের অনূদিত ফেরিস্তায় "lying between the provinces of Rintimpore, Malava, Behar and the Deccan লিখিত আছে। ফৈজি সারহিন্দির আকবরনামায় লিখিত আছে "It is bordered on one side by Malwa and the Dakhin, on another by Garhi." ফেরিস্তায় প্রস্থে ৫০ ক্রোশ লিখিত আছে।

দ্বারা প্রক্ষালিত হইয়া এই অরণ্যপর্ব্বতসঙ্কুল রাজ্য প্রকৃতির রম্য নিকেতন হইয়া উঠে। প্রকৃতির অঙ্কশিশু অশিক্ষিত গোঁড়গণ ইহার বনে পর্ব্বতে আবাস স্থান স্থাপন করিয়া আহার বিহারে সময় যাপন করিত। ক্রমে ক্রমে ইহাদের দ্বারা গ্রাম দুর্গাদিও গঠিত হইতে আরব্ধ হয়, ও তাহাদের কোন কোন দলপতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপনে চেষ্টা করিতে থাকে। এই বিস্তৃত প্রদেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু রাজা উপস্থিত হইয়া গোঁড়গণের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনারা তাহাদের নরপতি হইয়া উঠেন। এই রূপে বিশাল গোঁড়ওয়ানা কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মোগলরাজত্বকালে এই বিস্তৃত প্রদেশে প্রায় ৭০ হাজার গ্রাম ও অনেক দুর্ভেদ্য দুর্গ বিদ্যমান ছিল।

এই গোঁড়ওয়ানা প্রদেশ গঢ়াকটক * বা গঢ়ামন্দলা নামেও অভিহিত হইত। ইহার প্রাচীন নগর গঢ়া ও কটক হইতে সমস্ত রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। † ক্রমে ক্রমে ইহার অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কোন কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির অধীন হইয়া পড়ে। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে খরজী নামে একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি গঢ়াকটকের অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। খরজীর পুত্র গোরক্ষদাসও অত্যন্ত বীর্য্যশালী ছিলেন। তিনি গঢ়াকটকের অনেক রাজাকে স্বীয় বশে আনয়ন করেন। গোরক্ষদাসের পুত্র সুখনদাস পিতার পথানুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে অনেক রাজপুত অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। তাঁহার পুত্র অর্জ্জুনদাস ৪০ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করেন। অর্জ্জুনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ আমনদাস। এই আমনদাস এক দিকে যেমন

* আকবরনামায় কটকের পরিবর্তে কটঙ্ক আছে। আকবর নামার মতে গঢ়া ও কটঙ্ক এই দুই স্থান হইতে রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। ফেরিস্তায় গঢ়া বা কটক লিখিত আছে। মন্দলাও একটি নগরের নাম।

† গঢ়া সম্বন্ধে Imperial Gazetteerএর এইরূপ লিখিত আছে, "Garha—Ancient town in Jubbalpur District, Central Provinces."

পরাক্রমশালী অন্য দিকে তেমনই দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। ইনি পিতার সহিত যারপরনাই অসদ্ব্যবহার করিতেন। অর্জ্জুন দাস তজ্জন্য পুত্রকে অনেকবার কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই দুর্বিনীত পুত্র অবশেষে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পান্নারাজ নরসিংহদেবের আশ্রয় গ্রহণ করে।

নরসিংহদেব শরণাগত আমনদাসকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। এক সময়ে তিনি সুল্‌তান সেকেন্দর লোদীর আহ্বানে দিল্লী গমন করিলে, আমনদাসকে স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। আমনদাস অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুনদাস স্বীয় অপর পুত্র যোগীদাসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তাহাকে সমস্ত রাজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। এই সংবাদ আমনদাসের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। আমনদাস নরসিংহদেবের অনুপস্থিতিতে গোপনে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় জননীর প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতে থাকে, এবং একজন রাজসহচরকে হস্তগত করিয়া স্বীয় পিতা অর্জ্জুনদাসের হত্যা সম্পাদন করে। এই পিতৃহন্তা পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য গড়াকটকের অধিবাসিগণ যোগীদাসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে আমনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। যোগী পিতৃসম জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহারা অগত্যা নরসিংহদেবকে গড়াকটক অধিকারের জন্য আহ্বান করে। নরসিংহদেব আমনের এই পৈশাচিক ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া গড়াকটক স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিবার জন্য দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। আমনদাস তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রথমে বনে পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকে, পরে পথিমধ্যে তাঁহার শরণাগত হয়। নরসিংহদেব আমনকে ক্ষমা করিয়া তাহার পিতৃরাজ্য তাহাকেই সমর্পণ করেন।

গড়াকটকের একাধীশ্বর হইয়া আমনদাস আপনার প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হন। যৎকালে সুল্‌তান বাহাদুর গুজরাটি রাইসিন্ শাসনে অক্ষম হইয়া পড়েন, সেই সময়ে আমনদাস তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। সুল্‌তান বাহাদুর আমনের সাহায্যে রাইসিনকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনয়ন

করেন। তজ্জন্য তিনি আমনদাসকে সংগ্রামসাহ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই রূপে অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া আমনদাস প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে করিতেন। আমনদাসের দলপৎ নামে এক পুত্র ছিল। কিন্তু তাহার জন্মসম্বন্ধে নানা রূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করিত যে, দলপৎ আমনের ঔরসজাত পুত্র নহে, কিন্তু দত্তক পুত্র। গোবিন্দদাস কছুওহা নামে এক জন রাজপুত আমনদাসের অধীনে কার্য্য করিতেন। এক সময়ে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী হন, আমন দাস অপুত্রক হওয়ায় গোবিন্দ-দাসকে অনুরোধ করেন যে, তোমার পত্নীকে আমার অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেও। যদি তাহার কোন কন্যা জন্মে, সে কন্যা তোমার হইবে, কিন্তু পুত্র হইলে তাহা আমার পুত্র বলিয়া প্রচারিত হইবে। সেই গর্ভে পুত্র জন্মিলে তাহা আমনদাসের পুত্র বলিয়া প্রচারিত হয়, এবং পরে তাহারই, দলপৎ নাম হইয়া উঠে।* এই প্রবাদ সত্য কি অসত্য তাহা জানা যায় না। তবে দলপৎ যে আমনদাসের পুত্র বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তিনিই পরে গঢ়াকটকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

আমনদাসের সময় রাঠ ও মহোবা † প্রদেশে শালিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহারা রাজপুতদিগের চণ্ডেল শাখা হইতে উদ্ভূত হন। আমনদাস তাঁহাদিগের স্বজাতি হইলেও বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হেয় ছিলেন। কিন্তু

* Akbarnama (Elliot vol. VI. P. 33)

† Imperial Gazetteer এ রাঠ ও মহোবা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—"Rath—North western *tahasil* of Hamirpur District, North-Western Provinces." উক্ত প্রদেশে রাঠ নামে একটি নগরও আছে। "Mahoba—South-eastern *tahasil* of Hamirpur District, North-Western Provinces; consisting of a hilly and rocky tract, interspersed with the famous artificial lakes formed by the ancient Chandel princes." মহোবা নামে একটি নগরও আছে। তথায় চণ্ডেল বংশীয়দিগের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়. এই বংশের স্থাপয়িতার নাম চন্দ্রবর্ম্মা, চণ্ডেল বংশ রাজপুত দিগের ৩৬ শাখার অন্যতম।

তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য ও অগাধ ধনসম্পত্তি তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা শালিবাহনের বংশ প্রাচীন হওয়ায়, তাঁহাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহার দুর্গাবতী ও কমলাবতী নামে দুই সুন্দরী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে দুর্গাবতী সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধিমত্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমনদাস দুর্গাবতীর রূপলাবণ্য ও গুণগরিমার কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র দলপতের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদানে ইচ্ছুক হন। বিশেষতঃ চণ্ডেলবংশীয় রাজকন্যাকে পুত্রবধূরূপে আনয়ন করা তিনি গৌরবজনকই মনে করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি রাজা শালিবাহনের নিকট উক্ত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। আমনদাস বংশমর্য্যাদায় হীন হইলেও তাঁহাকে ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জানিয়া শালিবাহন উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। বিশেষতঃ তিনি দলপৎকে দুর্গাবতীর উপযুক্ত পাত্রই বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দলপৎ ও দুর্গাবতী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

আমনদাসের মৃত্যুর পর দলপৎ গঢ়াকটকের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণীর পরামর্শে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাণী দুর্গাবতী যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই বাহুবলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা স্বীয় স্বামীকে সমস্ত কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এইরূপ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সাহসসম্পন্না সহধর্ম্মিণী প্রাপ্ত হইয়া দলপৎ যে সুখী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? কেবল সুখী বলিয়া নহে, তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসিত হইতে লাগিল। দুই বৎসর রাজত্বের পর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে দলপৎ একটি পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। আদর করিয়া তাহার বীরনারায়ণ নাম * রাখা হইল। বীরনারায়ণও বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার ন্যায় সাহসী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য চিরদিন কাহারও প্রতি প্রসন্ন থাকে না। সাত বৎসর রাজত্বের পর দলপৎ ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী

* ফেরিস্তা প্রভৃতি, বীরনারায়ণকে বীরসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আকবর নামায় বীরনারায়ণই আছে। বীরসা সম্ভবতঃ পরে তাঁহার উপাধি হয়। হণ্টারে প্রেমনারায়ণ আছে।

দুর্গাবতী পঞ্চবর্ষীয় শিশুপুত্র বীরনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া এই দুঃসহ শোক হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এক্ষণে সমস্ত গড়াকটকের শাসন ভার তাঁহারই মস্তকে নিপতিত হইল।

পতিপরিত্যক্ত রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া রাণী দুর্গাবতী দিন দিন তাহার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় সৎসাহস, কার্য্যদক্ষতা ও ঔদার্য্যে বিস্তৃত গড়াকটক রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রয়োবিংশ সহস্র অধিবাসীপূর্ণ গ্রাম তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ সহস্র তাঁহার নিজের শিকদারগণ কর্তৃক শাসিত হইত, অবশিষ্ট গ্রাম সমূহের শাসনভার তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত রাজগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বংশের প্রধান পুরুষগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত রাজ্যশাসনের কথা সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। এই সময়ে নরসিংহদেবের পৌত্র রামচন্দ্র দেব পান্নায় রাজত্ব করিতেন, তিনি কখনও দুর্গাবতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন নাই। রাণী দুর্গাবতীর বাহুবল সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইত। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষরূপ পারদর্শিনী ছিলেন, মৃগয়ায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্তি ছিল, ধনুক ও বন্দুক উভয়েরই দ্বারা তিনি অব্যর্থ সন্ধান করিতে পারিতেন। হিংস্র বন্যপশুর বিশেষতঃ ব্যাঘ্রাদির সংবাদ পাইলে তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেন। রাজ্যের বল-

* আমরা রাণী দুর্গাবতী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করিতেছি,—
আবুলফজেল বলেন,—"She was highly renowned for her courage, ability, and liberality, and by the existence of these qualities she had brought the country under her rule."

ফেরিস্তা বলেন—"Famous for her beauty and accomplishments." (Dow)
"Celebrated for her beauty as for her good sense." (Briggs)
কৈজী সারহিন্দি বলেন,—"Remarkable for her beauty and loveliness."
নিজাম উদ্দীন আমেদ বলেন,—"Was very beautiful."

বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি বিংশসহস্র দক্ষ অশ্বারোহী, অগণ্য পদাতিক ও সহস্র হস্তী সমবেত করিয়াছিলেন। মালবের বাজবাহাদুরের সহিত তাঁহার অনেক বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং প্রতিবারেই তিনি বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। অধর নামক জনৈক কায়স্থসন্তানের সুপরামর্শে তিনি এই বিস্তৃত রাজ্য সুচারুরূপে শাসন করিতেন। অধর প্রথমতঃ একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমে উচ্চপদে অধিরূঢ় হন। এই কায়স্থসন্তানও অত্যন্ত সৎসাহসী ছিলেন।* তাঁহারই সুপরামর্শে রাণী সাহস ও দক্ষতার সহিত স্বরাষ্ট্র শাসনে ও সুবিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত পররাষ্ট্রীয়গণের সহিত ব্যবহারে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুস্থানে তাঁহার সুশাসনের কথা প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সাধারণতঃ রাণী বলিয়াই অভিহিত করিতেন।

যে সময়ে রাণী দুর্গাবতী গঢ়াকটঙ্কের শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে দিল্লীতে নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। বাবরসাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন অধিক দিন দিল্লীসাম্রাজ্যের একাধীশ্বর থাকিতে পারেন নাই। সেরসাহের সমর-কৌশলে তাঁহাকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়। আবার সেরসাহের পরলোকগমনের পর তদ্বংশীয় দুর্ব্বল সম্রাটগণের হস্ত হইতে ভারতের রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল। এই বংশের শেষ সম্রাটের নাম মহম্মদ আদলাই। আদলাই নিজ প্রভুত্ববিস্তারের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ববংশীয়গণই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে

* অধর সম্বন্ধে আকবরনামায় এইরূপ লিখিত আছে,—"With the assistance of Adhar Kayeth, the Rani assumed the Government showing no want of caurage and ability, and managing her foreign relations with judgment and prudence."

ফেরিস্তা বলিতেছেন,—"A brave officer of household, by name Adhar."

ফৈজি সারহিন্দি বলিতেছেন,—"Adhar, who was entrusted with the management of the whole business of that country."

প্রবৃত্ত হয়। গাজিখাঁসুরের পুত্র ও আদলাইএর ভগিনীপতি ইব্রাহিম কোন স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। তিনি পান্নারাজ রামচন্দ্রকে পরাজয় করিয়া তাহা অধিকারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি একেবারে উক্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পান নাই। এই সময়ে বাজবাহাদুরের রাইসিনস্থিত মৈয়ান নামক আফগানগণ তাঁহার অধীনতাচ্ছেদনের ইচ্ছা করিয়া ইব্রাহিমকে আহ্বান করিয়া পাঠায়। ইব্রাহিম রাণী দুর্গাবতীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাণী তাঁহার সাহায্যের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলে, বাজবাহাদুর তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া অনুনয় বিনয়ের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। রাণী বাজবাহাদুরের অনুরোধে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইব্রাহিম নিরুপায় হইয়া অবশেষে উড়িষ্যার অভিমুখে গমন করেন।

ইহার কিছুকাল পরে আদলাইএর দুর্ব্বল হস্ত হইতে ভারতের রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অবশেষে পাণিপথ ক্ষেত্রে পাঠানের শেষ চেষ্টা ক্ষীণালোক বিদ্যুতের ন্যায় দিগন্তক্রোড়ে মিলাইয়া গেল। দিল্লীর রাজছত্র সাহানসাহা আকবর সাহের মস্তকে ধৃত হইল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আকবর সাহ ভারতের চরিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, তখনও পর্য্যন্ত ভারতে হিন্দু ও পাঠানের ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতেছে। এই ক্ষমতার বিলোপ সাধন না করিতে পারিলে ভারতে যে মোগল রাজত্ব বদ্ধমূল হইবে না, ইহা সুচতুর আকবরসাহের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার অব্যাহত শক্তি তদীয় অভিভাবক বৈরামখাঁর দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তিনি প্রথমেই সেই আধার বিনাশসাধন করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে পাঠান ও হিন্দুর শক্তিসঙ্কোচের জন্য প্রয়াসী হইয়া উঠেন। তিনি পাঠানদিগের ক্ষমতালোপের জন্য ইচ্ছুক হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে একেবারে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাদের ক্ষমতার সঙ্কোচ করিয়া তাহাদিগকে নিজ সাম্রাজ্যের সহিত অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ উপায়

অবলম্বিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু রাজ্যের রাজগণ মোগল সম্রাটের সামন্তরাজা রূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু পাঠানদিগের হস্ত হইতে যে যে রাজ্য গৃহীত হইল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। এইরূপে ভারতের অনেক পাঠানশাসিত প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এলাহাবাদের নিকটস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী করা ও মাণিকপুর * অন্যতম। আবদুল মজিদ আসফ খাঁ নামে একজন সম্ভ্রান্ত ওমরা এই উভয় প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। তিনি বাদসাহের অত্যন্ত অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। সেই জন্য তিনি অন্যান্য অনেক ওমরা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন।

করা ও মাণিকপুর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া আসফখাঁ স্বীয় অধিকার-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার জায়গীরের নিকটবর্ত্তী পান্নারাজ্য আক্রমণ করিয়া বসেন। পান্নারাজগণ পাঠান-দিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলেরা ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিলে তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই জন্য বাদসাহের আদেশে আসফ খাঁ পান্নারাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হন। এই সময়ে রামচন্দ্রদেব পান্নারাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তিনি আসফখাঁর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহার রাজ্য আর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। তিনি মোগল বাদসাহের সামন্ত রাজারূপেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। ইহার পর গড়াকটকের প্রতি আসফ খাঁর দৃষ্টি নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি সহসা এই রাজ্য আক্রমণে সাহসী হন নাই। প্রথমে তিনি নানা প্রকার চর ও ব্যবসায়ীদিগকে তথায়

* Karra (Kora, Corah) Town in Siruthu tahsil, Allhabad District, North-Western Provinces, on the right bank of the Ganges, 42 miles by road north west of Allahabad city."

Manikpur—Town in Partabgarh District, Oudh, and head quarters of Manikpur pargana ; situated on the north bank of the Ganges 16 miles from Sulon, and 36 from both Partabgarh town and Allahabad" (Imperial Cazetteer)

প্রেরণ করিয়া এই রাজ্যের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হন। বিশেষতঃ বহুকাল হইতে সঞ্চিত এই রাজ্যের অগাধ ধনসম্পত্তির কথা তাঁহার অর্থ-পিপাসু চিত্তকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিয়াছিল। আসফ খাঁ গড়াকটকের বিষয় বাদসাহসকাশে লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহা আক্রমণের জন্য আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। যথাসময়ে বাদসাহের আদেশ পঁহুছিলে হিজরী ৯৭২ বা ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে, * আসফ খাঁ গড়াকটক আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, যদি রাণী বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে গড়াকটক আসফ খাঁর করতলগত হইত না। সে যাহা হউক, গড়াকটকের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল।

আসফ খাঁর আক্রমণের কথা ক্রমে রাণী দুর্গাবতীর কর্ণগোচর হইল। তিনি পূর্ব্বে আসফ খাঁর গতিবিধির বিষয় বিশেষ রূপে বুঝিতে সক্ষম হন নাই। অধর আসফ খাঁর পান্না আক্রমণ প্রভৃতি জানিয়াও এরূপ মনে করিতে পারেন নাই যে, গড়াকটক আক্রান্ত হইবে। কারণ, যাহা কোন কালে মুসলমানগণ দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, আসফ খাঁ যে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন ইহা অধরের মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয় নাই। এই জন্য তিনি আসফ খাঁর গতিবিধির কথা রাণীকে অবগত করান নাই, এবং আকবর বাদসাহের অসীম ক্ষমতার বিষয়ও রাণী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আসফ খাঁর গড়াকটকের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা শুনিয়া রাণী অধরকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পরিণাম ফল বিষময় হইবে। যদি বাদসাহ নিজে উপস্থিত হইতেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার শরণাগত হইতাম। কিন্তু এক্ষণে আর উপায়ন্তর নাই, আসফ খাঁকে বাধা প্রদান করিতেই হইবে। ইহার পর তিনি আসফ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে চৌরাগড় † দুর্গে গড়ামন্দলার রাজধানী স্থাপিত ছিল। গড়া-

* ফৈজী সারহিন্দি ৯৭১ বলেন।

† "Chauragarh—Ruined fortress in Narshingpur District, Central Provinces, on the crest of the outer range of the Satpur tableland, 800

মন্দলার অধিপতিগণ অনেক দিন হইতে গড়া-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনাদিগের রাজধানী স্থাপিত করেন। দলপৎসার সময়ে সিঙ্গুরগড়ের * দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গে গড়াকটকের রাজধানী স্থাপিত হয়। সিঙ্গুরগড়ের দুর্গ চণ্ডেলবংশীয় বেল রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, দলপৎসা তাহার সংস্কার ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী দুর্গাবতী তথায় অবস্থিতি করা অসুবিধা মনে করিয়া চৌরাগড়ে রাজধানী অন্তরিত করেন। এই চৌরাগড় সিঙ্গুরগড় অপেক্ষা গড়াকটক রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। সেইজন্য তিনি উক্ত স্থান নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। আসফ খাঁর আগমনের সংবাদ পাইয়া রাণী দুর্গাবতী সিঙ্গুরগড়ের দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় সৈন্যস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।

আসফ খাঁ প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্যে নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনাদি করিয়া গড়া-মন্দলার অধিবাসীদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলে। ক্রমে তাহারা দামুদা † পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই সময়ে রাণীর নিকট কেবল পঞ্চশত সৈন্য মাত্র অবস্থিত ছিল, তিনি আসফ খাঁর আগমনের সংবাদ পূর্ব্বে না পাওয়ায় অধরকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন। ক্রমে তাঁহার নিকট চারি সহস্র সৈন্য সমবেত হয়। পরে সকলের পরামর্শে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থিতি করাই স্থির হয়। সিঙ্গুরগড়ই সকলের লক্ষ

feet above the level of the Norbada valley, and 12 miles south-wes of Narshingpur" (Imperial Gazetteer)

* "Singaurgarh—Hill Fort in Damoah District, Central Provinces 26 miles north west of Jabalpur City, commanding the narrow Sangram pur valley founded by Raja Bel, a Chandela Rajput, it was enlarge by Raja Dalpat Sa of Garha Mandla, who made it the seat of Govern ment about 1540. It was the scene of the defeat of Rani Durgavati b Asaf khan, an officer of Akbar."

† দামুদা সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশের অন্যতম প্রধান নগর দামোয়া।

হইয়াছিল। আসফ খাঁর সহিত প্রায় ছয় হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক ছিল। * এই বিপুল বাহিনী লইয়া আসফ খাঁ দ্রুতবেগে দুর্গাবতীর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। রাণী প্রথমতঃ বনে পর্ব্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া আসফ খাঁর গতি পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আসফ খাঁ তাঁহার গতিবিধি বুঝিতে পারেন নাই। আসফ খাঁ দামুদা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গড়া অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং উক্ত স্থান অধিকার করিয়া বসেন। এই সময়ে রাণীর নিকটে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমবেত হয়। আসফ খাঁ অতঃপর দুর্গাবতীর গতিবিধি বুঝিতে পারিয়া কতক সৈন্য গড়ায় রাখিয়া তাঁহার অভিমুখে যাত্রা করেন। রাণী আর বনে পর্ব্বতে অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সিঙ্গুরগড়ে উপস্থিত হইয়া আসফ খাঁকে বাধা প্রদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

মোগলবাহিনী অগ্রসর হইলে, রাণী দুর্গাবতী সাহসশালিনী বীরাঙ্গনার ন্যায় বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে শরাসন ও তূণ লম্বমান হইতে লাগিল, এবং এক শাণিত বর্ষা হস্তে করিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল না, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতা ও তাহাদিগের অধীশ্বরীর দৃষ্টান্ত প্রত্যেকের হৃদয়কে সিংহপরাক্রমে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। † তাহারা শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎকারের জন্য এরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, ছত্রভঙ্গ ভাবেও অগ্রসর হইতে ত্রুটি করিল না।

* ফৈজি সারহিন্দি বলেন তাঁহার সহিত ১১ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল।

† "Like a bold Heroine she led on her troops to action, clothed in armour, with a helmet upon her head, mounted in howdar, with her bow an quiver lying by her side, and a burnished lance in her hand. Though her troops had not been accustomed to action, the love of liberty, and the example of their queen inspired every breast with a lion's courage. (Dow's Ferista P. 240)

রাণী স্বীয় সৈন্যদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ দিলেন। পরে নূতন শ্রেণী গঠিত করিয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ও সমবেতভাবে অগ্রসর হইতে বলিলেন, এবং রাজহস্তী হইতে নিশানা পাইলে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবে এইরূপ উপদেশ দিলেন।

এইরূপে তাহারা মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইল। অচিরকালমধ্যে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রাণীর সৈন্যগণ এরূপ উৎসাহে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে ক্রমে মোগলবাহিনী পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। প্রায় ছয় শত * মোগল রাণীর সৈন্যের বর্ষা, তরবারি ও শরাঘাতে ধরিত্রীক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের অদম্য উৎসাহ যেন মোগলবাহিনীকে একেবারে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে মোগলগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। রাণীও সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বহুদূরে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন।

মোগলগণ পলায়ন করিলে, রাণী স্বীয় সৈন্যদিগকে হস্তপদাদি ধৌত ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, তাহারা বিশ্রামলাভে ব্যাপৃত হইলে তিনি স্বীয় কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। রাণী প্রস্তাব করিলেন যে, মোগলদিগকে সময় দেওয়া কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাদিগকে অদ্যই নৈশ আক্রমণের দ্বারা উত্যক্ত করাই উচিত। সময় পাইলে তাহারা অত্যন্ত অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে। কিন্তু তাঁহারা এমন কি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী অধর পর্য্যন্ত তাহাতে সম্মতি দান করিলেন না। তাঁহারা অগ্রে মৃতদিগের সৎকার কর্ত্তব্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। রাণী অগত্যা সম্মত হইয়া মৃতদিগের সৎকারের জন্য আদেশ দিলেন। মৃতদিগের দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে নৈশ আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই এই সাহসিক কর্ম্মে অগ্রসর হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে মোগলেরা যেরূপ

* ফৈজি সারহিন্দের মতে ৩ শত মোগল ধরাশায়ী হইয়াছিল।

ভাবে পরাজিত হইয়াছে, তাহারা আপনা হইতেই এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, যে দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইবার লোক নহে! রাণী তাহাদিগকে অবগত করাইলেন যে প্রাতেই ইহার বিষময় ফল ভোগ করিবে।

মোগলসৈন্যের এইরূপ পরাজয়ে আসফ খাঁ অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি নবীন উদ্যমে ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। গত যুদ্ধে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যগণ উপস্থিত হইতে পারে নাই, দুর্গম পথের জন্য তাহারা কামানাদি লইয়া পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা উপস্থিত হইলে আসফ খাঁর দেহে প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া পর দিন প্রাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। যদিও তাহারা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের নেতার উৎসাহে তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে সম্মত হইল। বিশেষতঃ গোলন্দাজ সৈন্যগণের আগমনে তাহারা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। আসফ খাঁ তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে কামানের সম্মুখে রাণীর সৈন্যগণ কদাচ দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। মোগল সৈন্যগণ সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন নূতন উৎসাহে গড়ামন্দলায় সৈন্যসহ তাহার রাণীকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আসফ খাঁ সচেষ্ট হইলেন। তিনি রাণীর শিবিরের সম্মুখস্থ একটি পর্ব্বত অধিকার করিয়া রাত্রিযোগেই তাহাতে কামান স্থাপন করিলেন। প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বত হইতে কামানশ্রেণী অগ্নিময় গোলা উদ্গীরণ করিয়া রাণীর সমস্ত সৈন্যসহ সিঙ্গরগড় দুর্গের ধ্বংস সাধন করিবে বলিয়া স্থির হইল।

প্রভাত হইবামাত্র পর্ব্বত শিখর হইতে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামানশ্রেণী অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে সেই শব্দ প্রতিহত হইয়া মহতী প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিল। মোগল সৈন্যের এই নবীন উদ্যম দেখিয়া, রাণী স্বীয় কর্ম্মচারিগণের অপরিণামদর্শিতার কথা তাহাদিগকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বুঝিলেন যে গড়ামন্দলার ধ্বংস অনিবার্য্য। যাহা হউক তিনি সে বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ না করিয়া বিপক্ষ সৈন্যের

বাধা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সিঙ্গরগড় দুর্গের নিকটস্থ প্রান্তরে তিনি অধিকাংশ সেনা সমবেত করিয়া তাহার সম্মুখে সংগ্রামপুর উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ অধিকার করিয়া মোগল সৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আসফ খাঁ রাণীর এই সমর-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তথাপি এবার তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অচিরে গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে সেই রন্ধ্রপথস্থ রাণীর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কামানের অগ্নিক্রীড়ায় সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য রন্ধ্রপথে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইল না। তাহারা ক্রমে ক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। অচিরকাল মধ্যে সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল।

রন্ধ্র পথ পরিষ্কার করিয়া মোগলসৈন্য প্রান্তর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাণীর সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। রাণী অধর কর্তৃক চালিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মোগলসৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সমরকৌশলে ও অপরিসীম পরাক্রমে তিন বার * মোগল সৈন্যগণ পশ্চাৎপদ হইল। চতুর্থ বার আক্রমণে তিনি আহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইবার ন্যায় দেখিয়া রাণী দুর্গাবতী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীদিগকে বীরনারায়ণকে পশ্চাদ্ভাগে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, বীরনারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। তাঁহার অপসরণে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মোগলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা বিজয় লাভ করিয়া রাণী দুর্গাবতীর দিকে ধাবিত হইল।

* ফেরিস্তা বলেন যে বীরনারায়ণ দুইবার মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৈজী সারহিন্দ তিনবারের কথা বলিয়াছেন।

বীরনারায়ণের সহিত অধিকাংশ সৈন্য অপসৃত হইলে রাণী দুর্গাবতী একরূপ জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিকট কেবল তিন শত সৈন্য অবস্থিত ছিল। তিনি তাহাদিগকেই লইয়া অদম্য উৎসাহে মোগলদিগকে বাধাপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে তিনি যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, এক্ষণেও তাহার কিছুমাত্র ক্রটি লক্ষিত হইল না। মোগলগণ সেই অল্পসংখ্যক সৈন্যের আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া পড়িল, তাহারা রাণী দুর্গাবতীর সমরোৎসাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। যৎকালে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে মোগলসৈন্য হইতে একটি তীক্ষ্ণ শর আসিয়া রাণীর চক্ষু * বিদ্ধ করিল। দুর্গাবতী স্বহস্তে তাহার উত্তোলনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইল না, কতকাংশ চক্ষু মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। সেই সময়ে আর একটি শর আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। অবিশ্রান্ত রক্তপাতে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুদ্ধার্থে পুনরায় প্রস্তুত হইবার উপক্রম করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখস্থিত অধর উত্তেজিত হস্তিসহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাণী তাহাতে সম্মত হইলেন না, অগত্যা অধর সেই উত্তেজিত হস্তীকে চালিত করিলেন। তাহার পদভরে অনেক মোগলসৈন্য বিদলিত হইল। ক্রমে মোগলগণ রাণীর চারি পার্শ্বে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা অবলোকন করিয়া অধর তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাণী এবারও সম্মত হইলেন না। তিনি অধরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি, এইবার তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। অধর প্রথমতঃ রাণীর কথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, পরে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। এই সময়ে মোগলগণ অগ্রসর হইয়া রাণীকে বন্দী করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, রাণী অধরের হস্ত

* ফৈজী সারহিন্দ কর্ণ ও কপালের মধ্যভাগ (রগ) বিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ফেরিস্তা চক্ষু বিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হইতে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিন্ন করিয়া লইলেন ও নিমেষমধ্যে আপনার বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু সেই পবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত বায়ু-প্রবাহে মিশিয়া গেল। এইরূপে সেই সৌন্দর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি এ জগত হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়ামন্দলার ভাগ্যলক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ছয় জন সামন্ত রাজা রাণীর দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া মোগলদিগকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। মোগলেরা সানন্দচিত্তে বিজয়ধ্বনি করিতে করিতে সিঙ্গরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল।*

* এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার স্থান লইয়া নানারূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুসারে সমস্ত ঘটনাগুলি প্রায় একই স্থলে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। সেই জন্য হণ্টার প্রভৃতি সিঙ্গরগড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কনিংহাম ও স্লীম্যান প্রবাদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করেন।" The scene of the battle between the rapacios Mahammudan soldier and the heroic Hindu queen is still pointed out by the people in the wide open plain about Sangrampur, four miles to the east of Singorgarh. But, according to tradition, it wss not there that Durgavati was wounded ; but in a second fight, which took place while retreating towords Garha."(Cunningham's Archœological Survey of India, Central Provinces, Vol IX. P. 52.)

"He was met by the queen regent, at the head of her troops near the fort of Singorgarh ; and an action took place, in which she was defeated. Unwilling to stand a seige, she retired after the action upon Garha ; and finding herself closely pressed by the enemy, she continued her retreat among the hills towards Mandala, and took a very favourable position in a narrow defile, about 12 miles east of Garha." ('Asiatic Society's Journal. Vol V. History of the Garha-Mundula Rajas, by Captain W. H. Sleeman.) স্লীম্যানের মতে এইখানেই বীরনারায়ণ ও রাণী আহত হন এবং শোষোক্তের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের সময়ে উক্ত রন্ধ্রপথের নিকটস্থ নদী সহসা জলপূর্ণ হওয়ায় রাণীর সৈন্যেরা মণ্ডলাভিমুখে গমন করিতে অশক্ত হয়। রাণীর মৃত্যুর পর তিনি সেই স্থানে প্রোথিত হন। অদ্যাপি লোক সেই স্থান দেখাইয়া থাকে।" She was interred at the place where she fell ; and on her tomb to this day the passing stranger thinks it necessary to place, as a votive offering, one of the fairest he can find of those beantiful specimens of white crystal, in which

কিছু দিন * অপেক্ষার পর আসফ খাঁ চৌরাগড় † অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিঙ্গরগড় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া রাজা বীরনারায়ণ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চৌরাগড়কে সুদৃঢ় করিয়া মোগলসৈন্যের বাধা-প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে অধিক সৈন্য ছিল না। যে কিছু সৈন্য ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া বীরনারায়ণ দুর্গাবতীর উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় মোগলবাহিনীকে প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইলেন। আসফ খাঁ অচিরকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বীরনারায়ণ এবারও সাহস প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অগণ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখে তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য ক্রমে কদলীবনের ন্যায় শায়িত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনিও আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, এবং মোগল

the hills in this quarter abound. Two rocks lie by her side, which are supposed by the people to be her drums converted into stone; and strange stories are told of their being still ocassionally heard to sound in the stillness of the night by the people of the nearest villages. Manifest signs of the carnage of that day are exhibited in the rude tombs, which cover all the ground from that of the queen all the way back to the bed of the river, whose unseasonable rise prevented her retreat upon the garrison of Mandala." (Sleeman) স্লীম্যান ও কনিংহামের উক্তির সহিত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার কিছু অনৈক্য বোধ হয়। কেবল একটি বিষয়ের মীমাংসা হইলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উপরোক্ত লেখকদ্বয়ের বর্ণনায় রাণী যে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু তিনি সিঙ্গরগড়ের নিকটে প্রথমে পরাজিত হন ইহাই কথিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় সিঙ্গরগড়ের নিকটেই রাণী জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুসারে তিনি আসফের সৈন্যদিগকে গড়াভিমুখে বিতাড়িত করিয়া ধাবিত হন। আসফ গড়ায় তাঁহার কতক সৈন্য রাখিয়া সিঙ্গরগড় অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যেরা তথা হইতেই সিঙ্গরগড়ের দিকেই যাইতেছিল। এই সময়ে তাহারা রাণীর দিকে ধাবিত হইলে রাণী মণ্ডলাভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করেন, ও গড়ার পূর্ব্ব দিকে রন্ধ্রপথে আশ্রয় লইয়া মোগল সৈন্যকে বাধা প্রদান করেন। এইরূপ মীমাংসা করিলে সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি হয়। এই প্রবন্ধের কতক অংশ মুদ্রিত হওয়ার পর, কনিংহাম ও স্লীম্যানের বর্ণনা আমাদের চক্ষে পড়ায় মূল প্রবন্ধে আমরা ইহার আলোচনা করিতে পারি নাই।

* ফৈজী সারহিন্দ দুই মাস পরে চৌরাগড় আক্রমণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ফেরিস্তায় অল্প দিন পরে লিখিত আছে।

† ডৌ সাহেবের ফেরিস্তায় জোরাগড় আছে, কিন্তু ব্রিগ্‌স চৌরাগড় লিখিয়াছেন।

অশ্বারোহী ও পদাতিকের পদভরে নিষ্পেষিত হইয়া গেলেন। বীরমাতার সহিত বীরপুত্রেরও অবসান ঘটিল

মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিলে, রাজপুতদিগের সেই চির প্রাচীন প্রথা জহরব্রতের অনুষ্ঠান আরদ্ধ হইল। রাজার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ দুর্গাভ্যন্তরে রাশীকৃত কাষ্ঠ ও অন্যান্য দাহ্যপদার্থ সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট চিতামঞ্চ প্রস্তুত করিল। দুর্গের সমস্ত রমণীগণ সেই মঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সেই প্রকাণ্ড চিতামঞ্চ অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অগ্নিশিখা ধূ ধূ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। অল্পকালমধ্যে সেই বিশাল চিতা সুন্দরী রমণীগণসহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মোগলেরা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কেবল দুই জন মাত্র রমণী কোনরূপে জীবিত ছিলেন। তাঁহারা চিতামঞ্চের কতকগুলি অদগ্ধ কাষ্ঠের নীচে শয়িত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন রাণী দুর্গাবতীর ভগিনী কমলাবতী এবং দ্বিতীয় জন বীরনারায়ণের সহিত পরিণয়ার্থে আগতা বীরগড়ের রাজকন্যা। আসফ খাঁ তাঁহাদিগকে বাদসাহের অন্তঃপুরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। * আসফ খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গড়াকটকের বহুকাল-সঞ্চিত ধনরত্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। তিনি অগণ্য হীরা, মাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, তন্নির্ম্মিত বাসন ও মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তিনি এক শত পেটিকা আলা উদ্দীন খিলিজির সুবর্ণ মোহর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রায় সহস্রটি হস্তী তাঁহার হস্তগত হয়, তন্মধ্যে তিনি দুই শতটী মাত্র ও যৎকিঞ্চিৎ লুণ্ঠিত দ্রব্য বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হীরামাণিক্যাদি কিছুই প্রদান করেন নাই। এই অগাধ সম্পত্তি তাঁহাকে বাদসাহের বিরুদ্ধে উত্থিত করিয়াছিল। কিন্তু পরিণামে তিনি তাহার ফল ভোগ করিয়াছিলেন। † অবশেষে গড়াকটক মালব সুবার অন্তর্ভূত হয়।

* ফৈজী সারহিন্দ বলেন যে, তাঁহাদিগকে বাদসাহের অন্তঃপুরে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু ফেরিস্তা প্রেরণের কথা বলেন না।

† আসফ খাঁর সম্বন্ধে Blochmann সাহেবের আইন আকবরীতে এইরূপ লিখিত আছে :—

আসফ খাঁ উক্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিলে দলপতির ভ্রাতা চন্দ্রসাহী * গড়ামণ্ডলা রাজ্যের অধিপতি হন। কিন্তু বাদসাহকে উক্ত রাজ্যের কোন কোন অংশ তাঁহাকে প্রদান করিতে হইয়াছিল।

"Acaf Khan Abdul Majid (of Harat), a descendant of Shaikh Abu Bakr i Taibadi.

* * * * * *

Khwajah Abdul Majid was a Grandee of Humayun, whom he served as Diwan. On Akbar's accession, he also performed military duties. When the Emperor moved to the Panjab, to crush Bairam'srebellion, Abdul Majid received the tittle of Acaf Khan. * * * * * Subsequently Acaf was appointed Governor of Dihili, received a flag and a drum, and was made a Commander of Three Thousand. When Fattu, a servant of Adli, made overtures to surrender Fort Channadh (Chunar), A. in concert with Shaikh Muhammad Ghaus, took possession of it, and was appointed Governor of Karah-Manik-pur on the Ganges. * * * * * * * * A. in the 7th year sent a message to Rajah Ram Chandr, the ruler of Bhath, to pay tribute to Akbar and surrender the enemies: But the Rajah prepared for resistance. * * * * The Rajah, after his defeat, * * * * obtained Akbar's pardon by timely submission. * * * * A. then left the Raja in peace, but the spoils which he had collected and the strong contingent which he had at his disposal made him desirous of farther warfare, and he planned the famous expedition against. Gadha-katangah, or Gondwanah south of Bhath, which was then governed by Durgawati, the heroine of Central India. Her heroic defence and suicide, and the death of her son, Bir-shah, at the conque st of Chauragadh (about 70 miles west of Jabalpur), are wellknown. The immense spoils which A. carried of led him temporarily into rebellion, and the 1000 elephants which he had captured he only sent 200 to court." তাহার পর তিনি মাণিকপুর আসিয়া বাদসাহকে তাহার অবশিষ্ট ধনরত্ন প্রদান করেন। কিন্তু বাদসাহী মৃৎসুদ্দীগণের ভয়ে পুনর্ব্বার গড়ায় পলায়ন করেন। বাদসাহ মহিদ কাসিম খাঁকে গড়ায় নিযুক্ত করেন। তাহার পর আসফ পুনরায় বাদসাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়া চিতোরজয়ে গমন করেন ও তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ৯৮১ হিজিরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* শ্রীম্যান চন্দ্রসাহীকে দলপতির ভ্রাতা বলিয়াছেন, কিন্তু মণ্ডলার নিকটস্থ রামনগর মন্দিরের প্রস্তরফলকে উক্ত বংশের যে পরিচয় আছে, কাপ্তেন ফেল সাহেব কর্ত্তৃক তাহার

এইরূপে রাণী দুর্গাবতীর অবসান ঘটে। যিনি রূপে, গুণে সাক্ষাৎ-দেবীস্বরূপিণী ছিলেন, তাঁহার পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিলে যে, হৃদয়ে পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তাঁহার ন্যায় পতিব্রতা পত্নী, স্নেহশালিনী জননী ও উদার-হৃদয়া রাণী ভারত ইতিহাসে অল্পই দৃষ্ট হয়; আজিও সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার এই পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষভাবে তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নর্ম্মদার সলিলধারার ন্যায় তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি চিরদিনই পুণ্য বিতরণ করিবে। বিন্ধ্যাচলের শ্বেত মর্ম্মরের ন্যায় তাহা চিরোজ্জ্বলরূপে বিরাজ করিবে। কে বলে হিন্দুর ইতিহাস নাই? আজিও ভারতের শশ্মানস্তূপের মধ্যে যে সমস্ত জীবন্ত স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের কোন্ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা ইতিহাসের আলোচনা করি না—তাই অতীত আমাদিগের নিকট মহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সামান্য মাত্র চক্ষু উন্মীলন করিলে আমরা দুর্গাবতী ও বীরনারায়ণের ন্যায় উজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু হায়! আমাদের সে চেষ্টা কোথায়? *

অনুবাদে তাঁহাকে দলপতির পুত্র বলিয়া বুঝায়। "Chandrashahi, the asylum of the unprotected, the abode of glory, the full lamp of the whole of his family, he whose wealth was fame, and the offspring of the prince Dalapati, was crowned (by the people)". মূল শ্লোক না দেখিলে ইহার মীমাংসা হয় না। আকবরনামার প্রবাদানুসারে আমনদাস নিঃসন্তান ছিলেন, পরে দলপৎকে দত্তক গ্রহণ করেন, সুতরাং চন্দ্রসাহীর উৎপত্তি কিরূপে হইল জানা যায় না। তবে তাহা প্রবাদ। আবার দুর্গাবতীর পূর্ব্বে দলপতের অন্য কোন পত্নী ছিলেন কি না জানা যায় না, থাকিলে তাঁহার অথবা বীরনারায়ণের পর দুর্গাবতীর গর্ভে চন্দ্রসাহী জন্মিয়াছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। স্লীম্যান অনেক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই জন্য আমরা তাঁহারই মত গ্রহণ করিলাম।

* এই প্রবন্ধের মুদ্রণ প্রায় শেষ হওয়ার সময় আমরা দুর্গাবতী ও তদ্বংশীয়দিগের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিবরণ জানিতে পারি। নিম্নে তাহাদের কিছু কিছু প্রদত্ত হইতেছে। রামনগর মন্দিরের প্রস্তরফলক ও স্লীম্যানের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যাদব রায় নামে এক ব্যক্তি

রণজিৎসিংহ ও ইংরাজ।

(৪)

লর্ড অকল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় রণজিতের অত্যধিক ব্যসনা-সক্তিই তাঁহার অন্তিম পীড়ার কারণ হয়। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল

এই বংশের স্থাপয়িতা। তিনি এই রাজ্যের পূর্ব্বরাজা নাগদেবের কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করিয়া গঢ়ামণ্ডলার অধিকার লাভ করেন। ৪১৫ সম্বতে যাদবরায় রাজা প্রাপ্ত হন। স্লীম্যান ইহাকে বিক্রম সম্বৎ বলেন। কনিংহাম চেদি সম্বৎ বলিতে চাহেন। স্লীম্যান প্রস্তরফলক হইতে দলপৎ প্রভৃতির সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তরফলকানুসারে সম্বৎ ১৬০৫ বা ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে দলপতের মৃত্যু হয়। প্রথম রাজত্ব হইতে তাঁহার রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ১১৯০ বৎসর। বীরনারায়ণ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দলপতের মৃত্যুর সময় তাঁহার ৩ বৎসর বয়স ছিল। তাহা হইলে ১৮ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে আসফ খাঁর গঢ়া আক্রমণ স্থির হয়। প্রস্তরফলক ও স্লীম্যানের বংশতালিকায় গোরক্ষদাসের উর্দ্ধতন পুরুষের নাম দাদিরায় ও রাজসিংহ আছে। কিন্তু আকবর নামায় খরজী ও সুখনদাস আছে। দলপৎ ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পূর্ব্বে আর এক জনের সহিত দুর্গাবতীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দলপতের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। দলপতের বংশমর্যাদা হেয় হওয়ায় তাঁহার সহিত বিবাহ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। পরে দলপৎ সসৈন্যে মহোবা আক্রমণ করিয়া দুর্গাবতীকে লাভ করেন। গোপালপুর গ্রামে নর্ম্মদাতীরস্থ এক মন্দিরে এই বিবাহ হয়। বিবাহে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই বিবাহ হইতে দলপতের গুরুবংশীয়েরা বাজপেয়ী উপাধি লাভ করেন। তাঁহারা এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন। অধর রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী গঢ়ার নিকট রাণীতাল, তাঁহার এক ধাত্রী চেড়ীতাল ও অধর অধর তাল নামে পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুবংশীয় চূড়ামন বাজপেয়ীর সাহায্যে চন্দ্রসাহী গঢ়ামণ্ডলের রাজ্য লাভ করেন। স্লীম্যান গঢ়াকে উক্ত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী বলেন, কিন্তু কনিংহাম তাহা স্বীকার করেন না। চৌরাগড় সংগ্রামসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি গঢ়ার নিকট সংগ্রামসাগর পুষ্করিণী ও এক ভৈরব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরনারায়ণের পর মণ্ডলা উক্ত রাজ্যের রাজধানী হয়। স্লীম্যান দুর্গাবতী সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—"And of all the sovereigns of this dynasty she lives most in the page of history, and the grateful recollections of the people." (A. S. J. Vol V. 627.)

মণ্ডলার নিকটস্থ রামনগর মন্দির উক্ত রাজবংশীয় হৃদয়েশ্বর রাজার রাণী সুন্দরী কর্ত্তৃক ১৭২৪ সম্বৎ বা ১৬৬৭ খৃঃ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার প্রস্তরফলক মণ্ডলা নগরের মতিমহালে রক্ষিত হইয়াছে। Captain E. Fell সাহেব কর্ত্তৃক এই প্রস্তরফলকের অনুবাদ Asiatic Researches এর পঞ্চদশ খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহা হইতে দুর্গাবতী প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

"13. To whom was born Sangram-Shahi, who was the fire of general destruction to the heaps of his cotton-like foes, and upon the

পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশাদির সহিত রাজপ্রাসাদের আমোদ প্রমোদের সংমিশ্রণে একরূপ কাটিয়াছিল। কিন্তু দেহ আর কত অত্যাচার সহ্য করিতে পারে? ক্রমে পক্ষাঘাত দেখা দিল। কিছু সুস্থ হইয়াই অল্পদিন মধ্যে পুনরায় সুরা ও

appearnace of whose majesty pervading the universe, the mid-day sun became as a spark.

"14. Wishing to conquer this whole earth, he destroyed fifty-two fortresses, (considered) impregnable, by their ramparts, and bastions equalling the thunderbolt, and firm on the peaks of mountains.

"15. The son of this gem amongst monarchs was Dalapati of unsullied fame, whose renown the lord of serpents (Shesha) was long anxious to chant, but whose mouths could not completely accomplish his praise.

"16. Even those (princes) of morose dispositions continually embraced the dust of the feet of (this monarch), whose hands were always moist with the waters of charity, (who was) intent on his remembrance of Hari. The protector of those in his power and the guileless cherisher of his subjects.

"17. His consort, Durgavati was as prosperity itself to the fortunes of petitioners, beautiful, as the image of virtue, the acme (boundary) of the good fortune of this earth.

"18. Upon the dicease of the sovereign of the universe, she installed her son, the fortunate Viranarayan, three years old, in the seat of royalty.

"19. By her own renown famed in the three worlds, she made this whole earth, as it were, to change its appearance, by immensely high golden dwellings, as an unlimited splendid Hemachala, by the heaps of precious gems scattered everywhere, as a mine of innumerable jewels, and by the herds of frolicsome elephants, as possessing innumerable elephants of the lord of heaven.

"20. Surely, she who daily presented steeds, elephants, and millions of gold in unbounded charity, eclipsed by those high-famed acts the vast renown of the Kamadhenu.

"21. Always intent on the protection of her subjects, she herself mounted on an elephant, in every field of battle, conquering her powerful adversaries, rendered useless the Lokapalas.

নর্ত্তকীগণে মনোনিবেশ করিলেন। চলচ্ছক্তিহীন হইয়াও তিনি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন। অন্যের সাহায্যে অশ্বে আরোহণ করা বিরক্তিবোধে তিনি প্রথমতঃ নতজানু এক ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে পরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন। ফিরোজপুরে অন্যের বিনা সাহায্যে পাদচারণের চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি একটি ব্রিটিশ গোলাস্তূপের উপর পড়িয়া যান। এই সম্মিলনের সময় যদিও তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তথাপি তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু ও সতত প্রশ্নশীল জিহ্বার প্রভাব সকলকেই অনুভব করিতে হইয়াছিল। লাহোরে দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি বাক্‌শক্তি

"22. The fortunate Viranarayana of infinite fame, entered manhood; and the dignity of this prince diffused over the world, increased together with the portion of revenue requisite to be taken.

"23. In the course of time, a mighty chief was dispatched by Akbar powerful by the riches of the earth, and equalling Arjuna, for the tribute. He was disrespected by the prince.

"24 and 25. Upon a battle taking place, this illustrious warrior who made the earth bend beneath his vast army, and who had ever defeated his foes by his dreadful valour, was slain by hundreds of thousands of his adversary's arrows. Durgavati, who was mounted on an elephant severred her own head with scymiter she held in her hand: She reached supreme spirit, pierced the sun's orb (obtained salvation)."

কনিংহাম আসফ খাঁর গড়া আক্রমণ সম্বন্ধে একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"The story runs that the king of Delhi, when passing by Singorgarh saw a lamp burning on the top of the fort. He asked whose palace it was; and on being told that it was the palace of a Rani, he sent her a golden "cotton gin" (*charkha*), as an appropriate present. In return, Durgavati sent him a *pinjan*, or "cotton bow," for cleaning or teasing cotton wool. This well-deserved retort so enraged the King, that he marched at once with his whole army to fight the queen." (Archœological Survey of India vol IX P. 55.) এই প্রবাদের কিছু মূল থাকিলে আসফ খাঁর দিল্লীশাসন সময়ে উহা ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে তৎক্ষণেই তিনি গড়া আক্রমণ করেন নাই। করা-মাণিকপুরের শাসন কর্ত্তা হইয়া রাণীকে দমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। সম্ভবতঃ উক্ত অপমান তিনি কিছু কাল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন।

হীন হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পঞ্জাবের একাধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতেই তিনি ইঙ্গিত দ্বারা যুদ্ধাদির সংবাদ লইতেন ও আজ্ঞাদি প্রদান করিতেন। যখন দেশীয় ও বিদেশীয় সকল চিকিৎসাই বিফল হইল দেখিলেন এবং জ্বর ও উদরী তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল, তখন তিনি বহু অর্থব্যয়ে পুরোহিতদিগকে আহ্বান করিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়নের দ্বারা আরোগ্যলাভের চেষ্টা পাইলেন। দেব মন্দিরাদিতে বহুতর অশ্ব, হস্তী, স্বর্ণ আসন ও ভূরি অর্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যু-দিনে—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে—এক কোটি মুদ্রা দরিদ্রদিগের নিমিত্ত রাজপথে ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি বহুমূল্য কোহিনুরটি শ্রীশ্রীজগন্নাথে দেবের মন্দিরে প্রেরিত হইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ রাজমুকুটের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সে আজ্ঞা পালিত হয় নাই।

সন্ধ্যার সময় তাঁহার দেহের অবসান হয়। পর দিন প্রাতঃকালে শবদেহ গঙ্গোদকে বিধৌত হইল এবং রাজসম্মানের সহিত বাহিত হইয়া দাহনস্থলে নীত হইল। শবদেহের পশ্চাতে পশ্চাতে রণজিতের চারি মহিষী বহু অলঙ্কার ও মণিমুক্তাদিতে বিভূষিতা হইয়া সুসজ্জিত শকটে যাইতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে পাঁচজন ক্রীতদাসী স্বল্প পরিচ্ছদে চলিল। দাহনস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রধানা মহিষী রামকুন্দন রণজিতের পুত্র, প্রপৌত্র ও প্রধান মন্ত্রীকে রণজিতের মৃতদেহ স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, তাহারা পরস্পরে মিলিত থাকিবে ও খালসাদিগের প্রতি আসক্ত থাকিবে। ইহার যদি অন্যথা হয় তাহা হইলে সতীর অভিশাপে সহস্রগোবধজনিত মহাপাপে তাহারা লিপ্ত হইবে। তদনন্তর মহারাণী চিতায় আরোহণ করিয়া রণজিতের মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বসিলেন। অন্যান্য মহিষীরা ও ক্রীতদাসীরা চতুর্দ্দিকে ঘিরিল। দাসীদিগের মধ্যে কয়েকজন সদ্যক্রীত ও নিতান্ত বালিকা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। শিখা বিস্তার করিয়া অগ্নি উর্দ্ধে উঠিল, পতিব্রতা রমণীগণের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ক্ষণেক মাত্র দৃষ্ট হইল, অগ্নি ও

ধূম্ররাশি সকলই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজ ও তাঁহার মহিষীগণ ও দাসীগণের দেহসকল ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইল। এইরূপে রণজিতের জীবনলীলার অবসান হইল। অশিক্ষিত ও কুরূপ হইয়াও তিনি একমাত্র নিজের প্রতিভাবলে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পুর্ব্বেই সমস্ত পঞ্জাবের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যস্ত স্বাধিপত্যে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম আটান্ন বৎসর হইয়াছিল এবং যখন তিনি মাতার আধিপত্য দূরে পরিহার করিয়া আপনার বাহুবলে রাজপদলাভের জন্য দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র। সেই বৎসর তাঁহার জন্মদিনের পূর্ব্ব পর্য্যস্ত তিনি মাতার অধীন ছিলেন। তাঁহার মাতা দেওয়ান মহাশয়ের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। রণজিৎ লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না এবং সে সময়ের সকল দোষই তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার এক চক্ষু ও কুৎসিত রূপ দেখিয়া কেহই তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও দৃঢ় স্বভাবের পরিচয় পায় নাই। কিন্তু সপ্তদশ বর্ষ তাঁহাদিগের বংশের বিষম সময়। ঐ বয়সে তাঁহার পিতাও মাতার অধীনতা ছেদন করিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করিয়াছিলেন। রণজিৎও তাহাই করিলেন। ঐ বয়সে তিনিও স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। মাতা ও তাঁহার দেওয়ান মহাশয়ের হত্যা সংসাধিত হইল, এবং লাহোর উহার অলস শাসনকর্ত্তাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। তাঁহার অস্তিত্ব সুদূর কলিকাতাস্থ ভারতগবর্ণমেণ্টের গোচর হইবার পূর্ব্বেই তিনি পঞ্জাবের প্রধান রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সকল রাজন্যবর্গই তাঁহাকে ভয় ও সম্মান করিত। বোধ হয় তাঁহার কুরূপের ক্ষতিপুরণ স্বরূপেই তিনি স্বভাবতঃই দৃঢ়কায়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার শত্রুদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে চাতুর্য্যে, শঠতায় ও ক্ষমতায় ছাড়াইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তায় তিনি তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। পঞ্জাবের অন্যান্য রাজন্যবর্গের এই সকল গুণের অভাবেই রণজিৎ তাহাদিগের অধীশ্বর হইয়া-

ছিলেন। বন্ধু, শত্রু ও সর্ব্বাপেক্ষা খালসাগণ তাঁহার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি অতি অল্পকাল মধ্যেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়াই ও তাঁহার মতে অমত থাকিলেও সকলে রণজিতের মতা-বলম্বন করিতেন। রণজিৎ যে কার্য্য করিতেন, সকল বিষয়েই তিনি 'স্বয়ংই উপদেষ্টা এবং যৌবন কাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি আজ্ঞাদান করিতেই জন্মিয়াছেন ও অপরে উহা বহন করিতে জন্মিয়াছে ইহাই বোধ হইত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সৈন্য বিভাগের পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনায় রণজিৎ বহু বিদেশীয়কে উচ্চপদ দেন ও বহু সংখ্যক হিন্দুস্থানী, গুরখা প্রভৃতিকে সৈন্য-স্বরূপে নিযুক্ত করেন, ইহা ব্যতীত তিনি ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই সকল তাঁহার প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ অনভিমতে হইলেও তাহারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রতি অন্ধবিশ্বাসে কিছুতেই বাধা দেয় নাই। অধিক বয়সে তাঁহার সঞ্চয়স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শিখ ও মুসল্মান সকলের নিকট হইতে অর্থশোষণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দগড় রাজকোষে কোটি কোটি মুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও তিনি সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন সমস্ত দিতেন না। তাহারা বিদ্রোহী হইলে তিনি কিছু কিছু দিয়া থামাইতেন। রণজিৎ এরূপ কৃপণ হইলেও দানশীল ছিলেন। তাঁহার প্রশংসাকারিগণ বলিতেন যে, তিনি এক দিনে একশত গ্রাম অধিকার করিয়া পর দিবস একটি মৌখিক আজ্ঞায় সমস্তই অপরকে দান করিতেন। তাঁহার সর্দ্দার ও তহশীলদারগণ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন—কিন্তু তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে কিংবা কোন কারণে তাঁহারা সম্মান হারাইলে তিনি তাঁহাদিগের গৃহ সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত হিসাব মিলাইয়া লইতেন। যখন যে কার্য্যে থাকুন না কেন, সততই তিনি খালসা-গৌরবের জন্য ব্যস্ত একজন সৎশিক্ষকের ন্যায় ভাব দেখাইতেন। তিনি যে পাঁচলক্ষ মাত্র খালসাকে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাদিগের নিকট তিনি যে ধন্যবাদার্হ ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিখই খালসাদিগের ন্যায় অধিকার পাইত, তাহাদিগকেও কর দিতে হইত না ও তাহারা অত্যাচার ও পরদ্রব্যলুণ্ঠন দ্বারা

দিনপাত করিত। তাঁহার রাজত্ব কেবল মাত্র অত্যাচারপূর্ণ। প্রজাদিগের প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার ছিল না। তিনি ও তাঁহার প্রজাগণ তাহাদিগের অজ্ঞানতার গৌরব করিত। তাঁহার সময়ে পঞ্জাবে বিচারালয়, বিদ্যালয় কিম্বা কারাগার ছিল না। ধনীদিগের অর্থদণ্ড ও দরিদ্রের হস্তপদাদি কর্ত্তন করা হইত। তাঁহার মৃত্যুর বহু পর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের অনেক নগরে হস্তপদবিহীন অনেক ব্যক্তিকে রণজিতের নিষ্ঠুরতার নিদর্শনস্বরূপ দেখা যাইত। তিনি কখনও পথ, সেতু, খাল কিংবা জলাশয়ের সংস্কার কি নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্গ ব্যতীত সাধারণের উপকারার্থ কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই, এবং যে সকল বর্ত্তমান ছিল, তাহাদিগকেও ধ্বংসমুখে পতিত হইতে দেওয়া হইয়াছিল। নগর সকল পর্ণকুটীর ও ভগ্ন প্রাসাদের সমষ্টি মাত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং শিখদিগের গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য গ্রামগুলি ভগ্ন মৃণ্ময় প্রাচীর বেষ্টিত গুহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। খালসা ব্যতীত অন্যান্য কৃষিব্যবসায়িগণকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করা হইত। দেশটিকে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক জেলায় দশ হইতে চারি শত পর্য্যন্ত গ্রাম থাকিত। সকল গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রয়োজন হইলে প্রজাদিগের নিকট হইতে গৃহীত দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রীত হইত, অথবা পুরোহিত কিম্বা জায়গীরদারদিগকে দান করা হইত। কর দেওয়া হইলে মহারাজ, জায়-গীরদারগণ কিংবা রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ কেহই আর প্রজাদিগের জীবন মরণের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতেন না। রণজিৎ নিজে যেন কখন মৃত্যুমুখে পড়িবেন না, এরূপ ভাবেই কার্য্যাদি করিতেন। তিনি রাজ্যে চিরশান্তি স্থাপনের জন্য কোন উপায়ই করিতেন না। এই হেতু তাঁহার মৃত্যুর পরেই চল্লিশবৎসরস্থায়ী তাঁহার প্রতিভারক্ষিত রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

আজ কালিকার হিসাবে দেখিতে গেলে রণজিৎ রাক্ষসের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু সে সময়ের শিখ কি এতদ্দেশীয় ইংরাজ কাহারও মধ্যে নীতি বলিয়া কিছু প্রচলিত ছিল না। সে সময়ে ইংলণ্ডেও সুরাপানে মত্ত হওয়া বিশেষ দোষের ছিল না। এই নিমিত্ত ইংরাজগণ রণজিতের দোষ ধরিতেন না এবং রণজিতের

স্বদেশবাসিগণও প্রত্যেকেই সুবিধা পাইলে রণজিতের ন্যায় অত্যাচারী হইতে ত্রুটি করিতেন না।

রণজিৎ তাঁহার বহুদোষ ও দুষ্টবুদ্ধিসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রজা-দিগকে একটি জাতিতে পরিণত করেন, এবং একটি সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক বহুদিন উহা শাসন করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজের সহিত তাঁহার সৌখ্যবন্ধনও ছিল। তিনি যে সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর অরাজকতা ও অধিনায়কের অভাবের মধ্যেও ইংরাজের সহিত সমান ভাবে বহু যুদ্ধ করিয়া ইংরাজকে পরাজিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল।

(সমাপ্ত।) শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।

জগৎশেঠ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

নবাব সুজাউদ্দীনের জীবনকালেই তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের সহিত সরফরাজের মনোমালিন্যের সূচনা হয়। ইহার কারণ এই যে, সেই সমস্ত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা প্রবল থাকায়, সরফরাজ তাহা অসহ্য বিবেচনা করিতেন, এবং উক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের প্রতিও সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কাজেই সরফরাজকে তাঁহারাও তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। আলিবর্দ্দি ও হাজী আহম্মদ অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার বিশালরাজ্য করায়ত্ত করার ইচ্ছা করিতেছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দীন জীবিত থাকিতে তাহা পারিয়া উঠেন নাই। সরফরাজ তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহাদের অসীম ক্ষমতার জন্য ঈর্ষ্যান্বিত ও শঙ্কিত হইতেন; এবং তাঁহাদিগকে আপনার

কণ্টকস্বরূপ মনে করিতেন। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের, উক্ত দুই ভ্রাতার ন্যায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহারা সরফরাজের ব্যবহারে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং হাজী ও আলিবর্দ্দির সদ্ব্যবহারে ক্রমে তাঁহাদের পক্ষপাতী হন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুজাউদ্দীন মৃত্যুকালে পুত্রকে আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। সরফরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ কিছুকাল তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের যুক্তি, পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যখন যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই করিতেন। সকলের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজকার্য্যেরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইহার উপর আবার সরফরাজ অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হওয়ায় রাজকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিতেন না। এইরূপ কথিত আছে যে, দেড় সহস্র রমণী তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী ছিল। নবাব অধিংকাশ সময়ই তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে যাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ যথেচ্ছাচরের জন্য রাজকার্য্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে আরম্ভ হয়, অনেক কর্ম্মচারী তাঁহাকে শাসনকার্য্যে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন। ক্রমে সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিশালরাজ্য অচিরেই তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হহবে। সরফরাজ খাঁ মাতামহের প্রিয়পাত্র থাকায়, তাঁহায় নিকট হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল বাহ্যিক মাত্র ছিল, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবল হওয়ায় তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য ব্যর্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। তিনি মাতামহের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও শাসনকার্য্যের অমনোযোগের জন্য রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

সরফরাজের সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। উজীর কামরউদ্দীন খাঁ নাদির শাহের আগমন ঘোষণা

করিয়া বাঙ্গালার সুবেদারের নিকট হইতে তিন বৎসরের রাজস্ব চাহিয়া পাঠান। সরফরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জগৎশেঠ, রায়রায়ান ও হাজী আহম্মদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। পরে এইরূপ স্থির হইল যে, রাজস্ব প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত নাদির শাহের নামে মুদ্রাঙ্কন ও উপাসনা মন্দিরে উপাসনাদিরও অনুষ্ঠান হয়। নাদির শাহ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে সম্রাট মহম্মদ শাহ সরফরাজের ঐ সমস্ত ব্যবহার অবগত হইয়া যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন, ও তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। এইরূপে চারিদিক্ হইতে সকলেই সরফরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় ক্রমে তাঁহার পতনের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ, হাজি আহম্মদ প্রভৃতি সকলের সহিত তাঁহার প্রকাশ্যভাবে মনোবিবাদ ঘটিতে লাগিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

রায়রায়ান্ আলমচাঁদ মন্ত্রিসভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, রাজস্ব বিষয়ের সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, সেই জন্য রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধে তিনি সমস্ত জ্ঞাত থাকিতেন। রায়রায়ান্ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সরফরাজের বিলাসিতা ও অমনোযোগিতার জন্য সরকারী অর্থের অপব্যয় হইতেছে, তখন তিনি নবাবকে সতর্ক করা আবশ্যক মনে করিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন সর্ব্বদাই আলমচাঁদের পরমর্শানুসারে কার্য্য করিতেন, রায়রায়ান অনেক সময়ে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দান করিয়া রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। সেই জন্য সুজাউদ্দীন মুক্তহস্ত ও অমিতব্যয়ী হইয়াও কখন অর্থের একেবারে অপব্যয় ঘটাইতেন না, তিনি সরফরাজকে অযথা অর্থব্যয় হইতে হস্তসঙ্কোচ করার জন্য বারংবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। সরফরাজ তাঁহার সমস্ত উপদেশ অমান্য করিয়া পরিশেষে রায়রায়ানের যারপর নাই অববাননা করেন। বৃদ্ধ আলমচাঁদ উদ্ধত নবাবের এই প্রকার অপমান সহ্য করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করিলেন না, ক্রমে তাঁহার ব্যবহারে যারপর নাই বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরেই জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত সরফরাজের ঘোরতর মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। এই মনোবিবাদসম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়া থাকেন, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতপচাঁদের সহিত একটি লাবণ্যবতী বালিকার বিবাহ হয়. তৎকালে ধনকুবের জগৎশেঠ-বংশীয়-গণের নাম ভারতের সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইত, কাজেই শেঠজাতীয়েরা সকলেই জগৎশেঠবংশের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। জৈন সম্প্রদায়মধ্যে যে সমস্ত সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহারা প্রায়ই জগৎশেঠদিগের কুলবধূরূপে আনীত হইত। বিশেষতঃ জগৎশেঠগণ জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বিষয়েও শ্রেষ্ঠ হওয়ার তাঁহাদের পক্ষে আদান প্রদানের কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইত না। মহাতপচাঁদের সহিত যে বালিকার পরিণয় সংঘটিত হয়, তৎকালে তাহার ন্যায় সুন্দরী কন্যা এতদঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। এরূপ রূপবতী কন্যা যে শেঠবংশের গৃহলক্ষ্মী হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মহাতপচাঁদের বিবাহ মহাসমারোহে সংসাধিত হইয়াছিল। ফতেচাঁদ পৌত্রের বিবাহে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সেরূপ সমারোহ মুর্শিদাবাদের লোকেরা অতি অল্পই দেখিয়া থাকিবে। উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হইলে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার প্রসঙ্গ লইয়া মুর্শিদাবাদের সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার অলৌকিক লাবণ্যের কথা নবাব সরফরাজের কর্ণগোচর হয়। সরফরাজ তাহার রূপপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া এতদূর কৌতূহলপরবশ হইয়া পড়েন যে, সেই বালিকাকে দেখিবার জন্য যার পর নাই উৎসুক হন। কিন্তু সে যে পরিণীতা ও সম্ভ্রান্তবংশের গৃহবধূ সে বিষয়ে বিবেচনা করার ক্ষণমাত্র অবকাশ পাইলেন না। নবাব প্রথমতঃ জগৎশেঠকে আহ্বান করিয়া পাঠান। জগৎশেঠ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, সরফরাজ সেই বালিকার দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, নবাবের সেই ভয়াবহ প্রস্তাব শুনিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ জগৎশেঠের মস্তকে অশনিসম্পাত হইল। তিনি নবাবকে উক্ত বিষয় হইতে

প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য বারম্বার প্রার্থনা ও নানাপ্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠ নবাবকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন যে, নবাব এই প্রস্তাব পরিহার না করিলে জগৎশেঠবংশের সম্মান ও মর্য্যাদার যার পর নাই হানি হইবে, এবং তাঁহার বংশ চিরকাল কলঙ্ক বহন করিয়া স্বজাতীয়গণের মধ্যে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। নবাবের নিকট এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ জগৎশেঠের চক্ষুঃ অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু নবাব তাঁহার প্রার্থনায় বা অশ্রুবর্ষণে বিচলিত না হইয়া জগৎশেঠের বাটী বেষ্টন করার জন্য কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যকে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু জগৎশেঠের নিকট পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পৌত্রবধূকে পাঠাইয়া দিলে, নবাব একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে জগৎশেঠের ভবনে পৌঁছাইয়া দিবেন। জগৎশেঠ যখন দেখিলেন যে, নবাব কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে নবাব নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাঁহার গৃহবধূকে আনয়ন করিবেন, এবং উক্ত ব্যাপার লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহার বংশের কলঙ্ক দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং এরূপ স্থলে গোপনে উক্ত বালিকাকে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিবেচনা করিয়া জগৎশেঠ নবাবের প্রস্তাবে পরিশেষে সম্মতি প্রদান করিলেন।

রাত্রিযোগে গুপ্তভাবে সেই বালিকারত্ন নবাবের নিকট আনীত হইলে, নবাব তাহার অসামান্য রূপ-সুধাপানে দর্শনেন্দ্রিয়ের পিপাসামাত্রই নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সরফরাজ কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়াই সেই বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহার দর্শনমাত্র করিয়াই তাহাকে স্পর্শ না করিয়া স্বভবনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু সেই বালিকা নবাব প্রাসাদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাহার স্বামী তাহাকে নিজের গৃহলক্ষ্মী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাধ্য হইয়া নবাব সরফরাজের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেও তিনি নবাবের প্রতি মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন।

জগৎশেঠ আত্মবংশের এই অবমাননার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সেই অবধি জগৎশেঠবংশ নবাব সরফরাজের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠে। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ শত্রুতাচরণ না করিলেও, গোপনে নবাবের অনিষ্টকামনায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথা। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত বর্ণনা কতদূর সত্য বা বিশ্বাস্য তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। যে সমস্ত দেশীয় গ্রন্থে সরফরাজের রাজত্বকাল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই মুতাক্ষরীন্, তারিখ বাঙ্গালা অথবা রিয়াজুস্ সলাতিন্ প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত ঘটনার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না, অধিকন্তু শেঠবংশীয়েরা সরফরাজের সহিত ফতেচাঁদের বিবাদের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনার কোনরূপ মূল বা ভিত্তি আছে বলিয়া বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আবার তাহাতে অলঙ্কার সংযোগ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরফরাজ কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়াই জগৎশেঠের গৃহবধূকে দর্শন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সরফরাজের কৌতূহলের সহিত ইন্দ্রিয়-লালসা জড়িত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাদের লিখিত বিবরণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ইন্দ্রিয়লালসার কথা উল্লেখ করা তাঁহাদের যারপরনাই অসঙ্গত হইয়াছে। * ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, তৎকালে উক্ত বালিকার বয়স একাদশ বর্ষেরও ন্যূন ছিল, অথচ সেই বালিকার প্রতি,

* আমরা নিম্নে ২।১ জন প্রাচীন ঐতিহাসিকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে সাধারণে তাঁহাদিগের উক্তির যাথার্থ্য বিচার করিতে পারিবেন। "He (Futtuaahchand) had about this time married his youngest grandson named Seet Mortab Roy, to a young creature of exquisite beauty, aged about eleven years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust (?) for possession of her ; and sending for Juggaut Seet demanded a sight of her.—The old man (then complete four score) begged and entreated, that the Soubah would not stain the honour and credit of his house, nor load his last days with shame, by persisting in

সরফরাজের ইন্দ্রিয়বিকার হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই। সরফরাজ তখন অল্পবয়স্ক যুবা পুরুষ নহেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহার সেই

a demand which he knew the principles of his caste forbid a compliance with. . . .

"Neither the tears nor remonstrances of the old man had any weight on the Soubah, who growing outrageous at his refusal ordered in his presence his house to be immediately surronuded with a body of horse and, swore on the khoran that if he complied in sending his grand-daughter, that he might only see her, he would instantly return her without any injury. The Seet reduced to this extremity, and judging from the Soubah's known impetuosity, that his persisting longer in a denial would only make his disgrace more public, at last consented; and the young creature was carried with the greatest secrecy in the night to visit him. She was returned the same night, we will suppose (for the honour of that house) uninjured; be this as it may, the violence was of too delicate a nature to permit any future commerce between her and her husband.

"The indignity was never forgiven by Juggaut Seet and that whole powerful family, consequently became inveterate, though, concealed enemies to the Soubah" (Holwell's Interesting Historical Events, Part 1 Chap 2 pp. 76—77.)

"His (Juggut Seet's) eldest son, soon after the disgrace of Alumchand married a woman of exquisite beauty, the report of which alone inflamed the curiosity of the Nabab so much that he insisted on seeing her although he knew the disgrace which would be fixed on the family by showing a wife, unveiled, to a stranger. Neither the remonstrances of the father, nor his power to revenge the indignity, availed to divert the Nabab from this insolent and futile resolution. The young woman was sent to the palace in the evening; and after staying there a short space returned, unviolated indeed, but dishonoured to her husband. (Orme's Indostan, Madras reprint Vol II p. 30) হলওয়েল দশ বৎসরের বালিকা জন্য সরফরজের ইন্দ্রিয়লালসার কথা লিখিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহার চরিত্রনাশে সন্দেহ করিয়াছেন; দশ বৎসরের বালিকার চরিত্র নষ্ট করা এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব কিনা সাধারণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অর্ম্মে বালিকার স্থলে woman কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, যদি একস্থলে তাহার young বিশেষণটীও দিয়াছেন, তাঁহার unviolated কথায়ও সরফরাজে প্রতি কটাক্ষ করার ভাব বুঝা যাইতেছে।

দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি ইন্দ্রিয়-লালসার সঞ্চার হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে বিংশতিবর্ষীয়া রমণীগণও বালিকাপদবাচ্য হইয়া থাকে, সেই দেশের ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে একটী দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি জনৈক প্রৌঢ়-সীমাবর্ত্তী পুরুষের ইন্দ্রিয়বিকারের কথাটা কিরূপে নির্গত হয় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি তাঁহারা এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে বলা যাইতে পারে। কারণ, এ দেশেও ঐরূপ ঘটনা সচরাচর উপস্থিত হয় না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারিবেন যে, নবাব সরফরাজ খাঁ কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই সেই বালিকাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

জগৎশেঠের সহিত নবাব সরফরাজ খাঁর বিবাদ উপস্থিত হওয়ার যে কারণ ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক উল্লিখিত হইল, এবং দেশীয় কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায় তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত কারণে সন্দিহান হওয়ার আর একটী কারণ আছে। শেঠবংশীয়েরা তাঁহাদিগের উক্ত বর্ণনা একেবারেই স্বীকার করেন না। জগৎশেঠবংশের যে প্রচলিত বিবরণ আছে, তাহার কোনস্থলে এরূপ ঘটনার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে, শেঠবংশীয়েরা আপনাদের বংশের কলঙ্ক গোপন করার জন্য উক্ত বিষয়ের কিছুই স্বীকার করেন না, তাহা হইলে দেশীয় গ্রন্থাদিতে উহার কোন উল্লেখ না থাকায় শেঠদিগের প্রচলিত বিবরণ অনেকটা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা ফতেচাঁদের সহিত সরফরাজের বিবাদ হওয়া অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ শেঠদিগের গদীতে টাকা গচ্ছিত রাখিতেন, সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকার অর্থই মহিমাপুরের গদীতে রাখিতে হইত, এ কথা আমরাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নিজের সাত কোটি টাকা

শেঠদিগের গদীতে গচ্ছিত ছিল, তিনি অথবা নবাব সুজাউদ্দীন কখনও তাহা ফিরাইয়া লন নাই। সরফরাজ ইহার সংবাদ জানিতে পারিয়া জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। কি ফতেচাঁদ তাহা একেবারে অস্বীকার করায়, সরফরাজ তাঁহার প্রতি যারপর-নাই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হন, এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে চেষ্টা করেন। জগৎশেঠও সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। শেঠবংশীয়দিগের কথিত বিবরণ জগৎশেঠ নবাবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে নিতান্ত সামান্য কারণ নহে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ না করা শেঠবংশীয়দিগের পক্ষে যারপর নাই অন্যায় কার্য্য হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উক্ত ঘটনা প্রকৃত হইলে উহা জগৎশেঠবংশের একটি প্রধান কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত টাকা গচ্ছিত থাকার যদি কোন প্রমাণ না থাকে অথবা তাহা প্রকৃত না হয়, এবং যদি নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠের প্রতি অন্যায় রূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা যে তাঁহার পক্ষে যারপর নাই নিন্দার বিষয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, এবং তাঁহার অন্যায় ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া জগৎশেঠের তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে ফতেচাঁদ যেভাবে সরফরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহারও সমর্থন করা যায় না। শেঠদিগের কথিত উক্ত বিবরণও দেশীয় কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইহাও কতদূর সত্য তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। এই দুই বিবরণের মধ্যে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের কথিত বিবরণ গুরুতর হওয়ায়, দেশীয় কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায় উক্ত ঘটনার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া পড়ে এবং শেঠদিগের বর্ণিত বিবরণ সম্ভবতঃ দেশীয় গ্রন্থকারেরা তেমন গুরুতর মনে না করিয়া আপন আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু নবাব ও জগৎশেঠের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে উহা নিতান্ত সামান্য কারণ নহে। ফলতঃ যে কারণে হউক, সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া জগৎশেঠ

ফতেচাঁদ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন, এবং যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

* আমরা দেখাইয়াছি যে কি কারণে সরফরাজ ও জগৎশেঠের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত বিবরণ যে ভিত্তিহীন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু রহস্যের বিষয় এই যে, উক্ত ঘটনাকে অন্য আকারে চিত্রিত করিয়া সরফরাজের কলঙ্করাশি আমাদের বঙ্গকবি সিরাজের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। "পলাশীর যুদ্ধে" কবি জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের মুখ হইতে এইরূপ উক্তি বাহির করিয়াছেন :—

"বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।"

এখানে "পাপী" ও "দুষ্ট দুরাচার" সিরাজকে বলা হইয়াছে, অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের লিখিত সরফরাজ ও জগৎশেঠ কাহিনীই এই ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সরফরাজের স্থলে সিরাজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহার বালিকা জগৎশেঠ-বধূকে প্রাসাদে আনায়নের পরিবর্ত্তে তিনি বেগমের বেশ ধারণ করিয়া জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রদীপ্ত বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছেন। তবে মহাতপচাঁদের বধূ বা কুল উভয়ত্র একই আছে বলিয়া আমরা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিতেছি। কি ক্ষণে সিরাজউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! ইংরাজী, ফারসী বা বাঙ্গালা ইতিহাসে এমন কি বাঙ্গালা কাব্যেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে যাহার যে কোন দোষ ছিল, তাহাই সিরাজের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা যে যারপর নাই পরিতাপের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য। কাব্যের সাত খুন মাপ সত্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে কয় খুন মাপ সঙ্গত তাহাও বিবেচ্য।

সিরাজ-সমাধিদর্শনে।

কোন্ শান্তি-সাধনায় মগ্ন তুমি আজ,
হে বঙ্গ-গৌরব-রবি নবাব সিরাজ!
পার্শ্বে তব মাতামহ আলীবর্দ্দী খান,
জুড়া'তে তোমার ক্লান্ত অনুতপ্ত প্রাণ
--তোমারি ভগন স্থরে মিশাইয়া তান,
গাহিছে অনন্ত-গীতি। এ খোশবাগান
ব্যথিতের অশ্রুজলে দিতেছে প্লাবিয়া
পথিক দাঁড়ায় আসি স্তম্ভিত হইয়া!
হে সিরাজ! মহাবীর ইস্লাম-রতন,
সুপ্ত শান্তিবাসে হায় বসি অনুক্ষণ
এখনো কি ভাব দেব আমাদের তরে,
এখনো কি বঙ্গ-রাজ্য কভু মনে পড়ে?
নিয়তির কাল-চক্রে হইয়ে পতিত,
যদিও হে হ'লে তুমি অকালে নিদ্রিত,
তথাপি ওখান হ'তে ক'রো আশীর্ব্বাদ,
যেন মোরা ভু'লে যাই সন্তাপ বিষাদ!
শান্তিদেবী নিত্য আসি দিন দরশন,
তুমিও ভুলিয়া যাও "সংসার স্বপন"!
পথিকের দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রুজলে
দয়া করে উপহার লও পদতলে!

শেখ জমিরুদ্দীন—ইস্লাম-প্রচারক।

"শের আফগান্ ও শেরসাহ কি অভিন্ন?"

(ইতিহাসের কথা)

১৩০৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা "সাহিত্য". পত্রিকায় ৫৮৯ পৃষ্ঠার ফুট্ নোটে সুযোগ্য "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয় প্রশ্নবোধক একটী টিপ্পনী করিয়াছেন। উক্ত টিপ্পনীর কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম, শ্রীযুত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় "সাসারামের রোজা" শীর্ষক প্রবন্ধে শেরসাহ প্রসঙ্গে কয়েকটী অনৈতিহাসিক উক্তির অবতারণা করিয়াছেন, প্রতিবাদের সৌকর্য্যার্থ সেই উক্তিগুলি আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"শেরসাহ নানাশাস্ত্রে, নানাবিদ্যায় ও নানাভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বাবর, আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান্ সম্রাট্ মুসলমানদিগের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না।......তাঁহার (শেরসাহের) প্রকৃত নাম ফকির উদ্দীন, শেরসাহ তাঁহার উপাধি মাত্র। তিনি অনেকবার ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন এজন্য শেরসাহ উপাধিতে অভিহিত হইতেন। জগদ্বিখ্যাতা নুর্জাহান সর্ব্বপ্রথম ইঁহারই বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। ষড়যন্ত্রের ফলে নুর্জাহান পরিণামে অপর পুরুষের হস্তগতা হয়েন। শেরসাহ প্রথমে দিল্লীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সেনাপতি ছিলেন, তদনন্তর বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। ফকির উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া অতি সামান্যকাল রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রে তিনি দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করিতে বাধ্য হয়েন। এবার তিনি বেহারে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সাসারামকে দার-উল-সুলতানা (রাজধানী) বলিয়া ঘোষণা করেন। সসারামে শেরসাহের মৃত্যু হয়।......হোসেন সুর সাহ ফকিরুদ্দীন সেরসাহের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন।"

"সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের ঐ প্রশ্নবোধক টিপ্পনী ব্যতীত পূর্ণ দুই বৎসরের মধ্যে উপরোদ্ধৃত বিষয়ে কেহ কোন কথা বলেন নাই বলিয়াই

আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে উক্তি গুলির অনৈতিহাসিকতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইলাম। মহাভারতী মহাশয় অতঃপর কিছু মনে করিবেন না।

১। "বাবর, আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান্ সম্রাট্ ভারতবর্ষীয় মুসলমান গণের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না।

বাবর ও তৈমুর বিদ্বান্ ছিলেন স্বীকার করিলাম। শেরসাহের তুলনা না হয় তাঁহাদের সহিতই দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আকবর যে এত বড় বিদ্বান্ ছিলেন কই! এ কথা ত কোন ঐতিহাসিকই বলেন না, বরং অনেক ইতিহাসে তদ্বিপরীত উক্তিই দেখিতে পাই। প্রমাণ—

Literary education he (Akbar) had but little."

A short History of Indian people, by A. C. Mukrjee M. A. B. L.

"It is a remarkable fact that some of the greatest names in modern Indian History like Alauddin, Akabar Sivaji, Hyderali and Ranajit Sing are names of men more or less illiterate."

R. C. Dutt, C. S. C. I. E.

২। "তাহার প্রকৃত নাম "ফকির উদ্দীন"।"

তাঁহার প্রকৃত নাম "ফকির উদ্দীন" নয়। 'ফরিদ' কিংবা 'ফরিদ উদ্দীন'। প্রমাণ—

"The original name of Sherkhan was Ferid."

Stewar's History of Bengal.

"তাঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ"

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস।

"The tomb built by himself by Sultan Fariduddin Shersha"

Tablet attached to the tomb of Shersha at Sasaram.

৩। "তিনি অনেকবার বাঘের সহিত লড়াই করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এজন্য শেরসাহ উপাধিতে অভিহিত হইতেন।"

এ উক্তিও ঠিক নয়। বাঘের সহিত লড়াই করিয়া তিনি শেরসাহ উপাধি পান নাই, শুধু "শের" আখ্যা পাইয়াছিলেন। প্রমাণ—

"তিনি স্বহস্তে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র বধ করিয়া "শের" আখ্যা পাইয়াছিলেন।"

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস।

'For this bold action he was honoured with the title of Sherkhan."

Stewarts History of Bengal.

'সাহ' উপাধি তিনি সম্রাট্ হইবার পর গ্রহণ করেন।

"Sherkhan who had already taken the title of "Shersha as token of Royal dignity".

A short History of Indian people, by A. C. Mukerjee. M. A. B. L.

"Shersha was known as Sherkhan before his accession to the Delhi throne.

Prof. Manna.

৪। "জগদ্বিখ্যাতা নুর্জাহান সর্ব্বপ্রথমে ইঁহারই (শেরসার) বিবাহিতা পত্নী ছিলেন।"

এটা নিতান্তই প্রলাপোক্তি। শেরসাহের অভ্যুদয়কাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, হুমায়ুন সার সময়ে। আর নুর্জাহানের ঘটনা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আকবর ও জেহাঙ্গীরের সময়ে। নুর্জাহান শের সাহের বিবাহিতা পত্নী নন্। তাঁহার স্বামীর নাম শের আফগান্ খাঁ। তিনি পারস্যদেশবাসী। দেশবাসী আকবর ইঁহারই হস্তে নুর্জাহানকে সমর্পণ করিয়া ইঁহাকে বঙ্গদেশে এক জায়গীর দিয়া দেন। পরে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১৬০৬ খৃঃ) ছলে, বলে, কৌশলে শের আফগান্ খাঁকে নিহত করিয়া নুর্জাহানকে হস্তগত করেন। প্রমাণ—

"Nnrjehan was bestowed on Sher Afgan khan—a young

Persian lately came in the service and whom Akabar gave a Jaigir in Bengal."

"Sherafgan took his revenge with his dagger and was himself immediately despatched by the attendants. Nurjahan was sent to Delhi in 1606."

Elphinstone's. History of India.

৫। "শের সাহ প্রথমে দিল্লীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সেনাপতি ছিলেন, তদনন্তর বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।"

শেরসাহ কখনও বর্দ্ধমানের শাসন কর্ত্তা হন নাই। নুর্জাহানের স্বামী শের আফগান্ খাঁই বর্দ্ধমানের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রমাণ—

"He (Sher Afgan khan) was appointed Governor of Burdwan."

E. B. Cowell. M. A.

৬। "নানা কারণে বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রে তিনি দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করিতে বাধ্য হয়েন।"

নানা কারণে বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রে তিনি (শেরসাহ) কখনও কাহারও দ্বারা দিল্লীর সিংহাসন হইতে তাড়িত হন নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং তাহার পরেও তাঁহার বংশধরগণ নির্ব্বিরোধে দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্রই এ উক্তির সমর্থন করিবে।

৭। "সাসারামে সের সাহের মৃত্যু হয়।"

সাসারামে শের সাহের মৃত্যু হয় নাই। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ-অবরোধকালে ভূগর্ভস্থ বারুদখানায় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া শেরসাহ দগ্ধীভূত হন। এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। প্রমাণ—

"During the siege of Kalinjor when Sher was superintending the battles, he was involved in the explosion of a maga-

zine which had been struck by the enemy's shot and was so scorched that although he survived for some hours his recovery was hopeless from the first and towards evening he expired."

Elphinstone's History of India.

৮। "হোসেন স্থর সাহ ফকিরুদ্দিন শেরসাহের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন।"

হোসেন স্থর সাহ সের সাহের কনিষ্ঠ সহোদর নহেন; তিনি সের সাহের পিতা। সের সাহের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম নিজাম খাঁ। নিজাম খাঁ ব্যতীত সের সাহের আরও কয়েকটী ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সের সাহের সহোদর ভ্রাতা নন্, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাত্র।—

'Shersha was the grandson of Ibrahim Khan, boath he (Ibrahim) and his son Hossan were married into noble families of their own nation. Hossan held a Jaigir in Sasaram. He had two Sons by his Afgan wife Sher Khan and Nizam Khan."

Elphinstone's History of Jirdia.

"His (Sherkhan's) father was Hossan. Hossan had eight Sons. Ferid and Nizam of one mother. The other sons were born of slaves."

Shewart's Histoy of Bengal.

ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া আমরা একে একে মহাভারতী মহাশয়ের উক্তি গুলির অনৈতিহাসিকতা প্রতিপাদন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস লইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিবেন। মহাভারতী-মহাশয় বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থপরিচিত। তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখকের লেখনীমুখ হইতে ঈদৃশ অনৈতিহাসিক উক্তি বাহির হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি ইতিহাস জানেন না কিম্বা প্রতিবাদের বিষয়ীভূত প্রবন্ধ রচনা-সময়ে ইতিহাসের কথা একেবারে বিস্মৃত হওয়ায় কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে করাও ধৃষ্টতামাত্র;

তবে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং" সুতরাং দুঃখের বিষয় হইলেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রুস-জাপান যুদ্ধ—সুদূর প্রাচ্যের সেই মহাসমরাগ্নি অদ্যাপি সমান ভাবেই প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। মুকডেনের নিকট উভয়পক্ষ সমবেত রহিয়াছে বটে, কিন্তু আর্থারবন্দরের ব্যাপারই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের অপরিসীম পরাক্রমে বীরবর ষ্টসেল আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। তিনি জাপান সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি জাপানসেনা বীরপরাক্রমে আর্থারবন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। জাপানের নবসূর্য্যাঙ্কিত বিজয় নিশান আজ আর্থার বন্দরে উড্ডীয়মান হইল। প্রায় এক বৎসর সোৎসাহে যুদ্ধ করিয়া অগণ্য সেনাকে সমরক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়া জাপান আর্থারবন্দর অধিকারে সক্ষম হইলেন। জাপানের এই অলৌকিক বীরত্ব চিরদিন জগতের ইতিহাসেই বিঘোষিত হইবে। চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপান আর্থারবন্দর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুসিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া জাপানের হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লন; এই অপমান জাপান এত দিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫খৃঃ অব্দের প্রথম দিবসে তাঁহারা সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়া আর্থারবন্দর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। নববর্ষের নব সূর্য্যালোকে জাপানের নব সূর্য্যদীপ্ত নব নিশান ঝলষিত হইয়া উঠিয়াছিল। রুসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও আর্থারবন্দর রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

জাতীয় মহাসমিতি—ডিসেম্বর মাসের শেষে এবার বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছে। ভারতহিতৈষী শ্রীযুক্ত সার হেনরি কটন মহোদয় এবার সভাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কটন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চিরদিনই তিনি ভারতের হিতকামনার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই জন্য জাতীয় মহাসমিতি তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। জাতীয় মহাসমিতির আমন্ত্রণে কটন মহোদয় ভারতে আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সারবতী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতিতে এবার অন্যান্য কার্য্যেরও সুন্দররূপ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার প্রদর্শনীয় বিষয় এবার উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনীর জন্য যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন। বরোদার গাইকোয়াড় প্রভৃতি ইহার জন্য যারপর নাই যত্ন গ্রহণ করিয়াছেন।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীমতী শিখরিণীর তিব্বত-কাহিনী বেশ চলিতেছে। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে ফরাসডাঙ্গার একখানি প্রাচীন দলিল প্রকাশিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন একটি আলোচ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে চিত্ত আকর্ষণ করে।

অগ্রহায়ণের সাহিত্যে কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভারতচন্দ্রের যুগে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষও সুখপাঠ্য।

অগ্রহায়ণের জন্মভূমির শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রীর ক্ষত্রিয় অধিকারে বঙ্গের সমাজিকতা একটি আলোচ্য প্রবন্ধ।

ইংরেজী।

জানুয়ারি মাসের Calcutta Review এ Major A. B. N. Charchill এর লিখিত Short Notes on the History of Fort William নামক প্রবন্ধে অনেক ঐতিহাসিক

কথার অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের Archœology in India একটি গবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

অগ্রহায়ণ মাসের Edinburgh Review এর The Reformation in England একটি আলোচ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

জানুয়ারি মাসের Quarterly Review পত্রের Bishop Stubbes, Horace Walpole and William Cowper, The making of the United States, the Tudors and the Navy, Mathew Arnold এবং the War in the Far East প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

Bishop Creighton ও Sweden প্রবন্ধেও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

জানুয়ারি মাসের Historical Review তে A. H. J. Greenidge এর লিখিত the Authenticity of the Twelve Tables, Right Hon. Sir Edward Fry এর লিখিত Roncesvalles ও J. F. Chance এর লিখিত the Northern Question in 1717 নামক তিনটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গলার এক খানি সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভারত-প্রতিভা গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহাতে শিবাজীর জীবন-চরিত থাকিবে।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সরফরাজ খাঁ।

জব চার্ণক ।

ভাগীরথীর স্বচ্ছসলিল প্রতিবিম্বিত করিয়া সৌধকিরিটিনী কলিকাতা বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে বিরাজ করিতেছে। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ভুবনসুন্দরী কলিকাতা অমরাবতীর শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে। ভারতসাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ-ভবন বক্ষে ধারণ করিয়া সেই রম্য মহানগরী অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুদৃঢ় দুর্গ— ফোর্ট উইলিয়মের বিজয়-বাদ্য ভাগীরথীর তরঙ্গ-লহরীকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্গশিখরস্থ বিজয়-কেতন অনন্ত আকাশের নীলিমা চুম্বন করিবার জন্য বায়ুসাগরে অবিরত সন্তরণ দিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকে সুধাধবলিত রম্য নিকেতনসমূহ গগন স্পর্শ করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিতেছে। বিশাল রাজপথসকল শকটভারে প্রপীড়িত হইয়া কোলাহল-ধ্বনিতে সমগ্র নগরীকে শব্দায়মান করিয়া তুলিতেছে। বিদ্যুতের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া অপূর্ব্ব যানসমূহ অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। নানা শোভায় শোভান্বিত হইয়া পণ্য বিথিকাগুলি চিত্ত হরণ করিতেছে। বাণিজ্য-লক্ষ্মী মণিমাণিক্যজড়িত সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যেন ইহাতে চিরদিনের জন্য অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশাল জলযানসমূহ ভাগীরথীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে যে, বাণিজ্যলক্ষ্মী তাহাদিগকে ভেদ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছেন না। পৃথিবীর নানা দেশের বণিক্‌গণ এই বিশাল নগরীতে আপনাদিগের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া অশেষ সম্পত্তির

অধীশ্বর হইয়া উঠিতেছেন। আজ জগতের অন্যান্য জাতি ইংরেজের গৌরব-ভিত্তি এই মহানগরীর রূপৈশ্বর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে।

যে কলিকাতা এক্ষণে সকলের চক্ষে দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও বনপরিপূর্ণ একটি সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার বক্ষে ইংরেজের জাতীয়-নিশান প্রোথিত হইয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিতে আরম্ভ করে। যাঁহার অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় কলিকাতার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই শক্তিশালী পুরুষের বিবরণ প্রদান করিবার জন্য এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। মোগলের অপরিসীম শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া, আরঙ্গজেবের কঠোর নীতির দ্বারা শাসিত হইয়া ও সায়েস্তা খাঁর নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন। আজ কলিকাতা ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী! আজ কলিকাতা অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত! যদি জব চার্ণক ইহাকে জগতের সমক্ষে আনয়ন না করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা সম্ভবতঃ চিরদিনই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও বনসঙ্কুল নিম্ন-ভূমিরূপে বিরাজ করিত। সুতরাং কলিকাতার সহিত জব চার্ণকের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সকলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, এই কলিকাতার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে অপরীসীম কষ্টভোগও করিতে হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার ভারতাগমন হইতে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

জব চার্ণকের জন্ম ও বাল্যলীলার বিষয় আমরা কোনরূপ অবগত নহি। ইংলণ্ডের কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ ও কি প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি ভারতবর্ষের জন্য শ্বেতদ্বীপ হইতে চিরযাত্রা করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন্ সময়েই বা তিনি ভারতবর্ষে প্রথমে সমাগত হন, তাহাও নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, চার্ণক ১৬৫৫ বা ৫৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে তাঁহার বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ-

লাভের জন্য প্রাচ্য দেশে আগমন করিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির স্বদেশীয়গণ তাঁহাদের অধীনে কার্য্যের প্রত্যাশায় আপনাদিগের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর প্রাচ্যদেশে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য জাতিকে পরাজিত করিয়া আপনাদের আধিপত্যবিস্তারে প্রয়াসী হন। তাঁহারা তজ্জন্য দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট অনুনয়বিনয় ও বলপ্রদর্শনেও ক্রটি করেন নাই। ইংরেজ কোম্পানীর এইরূপ আধিপত্যবিস্তারের সময় জব চার্ণক ভারতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অধীনে নিযুক্ত হন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রথমতঃ কাশীমবাজার ইংরেজ কুঠীর জুনিয়ার মেম্বর রূপে দেখা যায়। সেই সময়ে কেন্ কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য তিন জন সহকারী নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নিম্নে চার্ণক চতুর্থ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। * এই কার্য্যে তিনি বার্ষিক ২০ পাউণ্ড বা দুই শত টাকা বেতন পাইতেন। কুঠীতে সহকারী নিযুক্ত হইয়া তিনি দক্ষতার সহিত কার্য্যসম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার দক্ষতার পরিচয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ক্রমে তাঁহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছুক হন।

কাশীমবাজারে কিছুকাল অবস্থান করার পর তাঁহাকে পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাঁহার পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করার কথা ছিল। সেই সময় অতিবাহিত হইলে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন যে, তাঁহার অবস্থিতিকাল পূর্ণ হইয়াছে, তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে যদি তাঁহারা তাঁহাকে পাটনার অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতে পারেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষের পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চার্ণক ১৬৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

* **Job Charnock Fourth 20£. (Hedges' Diary Vol II.XIvi)**

পাটনায় অবস্থিতিকালে তিনি ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ত্তরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে যদিও সাহানসাহা আরঙ্গজেব ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বররূপে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তথাপি ইউরোপীয়গণ মোগল রাজত্বের শিথিল শাসন প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য-বিস্তারে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বাদসাহ আরঙ্গজেবকে পরাক্রান্ত বলিয়া জানিলেও, তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণকে সেরূপ মনে করিতেন না! ইউরোপীয় বণিক্‌গণ অনেক সময়ে প্রাদেশিক নবাব দেওয়ান প্রভৃতির আদেশ অমান্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা আপনাদিগের সর্ত্ত-রক্ষার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন। যদি কোন শাসনকর্ত্তা তাহাতে বাধাপ্রদানে ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বাদসাহ দরবারে আবেদন করিতেন, পরে তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে ইংরেজ বণিকগণই অগ্রণী ছিলেন। চার্ণকের সময় পাটনায় এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া-ছিল। সে সময়ে বিহারে ইংরেজদিগের সোরার ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি লাভবান হইতেন। এই ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন। সকল সময়ে তাহা নীতিসম্মত না হওয়ায় শাসনকর্ত্তৃগণকে সে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইত। ১৬৭১ খৃঃ অব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রতি কঠোর নিয়ম প্রচার করায়, ইংরেজ কোম্পানীর সোরার ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হয়। চার্ণক কোন উপায়ে তাহার পূরণ করিতে না পারায় অগত্যা বাদসাহ দরবারে তজ্জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বাদসাহ আরঙ্গজেবের দরবারে ইংরেজ কোম্পানীর সুবিধার বিশেষ কোনরূপ আশা ছিল না। সাত বৎসর পরে ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে চার্ণক অবগত হইলেন যে, বাদসাহ ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যরক্ষার জন্য ইচ্ছুক নহেন। এই সময় হইতে ইংরেজ কোম্পানী ক্রমে মোগল রাজত্বের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, চার্ণকের বিশেষ চেষ্টায় ব্যবসায়ের ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইতে লাগিল।

কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৬৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহার বার্ষিক ৪০ পাউণ্ড বা ৪০০ টাকা বেতন স্থির করিয়া দিলেন। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে চার্ণক বার্ষিক ২০ পাউণ্ড বা ২০০ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভ করিয়া চার্ণক উৎসাহসহকারে পাটনা কুঠীর কার্য্যপরিচালনে যত্নবান হইলেন। তাঁহার যত্নে দিন দিন পাটনা কুঠীর উন্নতি হইতে লাগিল। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে চার্ণক মাদ্রাজ কাউন্সিলের পঞ্চম পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তথায় যাইতে অসম্মত হন।

এই সময়ে তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। চার্ণক এতদিন অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন কারতেন। যদিও চার্ণক দক্ষতা, সাহস ও উদ্যমে অতুলনীয় ছিলেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র সুনির্ম্মল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পাটনায় অবস্থিতিকালে তাঁহার চরিত্র দূষিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়, এবং ইহার পরেও সেইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। যাহাহউক, এই সময়ে তিনি একটি হিন্দু বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহব্যাপার উপন্যাসের ঘটনার ন্যায় মনোহর। সকলেই অবগত আছেন যে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বেণ্টিঙ্ক তাহার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। মোগল রাজত্বকালে এই প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার প্রতি মোগল বাদসাহদিগেরও দৃষ্টি ছিল। ১৬৭৮-৭৯ খৃঃ অব্দের এক দিবস পাটনায় একটি সতীদাহ সংঘটিত হইবার উপক্রম হয়। স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশির দ্বারায় সজ্জিত-চিতায় শায়িত মৃত-ব্যক্তির পার্শ্বে তাহার যুবতী ভার্য্যা নানা অলঙ্কার ভূষিতা হইয়া ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। উক্ত বিধবা সহমরণে যাইতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছুক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চার্ণক সেই বিধবার অনুপম রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াসী হন। তিনি স্বীয় প্রহরীদিগকে তাহার উদ্ধারের জন্য আদেশ দিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিতা হইতে অক্ষত

অবস্থায় আনয়ন করে। চার্ণক তাহাকে নিজ আবাসস্থানে লইয়া যান, এবং উক্ত বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে চার্ণকের অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কলিকাতাপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে তাঁহার উক্ত পত্নীর মৃত্যু হইলে, তথায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। *

* "Before, or about the year 1678-79, Mr. Charnock, smitten with the charms of a young and beautiful Hindu, who decked with her most pompous ornaments, and arryed in her fairest drapery, was at the point of sacrificing an innocent life, of (perhaps) fifteen summers on the alter of Paganism, directed his guards to seize the half-unwilling victim ; the obedient guards rescued her from an untimely death and Charnock softly conducted her to his house. They lived together many years. She bore to him several children, and dying shortly after the foundation of his new city, was entered at Mausoleum, which to this day stands entire, and is the oldest piece of masonry in Calcutta." (Bengal Obituary P. 2.), চার্ণকের এই পত্নী সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত আছে। কাপ্তেন হামিল্টন অনেক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, চার্ণক তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধির উপর একটি কুক্কুট বলি দিতেন। এই কুক্কুট-বলি লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। হেজেস্ ডায়েরী সম্পাদক ইউল সাহেব বলেন যে, উহা হিন্দু বা খৃষ্টান প্রথা সম্মত নহে। উইলসন্ সাহেব ডাক্তার ওয়াইজের প্রমাণ তুলিয়া বলেন যে, মুসলমান ও হিন্দুরা পাঁচ পীর মানিয়া থাকে, সেই পাঁচ পীরের জন্য কুক্কুট বলি দেওয়া হয়। উইলসন্ সাহেবের এ যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুরা পাঁচ পীর মানিলে যে মোরগ বলি দেয় ইহা প্রকৃত নহে। আর যদিও কোন কোন হিন্দু তাহা স্বীকার করে, তথাপি যাহাদের বিধবা সহমরণে যাইতে পারে, সেরূপ হিন্দু কখনও মোরগবলি স্বীকার করে না। কি লইয়া এই গোলযোগ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। চার্ণকের পত্নী হিন্দু বিধবা হইলে, তিনি যে মোরগবলি মানিতেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? তাঁহার মৃত্যুর পর চার্ণকই মোরগ বলি দিতেন, এ প্রথা চার্ণকেরই অনুমোদিত। উক্ত হিন্দু বিধবা চার্ণকের পত্নী হইলে তিনি যে আর হিন্দু ছিলেন না তাহা বোধ হয় বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এক্ষণে উক্ত পক্ষীটি তাঁহার প্রিয় ভক্ষ্য হইয়াছিল বলিয়া, কি চার্ণক অন্য কোনও কারণে মোরগ বলি দিতেন, তাহার সিদ্ধান্ত কিরূপে হইবে? ফলতঃ ইহাতে চার্ণকের খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ আস্থা ছিল না ইহার প্রমাণ হইতে পারে। ইউল সাহেব উক্ত বিধবাকে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করার প্রতি সন্দিহান হইয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, সে সময়ে পাটনায় বা অন্য কোন স্থানে ইউরোপীয়দিগের এরূপ সাহস ছিল না যে, কোন হিন্দু বিধবাকে চিতা হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। ইউল এই বিষয়ে বিশেষরূপে বিবেচনা করেন নাই। বস্তুতঃ সহসা ইউরোপীয়গণ এরূপ করিতে সাহস করিতেন না সত্য, কিন্তু ইহা একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই ঘটনাটি পর্য্যালোচনা করিতে আমাদের জানিতে হইবে যে, তৎকালে মোগল বাদসাহদিগের বিনা আদেশে

ইহার অব্যবহিত পরে কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্যপরিচালনের জন্য চার্ণককে তথায় যাইতে আদেশ দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ ষ্ট্রেণশ্রাম মাষ্টার কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কুঠীর কার্য্যনির্ব্বাহের নানারূপ গোলযোগ দেখিয়া চার্ণককে কাশীমবাজার আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। চার্ণক পাটনা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে অসম্মত হন। তিনি নানা প্রকার আপত্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া মাষ্টার তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে কাশীমবাজারের অধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে হুগলীতে স্থানান্তরিত করেন ও তথায় দ্বিতীয় পদে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে চার্ণক আপনাকে যারপরনাই অবমানিত মনে করেন, তিনি কিছুতেই পাটনা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। কোম্পানীর কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, এবং মাষ্টারের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে

কোন সতী সহমরণে যাইতে পারিত না, এবং বলপূর্ব্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ ছিল। এই ঘটনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত বিধবা সহমরণে যাইতে তাদৃশ ইচ্ছুক ছিল না। প্রথমে স্বীকৃত হওয়ায় তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে চিতায় উঠাইয়া দেয়, এজন্য মোগল কর্ম্মচারিগণ কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু যখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে সে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহার আত্মীয়েরা তাহার প্রতি বলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে চার্ণক তাহার উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে তাহার আত্মীয়েরা বাধা দিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এই ভয়ে তাহারা কিছু করে নাই, এবং চার্ণক উক্ত রমণীর রূপে মোহিত হইয়া ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ ঘটনাটি যে সাধারণ ঘটনা হইতে পৃথক্ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধবার আত্মীয়েরা বাধা না দিলেও তাহারা যে চার্ণকের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে। হলওয়েলের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। হলওয়েল বলিতেছেন,—"It has been already remarked in a marginal note that the Gentoo women are not allowed to burn, without an order of leave from the Mahommedan government, it is proper also to inform our readers this privilage is never withheld from them.—There have been instances known when the victim has, by Europeans, been forceably rescued from the pile; it is currently said and believed (how true we will not aver) that wife of Mr. *Job Charnock* was by him snatched from this sacrifice; be this as it may, the outrage is considered by the *Gentoos*, an atrocious, and wicked violation of their sacred rites, and privilages." (Holwell's Interesting Historical Events Pt II. P. 99.)

পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থান গিফোর্ডকে মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। চার্ণকের কার্য্যদক্ষতায় তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে, মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের অন্যান্য সমস্ত প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারেন, তথাপি চার্ণককে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেই হইবে। * এই আদেশের পর চার্ণক ১৬৮০ খৃঃ অব্দে কাশীমবাজারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তথায় পুনরাগমন করেন।

চার্ণক কাশীমবাজারে আসিয়া দক্ষতাসহকারে কুঠীর কার্য্যপরিচালনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে বাঙ্গলায় ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে বিনা শুল্কে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার জন্য আদেশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক নূতন সুবেদারের নিকট হইতে তাঁহাদিগকে তজ্জন্য নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত। এই সমস্ত অসুবিধা নিবারণের জন্য ইংরেজ কোম্পানী নবাব সায়েস্তা খাঁর সাহায্যে বাদসাহদরবার হইতে এক নিশান লাভ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ইহাতেও গোলযোগের নিবৃত্তি হয় নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের সহিত মোগল কর্ম্মচারিগণের ক্রমান্বয়ে বিবাদ চলিতে থাকে। বাঙ্গলার বাণিজ্যকার্য্য পূর্ব্বে মান্দ্রাজের অধ্যক্ষের অধীন ছিল। এক্ষণে তাহার বিশেষরূপ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ডিরেক্টরগণ বাঙ্গলাকে মান্দ্রাজ হইতে পৃথক্ করিয়া, ইহার একজন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, এবং ১৬৮২ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হেজেস্ বাঙ্গলার প্রথম গবর্ণর বা স্বাধীন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া এখানে আগমন করেন। † যদিও এই সময়ে বাঙ্গলার বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছিল, তথাপি ইহার নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কতকগুলি অনধিকারী ইংরেজ এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হয় ও মোগল কর্ম্মচারিগণের সহিত

* "The Court declaring to the Government of Fort St. George, "that they would rather dismiss the whole of their other Agents, than that Mr. Charnock should not be the chief of Cassimbazar." (Bruce's Annals of the E. I. Company, Vol II. P. 450.)

† মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পৃঃ ২১১।

তাঁহাদের বিবাদে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে থাকে। হেজেস্ ক্রমে গোলযোগের মীমাংসার জন্ত সচেষ্ট হন। তিনি প্রথমতঃ কাশীমবাজারে হয়। হইয়া চার্ণক ও তত্রস্থ কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত পরামর্শ স্থির করেন। তিনি ঢাকার নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত গোলযোগের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। ঢাকায় অবস্থানকালে হেজেস্ চার্ণকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইয়াছিলেন। তাহা তিনি তাঁহার ডায়েরি বা রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেজেস্ লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন দেশীয় লোকের নিকট হইতে অবগত হন যে, চার্ণক ১৯ বৎসর হইতে একটি হিন্দুরমণীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত রমণী তাঁহার কোন আত্মীয়া। তিনি আরও অবগত হইয়াছিলেন যে, পাটনায় অবস্থানকালে তিনি একটি হিন্দুর পত্নীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। নবাব তাঁহাকে তজ্জন্য দণ্ডপ্রদানে ইচ্ছুক হইলে চার্ণক তাহার স্বামীকে অর্থ প্রদান করিয়া গোলযোগের নিবৃত্তি রেন। * এই সমস্ত ব্যাপার সত্য হইলে উহা যে চার্ণক-চরিত্রের কলঙ্ক

* "December 1.—I sent James Price to Roy Nundeloll's. This morning a Gentoo sent by Balchund, Governor of Hugly and Cassimbazar, made complaint to me that Mr. Charnock did shamefully, to ye great scandall of our Nation, keep a Gentoo woman of his kindred, which he has had these 19 years ; and that, if I would not cause him to turn her away, he would lament of it to the Nabob, which, to avoid further scandall to our Nation ; with fair words I prevailed with ye poor fellow to be pacified for ye present.

† "I was further informed, by this and divers other persons, that when Mr. Charnock lived at Patuna, upon complaint made to ye Nabob that he kept a Gentoo's wife (her husband being still living, or but lately dead), who was runaway from her husband and stolen all his money and jewels to a great value, the said Nabob sent 12 soldiers to seize Mr. Charnock, but he escaping (or bribing ye men) they took his Vakeel and kept him 2 months in prison, ye souldiers lying all this while at ye Factory gate till Mr. Charnock compounded the business for Rupees 3000 in money, 5 Pieces of Broad cloth, and some sword-blades. Such troubles as those he has divers times at Cassim-

পদচ্যুত ব সন্দেহ নাই। যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি যাহাকে বিবাহ চার্ণকের ছলেন, তাঁহার সহিত মিলনের পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, তুর্বা তাঁহার পত্নীবিদ্যমানে উপপত্নীরক্ষাও প্রমাণীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন কাশীমবাজারেও তিনি ঐরূপ অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, এই সমস্ত কারণে বোধ হয় যে, চার্ণক প্রকৃত খৃষ্টান ছিলেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গুপ্তভাবে অর্থাদি গ্রহণের বিষয়েও হেজেসের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মীমাংসার জন্য হেজেস্ তথায় নবাবের সহিত একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পুনর্ব্বার কাশীমবাজারের দিকে অগ্রসর হন, এবং দ্বিতীয় বার তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

হেজেস্ জন্সন নামক একজন ইংরেজকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জন্সন অনুসন্ধানে বাহির করেন যে, নেলর নামে একজন কোম্পানীর কর্ম্মচারী গুপ্তভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিত। কাউন্সিলের অধিবেশনে হেজেস্ তাহার বিচার করিয়া তাহাকে দোষী স্থির করেন। তাহার পর চার্ণকের অনুসন্ধান আরব্ধ হয়। অনন্তরাম নামে একজন দেশীয়কে চার্ণক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেজেস্ তাহার দ্বারা চার্ণকের অর্থগ্রহণ স্বীকার করাইয়া লন। * তাহার পর কাশীমবাজার কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যদিগেরও বিচার হয়। হেজেসের এই-রূপ ব্যবহারে চার্ণক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং ক্রমে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার পর হেজেস্ স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলে বিয়ার্ড তাঁহার স্থানে বাঙ্গলার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং বাঙ্গলা পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের অধীন হয়। † মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্ট গিফোর্ড বাঙ্গলায় আসিয়া পুনর্ব্বার নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। চার্ণকও দিন দিন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসালাভ করিতে আরম্ভ করেন।

bazar, as I am credibly informd, and whenever she or Mr. Charnock, dyes, ye pretence will certainly lye heavy on ye Company." (Hedges Diary vol I. P. 52.) ডায়েরির সম্পাদক প্রানার উক্ত ঘটনাকে বিধবা সতীর উদ্ধারের সহিত এক বলিতে চাহেন। কিন্তু দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বোধ হয়।

* Hedgs' Diary, Wilson's Annals. † মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

ইংরেজ কোম্পানী আপনাদিগের সর্ব্বরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলে ক্রমে মোগল কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহদের বিবাদ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ মোগল কর্ম্মচারিগণের আদেশও অমান্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৬৮৫খৃঃ অব্দে চার্ণকের সহিত মোগল কর্ম্মচারিগণের গোলযোগ উপস্থিত হয়। কাশীমবাজারের দেশীয় ব্যবসায়িগণ ও ইংরেজ কুঠীর সরবরাহ-কারগণ চার্ণক ও তাঁহার সহযোগিগণের বিরুদ্ধে অনেক টাকার দাবী করিলে কাশীমবাজারের কাজী অভিযোগকারিগণের ৪৩ হাজার টাকা প্রাপ্য স্থির করেন। নবাব সায়েস্তা খাঁও উক্ত বিষয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন। * নবাব চার্ণককে ঢাকায় উপস্থিত হওয়ার জন্য পরওয়ানা পাঠাইয়া দেন। চার্ণক সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। তিনি বিচারাদেশের পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় ছিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীমবাজার কুঠীর সহিত অন্যান্য স্থানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ দেন ও মৃত বিয়ার্ড সাহেবের স্থানে যাহাতে চার্ণক হুগলীতে যাইতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি এই সময়ে অত্যন্ত নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছিলেন। † কিন্তু চার্ণক ১৬৮৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে কাশীম-বাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলীতে উপস্থিত হন।

এই সময়ে মোগলদিগের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের আদেশ লইয়া তাঁহারা বাদসাহ আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। বোম্বাইএর অধ্যক্ষের প্রতি মোগল-জাহাজ ধৃত করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। চট্টগ্রাম অধিকার করার জন্য

* Hedges' Diary vol II, (Documentary Memoirs of Job Charnock) also, Wilsons Annals.

† "The conduct of this war was entrusted to Job Charnock, the Company's principal agent at Hughley, a man of courage without military experience, but impatient to take revenge of a Government from which he had personally received the most ignominous treatment having not long before been imprisoned and scourged by the Nabob."

Orme's Indostan Vol II P 12.

বঙ্গোপসাগরে কতিপয় জাহাজপ্রেরণেরও প্রস্তাব হইয়াছিল। নিকল্‌সন ও স্টামন বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধ-জাহাজ পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হন। নিকল্‌সন প্রথমে ৪ শত সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে হুগলীর অধ্যক্ষ চার্ণকের নিকটও ৪ শত সৈন্য ছিল; এই ৮ শত সৈন্য মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। একটি সামান্য ঘটনায় উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিয়া উঠে। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দের ২৮এ অক্টোবর তিন জন ইংরেজ সৈন্য হুগলীর বাজারে উপস্থিত হইলে নবাব সৈন্যের সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাতে ইংরেজ সৈন্যত্রয় অবমানিত ও আহত হইয়া ফৌজদারের নিকট নীত হয়। কাপ্তেন লেসলি তাহাদের উদ্ধারে অগ্রসর হইলে নবাবসৈন্য তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তাহারা বুরুজ হইতে ইংরেজদিগের নৌকা ও জাহাজের প্রতি গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। এইরূপ গোলাবর্ষণে ইংরেজকুঠীর চারি পাশের কুটীর প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। * সেই সময়ে অধিকাংশ ইংরেজসৈন্য চন্দননগরে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বে কাপ্তেন রিচার্ডসন মোগল বুরুজ আক্রমণের জন্য প্রেরিত হন। তাহার পর ইংরেজ সৈন্যগণ চন্দননগর হইতে উপস্থিত হইলে কাপ্তেন আরবুথনট্ বুরুজ অধিকার করিয়া বসেন। ইংরেজদিগের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া ফৌজদার আবদুল গণি হুগলী হইতে পলায়ন করেন। এই অগ্নি-যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য হত, আহত অনেক সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়। ইংরেজকুঠীও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইংরেজদিগের ৩ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। † ইহার পর ফৌজদার আবদুল গণি ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তাহার বলে ইংরেজেরা আপনাদিগের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, ও নূতন সনন্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্যাধিকার লাভ করেন।

হুগলীর বিবাদে ইংরেজ কোম্পানী জয়লাভ করিলেও তাঁহারা নির্ব্বিবাদে

* ষ্টুয়ার্টের মতে নদীবক্ষস্থিত নিকল্‌সন সৈন্যের গোলাবৃষ্টিতে ইংরেজ কুঠীতে অগ্নি সংযোগ হয়।

† Stewart.

বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে পারেন নাই। হুগলীর দুর্ঘটনার সংবাদ নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট পঁহুছিলে, তিনি পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠী অধিকারের আদেশ প্রদান করিয়া হুগলীতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। চার্ণক এই অবসরে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া, তাহার নিকটস্থ সুতানটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুতানটি কালে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠে। মোগলদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ আরম্ভ করার জন্য ও বাঙ্গলায় আপনাদিগের আধিপত্যবিস্তারের জন্য ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ অনেক দিন হইতে একটি সুরক্ষিত স্থানের চেষ্টা করিতেছিলেন। হেজেস্‌ও তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। চার্ণকও সে বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সুতানটিতে ১৬ শত খৃঃ অব্দের খৃষ্টম্যাস বা বড়দিন অতিবাহিত করিয়া তথায় একটি দুর্গ ও টাঁকশাল নির্ম্মাণের ও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের প্রার্থনা করিয়া পাঠান। কিন্তু নবাব তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায়, তিনি মোগলদিগের প্রতি পুনর্ব্বার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। চার্ণক ও নিকল্‌সন সুতানটি হইতে যাত্রা করিয়া হিজলী দ্বীপ অধিকার করিয়া বসেন।

মোগল কর্ম্মচারিগণও যথাসাধ্য ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজেরা হিজলী অধিকার করিলে মোগলসৈন্য তাহার পুনরাধিকারের চেষ্টা করে। মালিক কাসিম নদীর দিকে বুরুজ স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই সময়ে মোগলসেনাপতি আবদুল সমদ ১২ হাজার সৈন্য লইয়া হিজলী অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার এক দল সৈন্য রসুলপুর নদী পার হইয়া হিজলীতে উপনীত হয় ও নগরে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, ইহাতে ইংরেজেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। চার্ণক একটি অট্টালিকাকে সুরক্ষিত করিয়া তথায় বুরুজ স্থাপন করেন। এই সময়ে কাপ্তেন ডেনগম ৭০ জন নূতন ইংরেজসৈন্য লইয়া হিজলীতে উপস্থিত হন। তাহাদের সাহায্যে চার্ণক প্রভৃতি মোগলদিগকে আক্রমণ করিলে মোগলেরা হিজলী পরিত্যাগ করে। * আবদুল সমদ ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে টানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে

* Hedges' Diary Voll II, also Wilson's Annals.

আদেশ দেন ও নূতন সনন্দ আনাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বহুদিন গত হইলেও সনন্দ উপস্থিত হয় নাই। আবদুল সমদ হিজলীর জলবায়ুর জন্য বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা সহজে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। সেই জন্য তিনি সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

হিজলীর দূষিত জলবায়ুর জন্য ইংরেজেরা তথায় অধিক দিন বাস করিতে না পারায় তাঁহারা তথা হইতে উলুবেড়িয়া পরে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার সুতানটিতে আগমন করেন। সুতানটিতে উপস্থিত হইলে নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসিতে আদেশ দেন কিন্তু চার্ণক সুতানটিকে সুরক্ষিত ও বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্তির আশায় আয়ার ও ব্রাডিল্ নামে প্রতিনিধিদ্বয়কে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে মালাবার উপকূলেও মোগলদিগের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংলণ্ড হইতে কাপ্তেন হীথকে সৈন্য ও জাহাজ সহ বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। হীথ প্রথমে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া পরে তথা হইতে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুতানটিতে উপস্থিত হন। এই সময়ে সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলে বাহাদুর খাঁ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তৎকালে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনায় বাহাদুরসাহ ইংরেজদিগকে মোগলের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে কাপ্তেন হীথ সুতনটির সমস্ত ইংরেজদিগকে লইয়া চট্টগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তাঁহারা বালেশ্বরে উপদ্রব করিতে ত্রুটি করেন নাই। হীথ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া, আরাকানরাজকে ইংরেজদিগের সাহয্যের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা তাহার কোন উত্তর প্রদান না করায়, হীথ বিরক্ত হইয়া গবর্ণর চার্ণক ও অন্যান্য সমস্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীসহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। আয়ার ও ব্রাডিল বন্দীস্বরূপে ঢাকায় অবস্থিতি করিতে থাকেন

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পৃষ্ঠা ২৮৬।

নবাব সায়েস্তা খাঁর দেহত্যাগের পর ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংরেজদিগের প্রতি নবাবের ক্রোধাগ্নি কিঞ্চিৎ শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাদশাহের আদেশক্রমে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বন্দী ইংরেজ প্রতিনিধিদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দেন ও ইংরেজদিগকে মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। নবাবের অনুরোধ-অনুসারে পঞ্চদশ মাস মান্দ্রাজে অবস্থিতি করার পর চার্ণক ও বঙ্গীয় কাউন্সিল প্রিন্সেস নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪এ আগষ্ট * পুনরায় সুতানটি বা কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় হইতে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা আরব্ধ হয়। পর বৎসর ১৬৯১ খৃঃ অব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানীর জন্য নূতন সনন্দ আনাইয়া দেন। তদনুসারে ইংরেজেরা বার্ষিক ৩ হাজার টাকা মাত্র পেস্কশ প্রদান করিয়া বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন।

এইরূপে সুতানটিতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া চার্ণক তাহাকে সুরক্ষিত ও সুগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বহুকাল ধরিয়া যাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা ফলবতী হইতে চলিল। ক্রমে তাঁহারা সুতানটির সংলগ্ন কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণেরও ইচ্ছা করেন। কালে সে ইচ্ছারও পূরণ হইয়াছিল, এবং উক্ত তিন স্থানই কলিকাতা মহানগরী নাম ধারণ করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠে। যে সুতানটি বা কলিকাতা সামান্য গ্রামমাত্র থাকিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা মহানগরী হইতে চলিল। সুতানটির নাম লোপ হইয়া তাহার স্থলে কলিকাতার নাম বিঘোষিত হইতেছে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চার্ণক কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইবেন। †

* হেজেস ডায়েরী সম্পাদক ইউল সাহেব জুলাই বলেন। অর্ম্ম ১৬৮৯ খৃঃ অব্দে বলেন। কিন্তু উইলসন ১৬৯০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† "Job Charnock died in the settlement which he had at length

এইরূপে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা * ও তাহার উন্নতির সূচনা করিয়া ১৬৯৩ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারি চার্ণক সুতানটিতে দেহত্যাগ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ যে স্থানের তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায়ই তিনি সমাহিত হন। অদ্যাপি কলিকাতার সেণ্ট জন্‌স চার্চ্চে তাঁহার সমাধি বিদ্যামান রহিয়াছে, এবং তদুপরি স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহাকে কলিকাতায় স্থাপয়িতা বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কিরূপ অধ্যবসায়সহকারে জব চার্ণক ব্রিটিশসাম্রাজ্যের রাজধানীপ্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, চার্ণক কর্তৃক তাহা সূচিত হয়। এই প্রবন্ধ হইতে সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ইংরেজেরা বহুদিন হইতে বাঙ্গলায় আপনাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন

come to found at Chuttanutty. That name is forgotten, but Job's own name should survive as long as the history osEngland's empire in India, the name of the founder of Calcutta. (Hedgs' Diary vol II. Documentary Memoirs of Job Charnock.)

* এদেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, জব চার্ণক বর্ত্তমান বারাকপুরেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নামানুসারে তাহার চানক নাম হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, জব চার্ণকের সুতানটিতে আগমনের পূর্ব্বেও চানকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—"The place appears (Tsjannock) in a map given by Valentyn in his great History of the Dutch East Indies (Vol v), and this map was prepared by Van der Broeck, who was Dutch chief at Hugli in 1662. The court also, in a letter written about December 1677, offer a handsome reward to the officers and crew of any of their ships which should go up the river te Hugli, "or at last as far as Channock." Charnock, we have seen, who came to India in 1657, was fixed at Patna as early as 1663, and probally some time before, as well as for many years after. It appears almost impossible that he could have been living at Barrackpore, or given his name to a place in that position, before 1662, or even before 1677." (Hedges' Diary. Vol II. Documentary Memoirs of Job Charnock)

যাঁহারা মনে করেন যে, ইংরেজেরা একদিনে পলাশী-প্রান্তরে সিরাজ উদ্দৌলাকে বিতাড়িত করিয়া আপনাদিগের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ আলোচনা করিলে তাঁহাদিগের ভ্রম অপনোদন করিতে সক্ষম হইবেন। এক দিনে কখনও বাঙ্গালায় বা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক, জব চার্ণক যে ইহার সূচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে অধ্যবসায়ী সাহসী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের চরিত্র সেরূপ নির্ম্মল ছিল না। চার্ণকই বল, ক্লাইবই বল, হেষ্টিংসই বল, কেহই আপনাদিগকে সাধুচরিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়পরায়ণও ছিলেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতৃগণের এরূপ কলঙ্ক যে ক্লেশকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দাতিয়া-রাজ্য।

বুন্দেলখণ্ডের অনেক কয়খানি ইতিহাস আছে, কিন্তু একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সকল জ্ঞাতব্যে পরিপূর্ণ নহে। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ললিতপুরের ডেপুটী কমিশনর মেজর জন লিণ্টন মহোদয়ের আগ্রহে বুন্দেলা ঠাকুর (Bundela Thakur) ও জায়গীরদার দেওয়ান বিঝি বাহাদুর মহবত সিং ঝান্সির কমিশনর এবং বুন্দেল ষ্টেটের পলিটিকাল এজেণ্ট মিঃ কুইণ্টনের সহকারিতায়, বুন্দেলখণ্ডের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্ত প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। দেওয়ান বাহাদুর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়া এবং বুন্দেল পরিবারের পরিচিত যে সকল লেখক ইতিপূর্ব্বে উক্ত রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক হিন্দী ভাষায় বুন্দেলখণ্ডের একখানি ইতিহাস রচনা ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি

প্রাচীন লোকমুখে ও নানা ধ্বংসাবশেষ ও প্রস্তরফলকাদি হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুরের এই হিন্দী ইতিহাস খানার ইংরেজী অনুবাদ গত ১৯০২ সালের এসিয়াটিক সোসায়িটীর পত্রিকায় History of Western Bundelkhand নাম দিয়া মিঃ C. A. Silberrad প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উক্ত প্রবন্ধ হইতে অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রের' পাঠকগণকে দাতিয়া রাজ্যের বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

দেওয়ান বাহাদুর স্বকীয় ইতিহাসে নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির সাহায্য লইয়াছেন ;—ভারতবর্ষের ইতিহাস (হিন্দী), বিষ্ণুপুরাণ (হিন্দী), কইপারিয়া (হিন্দী), ভরসিংহ-চরিত্র (হিন্দী), ছত্রপ্রকাশ (হিন্দী), বুন্দেল-চরিত্র (হিন্দী); Geography of the Central Provinces ; কৃষ্ণ নারায়ণের উর্দ্দু ইতিহাস ; ওয়াকিয়ট-ই বুন্দেল (উর্দ্দু), Imperial Gazetteer of Bundelkhand. দেওয়ান বাহাদুরের ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত,—ইতিহাস ও ভূগোল। ভারতের অধিকাংশ লোক হিন্দী জানেন ও বুঝিতে পারেন, এই জন্যই তিনি এই গ্রন্থ হিন্দীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৬২৫ সালে বীরসিংহ দেব Orchhaর সিংহাসনে জুজহর সিংহকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট দশ তনয়ের প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকার জায়গীর প্রদান করেন। এই সময় ভগবান রাও ও তাঁহার দুই পুত্র, পিতা বীরসিংহ দেবের প্রতিনিধিস্বরূপ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে ছিলেন। তাঁহার অপর দুই পুত্র—ধর্ম্মঙ্গদ এবং শথার্থসিংহ Orchhতেই অবস্থান করিতেছিলেন। বীর সিংহ দেব ভগবান রাওএর অংশের তালিকা তদীয় পুত্র ধর্ম্মঙ্গদের হস্তে অর্পণ করেন। ধর্ম্মঙ্গদ অতিশয় সাহসী ও সুনিপুণ রণবীর ছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি সন্তরণ দ্বারা একটী নদী উত্তীর্ণ হইবামাত্র সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র দেখিতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ একটী মাত্র মুষ্টাঘাতে তাহাকে পশু জীবন হইতে চিরবিমুক্ত করিয়া দেন। ধর্ম্মঙ্গদ ঐ তালিকা প্রাপ্তিমাত্র পালোয়াতে গমন করতঃ সুন্দররূপে দেশ শাসন করিতে থাকেন। হরদেব এবং তাঁহার নয় সহোদরও স্ব স্ব জায়গীর অধিকার করেন। ভগবান রাও এই সংবাদ-

শ্রবণে সম্রাটের অনুমত্যনুসারে Orchhaতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আমাকে কি আদেশ করেন?" বৃদ্ধ রাজা তদুত্তরে বলেন,—'কিছুই না; আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমার ভ্রাতৃগণ মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়াছি। তোমার অংশের তালিকা তোমার পুত্র ধর্ম্মঙ্গদের নিকট আছে, তাহার নিকট যাইয়া গ্রহণ কর।' ভগবান পিতার সহিত বাদবিসম্বাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, দাতিয়ার প্রকাণ্ড প্রাসাদ, চারি জন পারিষদ এবং তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাকে প্রদত্ত হউক। রাজা সম্মত হইয়া প্রাসাদ এবং তন্মধ্যস্থিত গুপ্ত ধনরত্ন তাঁহাকে প্রদান করেন। ১৬২৬ সালে ভগবান রাও তাঁহার দুই পুত্র পৃথ্বীরাজ ও শাবকারাম সমভিব্যাহারে দাতিয়াতে আগমন করেন। বীরসিংহ দেবের মৃত্যুতে তিন বারোণি দখল করেন,—ইহা তাঁহার পিতার ভরণ পোষণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি একবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৪৭ সালে কালকবলে পতিত হন। কিন্তু গেজেটিয়ারে প্রকাশ যে, ১৬৪০ সালে ভগবান রাও ও তদীয় ভ্রাতা বেণী দাস সংগ্রামক্ষেত্রে এক রাজপুত কর্ত্তৃক নিহত হন।

যাহা হোক্ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র পৃথ্বীরাজ এবং শাবকারাম দিল্লীতে যাইয়া, তাঁহাদের পিতার জায়গীর প্রাপ্তির জন্য সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ তৎকালে পশ্চিমে একটী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কাজেই তাঁহাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দিতে পারিলেন না। বীরত্বে ও সাহসে মুগ্ধ করিবার আশায় দুই ভ্রাতা সেই যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধপ্রারম্ভে এই দুই তরুণ যোদ্ধা তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কতা করেন। সম্রাট-সৈন্য তাঁহাদের পরিচালনায় বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু এই জয়লাভে পৃথ্বীরাজকে সংগ্রামক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয় এবং শাবকরাম আহত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্রাট্ তাঁহাদের কার্য্যকুশলতায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া Orchh রাজ্য মধ্যস্থিত বার লক্ষ টাকার জায়গীর শাবকারামকে প্রদান করেন। এই সংবাদে পৃথ্বীরাজের বিধবা পত্নী রাজধানীতে উপনীতা হইয়া, তাঁহার পুত্র ছত্তরশালের

একটা উপায় করিয়া দিতে সম্রাটকে অনুবোধ করেন। সম্রাট প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ছত্তরশালকে বারোণীর ১২৫০০০ টাকার জায়গীর দান করেন এই সময় হইতে শাবকারাম বার লক্ষ টাকার এবং ছত্তরশাল সোয়া লক্ষ টাকার জায়গীরদার হন। শাবকারাম সম্রাটের কার্য্যে বাইশ বার যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং ১৬৮৪ সালে লোকান্তরিত হন। রাও দলপত রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হন, ইনি দাতিয়াতে একটী দুর্গ নিম্মাণ করেন। ১৭০৭ সালে আজম শাহ এবং বাহাদুর শাহের * মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে বাইশ জন নরপতি প্রথম পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ভারতের অবশিষ্ট নরপতিগণ শেষোক্ত পক্ষাবলম্বন করেন। বাহাদুর শাহ আগ্রা আক্রমণ করিবার জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। রাও দলপত রাও আজম শাহের সৈন্যাপত্য করিতেছিলেন। এই আক্রমণ সংবাদ পাইয়া তিনি দ্বাবিংশ জন নৃপতির সহিত শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার সন্নিকট যাজুন নামক একটী গ্রামে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই তুমুল আহবে ২১০০০ সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। রাও দলপতও নিহত হন, তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত সগৌরবে ও অতুল বিক্রমসহকারে নিজ স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক দিন তিনি চারিশত তীর নিক্ষেপ করেন। দলপত রাওয়ের তিন পুত্র,—(১) ভরৃতি চাঁদ, (২) রামচাঁদ এবং (৩) পৃথ্বী সিংহ। তন্মধ্যে ভরৃতি চাঁদ ১৭০৮ সালে পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎকনিষ্ঠ রামচাঁদ উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। ইনি অতিশয় স্বাধীনচেতা পুরুষ এবং জ্যোতিষ ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির সময় তৎপুত্র রামসিং পূর্ণবয়স্ক। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সহিত বিবাদ করতঃ রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। পুত্র চান্দেরিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্ব্বাসিত হইয়া রামচন্দ্রের দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তিনি স্বীয় তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। কিয়দ্দিবস এই ভাবে অতিবাহিত হইলে তাঁহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি নবকুমারের গুমানসিংহ

* ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিবাদ।

নামকরণ করেন। ইহার বিংশ বর্ষ পর তাঁহার আর একটী পুত্র হয়—তাহার নাম ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিতের জন্মের ঠিকুজিপত্র দিল্লীতে রামসিংহের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি গণনা করিয়া দেখেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই বালকের সমস্ত পূর্ব্বপুরুষগণের মৃত্যু হইবে। কিন্তু বালক অতিশয় ধার্ম্মিক হইবেন এবং কালে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবেন। রামচন্দ্র এই ঠিকুজিখানি বিশ্বাস না করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। কিন্তু শীঘ্রই দুর্ভাগ্য দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইহার অনতিকাল পরে সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহ * কর্তৃক ভগবান রাও খিচ্চিকে (Khichhi) পরাজিত করিতে আদিষ্ট হন। রামচন্দ্র ১০৮টী গাভী এবং এক মণ স্বর্ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া সম্রাটের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্বেও তিনি অস্ত্র বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া যুবকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে পারিতেন। কোরাজাহানাবাদে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে দাতিয়া হইতে সাত হাজার পদাতিক সৈন্য আসিয়া তাঁহার সৈন্যবল বৃদ্ধি করে। তিনি গজপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া যান। বিধির লিপি অখণ্ডনীয়, অবশেষে, শত্রুপক্ষের একটী গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তকে লাগে, তাহাতেই তিনি হাওদার উপরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁহার পার্শ্বে একজন সাহসী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিশালী ঠাকুর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরস্ত্রাণ পরিধান করতঃ সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যবূহ শত্রু-দুর্গ আক্রমণ করতঃ ঠাকুরের মস্তকোপরি বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে, ভগবান রাও মুষ্টিমেয় সৈন্যসহকারে পলায়নপর হন। বিজয়লাভের পর সম্রাট সৈন্য-মৃতের সৎকার করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাহাদুর শাহ প্রবীণ বীরের পরলোকগমনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং খেলাৎ ও পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত রাম সিংহের পুত্রকে আহ্বান করেন; কিন্তু পুত্র তৎকালে পীড়িত থাকায় সম্রাট সদনে উপস্থিত হইতে অক্ষম হন। দুই বৎস-

* ১৭১৯—১৭৪৮

রের মধ্যে রামচন্দ্র ও গুমান সিংহও লোকান্তর গমন করেন এবং ১৭৪৬ সালে রামসিংহের রাণী অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইন্দ্রজিৎকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি দাতিয়াতে সীতাতল প্রস্তুত করেন।

এই সময় মোগল-সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে ছুটিতেছিল। ১৭৪৮ সালে মহারাষ্ট্রীয় নরুশঙ্কর, দাক্ষিণাত্য হইতে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণার্থে যাত্রা করেন। রাজা তখনো বালক, রাজমন্ত্রিগণ আততায়ীর হস্তে ভানরার পরগণা অর্পণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়েই আলমপুর * পরগণা হোলকারকে প্রদত্ত হয়। ১৮১৯ সালে ইন্দ্রজিৎ শমথরের দেবী ধরজ্জধরের নামে সোয়ালক্ষ টাকার জায়গীর ছাড়িয়া দেন এবং তৎসঙ্গে বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রীও দান করেন। ইন্দ্রজিৎ সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় নামানুযায়ী ইন্দ্রঘর † নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং পুত্র ছত্রজিৎ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৮৮ সালে মহজিৎ সিংহ দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লীতে যাইবার কালে ছত্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এতই সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয় যে, উভয়ে উভয়কে ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৩ সালে পণ্ডিত গোপাল রাও মহাদাজি, সিন্ধিয়ার আদেশে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন, এই আক্রমণ পরে সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তিনি প্রথমতঃ ৩ই ফাল্গুন (মার্চ্চ ১৭৯৪) বারোদল পদাতিক, আট হাজার অশ্বারোহী এবং ৯৬টী কামান লইয়া দাতিয়া আক্রমণ করেন। রাজা দশ সহস্র পদাতিক এবং ৩০টী কামান লইয়া নগরের বহির্ভাগে শত্রুর গতিরোধ করেন। তিন দিনে রাজার পক্ষের সাত শত সৈন্য ও আট জন সর্দ্দার এবং গোপাল রাওর সাত হাজার সৈন্য হতাহত হয়। ঝান্সিস্থিত পেশোয়া-সেনাপতি সিওরাও ভাও, পণ্ডিতকে কিছু উপহার দিতে রাজাকে প্রতিশ্রুত করাইয়া এবং অপর দিকে গোপালকেও

* গোয়ালীয়ার রাজ্যভুক্ত একটী জনহীন পরগণা। ঝান্সি হইতে কিছু পশ্চিমে, এখনে হোলকার কর্ত্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে।

† দাতিয়াতে ; দাতিয়া সহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে।

প্রস্থান করিতে উপদেশ দিয়া শান্তি সংস্থাপন করেন। পেশোয়া-সেনাপতি গোপালকে ইহাও বলেন যে, ইহাতে তাঁহার গৌরব অব্যাহত থাকিবে। উভয়পক্ষ এই পরামর্শে সম্মত হইলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় এবং সিন্ধিয়া-সেনাপতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৯৭ সালে সিন্ধিয়া * পুনরায় কুড়ি হাজার পদাতিক এবং ৫০টী কামান সহ অম্ভোজি ইঙ্গ্লিয়াকে প্রেরণ করেন। এই সৈন্য-সংঙ্ঘ ভাগবারে উপনীত হইয়া ফাল্গুন মাসে (মার্চ্চ ১৭৯৮), রাজার পক্ষের কাল-জোলিস্থ † পাঁচ জন কর্ম্মচারী ও দুই শত অশ্বারোহী এবং পদাতিককে নিহত করে। যুদ্ধাস্ত্রগারও তাহাদের হস্তগত হয়। চৈত্র মাসে (এপ্রিল) তিনি বার হাজার সৈন্য লইয়া রাজপুত্রকে সিওনরাহ ‡ দুর্গে অবরোধ করেন। আট মাস ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। পরিশেষে সিন্ধিয়া সৈন্য দুর্গ অধিকার করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস আরম্ভ করিলে, রাজসৈন্য প্রথমতঃ অনর্গল অনল উদ্গীরণ করিতে থাকে, পরে আততায়ীদিগকে এক মাইল দূরে তাড়াইয়া লইয়া যায়। উভয় পক্ষে প্রায় ছয় হাজার সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। অম্ভোজি ব্যর্থমনোরথ হইয়া কাচ্ওয়াহা (Kachhwaha) প্রদেশে ‖ গমন করেন। ১৮০০ সালে ষোল দল পদাতিক, সাত হাজার অশ্বারোহী এবং ৮০টী কামান লইয়া বালীরাও আগমন করেন। বিলাহরিতে ¶ তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। রাজা ছত্রজিৎ § রাজা জয়সিংহ, রাজা দুর্জ্জনশাল, জাখোলনের** দেওয়ান চিত্তর সিংহ, রাও ঘালনসিংহ, জারগোজি লক্ষপোজি, এবং অন্যান্য বুন্দেল সর্দ্দারগণ চারি সহস্র সৈন্য লইয়া বিপক্ষীয়দিগের গতি-রোধার্থে অগ্রসর হন। জয়পরাজয় ভগবানের হস্তে, রাজা জয়সিংহ, দেওয়ান

* ইনি দৌলত রাও সিন্ধিয়া, কারণ মহাদিজি সিন্ধিয়া ১৭৯৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

† ইন্দ্রঘরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান।

‡ দাতিয়াতে, সিন্ধুনদীতীরে। দাতিয়া হইতে ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।

‖ বর্ত্তমান জালাউন জেলা।

¶ গোয়ালিয়ারে দাতিয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে।

§ গেজেটিয়ারে 'ছত্তর শল' লিখিত হইয়াছে। (I. 409)

** ঝান্সি জেলায়, ললিতপুর পরগণায়। ললিতপুর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম।

চিত্তর সিংহ এবং দালিল সিংহ পরাজিত হইয়া স্ব স্ব অধিকারে প্রস্থান করেন। দুর্জ্জনশালও কিঞ্চিৎ পরে 'মহাজনো যেন গত সঃ পন্থা' এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করতঃ তাঁহাদের অনুগমন করে। কিন্তু ছত্রজিৎ এবং জারগোজি লক্ষপোজি সিওনরাহ নামক স্থানের নিকট বিপুল উৎসাহভরে সিন্ধিয়া-সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতে থাকেন। লাল সাহ এবং অন্যান্য কাচওহাগণ আসিয়া তাঁহাদের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। দুর্জ্জনশাল ভানরারাব হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পরিশেষে এই সম্মিলিত সৈন্যের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বালীরাও পরাজিত হইয়া উৎসাহভগ্ন হইয়া পড়িলেন।

১৮০১ সালে দৌলতরাও সিন্ধিয়া পীরু সাহের * অধীন পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, চারিদল পদাতিক এবং ১৮টী কামান বালীরাওএর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। পীরুসাহ, সিওনরাহে উপস্থিত হইবামাত্র, বুন্দেলগণ তাঁহাকে ঘাটিতে আক্রমণ করিল। দ্বাদশ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর রাজ-সৈন্য পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ দিল। কিন্তু ছত্রজিৎ কেবলমাত্র ৩০ জন বাছাই অশ্বারোহীর সহিত শত্রুব্যূহের বামভাগ আক্রমণ করতঃ বর্ষা দ্বারা পীরুকে আহত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে একজন সিন্ধিয়া-সৈন্য তাঁহার মস্তকে তরবারির আঘাত করে। সেই আঘাতেই রাজা অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইবামাত্র ওয়ালিবসনোয়ার নামক এক ব্যক্তি তুলিয়া ধরে এবং রোহাজ খাঁ এবং অন্যান্য সৈন্যের সাহায্যে তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যায়। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রাজার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া যায়। যথাবিহিতরূপে রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরিচ্ছিত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ছত্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত বর্ষাঘাতে পীরুকেও ভবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সিন্ধিয়া-সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরে ১৮০২ সালে উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

পরিচ্ছিত একজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি প্রজামণ্ডলী ও সৈন্য-সামন্ত সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক

* পেরোন (M. Perron) নামেই বিশেষ পরিচিত।

গমন করেন। পরিচ্ছিত জঙ্গলের মধ্যে একটী বালক কুড়াইয়া পান। তিনি বালককে প্রাসাদে আনায়ন করতঃ বিজ্‌হি নামকরণ করিয়া দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালের ৩রা মাঘে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) রাজার মৃত্যু হইলে এই দত্তক পুত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। বিজ্‌হি বাহাদুরকে দারোহিতে * সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হয়। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হন এবং ১৯১৪ সালের ৮ই কার্ত্তিক তারিখে (অক্টোবর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইহধাম পরিত্যাগ করেন। দেওয়ান মহেশ্বরণ সিংহের পুত্র ভগবান সিংহ রাজার দত্তক নির্ব্বাচিত হইয়া ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে (ডিসেম্বর মাস) সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইনিই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বৃটীশরাজের নিকট হইতে লোকেন্দ্র মহারাজ উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন।

আগামী কোন বারে পাঠকগণকে চান্দেরি রাজ্যের ইতিহাস শুনাইবার বাসনা থাকিল।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

জগৎশেঠ

পঞ্চম অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

হাজী আহম্মদ, আলিবর্দ্দী ও তদ্বংশীয়েরা সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর হইতে ধীরে ধীরে সরফরাজের বিরুদ্ধে যে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জগৎশেঠ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। নবাব সরফরাজের সহিত আলিবর্দ্দী বা হাজী আহম্মদের এতদিনে কোন প্রকাশ্য

* গোয়ালিয়ারে ঐ নামের একটী প্রধান পরগণা। জালাউন হইতে ৩০ মাইল।

ভাবে বিবাদ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু উভয় পক্ষ পরস্পরকে পরস্পরের ঘোর বিদ্বেষী মনে করিতেছিল। সরফরাজ হাজী আহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার উপহাস ও উপেক্ষার ভাষা প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে হাজী আহম্মদ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিয়া সরফরাজের ঈদৃশ ব্যবহারের কথা আলিবর্দ্দীর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তাঁহার লিখিত বিবরণে সরফরাজের ব্যবহার অতিরঞ্জিত হইয়া আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইত। আলিবর্দ্দী খাঁ ক্রমে ক্রমে সরফরাজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার বংশের প্রতি সরফরাজের অযথা ব্যবহারের প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হন। সরফরাজও আলিবর্দ্দীবংশীয়গণের উপর বিরক্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে অপসৃত করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার পর একটি বিশেষ কারণে আলিবর্দ্দীবংশীয়েরা সরফরাজের প্রতি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন। হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী ও সাতাউল্যা খাঁর কন্যার সহিত আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মুসল্‌মানগণ আপনাদিগের বংশের মধ্যে মুসল্‌মান শাস্ত্রের অনিষিদ্ধ নিয়মানুসারে বিবাহ ব্যাপার সম্পাদন করিতে গৌরব মনে করিয়া থাকেন। উক্ত কন্যাটি সুন্দরী হওয়ায় সরফরাজ খাঁ স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ প্রদানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়া প্রকাশ করেন নবাবের এইরূপ ব্যবহারে আলিবর্দ্দী-বংশীয়েরা আপনাদিগকে যারপর নাই অবমানিত মনে করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। যদিও সেই কন্যাটির মৃত্যু হওয়ায় উভয় পক্ষের প্রকাশ্য বিবাদ সেই সময়ে উপস্থিত হয় নাই, তথাপি অধিক দিন তাঁহাদিগের অন্তরস্থিত বিদ্বেষবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারে নাই। আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া সরফরাজের ধ্বংসপথ বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমতঃ দিল্লী হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইলে সরফ-

রাজকে তিনি যে সহজেই পরাস্ত করিতে পারিবেন, এই ধারণা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল। সরফরাজ নাদির শাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ করায়, সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহার প্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হন। সরফরাজের বিপক্ষদল সেই বিষয়ের নানাপ্রকার কথা সম্রাটের কাণে তুলিয়া সরফরাজের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব আরও বাড়াইয়া তুলেন। বাদশাহ ও তাঁহার আমীর ওমরাহদিগকে বহু পরিমাণে অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহাদিগের নিকট নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বাদশাহের দরবার হইতে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ লাভে সক্ষম হন। উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিহারের কতিপয় বিদ্রোহী জমীদারকে দমন করার ছলে সৈন্য সজ্জা করিতে আরম্ভ করেন ও ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। যে দিন তিনি যাত্রা করেন, তাহা গোপনে জগৎশেঠকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত পত্রপ্রেরণের পর আলিবর্দ্দী বিহার পরিত্যাগ করেন। জগৎশেঠ যে দিবস উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার ৫।৬ দিন পরে আলিবর্দ্দীর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জগৎশেঠের পত্রের সহিত আলিবর্দ্দী নবাব সরফরাজ খাঁর নামেও এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাবকে তাঁহার পত্র প্রদান করিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও নবাবকে জানাইয়া দেন। নবাবের পত্রে আলিবর্দ্দী এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, "তাঁহার স্ববংশীয়গণের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে অবমাননার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন, নবাব যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার স্ববংশীয়গণকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার ন্যায় আজ্ঞাকারী ভৃত্য কখনও নবাবের আদেশ অমান্য করিতে ইচ্ছুক নহেন।" নবাব এই পত্র পাঠ করিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। হাজী আহম্মদকে এই সমস্ত বিষয়ের মূল বিবেচনা করিয়া নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। হাজী আহম্মদও নবাবকে সান্ত্বনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। হাজী আহম্মদকে

ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কিনা এই বিষয় লইয়া মন্ত্রিবর্গের মধ্যে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে মহম্মদ গাওস খাঁর কথানুসারে হাজী আহম্মদকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর নবাব তাঁহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নিজেও যুদ্ধসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হন। জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ প্রভৃতি নবাবকে এরূপ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দী যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিতেছেন।। কিন্তু নবাব চর পাঠাইয়া অবগত হন যে, আলিবর্দ্দী যুদ্ধের জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। নবাব মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া খামরা নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ বিহার অতিক্রম করিয়া শখরিগলি নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারিগণ আপনাদের প্রাপ্য বেতনের প্রার্থনা করে, এবং তাহা না পাইলে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হয়। সেই সময়ে আলিবর্দ্দীর নিকট ৪৫ হাজার টাকার অধিক ছিল না, তাঁহার দেওয়ান চিন্তামণি জগৎশেঠের নিকট হইতে টাকা আনাইবার প্রস্তাব করিলে আলিবর্দ্দী বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনায় তাহাতে আপত্তি করেন। এই সময়ে দীপচাঁদ ও অমীচাঁদ নামে দুইজন পাটনার ব্যবসায়ী আলিবর্দ্দীর শিবিরে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা আলিবর্দ্দীকে টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন। * তিনি রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া সূতীর নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় সরফরাজ ও আলিবর্দ্দীর মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

মুতাক্ষরীণে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই যুদ্ধের পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী ও জগৎশেঠের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান হইলেও জগৎশেঠ একটি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—তিনি আলিবর্দ্দীর কর্ম্মচারীদিগের নিকট টিপ্ † পাঠাইয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে ধৃত করিয়া সরফরাজের নিকট উপস্থিত করার জন্য ব্যস্ত

* Holwell's Intersting Historical Events Part 1 p. p. 89-94.

† বর্ত্তমান নোট বা চেকের ন্যায় কাগজ, তাহাতে টাকা দেওয়ার আদেশ থাকিত।

ছিলেন, আলিবর্দ্দীর অনেকগুলি কর্ম্মচারীর হস্তে সেই টিপ্ পড়িয়াছিল। এমন কি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী মস্তাফা খাঁও একখানি টিপ্ প্রাপ্ত হন। মস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দীকে সমস্ত কথা জানাইয়া পরদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলায়, আলিবর্দ্দী তাহাতে স্বীকৃত হন। * মুতাক্ষীরণের উক্ত বিবরণ সত্য কিনা তাহা বুঝা যায় না। আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত জগৎশেঠের যেরূপ যোগ ছিল, তাহাতে তিনি যে আলিবর্দ্দীকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না, তবে যদি নবাবের আদেশে তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ জগৎশেঠ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক উহার বিপরীত কথারই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, আলিবর্দ্দী খাঁই জগৎশেঠের দ্বারা সরফরাজের কর্ম্মচারীদিগের নিকট এইরূপ টিপ্ পাঠাইয়াছিলেন, অনুবাদকের সময় সরফরাজের একজন কর্ম্মচারী জীবিত ছিলেন। তিনি চারি হাজার টাকার এক টিপ পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপ টিপ পাইয়া সরফরাজের কর্ম্মচারিগণ ধুলা মাটি আবর্জ্জনার দ্বারা কামান পূর্ণ করিরা যুদ্ধ করিয়াছিল। † সরফরাজের কোন কোন কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিলেও তাঁহার বিশ্বাসী সেনানীগণ আলিবর্দ্দীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের প্রভুভক্তির পরিচয় দেখাইয়াছিলেন।

* Mutaqherin (English translation) vol I p. 363.

† "We know for certain, and this is the universal report, that the manœuvre was played by Alevurdy qhan himself through Djagatseat, his friend, againts Serefraz qhan's officers ; and we have been assured by one of them, still living, that himself had received such a Tip for 4000 R. and had been desired to load the artillery only with earth and rubbish. The universal report at Moorshoodabad is, that in fact some guns were served in that manner ; and by the by not a word is said by the author of Serefarz khan's artillery." (Mutaqherin Translator's note p. 383) বারুদ ও গোলাগুলির পরিবর্ত্তে সরফরাজের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ধুলা মাটি দ্বারা কামান ছাড়ার কথা তারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজুস সলাতীন গ্রন্থেও লিখিত আছে।

ইঁহাদিগের মধ্যে গাওস খাঁ প্রধান। গিরিয়ার বিশালক্ষেত্রে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আলিবর্দ্দী ও সরফরাজের মধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ নিহত হন। তাঁহার প্রধান ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গাওস খাঁ জগতে অতুলনীয় প্রভুভক্তি দেখাইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। গাওস খাঁর সেই দেবদুর্লভ প্রভুভক্তির জন্য গিরিয়ার চারিপাশের লোকে অদ্যাপি তাঁহাকে দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গ্রাম্য গাথাও রচিত হইয়াছে। যে স্থানে তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন, তথায় একটি দরগা স্থাপিত হয়, অদ্যাপি গাওস খাঁর দরগা লোকে পূজা করিয়া থাকে। * গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদে আনিয়া সমাহিত করা হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সরফরাজের অশিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইয়াছিল, গিরিয়ার যুদ্ধে তাহা শেষ হইয়া যায়। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের সাহায্যে আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রশংসা করা যায় না। আলিবর্দ্দী ও হাজী আহম্মদ প্রভুবিদ্রোহিতা পাপে আপনাদিগকে কলুষিত করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নবাব সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহে যাঁহারা শ্রীসম্পন্ন ও ক্ষমতশালী হইয়া উঠেন, সেই সুজাউদ্দীনের পুত্রের রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিয়া কৌশলে ও বলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে যে ঘোরতর কলঙ্কের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহারা সরফরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আয়োজন করা কদাচ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা অনায়াসে আপনাপন পদত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন

* গাওস খাঁর বিবরণ "মুর্শিদাবাদ কাহিনীর" গিরিয়া নামক প্রবন্ধে ও তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রাম্য কথা উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। গিরিয়া যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে।

করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে অন্য যে এক উদ্দেশ্য ছিল তাহারই জন্য তাঁহারা সরফরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সে উদ্দেশ্য—মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভের ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহারা যে বিদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেই হইবে। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানকেও এ বিষয়ে প্রশংসা করা যায় না। তাঁহারা যে সরফরাজ কর্ত্তৃক অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিশোধ বড়ই নিন্দনীয় ভাবে লওয়া হইয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে যে কারণে জগৎশেঠ সরফরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহা বিশ্বাস করিলেও তাঁহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করার সমর্থন করা যায় না। আর যদি শেঠবংশীয়-দিগের বিবরণানুসারে মুর্শিদকুলী খাঁর গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ না করায় উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়া সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা যে জগৎশেঠ ফতে-চাঁদের পক্ষে ঘোরতর কলঙ্কের কথা তাহার সন্দেহ নাই। অথবা প্রকৃত পক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁর অর্থ শেঠদিগের নিকট গচ্ছিত না থাকা সত্ত্বেও সরফরাজ যদি তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও জগৎশেঠের এরূপ নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া উচিত হয় নাই। তিনি প্রকাশ্য ভাবে সরফরাজকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন। অন্যায়রূপে অত্যাচার-প্রপী ড়িত হইলে জগৎশেঠ বাদশাহের নিকট সরফরাজের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিতেন, এবং বাদশাহ-দরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তিনি অল্প চেষ্টায় সরফরাজকে পদচ্যুত করাইতেও পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রভুদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া গোপনে তাহাদিগের সহিত, পত্রাদির আদান প্রদান করিয়া, এবং নবাবকে তাহার কিছু না জানাইয়া ঘোরতর কাপুরুষতা ও কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দ্দীর প্ররোচনায় নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে অর্থপ্রদানে বশীভূত কয়িয়া সরফরাজের সর্ব্বনাশের পথ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ফলতঃ ফতেচাঁদের ন্যায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধের এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার কদাচ সমর্থন করা যায় না। রায়রায়ান্ আলমচাঁদও যে ঘোরতর নিন্দার কাজ করিয়াছিলেন, সে

বিষয়েও সন্দেহ নাই। এরূপ ঘৃণিত ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। প্রভুদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, পরিণামে তিনি ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি গুলি বিদ্ধ হওয়ায় তিনি ...ত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গৃহে আনীত হন। তথায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া এই ঘটনার জন্য এতদূর অনুতপ্ত, লজ্জিত ও অশান্ত হইয়াছিলেন যে আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়া * শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। ফলতঃ সরফরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহা যে সর্ব্বথা নিন্দনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ষড়যন্ত্র অপেক্ষা আরও একটি ঘৃণিত ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র মুর্শিদাবাদে সংঘটিত হইয়াছিল। গিরিয়া যুদ্ধের ন্যায় তাহারও বিষময় ফল—পলাশীর যুদ্ধ! যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

প্রাচীন ঐতিহাসিক ফর্দ্দ

প্রায় সাত আট বৎসর পূর্ব্বে আমার পাঠ্যাবস্থায়, এক দিন আমি আমাদের 'দপ্তরখানা'-স্থিত প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি সমূহ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কয়েক খানি অতি প্রাচীন (১৬২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) ফর্দ্দের প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হয়। কিছু পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা একটী ঐতিহাসিক ফর্দ্দ। উহাতে রাজা বাদসাহদিগের নাম ও রাজত্বের সময়ের সংখ্যা লিখিত আছে। কিন্তু ফর্দ্দ মধ্যস্থ অশ্রুতপূর্ব্ব নামগুলি দেখিয়া বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উহা অতিযত্নে পৃথক্ রাখিলাম ও বন্ধু বান্ধবগণকে দেখাইয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলাম

* তারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজুস সালাতিনে লিখিত আছে যে, আমলচাঁদ হীরা চুষিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু রাসায়নিকদিগের মতে হীরক বিষাক্ত নহে। তবে মূল্যবান কোন কোন প্রস্তর বিষাক্ত বলিয়া শুনা যায়।

পাঠ্যাবস্থায় ও বিষয়ের আলোচনার সেরূপ সুবিধা ঘটে নাই, কাজেই উহা ঐ অবস্থায়ই রহিল। কয়েক বৎসর পর জনৈক বন্ধুর নিকট একখানি "পুণ্য" পত্রে "পীঢ়ী দর্ পীঢ়ী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, মৎসংগৃহীত ফর্দ্দগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিলক্ষণ উপলব্ধি হইল।

পীঢ়ী দর্ পীঢ়ীর ভূমিকা লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—"যে ইতিহাসের মূল বেদ, যে ইতিহাসের প্রকাণ্ড কাণ্ড রামায়ণ ও মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী যাহার শাখা, নানা প্রাকৃত ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস সমূহ যাহার পল্লব দল, আমাদিগের আলোচ্য ইতিহাসটী ভারতের সেই ইতিহাস বৃক্ষের একটী অতি ক্ষুদ্র পল্লবস্বরূপ।" অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল-গর্ভে কত লীলা খেলার চিত্র সমাহিত আছে কে বলিবে! আজি যাহাকে 'হাঁ' বলিতেছি, অনুসন্ধান ও প্রমাণে কালি তাহাকে 'না' করাইল; এইরূপ আজি যা 'না' ছিল, কালি তাহা 'হাঁ' হইতেছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের বিধান বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ সসম্ভ্রমে আজিও বহন করিতেছেন,—সেই অসীম প্রতাপান্বিত ভারত-বিশ্রুত নরাধিপের জন্ম মৃত্যু ও স্থান নির্ণয় তো দূরের কথা, তাঁহার পিতার নাম ও জাতি পর্য্যন্তও সর্ব্ববাদী-সম্মত রূপে নির্ণীত হইল না! জানি না সময়ে উপস্থিত ফর্দ্দের কোন মহাপুরুষ বল্লালের পিতৃত্বে দাবী করিয়া বসিবেন কি না! তাই এই ফর্দ্দের অভিনবত্বে অশ্রদ্ধা করিতে সাহস হয় না। পরন্তু ফর্দ্দটী বিশেষ সমাদরযোগ্য।

অদ্য ঐতিহাসিক চিত্রের পাঠকগণকে মদাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক ফর্দ্দ কয়েকখানি উপহার দিতেছি, যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক ফর্দ্দের লিখিত অশ্রুতপূর্ব্ব দুই একজন রাজারও সন্ধান পান, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

প্রায় এক ফুট দীর্ঘ ৫½ ইঞ্চ প্রস্থ বিশিষ্ট সাতখানি 'তুলট' কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। সর্ব্বোপরি "শ্রীশ্রীরাম" তন্নিম্নে "১১৪৯ সাল" বাম দিকে তির্য্যগ্ ভাবে "আমল রাজাবর্গ" লিখিত আছে। তন্নিম্নে "হেডিং" এইরূপ লেখা—

"রাজা যুধিষ্ঠির আদি জন বর্ষ মাস দিন—"

হস্তিনাধিপ রাজা যুধিষ্ঠির হইতে দিল্লীপতি আহমদ সাহ বাদসাহ পর্য্যন্তের নাম,

প্রত্যেকের রাজত্বের বৎসর, মাস ও দিনের সংখ্যা লিখিত আছে। দিল্লীর ৭৩ জন, ও পাটনার ৪২ জন * হিন্দু রাজার বিষয় ফর্দ্দে উল্লেখ আছে এবং কোন্ বংশের পর, কে কাহার পর রাজ্য পান, তাহাও সংক্ষেপে লেখা আছে। প্রথমোক্ত দিল্লীর ৭৩ জন রাজা ৩২৯৪ বৎসর ও পাটনার ৪২ জন রাজা ৩০০ বৎসর, একুনে ১১৫ জন হিন্দু রাজার প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ভারত শাসনের বিষয় লিখিত আছে। আমাদের ফর্দ্দের হিন্দুর শেষ রাজা দক্ষিণ পাল। ফর্দ্দে লিখিত আছে, "হরেক বাদসাবর্গ সুলতাব্দী বাদসা রাজা দক্ষিণপালকে মারিয়া তক্ত লইলেন। সুলতাব্দী হইতে আমদসাহ পর্য্যন্ত ৫৪ জন মুসলমান বাদসাহ ১১৫৫ বৎসর, ৩ মাস ৭ দিন দিল্লীতে রাজত্ব করেন। সর্ব্বশেষে লিখিত আছে "মহাম্মদ সাহ সন ১১৫৫।৩ বৈশাখ। তন্নিম্নে বর্ত্তমান আমদসাহ ১১৫৫।৪ বৈশাখ। তৎপর সুবা, সরকার, পরগণা ও জমার সংখ্যা আছে।

১৮১০ ইংরাজী সালে লিখিত ৺ মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কৃত রাজাবলী গ্রন্থের সহিত ফর্দ্দোক্ত বিষয়ের অনেকাংশ বেশ মিল দেখা যায়। কথিত পীঢ়ী দর্ পীঢ়ীর সহিতও কোন কোন অংশে মিল আছে। আমাদের ফর্দ্দের বয়স প্রায় দেড় শ বৎসরেরও অধিক, রাজাবলীর বয়স কিছু কম এক শত বৎসর। এমন অনেক নাম ও রাজত্বকালের বিবরণ দেখিয়াছি যে, তাহা কেবল আমাদের ফর্দ্দে ও রাজাবলীতে আছে, আর কোন গ্রন্থে নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এই সকল গ্রন্থোক্ত বিবরণ সকল কোন লুপ্তপ্রায় একই মূল গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলা বাহুল্য আমাদের ফর্দ্দেই পূর্ব্বে গৃহীত তৎপর 'দশনকলে আসল নষ্ট' বলিয়া যে প্রবাদ আছে, রাজাবলী প্রভৃতিতে তাহাই বোধ হয় বর্ত্তিয়াছে।

তুলনা দ্বারা অযথা প্রবন্ধ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সে বিষয় বিরত হওয়া গেল। অনুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণ আমাদের ফর্দ্দের সহিত উল্লিখিত গ্রন্থগুলি তুলনা করিলে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন। নিম্নে ফর্দ্দটীর নকল প্রদত্ত হইল।

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু।

* এই ৪২ জনা রাজা পাটনাতে থাকিয়াই দিল্লী শাসন করিতেন।

শ্রীশ্রীরাম।

সন ১১৪৯ সাল।

রাজা যুধিষ্ঠির আদি জন বর্ষ, মাস, দিন।

যুধিষ্ঠির	১	১০৮। ০।১৫
পরীক্ষিত	১	৯৫। ৪। ০
জন্মেজয়	১	৮৭। ৩। ৮
রসমঞ্জন	১	৮২। ৪।১২
দশরথ	১	৭৫। ১।২৫
রত্নসার	১	৮১।১০।১১
ভীমপাল	১	৫৮। ৭। ৩
সুসেন	১	৮৩। ০। ৯
লোহিত	১	৭২। ৫।১০
রঞ্জীত	১	৬৪। ৪। ৩
নরজীত	১	৬৫।১০।১৫
লোকপাল	১	৬৫। ০।১৫
নরসিংহ	১	৬১। ০। ০
সুবল্য	১	৫১। ৬। ২
সুরপাল	১	৫৪। ১। ৩
সুর	১	৫৫। ৩।১৫
সিমন্তন	১	৬০। ২। ৮
সাপন	১	৫৬। ১। ২
সুসঙ্গার	১	৫৩।১০। ০
রূপসিংহ	১	৫৫। ০।১৪
ধন্বন্তরি	১	৭২। ২। ৪
দর্পপাল	১	৫৯। ১। ০
হিমসেন	১	৭৭। ৯। ০
ত্রিরূপ	১	৭৭। ০। ০
নরসিংহ	১	৪৬।১১। ০
সুরদাস	১	৪১। ১। ০
লোকমণি	১	৪৯। ৯। ০
	২৭	১৮১২। ১।১৪

রাজা দিনার আদি লোকমণি মারিয়া

দিনার	১	১৭। ৩।২১
কমলাদেব	১	৪৮। ৩। ১
সুরসাহ	১	৪২। ৮। ৬
রূপসাহ	১	৬৫।১০। ৯
নরোত্তম	১	৪৮। ১। ১
পর্ব্বতসাহ	১	৩৩। ৭।১০
বিশ্বেশ্বর	১	৫৩। ১। ৩

আসল রাজাবর্গ

হিমাঙ্গদ	১	২৫। ৪। ৬
সরূপমণি	১	৪১। ০।১২
উগ্রসেন	১	৪৪। ০। ৪
স্কন্দপাল	১	৩০। ৪। ৬
সংগ্রামদেব	১	২৭। ৯। ৩
	১২	৪৭৭। ৪।১৯

রাজা দিনমাধব আদি

দিনমাধব	১	৬৫। ৭। ১	শ্রীপাল	১	১৭। ০। ৪
প্রাণমল্ল	১	২৭।১১। ২	গোপাল	১	৭২। ৪।২৬
চন্দ্রমল্ল	১	২২। ৩। ৭	জীবনমল্ল	১	১৯। ১। ৯
দিনমণি	১	৩৫। ৪। ২	বিরিঞ্চি	১	১৩। ৭। ৫
মহানন্দ	১	৪১। ৫। ৪	বৈজয়ন্ত	১	৪৮।১১। ০
জীতমল্ল	১	২৯। ০। ৬	নরহরিদেব	১	৪২। ৭। ৫
রুদ্রমল্ল	১	২৮। ৮। ১	রণমাধব	১	৫৫। ১। ২
বিক্রমাদিত্য	১	১৯। ৭। ১	সমাজীব	১	৩০। ৩। ২
শান্তিমল্ল	১	৪৩। ১। ০	বায়োশক্র	১	২৬। ২। ১
শূলপাণি	১	২৮। ৮। ২		১৯	৬৩৬। ৮।২১

রাজা রামধর শম্ভু আদি রায়োশক্রকে মারিয়া

রামধরশম্ভু	১	১২। ৯। ৭	কেশাদিত্য	১	৬।১০। ৪
বিজয় শম্ভু	১	২১। ১।২৫	ঈশাদিত্য	১	৪২। ৩। ৯
জীতশম্ভু	১	৩২। ৫।১৬	সোমাদিত্য	১	১৭। ২। ৫
দৈত্যারিশম্ভু	১	১২। ৮। ২	প্রতাপাদিত্য	১	১২। ৭। ৫
শক্রজীতশম্ভু	১	৩২। ৬।১১	চন্দ্রাদিত্য	১	২। ১। ৫
বিনায়কশম্ভু	১	৩৩। ০।১৫	শক্রাদিত্য	১	১। ৯। ৩
তেজাদিত্য	১	১৬। ০।১২		১৪	২৫২। ৯। ৬
স্থরাদিত্য	১	৯। ৪। ৭			

রাজা বিক্রমাদিত্য শক্রাদিত্যকে মারিয়া

১ ১১৫। ০। ০

দিল্লীতে আমল	৭৩
পাটনাতে আমল	৪২

রাজা রুদ্রপালাদি বিক্রমাদিত্যের পর

রুদ্রপাল	১	১৫। ০। ০	ইন্দ্রসাহ	১	৩। ৮। ৪
চন্দ্রসেন	১	৬। ৪।১৫	বীরসাহ	১	৩। ৮। ৪
নরপতিপাল	১	৯। ৪। ৫	ভীমসাহ	১	৫। ৭।১৮
নরহরিসিংহ	১	১। ৫। ২	বিন্দপাল	১	৫। ৭।২৩
সুন্দরমল্ল	১	২। ৩।১৫	বিক্রমপাল	১	১৬। ৭। ০
বৃহস্পতিপাল	১	৫। ৭। ২		১১	৭৫। ২।২৮

রাজা মল্লকচন্দ্র আদি বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া

মল্লকচন্দ্র	১	১১। ২। ২	সোমচন্দ্র	১	৭। ৫। ০
বিক্রমচন্দ্র	১	২। ৪।১০	শোভাচন্দ্র	১	৬। ৩। ২
রাজকচন্দ্র	১	১। ৭। ২	গোবিন্দচন্দ্র	১	৩৬। ১।২০
রামচন্দ্র	১	২।১১। ১	উত্তমচন্দ্র	১	৪। ৪। ৪
কল্যাণচন্দ্র	১	৬। ৪। ৯		৯	৭৮। ৫।২০

রাজা পরশুরাম তারসী উত্তমচন্দ্রের পর

পরশুরাম তারসী	১	৪।৫।১২
গোবিন্দরাম	১	১০।৪। ০
গোপীরমণ	১	৫।৭। ১
মহানন্দ মহীপাল	১	৪।২। ৭
	৪	২৪।৬।২০

রাজা দক্ষিণসেন আদি বাঙ্গালা হইতে জায়া মহানন্দকে মারিয়া রাজা হইলেন।

দক্ষিণ সেন	১	৮। ৫। ১
বল্লভ সেন	১	১২। ৪। ৩
মাধব সেন	১	১। ৩। ৭
দুন্দুভি সেন	১	৯। ৭। ২
স্থুর সেন	১	৫।১০। ৯
দেব সেন	১	৬। ০।১২
কল্যাণ সেন	১	২। ২।১২
বঙ্গ সেন	১	৪।১১। ০
নারায়ণ সেন	১	২। ৪।১৫
লছ্মন সেন	১	৬। ৭।১২
দামোদর সেন	১	১১। ৫। ২
বীরু সেন	১	১১। ০। ০
	১২	৭৮। ০।১৪

রাজা মাধব সিংহাদি উত্তর হইতে জায়া বীরসেনকে মারিয়া রাজা হইলেন—

মাধব সিংহ	১	১৭। ১। ৬
অতুল সিংহ	১	১৪। ৫। ০
নর সিংহ	১	১৫। ৫। ০
বীর সিংহ	১	৩। ৪। ৯
ঈশান সিংহ		১১। ৮। ১
রাজ সিংহ		১০। ৮। ৬
		৭২। ২।২২

রাজা ভুবন সিংহ বিলাত হইতে আসিয়া রাজসিংহকে মারিয়া সিংহাসনে বসিল—

ভুবন সিংহ	১	১০। ৪। ৯
জয় পাল	১	১১। ২। ১
বলজীত	১	১০। ৪। ২
উদয় পাল	১	১৩। ৭। ৫
দক্ষিণ পাল	১	২৭। ৩। ৩
		৭২। ৮।২০

হর্কে বাদসাবর্গ স্থলতান্দী বাদ্সা রাজা দক্ষিণপালকে মারিয়া তক্ত লইলেন

সুলতান্দী	১	২৩। ৯।২৯	আহমদ	১	১৫। ৪।১২
জয়রদ্দী	১	২৫।১১। ৪	সাহ মাণিক	১	২৭। ৫। ৭
সমসদ্দী	১	২৯। ৭। ৩	বার্ব্বক সাহ	১	২৯। ৭।১২
কুতুবদ্দী	১	২৭। ৭।১৩	করম সাহ	১	১৫। ০।১৫
সুলতান্দী	১	১৭। ৩।১৫	সাহ নিজাম	১	৭। ০। ৭
ইনামতদ্দী	১	৩১। ৯।২৯	সাহ নর	১	১৭। ৬।১৪
জয়রদ্দী	১	২৭। ৫। ৯	সাহ মল্লক	১	১৯। ৩।১৪
ময়দ্দী	১	২৩। ৪। ০	মহম্মদ আফগান	১	১৬।১১। ৮
সাহআলী	১	২৪। ৪। ৩	সুলতান সাহ	১	১৫। ৩।১৮
সাহ জালালদ্দী	১	২৬। ৪। ৩	গহন আফগান	১	১৩। ২। ৯
সাহ দিলাল	১	১৩। ১। ০	সাহ বিরাহিম	১	২৯। ৯।২১
সাহ ছিলেমান	১	২৯।১০।২৬	সুলতান বিরাহিম	১	৮। ৭।১৫
সুলতান সমস	১	১৩। ১।২০	সাহ আজদ	১	৭। ৯।২৫
আলাউদ্দী	১	২৭। ৭।১৪	সাহ মগু	১	১০। ৪।১৯
কুতুব সাহ	১	৩৪। ৫।২৪	সাহ হবিব্	১	১১। ৪।১৯
ইনায়ত সাহ	১	১৫। ১।২১	ছিলম সাহ	১	৮। ৯।১৫
সের সেতাচ	১	১৭। ৯।১৪	পিরোজ সাহ	১	০। ০। ৩
পিরোজ সাহ	১	৫৮। ৫।১৩	আদম আফগান	১	৩। ৪।১৮
নিজাম সাহ	১	৪১। ৯।১৪	কুতুব আফগান	১	৪২।১০।২২
আদম সাহ	১	২৭।১১। ০	সাহ তিমির	১	৭। ৯। ৬
সাহ আদম	১	৩৭। ৫। ৯	সাহ সিকর	১	৭। ০। ৭
ফতে আমানত	১	১৫। ৭।২৯	সাহ হোমাও	১	১০। ০।২৪
পূরণ সাহ	১	১৫। ৩।২৫	সাহ একব্বর	১	৫১। ০। ০

সাহ জাহঙ্গীর	১	২৩। ৭। ৩
সাহ জাহা	১	৩২। ৯।১০
সাহ আরঙ্গজেব	১	৫১। ০। ০
সাহ আলম	১	৫। ০। ০
ফরকসের	১	৭। ২। ০
	৫১	১১২৫। ৩। ৭

মহম্মদ সাহ ১ ৩০। ৭। ০

সন ১১৫৫ ৩বৈশাখ ফৌতি।

বৰ্ত্তমান

আমেদসাহ ১

সন ১১৫৫ ৪ঠা বৈশাখ।

পরগণা দামজমা সুবা সরকার

একব্বাবাদ	১	৪	২৭৪	৬০০০০০০০
লাহোর	১	২৭	৩২১	৯০০০০০০০
কাবুল	১	২১	২৫৫	১৯০০০০০০০
কাসমির	১	৩০	১৭০	১২০০০০০০০
আজমের	১	৩৮	১৮৯	৫৬০০০০০০০
জাঠা	১	৩২	১৫২	১১০০০০০০০
মুলতান	১	৩৪	১১০	৫৬০০০০০০০
সাকত্র	১	২৪	১০৪	৪৬০০০০০০০
বিলোয়ার	১	১১	১৫৯	৩৮০০০০০০০
দক্ষিণ	১	১৫	৮০	৪০০০০০০০
বিহার	১	২৮	১৪৯	৪০০০০০০০
বাঙ্গালা	১	২৭	১২২৮	২৮০০০০০০০
উড়স্যা	১	২৮	১৫০	১৯০০০০০০০
গউর	১	৪৫	১৪৩	২৮০০০০০০০
আমদাবাদ	১	২৯	২৯২	৫৪০০০০০০০
ইলাহাবাদ	১	১৬	২৬০	৪০০০০০০০০

দক্ষাত			
১	২৯	১৪৩	৩০০০০০০০০
াহারাষ্ট্র			
১	১০	৭৯	৫০০০০০০০০
১৯	৪৮৮	৪৫৬৫	৪৪৮৮০০০০০০০

হককত জমা বাদসাহি

আমল সাহ অতবংশের আলমগির

		সুভেতিকাদার	সুভেতবলাক
সুভেজাত	২১		
বাদ			
গয় আমলে	২		
	১৯	৮	৮

জাত সরকার	৪৮৮
জাত পরগণা	৪৫৬৫
জাত জমা দাম	৪৪৮৮০০০০০০০
জাত সোকা রূপেয়া	১১২২০০০০০০

এক বৃন্দ বার কোটী বিশ লক্ষ *

* এই ফর্দ্দের শ্রেষোক্ত কয়েকটি নাম ব্যতীত অন্য নামের ঐতিহাসিকত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলম্মান নামগুলির সহিত ইতিহাসের কোনই সম্পর্ক নাই। তবে হিন্দু রাজগণের নাম আজিও অজ্ঞাত, তজ্জন্য সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। তথাপি যে সমস্ত রাজার নাম স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের উল্লেখ বিশেষরূপে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদিগেরও ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সমান সন্দেহ। আইন আকবরীতেও এইরূপ অনেক হিন্দু রাজার নাম আছে। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রদেশ গুলির বিবরণ কতকটা আইন আকবরীর নকল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এইরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক ফর্দ্দ যে কৌতূহলবর্দ্ধক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্পাদক

ঐতিহাসিক বীর-গাথা।

গাওস্ খাঁ।

(সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" ১ম খণ্ডে একাদশ অধ্যায়ে "গিরিয়ার যুদ্ধ ও সরফরাজের মৃত্যু"র বিবরণ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৯২—৬০৩)

"নাই নাই নাই—নবাব নিহত"
দূত কহে আসি "নাই ;"
চমকে গাওস "নবাব নিহত!
সবি বৃথা হ'ল ছাই।
আমার ভল্লে ধরেছে বিদ্ধ
শত্রু সেনানী শির,
বিজিত পতাকা দম্ভ দলিত
আছে মোর করে থির ;
সব শেষ হ'ল—ব্যর্থ বিজয়,
নবাব নিহত—নাই!
যে মাণিক তরে যুঝিয়া মরিনু
ফি'রে দেখি তারে ছাই!"
"কোথারে বর্দ্দি কোথা কৃতঘ্ন,
কুক্কুর হ'তে হীন,
অন্নদাতার বক্ষরক্তে
শোধিলি তাহার ঋণ!
শোধ শোধ তার প্রতিশোধ তার
এখন র'য়েছে বাকি,
গাওস খাঁয়ের কঠোর খড়্গ
দিবে না দিতেরে ফাঁকি।"

চল চল চল বেগে ছুটে চল
ছোট্‌রে অশ্ব সাদী,
ঝলকি ভল্ল চমকি কৃপাণ
অরির অক্ষি ধাঁদি।
ছোটারে আমার গজেন্দ্র-প্রবরে
পিশাচ পামর পাশে,
এ মোর খড়্গ উঠেছে খেপিয়া
বর্দ্দি-রক্ত আশে।"
"কে ওরা পলায়, আমারি সৈন্য!
ধিক ধিক শত ধিক্!
কাপুরুষ নাম লভিতে জগতে
করিলি কি তোরা ঠিক!
প্রভুর রক্তে রণ-অঙ্গন
সিক্ত সকলে হে'রে,
কেমনে পলা'স কৃতঘ্ন মত
তুচ্ছ জীবন তরে!
ললাটে লেপিয়া কলঙ্ক কালি
বাঁচিয়া কি আর ফল,
ফের ফের তোরা বীরের মতন
প্রতিশোধ ল'তে চল।

বীরের বংশে জনম তোদের
বীর সাজে সাজি কায়,
কেমনে ভুলিলি আপন গর্ব্ব
কেমনে দলিলি পায় !"
"কেহ ফিরিলি না, কেহ ফিরিলি না,
ওরে শৃগালের দল !
শত পদাঘাত শিরে তুহাদের
নরকেতে নাহি থল।
ডুবাতে নবাবে ওরেরে কপট
কেনরে আসিলি রণে,
কেন না রহিলি রমণী আঁচল
ধরি বসি' গৃহকোণে !
ধিক ধিক ধিক শতধিক মোরে,
তুহাদের সেনাপতি !
কলঙ্ক মম, ঘুচাব এবার
সমরে শয়ন পাতি।"
"কি দেখ কুতুব, কি দেখ বাবর,
ফিরিতে ক'রনা আশ,
সকলেই যদি ছেড়ে চলে যায়,
আমাদের নাহি ত্রাস।
সমুখে শত্রু সিন্ধু সমান
তুচ্ছ সে সবে মানি,
যে কজন আছি মত্ত হস্তী
মথিব তাহারে জানি।
দারুণ দলনে সেনা তরঙ্গ
উগারিবে ফেনরাশি ;
ল'তে প্রতিশোধ বীরের বীর্য্য
এস সবে পরকাশি।"
ছুটিল গাওস গজের পৃষ্ঠে
গরজি ভীষণ রোষে,
বিদ্ধ ব্যাঘ্র আততায়ী'পরে
ছোটে যথা আক্রোশে।
ছুটিল কুতুব, ছুটিল বাবর
বেগবান বাজী 'পরে,
নাচায়ে নগ্ন শাণিত শস্ত্র
দীপ্ত দিনেশ করে।
সাথে সাথে ছোটে সৈনিকদল,
পলায়ন-অবশেষ,
শত বজ্রের তাড়নে কভুও
টলেনি যে একলেশ ;
কোটী কৃপাণের মুখেতে ধাইতে
কাঁপেনা যাদের প্রাণ,
সমরাঙ্গনে সমাধি স্বর্গ,
সুদৃঢ় হৃদয়ে জ্ঞান।
সহসা যেমন ঘূর্ণিত বায়
হুঙ্কারি ভীম রবে,
ঘন অরণ্যে প্রবেশিয়া বেগে
মথে মহীরুহ সবে,
উপাড়ি আছাড়ি ভাংগি বাহুশাখা
শত বিভিন্ন পাকে,
তেমতি গাওস সৈন্যের সহ
প্রবেশি 'শত্রু ঝাঁকে

ভল্লে ভেদিয়া কৃপাণে কাটিয়া
মথিল মর্ম্মতল
অরাতি সেনার ; শোণিতের স্রোতে
লোহিত নদীর জল।
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুর ব্যূহ
পলায় সৈন্য ত্রাসে।
"ওরে রে' বর্দ্দি, ওরে বর্ব্বর
আয়রে আমার পাশে ;"
গরজে গাওস হাওদার'পরে
দাঁড়ায়ে ভল্ল হাতে,
"তোরি কলঙ্ক ধোয়াইব আজি
তোহারি রক্তপাতে।"
একি একি একি সহসা গাওস
পড়িল গজের পিঠে ;
অজ্ঞাত কার অগ্নি-গোলকে
বাম জানু তার টুটে ;
রক্তের ধার চুমে ধরাতল
ভ্রূক্ষেপ নাহি কিছু।
"বসাও বাহনে ; কুতুব কুতুব
নামাও আমারে নীচু,
বসাও তোমার অশ্বের পিঠে
দেও অসি তুলি করে,
বর্দ্দি-রক্তে না রাংগি খড়্গ
ফিরিব না কভু ঘরে।"

চড়িল গাওস, ছুটিল অশ্ব
তড়বড়ি তীরবেগে,
ঘুরায় খড়্গ না হয় লক্ষ্য ;
গর্জ্জে, যেন সে মেঘে।
আজি বুঝি বীর দিবে রসাতল
সারা এ বিশ্বটারে,
অসীম আকাশ কাঁপে, মনে হয়,
হুঙ্কারে বারে বারে।
হায় রে নিয়তি, কে ঘুচাতে পারে
কঠোর কপাল-লেখা,
সব বীরত্ব সব উদ্যম
হয়ে যায় শেষে ফাঁকা।
বীরের খড়্গ বীর-হাতে রয়,
বাসনা সকল বাকি ;
বক্ষে বিঁধিল অগ্নি-গোলক
পলায় পরাণ-পাখী।
রক্ত-সিক্ত পড়িল গাওস
শেষের শয্যা'পরে,
"শোধ—শোধ—শোধ—প্রতি-
শোধ—শেষ"
আর না বাক্য সরে।

শ্রী—

সাময়িক-প্রসঙ্গ

রুস-জাপান যুদ্ধ—আর্থার বন্দর জাপানের হস্তে পতিত হওয়ার পর জাপান অভিনব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া রুসিয়াকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। অধিকাংশ জাপান সৈন্য এক্ষণে মুকডেনের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, শীঘ্রই আবার বসুন্ধরা নরশোণিতে রঞ্জিত হইবেন, এইরূপ অনুমান হইতেছে। ওদিকে আবার অন্তর্বিপ্লবে রুসিয়াকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। শ্রমজীবিগণ তাহাদের অসুবিধা দূর করার জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে ও জারের নিকট আবেদনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ফাদার গেপোন তাহাদের নেতা হইয়া জার দরবারে গিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে এরূপ নির্য্যাতন করিয়াছে যে তজ্জন্য দেশমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। গেপোন পলায়ন করিয়া ফ্রান্সদেশে আশ্রয় লইয়াছেন। গোরকি নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারও নির্ব্বাসিত হইয়া কারারুদ্ধ আছেন। জনসাধারণের প্রতি রাজ কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জারের পিতৃব্য ভ্লাডিমির ও সার্জিয়স কঠোরতার মাত্রা কিছু বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। ফরাসীবিপ্লবের প্রথমেও এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তখনকার ষোড়শ লুইএর সঙ্গে বর্ত্তমান জারেরও কতক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই দুর্ব্বলচিত্ত। সুতরাং রুসিয়ার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। অন্তর্বিপ্লবে ও বহিরাহবে রুসিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবে ফ্রান্স বহির্যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকীয় দলকে বিধ্বস্ত করিয়া বিপ্লবপক্ষ সমস্ত সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করায় ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে অজেয় হইয়া উঠে। ফ্রান্সের সেই পরাক্রমের শেষ ফল অবশেষে নেপোলিয়ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ইউরোপে এক মহা তুফানের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু রুসিয়া-বিপ্লবের নেতৃগণ সেইরূপ পরাক্রমশালী হইয়া জাপানের সম্মুখীন হইতে পারিবেন কি? তাহা যদি না

পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্তর্বিপ্লবে বিশেষ কোনরূপ ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ রাজকীয় সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে কি না বলা যায় না। বহিঃশত্রুকে দমন করিতে না পারিলে অন্তর্বিপ্লবের গৌরব দেশমধ্যে প্রচারিত হইবে কি না সন্দেহ। যদি তাঁহারা রাজকীয় দলকে পরাভূত করিয়া দেশের শাসন সহস্তে গ্রহণ করেন, অথচ বহিঃশত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রয়াসী হন, ত হইলে জনসাধারণ তাঁহাদের গৌরব করিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, রাজকীয় দল অদ্যাপি রুসিয়ার গৌরব বজায় জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। জাপান কর্তৃক বারম্বার পরাজিত হইয়াও তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যে পক্ষ বাহিরে রুসিয়ার গৌরব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন, জনসাধারণ তাঁহাদেরই পক্ষপাতী হইবে। সেই জন্য মনে হয়, রুসিয়ার অন্তর্বিপ্লব স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ ফাদার গেপোন প্রভৃতি নিরীহ নেতৃগণ ফরাসী-বিপ্লবের রক্তপিপাসু দলপতিগণের সমকক্ষ হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সেরূপ না হইলে রাজকীয় দলকে একেবারে বিধ্বস্ত করাও কঠিন হইবে। তবে যদি তাঁহারা ফরাসীবিপ্লবের পুনরভিনয় না করিয়া আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকেন, সে কথা স্বতন্ত্র। ভগবান্ করুন, জগতে আর যেন ফরাসীবিপ্লবের পুনরভিনয় না ঘটে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—বিগত ৬ই মাঘ বঙ্গদেশের কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া কেন সমস্ত ভারতবর্ষের এক দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। সেই দিন অপরাহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি রাজ-তুল্য ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজন্ম কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মানুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা যে 'জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী' হইয়াছেন ইহা কে অস্বীকার করিবে। মহাত্মা রামমোহন যে উপনিষদোক্তধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উপনিষদোক্ত দ্বৈতবাদের দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি তাঁহার মূল মন্ত্র ও তপস্যা ছিল। তিনি তাহা প্রতিপালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে

জন্মগ্রহণ করিলেও কঠোর বৈরাগ্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিপালনে কখনও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কেবল তাহাই নহে, তিনি সূর্য্যস্বরূপ থাকিয়া নিজ পরিবার মধ্যে একটি সৌর জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র, স্বর্ণকুমারী সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বল গ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। ধর্ম্ম ও সাহিত্যে যাঁহার জ্যোতিঃপুঞ্জ পড়িয়া এক অভিনব পন্থার সৃজন করিয়াছে, তাঁহার নাম চিরদিনই যে বাঙ্গলার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? ধন্য বঙ্গভূমি! যে দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় পুরুষ তোমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধন্য বঙ্গ-সাহিত্য! যে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা তুমি আলোকিত হইয়াছ।

সহযোগী চিত্র

বঙ্গীয়।

পৌষের ভারতীতে শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়ের লিখিত শঙ্কর চক্রবর্ত্তী একটি আলোচ্য প্রবন্ধ। লেখক শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে অনেক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যালের লিখিত মথুরাতত্ত্বে মথুরার প্রাচীন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পৌষের বঙ্গদর্শনে রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের অনেক বিশিষ্ট প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুরের লিখিত দিল্লীর শিল্প প্রদর্শিনী একটি আলোচ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিবঙ্কুরও সুখপাঠ্য।

পৌষের প্রবাসীতে শ্রীরামলাল সরকারের লিখিত সার রবার্ট হার্ট ও চীনের শাসন সংস্কার একটি আলোচ্য প্রবন্ধ। মাননীয় বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্রের লিখিত উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটি গবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। দুই খণ্ড শিলা লিপি প্রবন্ধে শ্রীযতীন্দ্র-

মোহন সিংহ ঢাকা জেলা মাণিকগঞ্জ মহকুমার গড়পাড়া গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত দুই খানি আরবী অক্ষরে খোদিত শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন। এক খানি আহম্মদ সাহের সময়ের স্থির হইয়াছে।

পৌষের বীরভূমিতে শ্রীসত্যচরণ রায়ের লিখিত সিংহলে ইংরাজ একটি আলোচ্য প্রবন্ধ। শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির লিখিত শ্রীহট্টে বৈষ্ণব প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী।

১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রে William Irvine এর লিখিত The Later Mughals একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ কথিত সংখ্যায় কেবল ফরখ্ সেরের রাজত্ব কালের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের East and West পত্রে Mr. C. A. Kincaid এর লিখিত The Parsis and Hellenic Influence আলোচ্য প্রবন্ধ। Mr. H. G. Keene এর লিখিত The Moghal Palace একটী সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

বিবিধ

শ্রীযুক্ত ফরেষ্ট সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত সরকারী কাগজ পত্র হইতে উহা রচিত হইয়াছে।

মাগুরার সেই অন্ধ উকীল সীতারাম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থখানি ভাল হইবে আশা করা যায়।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে উপেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দারাশেকো।

দারা শেকোর "সির-উল-অস্‌রার"

কয়েক মাস পূর্ব্বে মেটিয়াবুরুজ নিবাসী "মহম্মদ লতিফ" নামক কোন মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট আমি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত একখানা পারসী পুঁথি দেখি। পুঁথি খানি মোগল সম্রাট্‌ শাহ্‌জহাঁর পুত্র দারা শেকো-সঙ্কলিত। পুঁথি খানির হরফগুলি এখনও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। কৌতূহল পরবশ হইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে করিতে দেখি যে ইহাতে এক অভিনব বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বেদ, উপনিষৎ ও হিন্দু দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাপারই ইহার আলোচ্য বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসাচ্ছলে ইহাতে কোরাণের যথেষ্ট বচনও সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ, পুঁথিখানি বড়ই অপরূপ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোভও জন্মিল; কাজেই ভদ্র মুসলমান মহোদয়ের নিকট পুঁথি খানি ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা যথাশক্তি মূল্য দিয়া পুঁথি খানিকে স্বাধিকার-ভুক্ত করিলাম। পরে, শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এই পুঁথি খানির কতক অংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উক্ত পুঁথির বঙ্গানুবাদের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত হইল।

সংগৃহীত পুঁথিখানির নাম "সির-উল-অস্‌রার্‌" অর্থাৎ "নিগূঢ় রহস্য"।

মোগল সম্রাট্‌ শাহজহাঁ বাদ্‌শাহের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র দারা শেকো ইহার অনুবাদক। হিজ্‌রা ১০২৪, ২৯শে সফর, অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ্‌ মাসে দারা জন্মগ্রহণ করেন। নুরজহাঁ বেগমের ভ্রাতা উজির অসফ্‌খাঁর কন্যা "অর্জ্জুমন্দ্‌" ইহার মাতা। সাধারণতঃ, এই রমণী মমতাজ

মহল” ও “অলিয়া বেগম” নামে খ্যাতা। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে (১০৪৩ হিঃ), দারার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় পিতৃব্য-কন্যা নাদিরার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় জহাঁগীরের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান পরবেজ-কন্যা এই নাদিরার গর্ভে দারার দুই পুত্র জন্মে। ইঁহাদের নাম “সোলেমান শেকো” ও “সিপহর শেকো”। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কান্দাহার-অবরোধে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে দারা স্বেচ্ছায় পিত্রাদেশ লইয়া পুনরায় কান্দাহার অবরোধ করিতে যান। পরে অবরোধে ৫ মাস অতীত হইল দেখিয়া তিনিও অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া আসেন। যাহা হউক, এই অবরোধে দারা বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে শাহ্‌জহাঁ এক মহৎ উৎসব করেন। এই উৎসবে, তাঁহার প্রিয় পুত্র দারা শেকোকে প্রচুর অর্থ ও একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদের সহিত (“শাহ্‌ বুলন্দ ইক্‌বার দারা শেকো”) উপাধি দান করিয়া তাঁহাকে তিনি বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। অতঃপর, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জহাঁর পীড়িতাবস্থায় রাজসিংহাসন লইয়া দারা ও ঔরঙ্গজেব আলমগিরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এইযুদ্ধে দারা পরাভূত হইয়া সিন্ধু দেশাভিমুখে পলায়ন করেন তথায় তিনি সিন্ধু দেশাধিপতি-কর্ত্তৃক ধৃত হ’ন। অপিচ, হাওদা শূন্য একটী হস্তি পৃষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় স্থাপিত হইয়া ঔরঙ্গজেব-সমীপে আনীত হ’ন। এরূপ দীনাবস্থায় তাঁহাকে সহরের প্রধান প্রধান স্থানে ঘুরাইয়া বেড়ান হইয়াছিল পরে প্রাচীন দিল্লীস্থ খিজিরাবাদ নামক স্থানের একটী কারাগারে তাঁহাকে কিছু দিন আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই ভীষণ কারাগারে ১০৬৯ হিজরা ২১ জিলহিজ্জায় অর্থাৎ ২৯শে আগষ্ট ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের অনুমত্যনুসারে দারা শেকোর শিরশ্ছেদ হয়। এ ব্যাপার রাত্রিযোগে সঙ্ঘটিত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার শিরঃশূন্য-কলেবর হস্তীর পৃষ্ঠে তুলিয়া জন-সাধারণে প্রদর্শিত হয়। অনন্তর, হতভাগ্য দারা শেকোর ছিন্নশিরঃ সম্রাটের নিকট আনীত হইল তিনি তদ্দর্শনে যার পর নাই শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন অবশেষে তিনি দারার সশরীর মস্তক হুমায়ুনের কবরে সমাহিত করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে, সিপহর শেকো যিনি পিতৃসহ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন

তাঁহাকে গোয়ালিয়ারে বন্দী করিয়া পাঠান হইল। আর, দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকো কিছু কালের জন্য শ্রীনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য রাজকর্ত্তৃক ঔরঙ্গজবের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সমর্পিত হন। তাহারা তাঁহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেয়। ইনিও ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক গোয়ালিয়রে প্রেরিত হ'ন। কিন্তু, তথায় দুই ভ্রাতাই অল্পকাল মধ্যে কাল-কবলিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দারা শেকো পিতার অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। ইহার কারণ, শাহ্‌জহাঁ যে কেবল পুত্রের সারল্য, সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তাতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, দারার আর একটী গুণ তাঁহাকে বড়ই চমৎকৃত ও মোহিত করিয়াছিল। সেটী তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরক্তি। দারা, জ্ঞান-লাভের জন্য যেমন আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, হৃদয়ের পবিত্রতা লাভের জন্যও তেমনই হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। এই উদার ভাবের মধ্য দিয়া দেখিলে তিনি যে সমগ্র মোগল সম্রাট্‌গণের শীর্ষ স্থানীয়, এ কথা বলিতে হয়। দারা শেকো পারসী ভাষায় নিম্নলিখিত ৫খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম ও রচনা কাল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সফিনৎ-উল-অউলিয়া (১০৪৯ হিঃ)

২। সকিনৎ-উল-অউলিয়া (১০৫২ হিঃ)

৩। মজ্‌মা-উল-বহ্‌রেন (১০৬৫ হিঃ)

৪। সির-উল-অস্‌রার (১০৬৭ হিঃ)

৫। * * বাবা লাল দাস (?)

এক্ষণে, আমরা উক্ত ৫খানি গ্রন্থের মধ্যে "সির-উল-অস্‌রার" নামক গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

"সির-উল-অসরার" বা গূঢ় রহস্য। এখানি চতুর্ব্বেদের উপনিষৎগুলির অনুবাদ। অনুবাদক—মহম্মদ দারা শেকো। অনুবাদক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে হিঃ ১০৫০ তাঁহার কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থানকালে, তিনি "মোল্লা শাহ্"

নামক জনৈক সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্থফিদিগের ধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করিয়াছেন; স্থফিধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তক নিজেও লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তিনি Pentateuch, Gospel, Psalm ইত্যাদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকও পড়িয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে বেদে বিশেষতঃ উপনিষদে অদ্বৈতবাদ (বা তৌহিদ্) যেরূপ প্রাঞ্জল ভাবে লিখিত হইয়াছে এরূপ আর কোথাও নাই। বেদোপনিষদুপদিষ্ট এ তত্ত্বগুলি সাধারণ-গ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি উপনিষৎগুলি পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। আর, শাস্ত্রানুশীলনের প্রধান স্থান বারানসী তাঁহার শাসনাধীন থাকায় তিনি তথাকার বড় বড় পণ্ডিতের সাহায্যে "স্বয়ং" এই অনুবাদ লিখিয়াছেন। মৎ-সংগৃহীত এই পুঁথির প্রারম্ভে "শ্রীগণেশায় নমঃ" লিখিত আছে। এই পুঁথির শেষভাগে লিখিত আছে যে এই অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহার ৬ মাস লাগিয়াছিল। এবং ইহা ২৯শে রমজান্ ১০৬৭ হিঃ সমাপ্ত হয়। মৎ-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থখানির নাম "সির-উল-অসরার" লিখিত আছে। এই নাম Stewart সাহেবের তালিকায়ও (P. 53. XXII) পাওয়া যায়। কিন্তু Sir William Ouselyর' সংগ্রহ-তালিকায় (No 480), Cambridge, King's college লাইব্রেরীর ২১৭ নং পুস্তকে এবং Anquetilর অনুবাদে (Vol I, p. 6) ইহার নাম "সির অকবর" দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এই গ্রন্থে ৫০ খানি উপনিষদের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।* (Anquetil Duperon) আঁকেতি ডুপেরোঁ নামক একজন ফরাসী লেখক কর্ত্তৃক এই পারসী অনুবাদের একটী লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাঁহার পুস্তকের নাম দেওয়া হইল—

Oupnekhat (i. e Secretum tegendum) opus ipsa in India rerissimum, Continens antiquam et arcanam doctrinam equatuor Sacris Indorum libris excerptam, ad verbum e

* উপনিষদগুলির নাম বাহুল্য ভয়ে দেওয়া হইল না। নিম্নলিখিত পুস্তকে নামগুলি উক্ত আছে। Colbrooke Essays, pp 91—98, weber, Indische Studien, Heft 1—2, & Vorbesugen pp 148—165.

Persico idiomate in Latinum Conversam, etc. Argentorati, 1801."

আমরা পূর্ব্বে দুপেরোঁর অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছি। কাহারও কাহারও ধারণা যে দুপেরোঁর অনুবাদই অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস যে দুপেরোঁর অনুবাদের সারবত্তা কিছুই নাই। দারার পারসী অনুবাদ ও দুপেরোঁর লাটিন অনুবাদ পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে দুপেরোঁর সংস্কৃত ভাষায়তো দূরের কথা পারসী ভাষায়ও তাঁহার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি ছিল না।

দুপেরোঁ তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে দারার গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে; সুতরাং সাধারণের সুবিধার্থে তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিবেন। পারসীতে জের, জবর, পেষ প্রায়ই দেওয়া থাকে না—পাঠককে কোনও গতিকে বুঝিয়া লইতে হয়। কাফ্, গাফ্—দুইটী অক্ষরের কার্য্য প্রায়ই কাফের দ্বারা হইয়া থাকে। দুপেরোঁর কিরূপ সংস্কৃত শব্দজ্ঞান ছিল নিম্নোক্ত কয় ছত্র হইতে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন। তিনি "গর্গ" স্থানে kark' লিখিয়াছেন। এইরূপ—

গন্ধর্ব্ব	স্থানে	Kandherb
জ্ঞান	"	Aghian
ঋক্	"	Rak
যজুঃ	"	Djedjr
বুদ্ধি	"	Badia
অদিতি	"	Adat
বায়ু	"	Baib
বরুণ	"	Baran

ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দগুলি এইরূপ আকার ধারণ করিলে তাহার সংস্কৃত ভাষা যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অতীত। পারসী

সম্বন্ধে তিনি এরূপ বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখান নাই, সত্য। কিন্তু, তাঁহার অনুবাদ সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা নিম্নে "সির-উল-অসরার" গ্রন্থের ভূমিকার কিয়দংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। পাঠক ইচ্ছা করিলে মূলের সঙ্গে ডুপেরোঁর অনুবাদ মিলাইবেন—দেখিবেন মূল পারসীর সঙ্গে তাঁহার অনুবাদের কতদূর সম্পর্ক! আমাদের অনুবাদ এই—

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ক্ষমাশীল, কারুণিক পরমেশ্বরের নাম (গ্রহণ) পূর্ব্বক (নিবেদন)—যাঁহার আদি, রহস্যনিচয় (বিস্‌মল্লা) এই বাক্যে নিহিত বলিয়া ঈশ্বর প্রেরিত লেখকগণ (বিবেচনা করেন), যে ঈশ্বরের নাম ও ধন্যবাদ পবিত্র কোরাণের সমস্ত পুস্তকের আরম্ভ—সেই পুরুষের প্রশংসা,—সমগ্র স্বর্গদূত, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ, সিদ্ধ পুরুষ সকল ও কুলপতি নিচয় সম্বলিত সেই রৌদ্র নামকেই লক্ষ্য করিতেছে।

যখন ঈশ্বর—ন্যস্তচিত্ত ভক্ত দারাশেকো সেই শ্রেষ্ঠ (পুরুষের) আশীর্ব্বাদে এবং তাঁহার স্বর্গীয় ইচ্ছার অসীম প্রভাবে, ১০৫০ হিজ্‌রায় কাশ্মীরে উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য, শিক্ষকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্য-উপেদেষ্টা, নেতৃগণের পরিচালক, অদ্বৈত-বাদের সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ মোল্লাশাহ্‌র সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশ্বরযুক্ত হউন্!

যেহেতু সেই কুমার নিরন্তর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে ও অদ্বৈতবাদের উচ্চ মত শ্রবণে আমোদ অনুভব করিতেন; যেহেতু তিনি সুফি দার্শনিকদিগের নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং এমন কি নিজেও কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন; সেই জন্য অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় মত সমুদ্ভাবনের তৃষ্ণা প্রতিদিনই তদীয় মনে বৃদ্ধি পাইত এবং তাঁহার মন এ চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিত।

সেই রাজকুমার ইতঃপূর্ব্বেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ জনগণের ধর্ম্মমত শিক্ষা ও ধারণা করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং নানা স্থানে নানা

জনের নিকট একেশ্বর বাদিতার মত শ্রবণ করিয়া সুফি দার্শনিকদিগের বিবিধ ধর্ম্ম গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন এবং এমন কি নিজেও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অসীম মহা সমুদ্র-সম একেশ্বরবাদিত্বের অনন্তবক্ষে বিচরণ করিয়া ও তাহার অগাধ গর্ভে মগ্ন হইয়া তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের তৃষা দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে তাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এতই প্রবলা হইয়া উঠিল যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের কৃপা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ব্যতীত সেরূপ হওয়া অসম্ভব।

পবিত্র কোরাণের অধিকাংশ স্থলই দুর্ব্বোধ্য এবং তৎকালে কোরাণ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন এরূপ লোকের অভাবপ্রযুক্ত তিনি যাবতীয় পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সংকল্প করিলেন। এইরূপ সমুদায় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এই যে অনুক্ষণ ভগবানের বিষয় আলোচনা করিয়া তদ্গত চিত্ত ও তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারিলে আর অন্যের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। যাবতীয় গূঢ় রহস্য স্বতঃই উদ্ভিন্ন হইবে এবং একখানি গ্রন্থে যে বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে হয়ত গ্রন্থান্তরে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট, সুসমাচারিক গ্রন্থনিচয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে একেশ্বরবাদিতা এতই অস্পষ্ট ও জটিল ভাবে বর্ণিত যে পাঠককে ধাঁধার মধ্যে পড়িতে হয়। যে সকল গ্রন্থের ভাষা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন বহু ভাষাবিদ্‌দিগকে বেতন দিয়া তিনি সেই সকল গ্রন্থ অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন সে সকল অনুবাদও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ কিছু সহায়তা করে নাই।

তাহার পর হিন্দুস্থানের লোক যে সর্ব্বদাই একেশ্বরবাদিতার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং হিন্দুদার্শনিকগণ (যাঁহারা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন এই উভয় শ্রেণীর দার্শনিকগণই) যে ঈশ্বরের একত্ব অস্বীকার করেন না এবং তদ্বিষয়ে কোন আপত্তিও করেন না বরং ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে করেন তাহা কোন্ সূত্র ধরিয়া, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা

শেষে উল্লেখ আছে যে ২৭শে রমজান ১০৪৯ হিঃ ইহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থে যাঁহাদের জীবনী লিখিত আছে তাঁহাদের নাম যথা—

প্রথম মহম্মদ এবং ১১ জন পরবর্ত্তী ইমাম। সলেমান ফারিসী, উবইস্ করণি, হসন বস্‌রি। মহম্মদ পুত্র কাসিম, ৪ জন ইমাম, আবু য়ুসুফ এবং মহ্‌ম্মদ শাইবানি। শেখদিগের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ গ্রন্থে যে যে সম্প্রদায়ের শেখদিগের নাম আছে তাহার তালিকা যথা—

১। মরুফ করখি (মৃত্যু-২০০ হিঃ) হইতে মিয়ান জিব (মৃত্যু-১০৪৫) পর্য্যন্ত কাদিরি সম্প্রদায়। [ইহাদিগকে অব্দ-উল-কাদিরের পূর্ব্বে "জয়ানইদি" বলা হইত]

২। নক্‌যাবন্দী—[ইসা-দস্তামি-পুত্র বায়াজিদ তায়ফুরের সময় হইতে খাওয়জা সলিহ্‌র (মৃত্যু ১০৪৮ হিঃ) সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগকে "তায়ফুর" বলা হইত]

৩। জইদ (মৃত্যু-১৭৭ হিঃ) পুত্র অব্দ-উল—ওয়াহেদ হইতে শেখ জলাল থানেশ্বরী (মৃত্যু-৯৪০ হিঃ) চিষ্‌তি বা কিষ্‌তি সম্প্রদায়। *

৪। অব্দ উল্লা নসসৃজ-পুত্র আবু বেকার হইতে সুলতান ওয়ালদ—(মৃত্যু—৭১২ হিঃ) পর্য্যন্ত "কুব্‌রাবি" সম্প্রদায়। [নজম-উদ্দিন কুব্‌রা হইতে এই নামের উৎপত্তি]।

৫। মমশাদ্ দিনাবরি (মৃ—২৯৯ হিঃ) হইতে সিরাজুদ্দিন মহম্মদ শাহ আলম (মৃত্যু—আহ্‌মাবাদ ৪৪০ হিঃ) পর্য্যন্ত সুহ্‌রাবর্দ্দি সম্প্রদায়।

এই সফিনত্ অউলিয়ার লক্ষ্ণৌ প্রদেশে ১৮৭২ হিঃ একটী Lithograph সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সকিনত্-উল-অউলিয়া—সাধু মিয়ানজিব এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের বিবরণ-সমন্বিত একখানি সুন্দর গ্রন্থ। দারা শেকো ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তিনি ১০৪৯ হিঃ ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, মহম্মদ শাহ্ লিসান উল্লা মাহক মিয়ান-

* দারা তাঁহার ভগিনী জহান্ আরাকে (বেগম সাহেব) সফিনৎ-উল-অউলিয়ার মতানুসারে "কিষ্‌তি"-ধর্ম্মমতে স্বয়ং দীক্ষিত করেন।

জিবের একজন প্রধান শিষ্যের নিকট কাদিরি সম্প্রদায়-সম্মত ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। ইঁহারই প্রভাবে তিনি ধন, সম্পদসম্মানাদি সত্ত্বেও অনতিকাল মধ্যে প্রকৃত দরবেশের মনোবৃত্তি লাভ করেন। তিনি এই গ্রন্থ ১০৫২ হিঃ সমাপ্ত করেন।

মির মহম্মদ ও মিয়ানমির, মিয়ানজিবের অপর নাম। ইনি ৯৩৪ হিঃ সিন্ধুপ্রদেশস্থ সিবাস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল কাজি সাঁই দাতা (স্বামিদত্ত ?)। ইঁহারা খলিফ উমরের বংশ বলিয়া পরিচিত। মিয়ানজিব লাহোরে ৬০ বৎসর ছিলেন। শাহ্‌জহাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এই মহাত্মা ১০৪৫ * হিঃ লাহোরে দেহত্যাগ করেন। দারা শেকো ইঁহার সমাধির উপর একটী প্রকাণ্ড গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এই গ্রন্থের নকলকারীর নাম শরফুদ্দিন মুলতালি।

আমাদের লিখিত বিবরণ হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে দারা শেকো অদ্বৈতবাদ ও সুফি মতের সামঞ্জস্য দ্বারা কিরূপে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের একতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ অকবর শাহ্‌ ধর্ম্মসমন্বয়ের যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন দারা শেকো তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গভীর জ্ঞানপিপাসার সহিত অতুল বীরত্ব তাঁহাকে মোগল বাদশাহ্‌জাদাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছে। আমাদের মতে শাহ্‌জাহাঁর পর যদি দারা দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অল্পদিনের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইত না।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

* পাদিশানামায় মিয়ানজিবের অন্তকাল ১০৪৪ বলিয়া লিখিত আছে।

———o———

মুতাক্ষরীণ ও মুস্তাফা

"সৈয়র মুতাক্ষরীণ" নামক পারস্যগ্রন্থ ভারতবর্ষের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুলিখিত ও প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দ হইতে ১৭৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অধিকাংশ ঘটনা সুন্দর ও সুবিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই যুগ অতি সমস্যাময় সময়—এই যুগে সমস্ত ভারতবর্ষে যে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যে বিপ্লবের উপর বিপ্লবে ভারতবক্ষ বিধ্বস্ত হইয়াছে, অন্য কোন যুগের ঘটনাবলীর সহিত তাহা তুলনীয় নহে। এই যুগেই ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, এবং ইংরাজ জাতির গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু, তাঁহার বংশধরগণের অকর্ম্মণ্যতা, মারহাট্টাজাতির অভ্যুদয়, নাদির ও আহম্মদের প্রবল আক্রমণে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। গৃহবিবাদে মারহাট্টাসম্প্রদায়ের পতন হইতে থাকে; অবশেষে আহ-ম্মদসাহের উপর্য্যুপরি ভীষণ আক্রমণের পর পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারহাট্টা-বীর্য্য অস্তমিত হইল। আরকট ও বন্দীবাসের যুদ্ধে ফরাসীগৌরব বিলুপ্ত হওয়াতে ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মোগল ও মারহাট্টার পতনে, পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে সেই প্রাধান্য ভারতক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারতপরিত্যাগের প্রাক্কালে ইংরাজ-বিজয়ের রক্তরঙ্গে ভারতের বহুস্থান সুরঞ্জিত হইয়াছিল। সৈয়র মুতাক্ষরীণে এই যুগের বহু ঘটনার প্রামাণিক ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

এই প্রকাণ্ড পুস্তকে শেষ সাতজন মোগলবাদসাহের রাজত্বকাল, বাঙ্গালা-দেশে আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলার নবাবী আমল, অযোধ্যা প্রদেশে সুজা-উদ্দৌলা ও আসফউদ্দৌলার শাসনকাল এবং বাঙ্গালাদেশে ইংরাজদিগের

যুদ্ধবিগ্রহ—এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত ইতিবৃত্ত আছে। কিন্তু এই সকল রাজত্বকালের বর্ণনা অপেক্ষা এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালার যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এ পুস্তক পাঠ করিলে দেশের অবস্থা ও দশের অবস্থার যে সুন্দর ও সজীব আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে যেরূপ ভাবে নবাবসরকারের অসংখ্য নিগূঢ়-রহস্য সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, নবাবগণের নিভৃত অন্দরমহলের উন্মুক্ত জীবন্ত চিত্র যেরূপ ভাবে লোক-লোচনের পথবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। যেখানে নির্ভীক লেখকের তীব্র সমালোচনায় নৃপতিবিশেষের বা কোন প্রধান ব্যক্তির চরিত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যেখানে সুনিপুণ ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মানুসন্ধানে অনেক দুর্ব্বোধ্য ঐতিহাসিক সত্য সরল ও সতেজভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, যেখানে উন্নতমনা লেখকের সরল ও সহৃদয় বর্ণনায় উচ্চভাব ও উচ্চভাষার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে, সে সকল স্থান পড়িতে পড়িতে বিস্মিত ও বিমোহিত না হইয়া পারা যায় না। যে স্থানে গ্রন্থকার বৃটিশশাসনের প্রারম্ভে ইংরাজগণের রাজ্যশাসন-প্রণালীর সুবিস্তৃত সমালোচনা করিতে গিয়া একে একে দ্বাদশটি কারণ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ইংরাজশাসনের অবিচার, অত্যাচার এবং অকৃতকার্য্যতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে প্রদত্ত বিবরণীর সম্পূর্ণ প্রামাণিকতার না হউক, গ্রন্থকারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই পুস্তকে দেখি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে লোকের অবস্থা কিরূপ হীন হইতেছিল; আর যদি বর্ত্তমান সময়ের সহিত তৎকালীন সমগ্র বঙ্গবিহারের সাধারণ প্রজার অবস্থা তুলনা করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের অপেক্ষা কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারি। মুসলমান শাসকেরা বিশৃঙ্খল-ভাবে রাজস্ব আদায় করিয়াও তখন যে পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সুনিপুণ ও সুপরিচালিত বিরাট শাসনপ্রণালী দ্বারাও তাহার শতাংশের একাংশ রাজস্ব আদায় হয় না। এক্ষণে যেরূপ

সোরা, লবণ, গাঁজা, আফিঙ, ডাকবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি পন্থা হইতে গবর্ণমেণ্টের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, তখন এ সকল বিষয় হইতে এক কপর্দ্দকও সংগৃহীত হইত না। কিন্তু তখন জমির উৎপাদিকা শক্তি, উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ, অর্থাগমের সুবিধা, এবং দেশে ধনাধিক্য এত ছিল যে লোকে স্বল্পায়াসে স্বল্প আয় করিয়া, তদ্দ্বারা বহুবিলাসে, সমৃদ্ধভাবে ও পরম সুখে জীবন যাপন করিত। রাজায় রাজায় বিবাদ, বিদ্রোহীর বিদ্রোহ ও নানা দেশে সৈন্যপরিচালনা প্রভৃতি অপ্রীতিকর ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইলেও, সে সব ব্যাপারে প্রজাকুলের ব্যাকুল হইবার আবশ্যকতা ছিল না, বা তদ্দ্বারা তাহাদের শান্তি বা বিলাসভঙ্গ করিত না। রাজধানীর উন্মুক্তসমুদ্রে বিদ্রোহপবনে যে প্রচণ্ড সমরতরঙ্গ সমুত্থিত করিত, নিভৃতপল্লীর দূরপ্রান্তে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তাহার ক্ষীণরেখা শান্তসলিলের সমতলে বিলীন হইয়া যাইত। সৈয়র মুতাক্ষরীণের পত্রে পত্রে এই সকল বিষয় পাঠ করিলে, মনে মনে যে হর্ষোৎপত্তি হয়, তাহাতে গ্রন্থকারের সামান্য দুই একটি দোষের বিষয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি যুগপৎ ভক্তি ও প্রীতির সমুদ্রেক হয়। অসংখ্য অসংযোজ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, বিরাট ঐতিহাসিক পুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারকে কত কষ্ট ও কত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহাও আমাদের বিবেচনার বিষয়ীভূত না হইয়া পারে না।

সৈয়র মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকর্ত্তার নাম সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ। মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের বংশধরগণ "সৈয়দ" নামে পরিচিত হইয়া মুসলমান জগতে কিরূপ সম্মানিত হন, বঙ্গদেশে তাহা অবিদিত নাই। গোলাম হোসেন উচ্চবংশসম্ভূত এবং সুশিক্ষিত। বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার সংশ্রব থাকিলেও তাঁহার জীবন প্রধানতঃ সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। তিনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যে সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ মুতাক্ষরীণে স্থান পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কতকগুলি ঘটনায় নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট স্বীয় আত্মীয় বা বিশ্বস্ত বন্ধু-

বর্গের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। পুস্তকের দুই এক স্থলে মাত্র কোন কোন পারস্য গ্রন্থের বা বৈদেশিক গ্রন্থোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে পারস্য-গ্রন্থগুলি নিজে পড়িয়াছিলেন, এবং বৈদেশিক গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল ইংরাজ বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। বিবৃত ঘটনাবলীতে সর্ব্বত্রই সত্যতার সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই জন্যই মুতাক্ষরীণ পাশ্চাত্য জগতে অত্যধিক আদরণীয় হইয়াছে।

গোলাম হোসেন তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বস্থলেই একজন ধীর, সুবিজ্ঞ, সরল ও সুনিপুণ ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত হন। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিকের ভাষা যেরূপ রূপক ও কল্পনাময় হয়, গোলাম হোসেনের ভাষা সেরূপ নহে। তাঁহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সহজ, প্রাঞ্জল ও আড়ম্বরশূন্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় সত্যতা ও স্বদেশভক্তির সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃত ঘটনাবলী নিরপেক্ষ এবং অনতিরঞ্জিত ভাষায় প্রতিকৃত করিয়া দেখানই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য; মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আমরা গোলাম হোসেনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখি। * তিনি ঘটনা সকল যেরূপ দেখিয়াছেন বা জানিয়াছেন, অবিকল সেইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তিনি নিজে যেরূপ অবিচলিত হইয়া, নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা মুসলমান লেখকের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এ জাতীয় ইতিহাস য়ুরোপেও যে ধরণে লিখিত হয়, মুতাক্ষরীণও সেই ধরণে লিখিত। য়ুরোপীয় কোন ঐতিহাসিক মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকার হইলেও তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ ছিল না। †

* এ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই :—"It is the faithful historian's duty to bring to light whatever he knows with certitude. I shall take the liberty to assemble such events as are come to my knowledge and to speak of them precisely as they have happened without being biassed by either envy or love, and without flattering either side or party. * * * They (my readers) shall overlook all the blemishes of this history in favour of its sincerity and exactitude."

† It is written in the style of private memoirs in the most useful

যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক পাশ্চাত্যতুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত মুসলমান ঐতিহাসিকের বিস্তীর্ণ পুস্তকে কোন দোষ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের সময়, সুবিধা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় বিবেচনা করিয়া সে সকল বিস্মৃত হইতে পারেন।

সৈয়র মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবলম্বন হইয়াছে। দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বিস্তৃত পারস্য গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের সাধ্য বা সুবিধার আয়ত্তাধীন হয় নাই। তবে উক্ত অনুবাদ এত বিশ্বস্ত ও মূলানুবর্ত্তী যে মূল গ্রন্থের সাহায্য না লইলেও কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই। এমন কি পারস্যভাষাভিজ্ঞ সুবিখ্যাত ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বকীয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার সময় মূল-গ্রন্থের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। *

উপরোক্ত অনুবাদক হাজি মুস্তাফা নামে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম হাজি মুস্তাফা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি ফরাসি পরিবার ঘটনাক্রমে তুর্করাজধানী কনস্তান্তিনোপলে বাস করিতেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্কালে এই পরিবারে মাসিও রেমণ্ড (M. Raymond) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ফরাসী দেশীয় খৃষ্টান হইলেও, তুর্কসংস্পর্শে কতকাংশে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যখন তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, তখন রেমণ্ড ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ভাগ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন, তাহা দৈবক্রমে বিনষ্ট হওয়াতে কয়েকজন ইংরাজের সাহায্যে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। রেমণ্ড বঙ্গদেশে আসিয়া

and engaging shape which history can assume nor, excepting in the peculiarities which belong to the Mohomedan character and creed, do we perceive throughout its pages any inferiority to the historical memoirs of Europe. The Duc De Sully, Lord Clarondon or Bishop Burnet need not have been ashamed to be the authors of such a production—*General John Briggs*.

* "It bears such strong evidence of being a literal translation, that I did not think it requisite to search for the original." *Stewarts History of Bengal* pp. xiii—iv

উপনীত হন এবং তত্রত্য নবাবের রাজধানী মুর্শদাবাদে স্বীয় অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতৃ পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। রেমণ্ড মুর্শিদাবাদে ফীলখানা বা হস্তিশালার দারোগা ছিলেন। * নবাবের রাজধানীর জল বায়ু দোষে রেমণ্ড অল্পদিন মধ্যে বিলাস-স্রোতে ভাসমান হন এবং জনৈক মুসলমান রমণীর প্রেমকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন, এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মুস্তাফা নাম ধারণ করেন। মুস্তাফা বিলাসী হইলেও অলস ছিলেন না; তিনি অল্পদিন মধ্যে পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি এক সময়ে বৈদেশিকদিগের মধ্যে মুস্তাফা, হেষ্টিংস এবং ভান্সিটার্ট ব্যতীত আর কেহই পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। মুস্তাফা নানা কার্য্যে নানা ভাবে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করেন। তিনি পারস্য পুঁথি ও ভারতীয় অপূর্ব্ব সামগ্রী সমূহের বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা মক্কা মদিনা প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শনার্থ যাত্রা করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জেড্ডা ও মক্কা নগরে তাঁহার সমস্ত ধন রত্ন দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়; ধনরত্ন অপেক্ষা দুর্ল্লভ পুস্তকগুলি অপহৃত হওয়াতেই তিনি অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। মক্কা হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুসলমানগণ হাজি নামে পরিচিত হন; এজন্য রেমণ্ডের নাম হইল হাজি মুস্তাফা। হাজি মুস্তাফা এবার লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, এবং পুস্তকাদি সংগ্রহরূপ অনর্থক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরী মহিলা পরিবৃত অন্দরমহল গঠনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনগগনে তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; প্রৌঢ় বয়সে প্রেমবিলাসে যুবতীসঙ্গে লীলাখেলায় যে সমস্ত ফল হয়, তাঁহারও সে সকল ফল হইয়াছিল। † সমস্ত কথা তিনি খুলিয়া বলেন নাই, তবে তিনি যে মদ্যপায়ী

* মহারাজ নন্দকুমারের পত্র, "মুর্শিদাবাদ কাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† মুস্তফা নিজেই লিখিয়াছেন:—"Men on the decline of life who after abondoning the scheme of making a collection of books, jump at once into the project of making a collection of Female Beauties, must lay their account with cutting now and then a capital figure in certain adven-

ছিলেন না তাহা স্থানান্তরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। * হেষ্টিংসের শাসন-কালে নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর সহিত মুস্তাফার এক ভীষণ বিবাদ হয়, তৎ-সময়ে তিনি দুর্ব্বৃত্ত রেজা খাঁর কুচরিত্র-কাহিনী বিস্তৃত বিবরণীতে ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু ফুটিলে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণসমূহ প্রকাশিত হইলে, রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। এই সময়ে মুস্তাফ স্বীয় সন্তানদিগকে য়ুরোপে পাঠাইয়া স্বয়ং কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

মুস্তাফা পারসীক, ইংরাজী ও ফরাসী এই তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত ইংরাজ রাজ্যে, ইংরাজ সংস্পর্শে নানা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া মুস্তাফা উক্ত ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যে স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ মহাত্মগণও তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। পারস্যভাষায় তাঁহার অধিকার কত বেশী ছিল, তাহা যাঁহারা মুতাক্ষরীণের মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারি-বেন না। মূল মুতাক্ষরীণ সে সময়ে মুদ্রিত হয় নাই; হস্তলিখিত পুঁথিও দুষ্প্রাপ্য ছিল; তাহা হইতে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা কত দুরূহ ব্যাপার তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচ্য বিষয়।

মুস্তাফা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়াছেন; এই বৎসরই সুবিখ্যাত বাগ্মি-কুলগৌরব মহামতি এডমণ্ড বার্ক ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতশাসনের সমস্ত দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এক ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। মুস্তাফা হেষ্টিংসের নিকট নানাভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুগৃহীত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি অনুবাদপুস্তক তাঁহারই নামে উৎসর্গ করেন। †

tures, which never fail to spring up in a house where youth and beauty are jumbled together with old age and wrinkles."

Preface to the translation of Seir Mutaqherin. p. 2.

* P. G. Vol. I. (Preface).

† মুস্তাফা স্বীয় নাম গোপন করিয়া "Nota Manus" এই গুপ্তনামে সৈয়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদ বা Review of Modern Times নামক পুস্তক ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করেন।

গোলাম হোসেন ইংরাজদিগের নিকট সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; সম্ভবতঃ এই জন্যই ব্যক্তিগত-ভাবে হেষ্টিংসের কার্য্যপ্রণালীর কোনও তীব্র সমালোচনা তাঁহার পুস্তকে স্থান পায় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রামাণিক গ্রন্থের অনুবাদ পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে, তৎসাহায্যে হেষ্টিংস স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইবেন মনে করিয়া, মুস্তফা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই স্বীয় অনুবাদ পুস্তকের তিন খণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এই তিন খণ্ড প্রতিলিপিতে ৭৪০০ পৃষ্ঠা হইয়াছিল এবং তাহাতে দুই সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। পর বৎসর হইতে কলিকাতার কুপার কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়া ১৯ মাস পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাণ্ড তিন ভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান সময়ের মত উন্নত বা সুলভ হয় নাই; এজন্য উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গ্রন্থকারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি তিনি উক্ত ব্যাপারে যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিশোধের জন্য তাঁহাকে পুস্তক বাসন ও অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুস্তাফার দুর্ভাগ্য এত বেশী যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে জাহাজে মুদ্রিত পুস্তকগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা পথি মধ্যে বিনষ্ট হওয়াতে ইংলণ্ডে তাহার একখণ্ডও যায় নাই। যে অল্প সংখ্যক পুস্তক কলিকাতায় বিতরিত বা বিক্রীত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র মুস্তাফার গুরুতর পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয়ের স্মৃতি রক্ষা করিল। ইংলণ্ডে মুতাক্ষরীণের অনুবাদের বহুল প্রচার জন্য মান্দ্রাজের সৈনিক বিভাগের কর্ণেল জন ব্রিগস্ সাহেব এক অনুবাদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মারে কোম্পানি দ্বারা উহার একখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়। ব্যালফোর নামক জনৈক সাহেব অন্য এক অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। জোনাথন স্কটস্ সাহেবও কতকাংশ মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে মুস্তাফার পুস্তকই সম্পূর্ণ, সুন্দর ও মূলানুবর্ত্তী। তাঁহার পুস্তক পড়িলে অনেকস্থলে অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহার

ভাষা কিছু কঠিন ও আড়ম্বর পূর্ণ। ইহার এক কারণ এই যে অনুবাদ পুস্তকে এরূপ না হইয়া পারে না; দ্বিতীয় কারণ মুস্তাফা স্বয়ং ইংরাজ নহেন। মুস্তাফার পুস্তকের একটি বিশেষত্ব আছে; তাঁহার পুস্তক শুধু অনুবাদ নহে; তিনি নিজেও বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, তদানীন্তন অনেক ঘটনার বিশেষ সংবাদ জানিতেন, এবং তাহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও কম ছিল না। তিনি গোলাম হোসেনের বর্ণিত অনেক ঘটনা প্রকৃত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং অনেকস্থলে পুস্তকের নিম্নে যে টীকা বা টিপ্পনী সংযোগ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক নিগূঢ় রহস্য উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমান সমাজের অনেক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এজন্য গোলামহোসেনের পুস্তকের কোনস্থলে সামান্য মাত্র সাম্প্রদায়িক একদর্শিতা প্রকাশিত হইলেই মুস্তাফা উপযুক্ত সমালোচনা দ্বারা তাহা সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখা গিয়াছে, সেই স্থানেই মুস্তাফার সংযোজিত অংশে বহু সন্দেহ অপনীত করিয়া দিয়াছে। এই টীকাগুলি যেমন মৌলিক তেমন ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং মুস্তফা কেবল অনুবাদক নহেন—তিনি ঐতিহাসিকও ছিলেন, ভ্রমপ্রমাদ মানুষমাত্রেরই থাকে; মুস্তাফার বর্ণনা স্থানে স্থানে একটু অতিরঞ্জিত হইলেও, সময় ও দৈশিক অবস্থার বিষয় ভাবিয়া তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত।

সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্বে কোম্পানি প্রকাণ্ড চারিখণ্ড পুস্তকে মুস্তাফার অনুবাদ পুস্তকের এক সুবৃহৎ নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র পৃষ্ঠায় এই বৃহদাকার পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই পুস্তকের প্রচার হওয়া প্রার্থনীয়। * শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকার গোলামহোসেন স্বীয় পুস্তকে কোথায়ও নিয়মিত ভাবে স্বীয় জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থখানিও সময়ানুক্রমিক ভাবে লিখিত হয় নাই। তবুও সেই বিরাট গ্রন্থের নানাস্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে গোলাম হোসেনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বর্ষের "ভারতী" পত্রিকার "ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জগৎশেঠ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

সরফরাজের ধ্বংসের পর আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি যে উপায়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে তাঁহার প্রতি অপ্রীতি দূর করার জন্য তিনি সকলের সহিত সাধু ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি সরফরাজের পরিবারবর্গের প্রতি যারপরনাই সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নগরের ও রাজ্যের অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত নূতন নবাবের ব্যবহারে অসীম প্রীতিলাভ করে। আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট বিমোচনের জন্য যারপর নাই যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমানের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইতি পূর্ব্বে হিন্দুগণ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মুন্সীগিরি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, নবাব আলিবর্দ্দির সময় তাঁহারা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়েরও ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালীদিগকে ঐরূপ পদ প্রদান করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর এইরূপ উদার ব্যবহারে তাঁহাকে বাঙ্গলার আকবর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আলিবর্দ্দির পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন নবাব হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ভার দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার এইরূপ আদর্শ ব্যবহারে লোকে তাঁহার এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, তিনি যে অসদুপায়ে বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বিস্মৃত হইয়া গেল। এইরূপে কি সম্ভ্রান্ত, কি জনসাধারণ, কি প্রজাবর্গ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলার আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

যে জগৎশেঠের সাহায্যে আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠের পরামর্শে আলিবর্দ্দি খাঁ রাজ্যের অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি নবাবের দিন দিন অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ আলিবর্দ্দির রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুদ্বারা বার-ম্বার আক্রান্ত হওয়ায় তিনি অশেষ প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, রাজকোষের সমস্ত অর্থ প্রায় তাহাতেই ব্যয়িত হইত। এই জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জগৎশেঠের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যেরূপ অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহাতে জগৎশেঠের সাহায্য না পাইলে তাঁহাকে যার পর নাই বিপন্ন হইতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে রাজ্যমধ্যে যেরূপ হাহাকার বর্দ্ধিত হয়, প্রজাবর্গের যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, ও জমীদারগণ যেরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে রাজ্যের রাজস্ব-সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। অথচ প্রতিনিয়ত নবাবকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেই হইয়াছিল, সেই সময়ে জগৎশেঠ নবাবকে অনেক সাহায্য করিয়া-ছিলেন। কেবল অর্থ দিয়া নহে, তিনি এই বিশৃঙ্খলময় রাজত্বে নবাবকে অনেক সদুপদেশ দিয়া তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শান্তিময় করিতেন। ফতেচাঁদের এইরূপে পূর্ব্বাপর ব্যবহারে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অনুরাগ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং বৃদ্ধ জগৎশেঠও নবাবের সাধু ব্যবহারে যারপরনাই প্রীত ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, রাজস্ব দেওয়ান রায়রায়ান্ আলমচাঁদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সহকারী চায়েনরায়কে উক্ত পদ ও উপাধি প্রদান করা হয়। চায়েনরায় মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরারের কর্ম্ম করিতেন। *

* তারিখ বাঙ্গলা।

তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক হওয়ায় নবাব তাঁহাকে রাজস্ব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্গভূমি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানারূপে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, প্রজা-বর্গের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হওয়ায়, রাজস্ব আদায় বিষয়ে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে চায়েনরায় রাজস্ব দেওয়ান হইয়া প্রজা ও জমীদার বর্গকে সন্তুষ্ট রাখিয়া অনেক কৌশলে রাজস্ব আদায় করিতেন। নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় ও চায়েনরায়ের সুবন্দোবস্তে জমীদারেরা মহারাষ্ট্রীয় আক্র, মণের জন্য অনেক সময় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সুপরামর্শে চায়েনরায় অনেক সময়ে চালিত হইতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করার সংবাদ শুনিয়া সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলি খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মুর্শিদ-কুলী উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে তিনি প্রথমতঃ সন্ধির ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিবারবর্গের পরামর্শে অবশেষে তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মছলীপত্তনাভিমুখে পলায়ন করেন। পুরুষোত্তমের রাজা অবশেষে তাঁহার পরিবার ও সম্পত্তি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দি স্বীয় মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্শিদকুলীর জামাতা মির্জাবকীর উড়িষ্যা অধিকার করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করায়, আলীবর্দ্দিকে পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় যাইতে হয়। তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার হস্ত হইতে সৈয়দ্ আহ-ম্মদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃগয়ামোদ উপভোগ করিতেছিলেন, এই সময়ে শুনিতে পান যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে তিনি ইহার কিছু

সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য পূর্ব্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায়, তিনি যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। নবাব ক্রমে বর্দ্ধমানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই দিকে অগ্রসর হয়; এবং বর্দ্ধমানের চারিপাশে অগ্নি প্রদান করিয়া গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, সেইখানে উভয় পক্ষে কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়, এবং সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইহার পর রাত্রিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্ত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট ১০ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে, নবাব তাঁহাকে কোনরূপ উৎকোচ প্রদানে অস্বীকৃত হন। অগত্যা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়। প্রভাত হইলে নবাব স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া মহা-রাষ্ট্রীয়গণের প্রতি ধাবিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসে। নবাবের আফগান সেনাপতি যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় নবাব বহুদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং সে দিবস সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ হইতে উভয় পক্ষকে নিরস্ত হইতে হয়। উড়িষ্যার যুদ্ধে নবাব কতকগুলি আফগান সৈন্যকে বিদায় দেওয়ায় আফগান সৈন্যগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিল। যাহা হউক নবাব তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে নবাব সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় প্রথমতঃ তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়া উঠিল। যে দিবস তাঁহারা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ স্থির করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে। একটী অধিকৃত কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাব সৈন্যের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে। এইরূপ আক্রমণে নবাব সৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গভীর রাত্রিতে তাহাদের আক্রমণ আরও ঘোরতর হইয়া উঠে। প্রাতঃকালে নবাবের আদেশে সৈন্যগণ কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা জগন্নাথের পথ ধরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। নবাবের সমস্ত

সেনাপতি অতুল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর কর্ম্মচারী মীরহাবিব এই সময়ে নবাব সৈন্য মধ্যে ছিল, সে আহত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে বন্দী হয়, এবং পরে তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতিগণের উৎসাহে নবাব সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই সত্য, কিন্তু অনাহারে, অনিদ্রায় পথকষ্টে ও রণক্লেশে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের যারপর নাই অভাব ঘটিয়াছিল। একদিবস আলিবর্দ্দি খাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয়কে পরাজিত করিয়া তাহা-দের কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য অধিকার করায় সৈন্যেরা তাহা মহানন্দে ভোজন করিয়াছিল। এইরূপে কয়েক দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল। একদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় নবাবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকট দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী থাকায়, তাহারা এরূপভাবে আপনাদের শৃঙ্খল ঘুরাইতে আরম্ভ করে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর নবাবের নিকট অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই দিবস উক্ত হস্তীদ্বয়ের জন্য নবাবের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, এইরূপে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া কয়েক দিবস পরে নবাব সৈন্যগণ কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। নবাব-সৈন্যের কাটোয়ায় উপস্থিতির পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। নবাব সৈন্যগণ সেই দগ্ধাবশিষ্ট তণ্ডুল প্রভৃতি ভোজন করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই ভীষণ আক্রমণে নবাবসৈন্যগণের যারপরনাই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে। যে গ্রামে তাহারা উপস্থিত হয়, মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত শস্য অগ্নি সংযোগে ভস্মস্তূপে পরিণত করিত। পরিশেষে নবাব সৈন্য মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের এরূপ অভাব ঘটে যে, তাহাদিগকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভোজন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হইয়াছিল। মৃত জন্তুর মাংস পাইলে পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া কলহ আরম্ভ করিত; রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাইবার অবকাশ পাইত না। ক্রমাগত রাত্রিজাগরণে তাহাদের শরীর, অত্যন্ত

শীর্ণ হইয়া উঠে। জগন্নাথের পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়া তাহারা সামান্য মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইত। আবার সেই সময়ে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা কোন প্রকারে কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। সেখানেও দগ্ধ শস্যরাশি তাহাদিগের আহার্য্য হইয়াছিল। পরিশেষে মুর্শিদাবাদ হইতে তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। নবাব-সৈন্যের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া হাজী আহম্মদ মুর্শিদাবাদের যাবতীয় রুটীওয়ালার নিকট হইতে রুটী সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যসহ নৌকাযোগে কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন। এই ভীষণ আক্রমণ হইতে নবাব-সৈন্যের আত্মরক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাসের যে একটী স্মরণীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুকাল কাটোয়ায় অবস্থিতির পর নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে যাইবার জন্য উদ্যোগী হয়; এবং তাহাদিগের মধ্যে অর্থাভাব ঘটিয়া উঠে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মীর হাবিব মহারাষ্ট্রীরদিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অর্থাভাব দেখিয়া সে এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিল। মীর হাবিব ভাস্করের নিকট এইরূপ প্রকাশ করে যে, সে আলিবর্দ্দী খাঁর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা অনেক অর্থ আনিয়া দিতে পারে। ভাস্কর তাহার প্রস্তাবানুযায়ী মীর হাবিবকে সহস্র সৈন্য প্রদান করেন। হাবিব কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ দিয়া দ্রুতগামী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া নদীর পূর্ব্ব পারে আসিবার চেষ্টা করে, সে সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না; কাজেই নগরে প্রবেশ করিতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিল না। হাজী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াজিস্ মহম্মদ মহারাষ্ট্রীয়গণের বাধাপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তবে নিজামত কেল্লার নিকট অনেক সৈন্য রক্ষা করিয়া বিপক্ষগণের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মীর হাবিব কেল্লার দিক্ পরিত্যাগ

করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় ও স্থানে স্থানে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। অবশেষে তাহারা মহিমাপুরে জগৎশেঠের কুঠীতে উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এত শীঘ্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই তিনি স্বীয় গদী কোনরূপে সুরক্ষিত করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণের আগমন সংবাদ পাইয়া ফতেচাঁদ সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গদীর অগাধ সম্পত্তি স্থানান্তরিত করার বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরহাবিব মহিমাপুরে উপস্থিত হইয়া গদী আক্রমণ করিয়া বসে ও তাহা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সুবিধার জন্য তাহারা মহিমাপুরের গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করে। * অবশেষে রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ও স্বীয় ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হাবিব মুর্শিদাবাদের পশ্চিম কিরীট-কোণায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পরদিবস আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিয়া পঁহুছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্রুতবেগে কাটোয়াভিমুখে গমন করে। উক্ত দুই কোটী আর্কট মুদ্রায় জগৎশেঠদিগের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে উক্ত দুই কোটী টাকা শেঠদিগের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। এই লুণ্ঠনের পরও শেঠেরা প্রতিবার দরবারে কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। তৎকালে শেঠদিগের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়া সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহনা বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। বাস্তবিক এই সময়ে শেঠদিগের গদীর কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা এই লুণ্ঠন ব্যাপার হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে ধন রত্নাদি লুক্কায়িত করা সত্ত্বেও তাহারা দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিল এবং আর্কট মুদ্রারই প্রয়োজন থাকায় তাহারা উক্ত মুদ্রা আত্মসাৎ করে অন্য মুদ্রার প্রতি তাহারা তত লক্ষ্য করে নাই। আর্কট মুদ্রা গ্রহণের কারণ এই যে, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে

* মুতাক্ষরীণ Vol. II.

তাহার প্রচলন অধিক ছিল; এবং মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিকাংশই তত্তৎ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। ধন-রত্নাদি গোপন করার পরও যে গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা অনায়াসলভ্য হইতে পারে, অন্যান্য মুদ্রা তাহাতে কি পরিমাণে ছিল" ইহাই অনুমান করিলে শেঠদিগের গদীর তাৎকালীন শ্রীবৃদ্ধির বিষয় সহজেই প্রতীত হইবে।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কাটোয়া পরিত্যাগ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়ায় আপনাদিগের শিবির সন্নিবেশ করে, এবং ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। হুগলী হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময়ে ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। নবাবকে নীরব দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথী পার হইয়া পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অনেক স্থান লুণ্ঠন করে ও তথাকার শস্যাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেই সেই স্থানের অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া অন্যান্য স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সম্রাট্ মহম্মদ সাহ রঘুজীর বাঙ্গলা আক্রমণ ও অধিকারের কথা অবগত হইয়া, রঘুজীর সৈন্যদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে অনুরোধ পত্র লিখিয়া পাঠান। এদিকে বর্ষার অবসানে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণের জন্য কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হন। ভাগীরথী ও অজয় পার হইয়া নবাব সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য অজয়ের উপরে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। যেরূপ কৌশলে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেরূপ সমরকৌশল অল্প যুদ্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজয় পার হইয়া নবাব সহসা কাটোয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা এই আকস্মিক আক্রমণে ভীত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। নবাব ক্রমে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দাক্ষিণাত্যাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পেশওয়া বালাজী বাজী রাও বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। তিনি

প্রথমতঃ বিহারে আগমন করেন, পরে তথা হইতে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদিকে রঘুজী ভোঁসেলা ভাস্করের উত্তেজনায় নিজে বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলে আলিবর্দ্দি দুই দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি ভাগলপুরের নিকট বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি প্রদান করেন, এবং দুইজনে মিলিত হইয়া রঘুজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশওয়া আজিমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের চৌথ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে, নবাবকে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। পেশওয়া ও নবাবের মিলন শুনিয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বালাজী রাও সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহার পর অতি অল্পকালের জন্য বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

অধিক দিন স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষার অপগমে ভাস্করপন্ত প্রায় দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের সহিত উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় আগমন করেন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনরাগমনে যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছিলেন, নবাব তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করেন। এইরূপ নানা প্রকার গোলযোগে নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসুবিধাজনক মনে করিতেছিলেন। তিনি কৌশলে এই শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ভাস্করের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান, ভাস্করও তাহাতে সম্মত হন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণে মণকরা নামক স্থানে সন্ধি-শিবির প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবাব ভাস্করকে নিমন্ত্রিত করিয়া পাঠান ও তথায় সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্ত হইবে এইরূপ স্থির হয়। নবাবের প্রকৃত মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল। ভাস্কর নবাবের মনোগত ভাব বুঝিতে

না পারিয়া কতিপয় অনুচর সহ মণকরার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নবাবের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সৈন্যগণ ভাস্করকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। ভাস্করের অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বা আহত, কেহ বা নিহত হইলে, অবশিষ্ট কয়েক জন নদীতে ঝম্পপ্রদান করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের জন্য বঙ্গভূমি বারম্বার বিপর্য্যস্ত হওয়ায় এবং অধিবাসিগণ উৎপীড়িত, হৃতস্বর্ব্বস্ব ও পলায়িত হওয়ায় সরকারের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য নবাবকে যারপর নাই অর্থাভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যেখানে জগৎশেঠের গদী সরকারের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেখানে অর্থাভাব কোথায়? তাই নবাবের অর্থাভাব উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে অধিক দিন তাহার কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। শেঠেরা প্রয়োজনানুসারে নবাবের সাহায্য করিয়া তাঁহাকে এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই শেঠবংশীয়দিগের সহিত মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় ছিল এই সমস্ত ঘটনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে * জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র ও শেঠ আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতাবচাঁদ গদীতে উপবিষ্ট হন। ফতেচাঁদের বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। সেই বহুদর্শী বৃদ্ধ

* হণ্টার লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, কারণ, আমরা মহাতাবচাঁদের জগৎশেঠ ফরমানে দেখিতে পাই যে মহাতাবচাঁদ সম্রাট আমেদ শাহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে এই উপাধি পাওয়ায় তাঁহার মরণাব্দ ১৭৪৪ কি না ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে যদি সেই সময়ে মহাতাবচাঁদের বয়স অধিক না থাকায় অথবা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের অশান্তির জন্য তাঁহার জগৎশেঠ উপাধি পাইবার বিলম্ব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হণ্টার নিজামত দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের দ্বারা তাৎকালিক জগৎশেঠের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সন্দেহ থাকিলেও আমরা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যুবৎসর ধরিয়া লইলাম।

জগৎশেঠের মৃত্যুতে আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। যাঁহার সাহায্যে ও পরামর্শে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণরূপ ভীষণ বিপদ হইতে যিনি তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভাব যে যারপর নাই কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অল্পকাল মধ্যে শেঠ মহাতাবচাঁদ নবাবের সে অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফতেচাঁদের ন্যায় প্রতিভাশালী কার্য্যদক্ষ ও সুচতুর ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তিনি জগৎশেঠবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপন প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে তিনিই প্রথমে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। মাণিকচাঁদ হইতে যে গদীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল, ফতেচাঁদের দ্বারা তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাদশাহ ও নবাব দরবারে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। কেবল সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া তিনি আপনার নামকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি যে বহুগুণে গরীয়ান্ ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মনাশে সিপাহী-বিদ্রোহ।

খৃষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে বঙ্গভূমি হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রলয়ঙ্করী কাহিনী অদ্যাপি ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিঘোষিত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিরূপে এই বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল ও স্ব স্ব জাতীয় সিপাহীগণের সাহায্যে কিরূপে ব্রিটিশসিংহকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল, যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সে বিষয়ের অল্পবিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু কি নিমিত্ত এই মহাপ্রলয়াগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল, সে বিষয়ের নানা কারণ কল্পিত হইয়া থাকে। লর্ড

ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস-পিপাসা যে ইহার মূল কারণ, ইহাই সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন। অযোধ্যা, সেতারা, পুনা প্রভৃতি রাজ্য বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া তিনি ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে এক ভীষণ বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবৃন্দ ইহার প্রতিকারের জন্য সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। সেই সময়ে ধর্ম্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ গব্য ও শৌকর চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা কাটায় স্ব স্ব ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায়, প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গের সহিত তাহাদের মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলনে তাহারা এই ভয়াবহ বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল ইহাই সাধারণ কারণ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কাবুল ও ট্রান্সভাল বিজয়ী 'সিপাহী-জেনেরেল' লর্ড রবার্টস্ ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানপর ফরেষ্ট প্রভৃতি অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঐ সমস্ত কারণ ব্যতীত কোম্পানীর শাসনকর্ত্তৃগণের কঠোর নীতিবলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্মত অনেক প্রথার রোধ হওয়ায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় ব্রাহ্মণদিগের অপরিসীম ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এক মহা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অশান্তি ক্রমে হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সিপাহীদিগের হৃদয়েও স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর পুরাতন বন্দুকের পরিবর্ত্তে এনফিল্ড রাইফল প্রচলিত হওয়ায় তাহার টোটার জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহীদিগের পক্ষে অপবিত্র হওয়ায় তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। ঐ সমস্ত কঠোরনীতি মুসলমানদিগের কোন প্রথার প্রতি তাদৃশ হস্তক্ষেপ না করায় তাহাদের উত্তেজিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু লর্ড রবার্টস্ বলিতে চাহেন যে, রাজস্ব বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত হওয়ায়, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। এই বন্দোবস্তে কোম্পানীই প্রকৃত প্রস্তাবে জমীর অধিকারী হওয়ায় জমীদারবর্গ অসন্তুষ্ট হন। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব যে, লর্ড রবার্টসের এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজত্বে জমীদারেরা যে জমী সম্বন্ধে উত্তমরূপ অধিকার

পাইয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণা। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ায়, জমীদারদিগের অধিকার সুদৃঢ় হয়। যাহা হউক, লর্ড রবার্টস্ উক্ত মতের পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার পর ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার প্রথা দেশীয় রাজন্যগণের মনে অশান্তির উদয় করায় এই বিদ্রোহের অবতারণা হয়। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লর্ড রবার্টসের এই সমস্ত যুক্তির আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মনাশ-আশঙ্কায় কিরূপে সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল আমরা তাহারই বিষয় আলোচনা করিতেছি।

যে সময়ে সিপাহীগণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে কোম্পানীর সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কেবল টোটাকাটাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সিপাহীদিগের মধ্যে এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোম্পানী তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবে। কেবল সিপাহীদিগের মধ্যে বলিয়া নহে, সাধারণের মধ্যে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে যেন অশান্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। রাণীগঞ্জ, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মচারিগণের গৃহদাহ প্রভৃতি তাহার কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আইনবলে বিধবা-বিবাহ প্রথার অবতারণা হইতে হিন্দুদিগের মনে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় তাহারাই এই অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অবশ্য টোটাকাটার কথাও ইহার সঙ্গে আছে। কিন্তু তাহা মূল কারণ নহে। মেজর জেনেরাল হিয়ার্সের লিখিত ১৮৫৭ সালের ২৮এ জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্র হইতে আমরা এ বিষয় প্রথমে জানিতে পাই।* হিয়ার্সে বলেন যে, টোটাকাটার কারণ কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই দূরীভূত

* ("From Major-General J. B. Hearsey, C. B., Command.ng the Presedency Divison, to Major W. A. J. Mayhew Deputy Adjutant-General of the army,—dated Barrackpore, 28th January 1857).

I beg leave to report, for the information of Government that, an ill-filling is set to subsist in the minds of the Sepoys of the regiments at Barrackpore. A report has been spread by some designing persons, most likely Brahmins or agents of the religious Hindu party in

করিবেন, ও তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু যে অশান্তি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই সিপাহীদিগের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি বিধবা-বিবাহের বিরোধীদিগকে ইহার স্রষ্টা অনুমান করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ধর্ম্ম-সভার লোকদিগের দ্বারা সিপাহীদিগের মধ্যে ধর্ম্মনাশের বিশেষতঃ তাহাদিগের

Calcutta, (I beleive it is called the Dhurma Subha,) that they (the Sepoys) are to be forced to embrace the Christian faith.

On this report was grafted as an overt act to cause them to lose caste, the destributing amongst them of ball cartridges for the new Enfield rifle, that had the paper forming them greased with the fat of cows and pigs.

2. I should not have allowed these idle and groundless rumours to have had any weight on my mind, knowing that the latter circumstance (regarding the cartridges) would be remedied as soon as reported to higher authority, and trusting to the well-known repugnance of all officers with Native regiments to act or do anything that could be construed into a wish or desire to interfere with the religious prejudices of the men under their command.

3. But the circumstance of a surgent's Bangalow being burnt down at Raneegunj, supposed to have been caused by an incendiary, [a wing of the second Regiment native (Grenadier) Infantry, from this station being now there], and also three incendiary fires having occoured at this station within the last four days ;—one, the electric telegrah Bangalow, and since then two Bangalows that were unoccupied, the second occouring only last night ; as also Ensign F. E. A. Chamier, thirty-fourth Regiment, Native Infantry, having taken a lighted arrow from the thatch of his own Bangalow ;—has confirmed in my mind that these incendiarism is caused by ill-affected men, who wish thus to make known or spread a spirit of discontent, and induced the Sepoys to believe they are all labouring under some grievance, which they have not the manliness to make known to their officers.

4. Perhaps those Hindus who are opposed to the marriage of widows in Calcutta are using underhand means to thowart Government in abolishing the restraints lately removed by law for the marriage of widows, and conceive if they can make a party of the ignorant classes in the ranks of the army believe their religion or religious

খৃষ্টান হওয়ার কথা প্রচারিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভার সহিত সিপাহীবিদ্রোহের বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না। সৈনিক কর্ম্মচারিগণের এরূপ অনুমানের মূল কি তাহা অবগত হওয়ার উপায় নাই। যাহা হউক, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সিপাহীদিগের পরিবর্ত্তে হিন্দু জনসাধারণের স্কন্ধে এই বিদ্রোহ-সূচনার ভার অর্পিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

prejudices, are eventually to be abolished by *force*, and by *force* they are all to be to made Christians and thus by shaking their faith in Government lose the confidence of their offlcers by inducing Sepoys to commit offences (such as incendearism) so difficult to stop to or prove, they will gain their object.

5. Brigadier Grant directed commanding officers of Regiments at this station the day before yester-day to parade their corps, and asked them if they had any grievance to complain of. Three of the officers have reported their men to be perfectly satisfied, and Colonel S. G. Wheler, Commanding the thirty-fourth Regiment, Native Infantry, assured the rumour so industriously circulated was false, aud the Native officers and men said they were satisfied, that it was so, but one Native offlcer respectfully asked if any orders had been received regarding the Enfield rifle cartridges. This he could not answer, as the letter permitting *Ghee* or other matirial to be used for that purpose by the men only arrived this morning. I have, however, directing its contents to be made known to every Regiment in the cantonment, and a copy to be sent to Colonel C. S. Ried, commanding Dum-Dum, for Major Bontein's information.

6. It is my purpose, should this uneasy filling not abate, to parade the brigade, and myself explain the absurdity of the notion that, any, the most distant, intention to interfere with their religion is comtemplated by Government.

7. I am sorry to add that I this morning heard that the officer, Commanding Her Majesty's fifty-third Regiment in Fort William wrote to the officer in command of the wing of that Regiment at Dum-Dum to warn a company to be ready to turn out at any moment, and had distributed to the men of the company ten rounds of balled ammunition,

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লর্ড রবার্টস স্থির করেন যে, ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কায় লোকের মনে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, সিপাহীদিগের মধ্যেও তাহা প্রচারিত হইয়া পড়ে, পরে টোটাকাটার উপলক্ষে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তিনি কেবল বিধবাবিবাহকে একমাত্র কারণ বলেন নাই। কিন্তু অনেক দিন হইতে হিন্দু সাধারণের মধ্যে যে এই অশান্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ স্থির করেন। সতীদাহপ্রচার রোধ, শিশুকন্যাবধ-নিবারণ, ব্রাহ্মণদিগের প্রাণদণ্ড, খৃষ্টান মিসনরিদিগের ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ও তাহাদের কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের রক্ষা, বিধবাবিবাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের বিস্তার, এবং জেল কয়েদী-দিগের মধ্যে প্রত্যেকের রন্ধন করা রহিত করিয়া প্রত্যেক জাতির জন্য একজন বা ততোধিক ব্যক্তির রন্ধনে জাতিনাশের আশঙ্কায় জনসাধারণের মধ্যে এই অশান্তির অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ হয়। * তাহার পর লর্ড ডালহৌসী

informing that officer that a mutiny had broken out at Barrackpore amongst the Sepoys !!! No copy of this letter or note was sent to Lieutenant Colonel C. S. Ried, Commanding at Dum-Dum, nor to Brigadier Grant, or to myself. I need not enlarge on the great impropriety of such a proceeding as if it becomes known to the Sepoys, it will undoubtedly create an ill-filling amongst them." (Selections from State Papers preserved in the Military Dpt. 1857-58. Vol. I PP 4-6 W. Forrest)

* "The prohibition of *Sati* (burning widows on the funeral pyres of their husbands) ; the putting a' stop to female infanticide ; the execution of Brahmins for capital offences ; the efforts of Missionaries and the protection of their converts ; the removal of all legal obstacles to the remarriage of widows ; the spread of western and secular education generally ; and more particularly, the attemtp to introduce female education, were causes of alarm and disgust to the Brahmins, and to those Hindus, of high caste whose social privileges were connected with the Brahmanical religion" * * * Railways and telegraphs were specially distasteful to the Brahmins : these evidences of ability and strength

দেশীয় রাজাদিগের ঔরসজাত পুত্র বা স্ববংশজাত উত্তরাধিকারীর অভাবে দত্তক-পুত্রকে উত্তরাধিকারী স্বীকার না করিয়া সেই সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় তাহাও ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপের মধ্যে গণ্য হয়। * অবশ্য এই সমস্ত ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কা ব্যতীত অন্যান্য কারণও লর্ড রবার্টস্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফরেষ্ট সাহেবও উহাদিগের কতকগুলিকে এই বিদ্রোহসূচনার মূল বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি ক্যানিং ও ডালহৌসীর সময়ের ঘটনাগুলি উল্লেখ

were too tangible to be poohpoohed or explained away. Moreover railways struck a direct blow as the system of caste, for on them people of every caste, high and low, were bound to travel together. * * * nor was oppertunity wanting to confirm, apparently, the truth of their assertions. In the goal a system of messing had been established which interferred with the time, honour, custom of every man being allowed to provide and cook his own food. This innovation was most properly introduce as a matter of goal discipline, and due care was taken that the food of the Hindu prisoners should be prepared by cooks of the same or superior caste. Nevertheless, false reports were dissiminated, and the credulous Hindu population was led to believe that the prisoners food was in future to be prepared by men of inferior caste, with the object of defiling and degrading those for whom it was prepared. The news of what was supposed to have happened in the goals spread to town to town and from village to village, the belief grdually gaining ground that the people were about to be forced to embrace Christianity." (Robert's Forty-one years in India Vol. I).

* "Another weighty cause of discontent, chiefly affecting the wealthy and influencial classes and giving colour that the Brahmin's accusations that we intended to upset the religion, and violate the most cherished custom of the Hindus, was Lord Dalhousies strict enforcement of the doctrine of the lapse of property in the absence of direct or collateral heirs and the consequent appropriation of certain Native States and the resumption of certain political pensions by the Government of India. This was condemned by the people of India as grasping and as an unjustfiable interference with the institutions of the country, and undoubtedly made us many enemies." (Forty-one years in India Vol. I).

করিয়া বলিতে চাহেন যে, বিধবাবিবাহ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্য-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি হইতে অশান্তির সৃষ্টি হয়, এবং তৎসঙ্গে টোটাকাটা মিলিত হইয়া এই বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। *

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কলিকাতার ধর্ম্মসভার সভ্যদিগকে সন্দেহ করেন। লর্ড রবার্টস ধর্ম্মসভার প্রতি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ব্রাহ্মণ-সাধারণ কর্ত্তৃক যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত নীতি ও শিক্ষা প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনায় তাহারা এই অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করে। † ফরেষ্টও উক্ত মতের

* "An ancient and widely-spread custom has prohibited the Hindu widow from second marriage. During the administration of Lord Dalhousie, an Act which permitted her to marry again had been proposed and discussed, and it was passed by his successor. The permission for widows to marry again trenched upon to confirm the suspicion which had entered his mind that the Government wished to tamper with his creed. The establishment of telegraphs and railways, and opening of schools had created a filling of unrest in the land, and appeared to the orthodox to threaten the destruction of the social and religious fabric of Hindu society. The propagator of sedition and the fanatic, the two great enemies of our rule took advantage of the fieling of unrest and suspicion to raise the cry that a systematic attack was to be made on the ancient faith and customs of the people, and they pointed to the introduction of the grased cartridge as a proof of what they saw sedulously preached" (Forrest's History of the Indian Mutiny Vol. I).

† Those arbiters of fate, who are untie then all powerful to control every act of their co-religionists social, religious or political, were quick to perceive that their influence was meanest, and that their sway would in time to be wrested from them, unless they could devise some means for overthrowing our Government. They knew full well that the groundwork of this influence was ignorance and superstition

অনুসরণ করেন। কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এই মতের প্রচার হইয়াছিল কিনা, এবং তাঁহারাই সিপাহীবিদ্রোহরূপ প্রচণ্ড দাবানলের সূচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম বা শাস্ত্র লইয়া সময় অতিবাহিত করেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত ব্যাপারে দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ নিরীহপ্রকৃতি তাহাতে তাঁহারা যে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার বীজ অঙ্কুরিত করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, লর্ড রবার্টস ব্রাহ্মণসাধারণকে তজ্জন্য দোষী স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, ব্রাহ্মণসাধারণ ঐ সমস্ত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলেও, যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ নীতি ও শিক্ষা প্রচলনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল তাঁহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের যত্নে সতীদাহ রহিত হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ক্ষমতার হ্রাস হইবে বিবেচনায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদী ছিলেন, তাঁহারা উত্তেজনার প্রচার দূরে থাকুক, তাহার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিতেন। কারণ, তাঁহারা শান্তভাবেই আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পেশওয়াদিগের বংশধরের কথা স্মরণ করিয়া যদি লর্ড রবার্টস এইরূপ অনুমান

and they stood aghast at what they foresaw would be the inevitable result of enlightenment and progress. * * *
The fears and antagonism of the Brahmins being thus aroused, it was natural that they wish to see our rule upset, and they proceeded to poison the minds of the people with tales of the Government's determination to force Christianity upon them and to make them believe that the continuance of our power meant the destruction of all they held most sacred. (Forty-one year's in India Vol. I)

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কেবল ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছিল না, কিন্তু তাহার সহিত গূঢ় রাজনৈতিক সম্বন্ধও বিজড়িত ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই অশান্তি-প্রচারের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। ইহা তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণের অনুমানমাত্র। লর্ড রবার্টস প্রভৃতিও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। তাঁহারাও এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাচীন প্রথাসমূহের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে যে অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু তজ্জন্য যে সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কারণ, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তবে হিন্দু সিপাহীগণও হিন্দু সাধারণের মধ্যে হওয়ায় তাহারা যে ধর্ম্ম ও জাতিনাশ আশঙ্কায় কিছু উত্তেজিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। লর্ড রবার্টসও বলেন যে, হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের মধ্যে এই জাতিনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছিল। * এই জাতিনাশের বা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় হিন্দু সিপাহীগণ উত্তেজিত হইলেও মুসলমান সিপাহীগণের পক্ষে বলিবার কিছুই নাই। লর্ড রবার্টস রাজস্ব বন্দোবস্তের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে যে কেবল ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় এই অগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহা নহে, ইহার অন্য গূঢ় কারণও ছিল। সে কারণ, কোম্পানীর ব্যবসাদারী ও অত্যাচারপূর্ণ রাজত্ব। রাজস্ব ত সামান্য কথা, নানা প্রকার ট্যাক্সে ও অন্যান্য কারণে প্রজাসাধারণ উৎপীড়িত হওয়ায় এই অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা, প্রবন্ধান্তরে ইহার আলোচনা করিব। অবশ্য ইহার সঙ্গে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কাও বিজড়িত ছিল।

* "It has been made quite clear that a general belief existed amongst the Hindustani Sepoys that the destruction of their caste and religion had been finally resolved upon by the English as a means of forcing them to become Christians" (Forty-one years in India Vol I).

আমরা যতদূর জানিতে পারি, তাহাতে যে কারণে এই ভারাবহ বিদ্রোহ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, টোটাকাটাই তাহার প্রকাশ্য কারণ। পূর্ব্ব হইতে যে অশান্তির অগ্নি জনসাধারণের সহিত সিপাহীগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহাতে টোটাকাটার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে টোটাকাটাই এই অগ্নির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার গুপ্ত কারণ যে, অনেক ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ধর্ম্মনাশের যে আশঙ্কা লইয়া এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, প্রকাশ্যভাবে টোটা-কাটাই তাহার কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও তাহা আজিও প্রকাশিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে সমস্ত সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, দমদমার একজন খালাসী জনৈক সিপাহীর নিকট জলপানার্থে তাহার লোটা প্রার্থনা করায় সিপাহী সে কি জাতি না জানাতে তাহাকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। তাহার পর খালাসী উত্তর করে যে, শীঘ্রই তোমাদের জাতি যাইবে। কারণ, গরু ও শোকর চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা তোমাদিগকে কাটিতে হইবে। * ইহার পর হইতে সিপাহীরা জানিতে

* "(From Lieutenant and Brevet Captain J. A. Wright Commanding the rifle instruction Depot, to the Adjutant of the rifle Instruction Depot —dated Dum-Dum, 22nd. January 1857).

"I have the honour to report for the information of Major Bontein, commanding the Depot, that there appears to be a very unpleasant feeling existing among the native soldiers who are here for instruction, regarding the grease used in preparing the cartridges, some evil disposed persons having spread a report that it consists of a mixture of the fat of pigs and cows.

2. The belief in this report has been strengthened by the behaviour of a *Khalasi* attached to the magazine, who I am told, asked a Sepoy of the second regiment Native (Grenadier) Infantry, to supply him, with water from his *lota* ; the Sepoy refused, observing he was not aware of what caste the man was. *Khalasi* immediately rejoined—'you will soon lose your caste, as ere long you will have to bite, cartridges covered with the fat of pigs and cows'—or words to that effect.

পারে টোটার উপকরণে গবা ও শৌকর চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। তাহারা তাহাদের কর্ম্মচারিগণের নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহারা অম্লান-বদনে উহা অস্বীকার করেন। পরে তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। পুরাতন বন্দুক প্রচলন রহিত করিয়া এনফিল্ড রাইফল ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হন। তজ্জন্য টোটা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়মে তাহার কারখানা স্থাপিত হয়, ও দমদমা, অম্বলা ও শিয়ালকোটে এক একটি গুদাম স্থাপিত হইয়া কলিকাতা হইতে সেই সেই স্থানে টোটার চালান যাইতে আরম্ভ হয়। দমদমা ও বারাকপুরের সিপাহীরা কলিকাতার কারখানার লোকদিগের নিকট হইতে টোটার প্রকৃত উপকরণের বিষয় অবগত হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে ও এই বিদ্রোহের সূচনা করে। সুতরাং ধর্ম্মনাশের জন্য যদি বিদ্রোহের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে টোটাকাটাই যে তাহার প্রধান কারণ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। তবে সিপাহীদিগের মনে জনসাধারণের ন্যায় যে অন্যান্য কারণও অন্তর্নিহিত ছিল, তাহাও বিবেচিত হয়। কারণ, তাহারাও জনসাধারণের অন্তর্ভূত ব্যতীত বহির্ভূত নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে যে, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে পরিশেষে অনেকে ইহাদের নেতৃত্ব

3. Some of the Depot men, in conversing with me on the subject last night, said that the report has spread throughout India, and when they go to their homes their friends will refuse to eat with them. I assured them (believing it to be the case) that the grease used is composed of mutton fat and wax ; to which they replied—'It may be so, but our friends will not believe it ; let us obtain the ingrideints from the bazar and make it up ourselves ; we shall then know what is used, and be able to assure our fellow soldiers and others that there is nothing in it prohibited by our caste '

In conclusion I most respectfully beg to represent that the adopting the measure suggested by the men the possibility of any misunderstanding regarding the religious prejudices of the natives in general will be prevented.' (Selections from State Papers vol I.)

গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে শেষ অবস্থার কথা, সূচনার কালে নহে। ধর্ম্ম-নাশই হউক, বা কঠোর শাসননীতিই হউক, কোম্পানীর রাজত্ব যে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অশান্তির ফলেই সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল। তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিময়ী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। এই শান্তিময় রাজ্যে যে আর কখনও কোনও বিদ্রোহের অবতারণা হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমাদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ-দৃষ্টি আরও বিশদ হইলে ভাল হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ হইলে যে লোকে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হয়, ইহা জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। সকল জাতিই স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। মুসল্‌মানগণের বিরুদ্ধে ইউরোপের ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতে ধর্ম্মের জন্য রাজপুতের যুদ্ধ ও ধর্ম্মের জন্যই মহারাষ্ট্রীয় ও শিখজাতির উৎপত্তি। সেই হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা ঘটিলে তাহারা যে উত্তেজিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু লর্ড রবার্টস প্রভৃতি সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তেজনার জন্য যে ব্রাহ্মণদিগকে দোষী স্থির করিয়াছেন ইহা আমরা স্বীকার করি না। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সাধারণ যে বিচলিত হয়, সিপাহী-বিদ্রোহের পর সহবাসসম্মতির আইন বিধিবদ্ধ হও-য়ার জন্য আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। জানি না, লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতির ন্যায় আমাদের রাজপ্রতিনিধিবর্গ সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী কি না। তাহা হইলে সহবাসসম্মতি আইনের সময় যে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও পূজনীয় বাল গঙ্গাধর তিলক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতিবাদের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কিরূপ তাহাও বিবেচনার বিষয়। চূড়ামণি মহাশয় একরূপ সাধারণ আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোনই যোগ নাই। তিনি ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় সাময়িক আন্দোলনেরই নেতৃত্ব

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলক উত্তরোত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁহাকে যে নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানি না, রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাব পোষিত হইতেছে। সহবাসসম্মতির আন্দোলনের জন্য অন্যের বিশেষ কিছু হউক বা না হউক হিন্দুসমাজের মুখপত্র বঙ্গবাসীকে কিন্তু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতি সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে শান্তপ্রকৃতিই বলিয়াই জানেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাকে শারীর বলের ফল না বলিয়া—বংশানুগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতে কত জাতির অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধিত হইল, কত রাজবংশের উত্থান-পতন হইল। কত ধর্ম্ম প্রচারিত ও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণ যে হিন্দু সমাজের নেতা হইয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের বংশগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমেরই ফল। * যাঁহারা জ্ঞানে গরীয়ান্ ও আত্মসংযমে অটল তাঁহারা যে সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায় গরলের সৃষ্টি করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। বৌদ্ধ, পাঠান ও মোগলের ধর্ম্মের প্রবল আঘাত সহ্য করিয়া যাঁহারা অটলভাবে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সামান্য নীতিতে বিচলিত হইবেন ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

* "He is an example of a class becoming a ruling power in a country, not by force of arms but by vigour of heridatory culture and temperance. One race has swept across India after another, dynasties have risen and fallen, religions have spread themselves over the land and disappeared. But since the dawn of history, the Brahman has calmly ruled; swaing the minds and receiving the homage of the people, and accepted by foreign nations as the highest type of Indian mankind," (Hunter).

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রুষ-জাপান যুদ্ধ—আর্থার বন্দরের পতনের পর হইতে রুসিয়া ও জাপান মুকডেনের নিকট সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহে পরস্পরে পরস্পরকে মথিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। তাহারই ফলে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে মুকডেনের নিকট এক ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ যুদ্ধের তুলনা নাই। সাহোতীর হইতে আরম্ভ করিয়া মুকডেন পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ ক্রোশ ব্যাপিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহের অধিককালও এই লোকধ্বংসকর যুদ্ধ অবিরামগতিতে চলিয়াছিল। সুখের বিষয় এই যুদ্ধেও জাপান জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের অনেক বীর চিরদিনের জন্য ধরণীক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জাপান অপেক্ষা রুসিয়ার হতাহত যোদ্ধ্‌গণের সংখ্যা অনেক অধিক। মুক-ডেনের বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান জগতে আপনার অজেয় নাম প্রচার করিয়াছেন। অনেকে এত দিন মনে করিয়াছিলেন যে, মুকডেনের যুদ্ধের ফলাফল না দেখিলে জাপানের জয়লাভসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা যায় না। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এবারও কি জাপানের জয়লাভের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই? যদি নাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবে যে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। মুকডেনের যুদ্ধের পর রুস সৈন্য হার্বিন অভিমুখে পলায়ন করে। টাইলিং নামক স্থানে আর একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতেও জাপান জায়লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ উত্তরোত্তর প্রত্যেক যুদ্ধে এরূপ জয়লাভ জগতের কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। মাতৃপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাপান যে দৃঢ়ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই ফলে বিজয়-লক্ষ্মী প্রতিবারেই তাহার মস্তকে জয়মাল্য নিক্ষেপ করিতেছেন। ধন্য জাপান! আজ তোমার কৃতিত্বে জগৎ মুগ্ধ!

কার্জ্জন-প্রতিবাদ-সভা—আমাদিগের মহামতি রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর গত ১১ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে প্রাচ্য জাতিদের অপেক্ষা প্রতীচ্যেরা অগ্রে সত্যনিষ্ঠার আদর করিতে শিখে, এই কথা গুরু গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিয়া দেশমধ্যে এক বিরাট্ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। নানা কারণে দেখা যাইতেছে যে লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের ইদানীং যেন অনেক বিষয়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। সে দিন মন্ত্রি-সভায় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন বিধির আলোচনা কালে মাননীয় গোখেল মহোদয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও স্পষ্টবাদিতা শুনিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাহারই পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংবাদ পত্রাদিতে ইহার আলোচনার পর ২০এ মার্চ্চ কলিকাতার টাউন হলে তাঁহার মন্তব্যের ও সাধারণ শাসননীতির এক বিরাট্ প্রতিবাদ সভা হয়। তাহাতে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দিবস সভাপতির বক্তৃতা ব্যতীত অন্য কেহ বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হন নাই। সভাপতির যুক্তিপূর্ণ ধীর প্রতিবাদে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি ইংরেজী সংবাদ-পত্র সমূহও তাঁহার বক্তৃতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিবাদে যে ফল হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কার্জ্জন বাহাদুর আপনাদের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে যতই বলুন না কেন, তাঁহাদের প্রতীচ্য জগৎ সভ্যতার আলোক-দর্শনের পূর্ব্বে এই প্রাচ্যদেশেই যাবতীয় নীতির প্রচার হইয়াছিল। গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার পূর্ব্বে যে ভারতীয় সভ্যতা জগতে নীতির আলোক প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তবে কেহ কেহ মিসরীয় সভ্যতাকে প্রাচীনতম বলিয়া থাকেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতসামঞ্জস্য নাই। তাহা হইলেও মিসর প্রাচ্যের মধ্যে পড়িবে কি প্রতীচ্যের মধ্যে পড়িবে তাহাও আলোচনার বিষয়। এ সব বিষয়ে তর্ক বিতর্ক থাকিলেও অন্ততঃ লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের স্বজাতিগণের বন্য-ভাব দূর হইবার পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষ হইতে "অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং, অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশেষ্যতে!" গীত হইয়াছিল।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

মাঘের ভারতীতে শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বৈশালী নামে একটী গবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আলাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু কার্ত্তিক সংখ্যায় লিখিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের সন্তান কেবল রাঢ়ীর ব্রাহ্মণগণ, ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মাঘের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যে সামাজিক চিত্রে মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে তাৎকালিক পুরাতত্ত্ব ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ত্রিবঙ্কুরও সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

মাঘ মাসের বান্ধবে শ্রীকেদারনাথ মজুমদারের লিখিত ময়মনসিংহে পাঠান-রাজত্ব নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীতারকনাথ দাস গুপ্ত লিখিত ব্রহ্মদেশের কাহিনী একটি আলোচ্য-প্রবন্ধ।

মাঘের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত ফিরিঙ্গি বণিকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংখ্যায় ইহার পূর্ব্বাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে অক্ষয় বাবু আপনার সেই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে অগ্নিরা, ভারতের বাণিজ্য, সর্দ্দার উমাচরণ ও প্রবন্ধ-চিন্তামণি প্রভৃতি অনেকগুলি আলোচ্য প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্যও বটে।

মাঘ মাসের উপাসনা পত্রিকায় মোগল-রাজত্বে সতীদাহ নামক প্রবন্ধে সতীদাহ সম্বন্ধে মোগল বাদসাহদিগের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইংরেজী।

জানুয়ারি মাসের Royal Asiatic Society's Journal পত্রে A. F. Rudolf Hoernle লিখিত Some Problems of Ancient Indian History No III The Gurjar Clans নামক প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। Major W. Vost এর লিখিত Jaunpur and Zafrabad Inscriptions প্রবন্ধে হুমায়ুনও আক্-

বরের সমকালীন সাহাম বেগ ও তাঁহার পিতা হায়দরের সমাধি হইতে আবিষ্কৃত দুই খানি প্রস্তরফলকের আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্চ্চমাসের Indian Antiquary পত্রে Proceedings of the Royal Academey of Prussiaর O. Franke and R. Pischel লিখিত Kashgar and the Khoroshthi প্রবন্ধ Christian A. Cameron কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে। R. Shama Sastry B. A. লিখিত Chanakya's Land and Reveune Policy একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ।

মার্চ্চ মাসের East and West পত্রে Mr. Herbert M. Vanghan লিখিত An Indian Chaplain of tbe Eighteenth Century নামক প্রবন্ধে Reverend Benjamin Millingchamp সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্চ্চমাসের Hindustani Review পত্রে খাঁ বাহাদুর খোদাবক্সের লিখিত The Arabs before Islam প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বি, ডি, কামেশ্বর আয়ার এম, এ, লিখিত The Influence of the East over the West নামক প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে অবশ্যপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত পত্রে আরও দুই একটি আলোচ্য প্রবন্ধ আছে।

বিবিধ।

Elphinstone সাহেবের History of Indiaর নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। Sir George Birdwood এ সংস্করণে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

Edmund Candler সাহেব The Unvellinga of Lasha নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে অনেক গুলি চিত্রও আছে।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জাহানকোশা তে

চব্বিশ পরগণা।

পলাশীর বিশাল প্রান্তরে সিরাজ-উদ্দৌলার ভাগ্যলক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, ইংরেজের বিজয়-নিশান বঙ্গের ভাগ্যাকাশে চিরদিনের জন্য উড্ডীয়মান হয়। ক্লাইবের অমোঘ বাণী মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম বলিয়া ঘোষণা করিলে, মুর্শিদাবাদের সিংহাসন কিছুকালের জন্য তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করে। যদিও মীরজাফর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং দিল্লীর বাদসাহ তজ্জন্য তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাৎকালিক কর্ম্মচারিগণের আজ্ঞাকারীমাত্র ছিলেন। যাঁহাদের সাহায্যে জাফর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পরামর্শে তিনি যে চালিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ পলাশী যুদ্ধের পর যদিও ইংরেজেরা স্বহস্তে বঙ্গরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, এবং দেশীয় নবাবদিগকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, ইহাই জলন্ত সত্য। মীরজাফর বল, মীরকাসেমই বল, সকলেই তাঁহাদের অনুগ্রহে ও সাহায্যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমী নাম ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমে সেই অধিকারের সঙ্কোচ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গরাজ্যের—অবশেষে সমগ্র ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া উঠেন।

যে কোম্পানী নবাব মীরজাফর বা জাফর আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আজ্ঞাকারী কৃতজ্ঞ বন্ধু যে তাঁহাদের

প্রত্যুপকারে তৎপর হইবেন, ইহা স্বাভাবিকই বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, কোম্পানী পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আপনাদের অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে মীরজাফরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধিতেই তাঁহাদের অধিকারবিস্তারের কথা লিখিত হয়, ও সেই সন্ধিপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহারা কলিকাতা নগরীর ও কলিকাতা জমীদারীর বিস্তারের বিষয় তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।* সেই সন্ধিবলে পলাশী যুদ্ধের কয়েক মাস পরে কোম্পানী আপনাদিগের অধিকার বিস্তারের জন্য তৎপর হন।

ভুবনসুন্দরী কলিকাতা মহানগরীকে আলিঙ্গন করিয়া যে চব্বিশ পরগণা এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান জেলারূপে বিরাজ করিতেছে, অগণ্য শিক্ষিত ও ঐশ্বর্য্যশালী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাহার উন্নতি দিন দিন চরম সোপানে অধিরূঢ় হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, যাহার প্রধান স্থান আলিপুর, এক্ষণে দ্বিতীয় কলিকাতার ন্যায় সৌধবিভূষিত হইয়া শ্বেতাঙ্গদিগের বিশ্রাম-নিকেতন হইয়া উঠিতেছে, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি যাহার উপ বিভাগগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জেলার ন্যায়, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যে বঙ্গরাজ্যের

* বাদসাহ আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষের ১৫ই রমজান তারিখে ইংরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে লিখিত সন্ধিপত্রের ৮ম ও ৯ম ধারায় এইরূপ লিখিত আছে।

ARTICLE VIII.

"Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land, belonging to several zemindars, besides this, I will grant the English Company six hundred yards without the ditch.

ARTICLE IX.

All the land lying to the south of Calcutta, as far as Culpee, shall be under the zemindary of the English Company, and all the officers of those parts, shall be under their Jurisdiction. The revenue to be paid by them (the Company) in the same manner with other zeminders."

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কলিকাতা মহানগরীর নিকটবর্ত্তী তাহার সমৃদ্ধিপূর্ণ স্থানগুলিই নবাব নাজিম জাফর আলি খাঁর অনুগ্রহে প্রথমেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়। মীরজাফর প্রথমে তাঁহাদিগকে চব্বিশটী মহাল বা পরগণা জমীদারীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই চব্বিশ মহাল বা পরগণা হইতেই চব্বিশ পরগণার উৎপত্তি। আমরা নিম্নে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছি।

বাদসাহ দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে হিজরী ১১৭০ অব্দের ৫ই রবি-উস শানি, ইংরেজী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর বাঙ্গলা ১১৬৪ সালের পৌষমাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণা জমীদারীস্বরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে বাদসাহ ফরখ্‌সের তাঁহাদিগকে কলিকাতার জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কেবল সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর মাত্র ছিল। এক্ষণে তাঁহারা সেই জমীদারীর বিস্তারের জন্য নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণা বা মহালের জমীদারী লাভ করেন। এই চব্বিশ পরগণা বা মহাল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলী চাকলার মধ্যে ভাগীরথীর উভয় পারেই বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে কলিকাতার দক্ষিণেই ইহার অধিকাংশ পরগণাই অবস্থিত। কোম্পানী নবাব জাফর আলি খাঁর নিকট হইতে প্রথমতঃ যে চব্বিশ মহাল বা পরগণা লাভ করেন, তাহাদের নাম এই,—(১) পরগণা মাগুরা; (২) পরগণা খাসপুর; (৩) পরগণা মেদন্মল; (৪) পরগণা ইক্তিয়ারপুর; (৫) পরগণা বারিদহাটি; (৬) পরগণা আজিমাবাদ; (৭) পরগণা মূড়াগাছা; (৮) পরগণা পেঁচকুলী; (৯) কিসমত সাহাপুর; (১০) পরগণা সাহানগর; (১১) কিসমত গড়; (১২) পরগণা খাড়ীজুড়ী; (১৩) পরগণা দক্ষিণ সাগর; (১৪) কিসমত কলিকাতা; (১৫) কিসমত পাইকান; (১৬) কিসমত মানপুর; (১৭) কিসমত আমীরাবাদ; (১৮) কিসমত মহম্মদ আমীনপুর; (১৯) মলঙ্গীমহল; (২০) পরগণা হাতিয়াগড়; (২১) পরগণা ময়দা; (২২) কিসমত আকবরপুর; (২৩) কিসমত বেলিয়া; (২৪) কিসমত বসন্দরী। এই চব্বিশ পরগণার সনন্দ একখানি

পরওয়ানামাত্র ছিল। জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির প্রতি সেই পরওয়ানা প্রদত্ত হয়।*

* PERWANNAH FOR THE GRANTED LANDS,
Seal of Nabab Jaffir Ally Khan.

1170.

AALUM GEER, EMPEROR

fighting for the Faith, his Devoted

MEER MAHOMED JAFFIR ALLY KHAN BAHADUR, SUJAH-UL-MULCK, HOSSAEN O DOWLA, MOHABUT JUNG ANNO 4.

Ye Zemindars, Chowdras, Talookdars, Muccuddems, Recayahs, Morsawreans, Mootamettawahs of the Chuckla of Hughly, and others situated in Bengal, the terrestrial paradise, know, that the Zemindary, Chowdrahs, and Talookdarry of the countries in the subjoined list, hath been given, by treaty, to the most illustrious and most magnificent, the English Company, the glory and ornament of trade. The said Company wiil be careful to govern according to established custom, and usage, without any gradual decreation, and watch for the prosperity of the people, your duty is to give no cause of complaint to the Recayahs of the Company, who on their part, are to govern with such kindness, that husbandry may receive a daily increase, that all disorders may be suppressed, drunkenness and other illicit practices prevented, and the Imperial tributes be sent in due time, such part of the above said country as may be situated to the west of Calcutta on the other side of the Ganges, does not appertain to the Company, know their, Ye Zemindars, &c.' that ye are dependents of the Company and that ye must submit to such treatment as they give you, whether good or bad, and this is my express injunction.

TWENTY-FOUR MAHALS.

The Purgunnah of ... ... Mugra.
Ditto ... ... Khasspoor
Ditto ... ... Mudenmutt,
Ditto ... ... Ekhtearpoor.

নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে প্রাপ্ত সনন্দ কেবল পরওয়ানামাত্র হওয়ায়, ও তাহাতে কোম্পানীকে কেবল মাত্র উক্ত চব্বিশ পরগণার জমীদারীর ভার দেওয়ায়, তাঁহারা যাহাতে উক্ত সনন্দ বাদসাহের অনুমোদিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই চেষ্টার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, পরবৎসরের ১৫ই রবি-উল-সানি মাসে কোম্পানী বাদসাহের দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদিকের

The Pargunnah of ...	Barjutty.
Ditto ...	Azimabad.
Ditto ...	Moodagatcha.
Ditto ...	Putcha Kollu.
Part of the Pargunnah of	Shadpoor
	Shah Nagor.
Part of the Pargunnah of	Ghur.
The Pargunnah of	Karee Jurree.
Ditto	Deccan Saugeer.
Part of the Pargunnah of	Calcutta.
Part of the Pargunnah of	Paikan.
Part of the Pargunnah of	Munpoor.
Part of the Pargunnah of	Ameerabad.
Part of the Pargunnah of	Mohomed Awllpoor.
	Mellang Mahal.
The Pargunnah of ...	Hatteagur.
Ditto ...	Meida.
Part of the Pargunnah of ...	Akbarpoor.
Part of the Pargunnah of ...	Bellia.
Part of the Pargunnah of ...	Bussindarry.

Dated the 5th of Rabbi-ul-Sauni, anno quarto.

(In the Nabab's own hand, serving by way of signmanual). It is written, Finis.

(In Maharaja Doolabram's own hand, as Naib seen).

(In Rajah Rauge Ballab's own hand, as Hussoor Nevese). The 5th of Rabbi-ul-Sauni Anno quarto, registered iu the Imperial Register.

(In Rajah Congha Baharree's own hand, as Dewan of Bengal). The 5th of Rabbi-ul-Sauni Anno quarto, registered in the Dewanee Register.

নিকট হইতে বাদসাহের অনুমোদিত এক সনন্দ লাভ করেন। সেই সনন্দে কোম্পানী উক্ত জমীদারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই সনন্দে আমরা দেখিতে পাই যে, কোম্পানী মীরজাফরের দত্ত চব্বিশ পরগণা বা মহালের স্থলে সাতাইশ পরগণা বা মহাল প্রাপ্ত হইতেছেন। নিম্নে তাহাদের নাম ও কোন্ সরকারের মধ্যে সন্নিবেশিত তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

সংখ্যা	পরগণার নাম		সরকার
১	কিসমত পরগণা	কলিকাতা	সাতগাঁ
২	,, ,,	মাগুরা	,,
৩	পরগণা	খাসপুর	,,
৪	,,	মেদম্মল	,,
৫	,,	বারিদহাটি	,,
৬	,,	ইক্তিয়ারপুর	,,
৭	,,	দক্ষিণসাগর	,,
৮	,,	সানগর	,,
৯	,,	আজিমাবাদ	,,
১০	,,	গড়	সেলিমাবাদ
১১	,,	মুড়াগাছা	,,
১২	,,	পেঁচকুলী	,,
১৩	,,	খাড়ীজুড়ী	,,
১৪	কিসমত পরগণা	মানপুর	,,
১৫	,,	পাইকান	,,
১৬	,,	আমীরাবাদ	,,
১৭	,,	হাভিলিসহর	,,
১৮	,,	মহম্মদ আমীনপুর	,,
১৯	,,	নিমক ও মোম	,,
২০	পরগণা	হাতিয়াগড়	,,

সংখ্যা	পরগণার নাম	সরকার
২১	পরগণা ময়দা	সেলিমাবাদ
২২	,, আকবরপুর	,,
২৩	,, সাহাপুর	,,
২৪	কিসমত পরগণা আবওয়ার ফৌজদারী	,,
২৫	,, আবওয়ায় ফৌজদারী	,,
২৬	সায়র হাতিয়াগড়, ময়দা, মেদম্মল, মুড়াগাছা, ইক্তিয়ারপুরের কুতের অন্তর্গত	,,
২৭	কিসমত পরগণা বেলিয়া বসন্দরী	,,

মীরজাফর দত্ত চব্বিশ পরগণার সহিত দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদেক দত্ত সনন্দ লিখিত সাতাইশ মহালের সমুদয়েরই ঐক্য আছে, কেবল ইহাতে আরও চারিটী মহাল যোগ হয়, এবং বেলিয়া ও বসন্দরী এই দুই পরগণাকে এক পরগণা বলিয়া লিখিত হয়। যে চারিটীর যোগ হয় তাহাদের নাম (১) পরগণা হাভিলিসহর, (২) (৩) আবওয়ার ফৌজদারী (৪) হাতিয়াগড় প্রভৃতির সায়র। গ্রাণ্ট সাহেবও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেও উক্ত সাতাইশ মহালেরই উল্লেখ করিয়াছেন। * মীর মহম্মদ সাদকের প্রদত্ত সনন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, † তাহাতে পরগণাগুলির পার্শ্বে যে সরকারের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অনেক গোলযোগ দেখা যায়। সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভূক্ত অনেকগুলি পরগণাকে সরকার সেলিমাবাদের মধ্যে অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আইন আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুড়াগাছা, হাভিলিসহর, আকবরপুর, হাতিয়াগড় সরকার সাতগাঁয়েরই অন্তর্গত, কিন্তু উক্ত সনন্দের অনুবাদে তাহাদিগকে সরকার সেলিমাবাদের অন্তর্গত করা হইয়াছে, এবং যদিও তৎকালে পেঁচকুলী, সাপুর, গড়, খাড়ীজুড়ি, ময়দা, প্রভৃতি পরগণার অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি ঐ সমস্ত পরগণা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে

* 5th Report.

† Collection of Treaties &c. (1812).

ও কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত আইন আকবরীসম্মত পরগণাগুলির নিকট হওয়ায় তাহারও যে সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভূত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সরকার সেলিমাবাদ, কদাচ, ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, তাহা পশ্চিমপারেই শেষ হয়। সাতগাঁই কেবল পশ্চিম ও পূর্ব্বপারে বিস্তৃত ছিল। উক্ত দেওয়ানী সনন্দে ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদ কুলীখাঁর বন্দোবস্তী জমা কামেল তুমারী অনুযায়ী এই সাতাইশ মহাল বা চব্বিশ পরগণার ২,২২,৯৫৮ টাকা কর ধার্য্য হয়, এবং উক্ত সনন্দ অনুযায়ী কোম্পানী জমীদারীর অধিকার মাত্র পাইয়াছিলেন।

যে সময়ে কোম্পানী নবাব জাফর আলিখাঁর ও দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদেকের নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার পরওয়ানা ও সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইব নবাব মীরজাফরের সহিত বিহার প্রভৃতিস্থানে বাদসাহের বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ষষ্ হাজারী ও পঞ্চ হাজারী সওয়ার মনসব প্রদান করিয়া তাঁহাকে জবদস্ত উল মুল্ক নাসির উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন।* মীরজাফর বাদসাহ আলমগীরের রাজত্বের

*SUNNOD FOR COLONEL CLIVE'S MUNSOB.

On Saturday the 12th of Rabbi-ul-Sauni; in the fourth of the glorious and happy reign, and the 1171 st year of Hegira, in the Ressalla of the glory of nobility and rank of Ameers, the shrine of grandeur and dignity, instructed both in the ways of devotion and wealth, to whom the true glory of religion and kingdoms is known; the bearer of the lance of fortitude and respect; the embroider of the carpet of magnificence and greatness, the support of the empire and its dependencies, to whom it is entrusted to govern and aggrandize the empire; the conductor of victory in the battles fought for the dominion of the world; the destributer of life in the councils of state, to whom the most secret recesses of the mysteries of government discovered; the master of the arts of penetration and circumspection; the brightness of the mirror of truth and fidelity; the light of the tract of sincerity and integrity; who is admitted to and contributes to the determination of the royal councils; a participator of the secrets of the penetration

চতুর্থ বর্ষের ৫ই রবি-উল-সানি মাসে চব্বিশ পরগণার সনন্দ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, সেই বৎসরের ১০ই বা ১২ই রবি-উল-সানিতে কর্ণেল ক্লাইব বাদসাহ-দরবার হইতে সনন্দ ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। এই উপাধি-বলে ক্লাইব কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। এমন কি তাঁহার প্রভু কোম্পানী অপেক্ষাও তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হয়। নবাব মীরজাফর তাঁহার সাহায্যে দেশ মধ্যে অনেক পরিমাণে শান্তিসংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাদসাহ দরবার হইতে কেবলমাত্র মনসব ও উপাধিলাভ করিয়া কর্ণেল ক্লাইব সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি অন্যান্য মনসবদারদিগের ন্যায় আপনার পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্যও সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাতে তিনি রীতিমত সম্পত্তিলাভ করিতে না পারিলে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষায় যে কৃতকার্য্যও হইবেন না, ইহাও চিন্তা করেন। তাহার পরে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও আজ্ঞাকারী নবাব জাফর আলি খাঁ তাঁহাকে জায়গীর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কোম্পানীর জমীদারী,

of friendship ; who presides equally over the sword and pen ; modera-tion of the affairs of the earth ; chief of the Khans of the most exalted rank ; the pillar of the Ameers of the greatest splendour ; the trust of the zealous champions of the faith ; the glory of the heroes in the fields of war, and the administrator of the affairs of the immoveable empire ; councellor of enlighted wisdom and exalted dignity : adorned with friendship and honours ; endowed with dignity and discretion ; pillar of the dominions of Solomon ; the destributer of glory ; Buxey of the Empire ; Ameer of the Ameers ; hero of the empire ; tiger of the country ; Mahomed Ahumed Khan ; the brave, tiger of war ; the Commander-in-chief of the forces, glorious by victory, the tiger of Hind, might in battle.

And in the time of the Waka Nagarree of the list of the domestics, of the court of glory and majesty Soaklaal.

This was written : The command of (above) was passed, that Colonel Clive, an European be avoured with a Munsab of the rank of 6000 and 5000 horse, and the title of "Flower of the Empire, defender of the country, the brave, firm in war" this was entered the 10th of Rabbi-ul-suni, in the 4th year, according to the original yaddaust."

উক্ত চব্বিশ পরগণাই ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।* ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের এক পরওয়ানা দ্বারা নবাব মীরজাফর খাঁ কোম্পানীর জমীদারী চব্বিশ পরগণা লর্ড ক্লাইবকে জায়গীর প্রদান করেন। কোম্পানীর প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের জমীদারী উক্ত চব্বিশ

* No 2.

Perwannah from the Nabab Shujah-ul-Mulck, Hassain O Dowla, Meer Mahomed Jaffeer Khan Bahadur Mahaubut Jung, to *the Honourable* President and Council of Calcutta.

Be it known to the Council of the noblest of Merchants, the English Company, that where as the glory of the nobility, Zobdust-ul-Mulck. Nassera Dowla Colonel Clive, Sabut Jung Bahadur, has been favoured with a Munsub of the rank of six thousand and five thousand horse, from the Imperial Court, and has exerted himself in conjuntion with me, with the most steady attachment, and in the most strenuous manner, in the protection of the Imperial territories, in recompense thereof the Purgunnah of Calcutta, &c. belonging to the Chuckla of Hughley &c. of the Sircar Satgaum, &c. dependent on the Khalsa Shereefa and Jaghire amounting to two hundred and twenty two thousand nine hundred and fifty-eight Sicca Rupees and something more, conferred on the English Company by the Dewannee Sunnud as their Zemindarry, commencing from the month Pous, in the eleven hundred and sixty-fourth year of the Bengal style from the half of the season Rebbee-Sauskanned in the 1165th year of the Bengal style, is appointed the Jaghire of the glory of the nobility aforesaid. It behoves you to look upon the above person as the lawful Jaghiredar of that place and in the same manner as you formerly delivered in the due rents of the Governments, according to the kistibundee, into the treasury of the Court and the Jaghire, taking a receipt under the seal of the Daroga and Munshub and Treasurer, now, in like manner, you are regularly to deliver to the afore-mentioned Jaghiredar, the rents according to the stated payments, and receive a receipt from the aforesaid person. Be punctual in the strict execution of this writing.

Written the 1st of Zeckaida, 6th Sun of the reign (about the 13th July 1759)."

পরগণার উপসত্ব লর্ড ক্লাইবকে প্রদান করিবেন। লর্ড ক্লাইবকে চব্বিশ পরগণার জায়গীরপ্রদানে নবাব জাফর আলি খাঁ প্রকারান্তরে কোম্পানীকেই ক্লাইবের অধীন করিয়া দেন। অথচ ক্লাইব কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। একপক্ষ প্রভু ও আর একপক্ষ মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ক্লাইব ও তাঁহার প্রভু কোম্পানীর মধ্যে গোলযোগ চলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায়ও উক্ত বিষয় লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তাহার পর ক্লাইব পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার চিরস্থায়ী জায়গীর পরিবর্ত্তিত হইয়া ০ বৎসরের জন্য তাঁহাকে উক্ত জায়গীর প্রদান করা হয়। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুন নবাব নজমউদ্দৌলা ক্লাইবকে ১০ বৎসরের জন্য চব্বিশ পরগণায় জায়গীর প্রদান করিয়া এক সনন্দ প্রদান করেন।* তাহাতে এরূপ লিখিত হয় যে, দশ বৎসর অতীত হইলে চব্বিশ

* "Copy of the Sunnud from the Nabab Najim-ul-Dawlah, for the reversion in perpetuity, of Lord Clive's Jagheer to the Company. Dated the 23rd June 1765.

Be it known to the councellors and chiefs of the English Company, the present and future Mutseddees, Chowdries, Cannogoes; Muckandums, Royts, Muggaries, and all other inhabitants of the pergannah of Calcutta in the Sircar of Sautgaune &c. in the province of Bengal.

The sum of 222,958 rupees and odd agreeably to the Dewanee Sunaud, and the Sunaud of the High and Mighty Meer Mohomed Jaffier Khawn, Nazim of the province, has been appointed from the aforesaid pergunnahs belonging to the Chucklah of Hooghly, &c. in the Sircar of Sautgaun &c the zemidary of the English Company as an unconditional jagheer to the High and Mighty Lord Clive. Now likewise the said pergunnahs are confirmed as an *unconditional* jagheer to the High and Mighty aforesaid from the 16th of May, of the 1761th year of Christ (answering to the 14th of Zelcader, of the 1177th year of the Hegira) to the 16th May, of the 1774th year of Christ (answering to the 8th of Rubby-al Awval, of the 1188th year of the Higira) being ten years of which one year is expired and there are nine to come. They shall appertain as an unconditional jagheer to the High and Mighty aforesaid, and after the expiration of this term they shall

পরগণা কোম্পানীরই সম্পত্তি হইবে। এই সনন্দে কোম্পানী ও ক্লাইবের মধ্যে একরূপ গোলযোগের মীমাংসা হয়। পরে নবাব নজম উদ্দৌলার সনন্দ বাদসাহ-দরবার হইতে অনুমোদিত হইলে ক্লাইব কোম্পানীর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার উপস্বত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট বাদসাহ সাহ আলম নবাব নজম উদ্দৌলার প্রদত্ত সনন্দ স্থির থাকিবার আদেশ দেন।*

revert as an unconditional jagheer and perpetual gift to the Company, and if (which God forbid) the High and Mighty aforesaid shall die within this term, they shall revert to the Company, immediately upon his death. It is requisite that ye should regard the High and Mighty aforesaid, during the forementioned term, and after him the Company aforesaid as unconditional jagheerdars and regularly pay them the revenue of the aforesaid Pergunnahs.

Written the 23rd of June 1765, answering to the 3rd of Mahurrum of the 1179th years of the Higira."

* Copy of the Firmaan from the Emperor Shah Allam confirming the Reversion in perpetuity of Lord Clive's Jagheer to the Company. Dated the 12th August 1765.

Where as a sunnod has been presented to us under the seal of the Nabab, Najim-al-Dowlah Bahadur, to the following purport, viz. "The sum of 222958 Sicca Rupees and odd agreeably to the Dewannee Sunaud, and the Sunaud of the high and mighty Sujah-al-Muluck Hussain, O Dowlah Meer Mahamed Jaffiar Khawn Bahadur has been appointed from the pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircur of Satgaun &c. in the province of Bengal, (the Paradise of the earth), the Zemindary of the English Company as an unconditional jagheer to the High and Mighty Zuboust-al-Muluck Nasser-al-Dowlah Lord Clive Bahadur, now likewise the said pergunnahs are confirmed as an unconditional jagheer to the High and Mighty aforesaid from the 16th of May, of the 1764th years of the Christian style (answering to the 14th of the Zalcada of the 1177th year of Hizira) to the expiration of 10 years, they shall appertain as an uncondition Jagheer to the High and mighty aforesaid and after the expiration of this term to revert to the Company as an unconditional jagheer and perpetual gift; and if the High and Mighty

সেই সনন্দের বলে লর্ড ক্লাইব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণায় উপসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কোম্পানী চব্বিশ পরগণার সম্পূর্ণরূপ অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে তাঁহারা বাঙ্গালা, বিহারের দেওয়ানী লাভ করেন।

aforesaid should die within the said term they shall revert to the Company immediately upon his death and whereas the said sunnud has met with our approbation at this happy time. therefore our royal firmann, indispensably requiring obedience is issued, that in consideration of the fidelity of the English Company and the High and Mighty aforesaid, the said jagheer stood confirmed agreeably to the aforesaid Sunnud, it is requisite that the present and future Mutseddees, the Chowdries, Canongoes, Muckandums, Royts, and all other inhabitants of the Pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircar of Saatgaon &c. regard the High and Mighty aforesaid during the forementioned term and after him the Company aforesaid as unconditional Jagheerdars, and regularly pay them the revenues of the said Pergunnahs.

Written the 24th Saphar the 6th year of Jaloos.

CONTENTS OF THE ZIMMAN.

Agreeably to the paper which has been received, our sign manual our royal commands are issued, that whereas the sum of 222,958 sicca rupees and odd has been appointed from the Pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircar Satgaun &c. the Zemindary of the English Company, as an unconditional jagheer to the High and Mighty Subdut-Ol-Dowlah Lord Clive Bahadur, agreeably to the Dewannee Sunund, and the Sunund of the Nazim of the province, in consideration therefore of the attachment of the High and Mighty aforesaid, we have been graciously pleased to confirm to him the said Pergunahs for the space of ten years, commencing from the 16th May of the 1764th year of the Christian style, or 14th of Zelcader of the 1177th year of Hizira and in consideration of the attachment of the English Company, we have granted the said Pergunnahs to them after the expiration of the aforesaid term, as an unconditional Jaguir and perpetual gift, and if the High and Mighty aforesaid should die within this term the said Pergunnahs are to revert immediately to the English Company."

১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে কোম্পানী চব্বিশ পরগণার কেবল জমীদার মাত্র না থাকিয়া তাহার শাসনকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন। সেই সঙ্গে নবাব কাসেম আলি খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত বৰ্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম প্রদেশেরও শাসনভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কেবল কলিকাতা নগরীতে তাঁহারা তাঁহাদের দেশসম্মত শাসন ও বিচারাদি করিতেন, এক্ষণে চব্বিশ পরগণা, বৰ্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের প্রতি তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই সকল স্থানে কলিকাতার ন্যায় ইংলণ্ডীয় প্রথায় বিচারাদি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে চব্বিশ পরগণায় রীতিমত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত স্থাপিত হয়, এবং বৰ্দ্ধমান হইতে কয়েকটি সম্পত্তি ইহার রাজস্ব বিভাগের অধীনে আসে। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া ও যশোর হইতে কয়েকটি পরগণা চব্বিশ পরগণার সহিত মিলিত হয়, এবং ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বৰ্দ্ধমানের পরগণাগুলি হুগলীর অধীনে যায়। পূর্ব্বে আলিপুর ইহার প্রধান স্থান ছিল, এবং তথায় চব্বিশ পরগণার বিচারালয়াদি স্থাপিত ছিল। সমস্ত চব্বিশ পরগণা আলিপুরেরই অধীন ছিল। ১৮৩৪ খৃং অব্দ হইতে যশোর ও নদীয়ার পরগণা সমূহ চব্বিশ পরগণার সহিত মিলিত হইলে বারাসত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীনে তাহারা স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা গঠিত হয়। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই জেলা আলিপুর ও বারাসত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক্ষণে আলিপুর, ইহার সদর স্থান এবং বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট ইহার উপবিভাগ ও বারুইপুর একটী চৌকী, এবং বারাকপুর ও দমদমায় একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট থাকেন। পূর্ব্বে সাতক্ষীর উপবিভাগ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে তাহা খুলনা জেলার অধীন হইয়াছে।

নবাব জাফর আলি খাঁর প্রদত্ত চব্বিশ পরগণা ও মীর মহম্মদ সাদেক দত্ত সাতাইশ মহাল কিছু পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন তারিখের একখানি পত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি জাফর আলি খাঁর ও মীর মহম্মদ সাদেকের প্রদত্ত পরগণা-

গুলি এইরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। (১) মাগুরা, (২) সাতুল, (৩) আজিমাবাদ, (৪) মুড়াগাছা, (৫) মেদন্মল (৬) আকবরপুর, (৭) পেঁচকুলী, (৮) বারিজহাটি; (৯) ইক্তিয়ারপুর (১০) গড়, (১১) হাতিয়াগড়, (১২) ময়দা, (১৩) বেলিয়া (১৪) বসন্দরী (১৫) কলিকাতা (১৬) আমীরপুর (১৭) মানপুর (১৮) পাইকান (১৯) সাপুর (২০) সানগর (২১) খাড়িজুড়ী, (২২) দক্ষিণ সাগর (২৩) খাসপুর, (২৪) উত্তর পরগণা। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পরও এই পরগণা বহুকাল পর্য্যন্ত * কোম্পানীর জমীদারী বলিয়া উল্লিখিত হইত। মেজর রেনেলের ১৭৮১ খৃঃ অব্দের মানচিত্রাবলীর গঙ্গার ব-দ্বীপ (The Delta of the Ganges) নামক মানচিত্রে এই সমস্ত পরগণাকে কোম্পানীর জমী (Company's Lands) বলিয়া লিখিত দেখা যায়।

আমরা এক্ষণে নবাব মীর জাফর প্রদত্ত মূল চব্বিশ পরগণার মধ্যে যাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থান প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

(১) মাগুরা—আলিপুরের অধীন, ইহার প্রধান প্রধান স্থানের নাম আলিপুর, গর্ডেন রিচ, খিদিরপুর, চেতলা ইত্যাদি।

(২) খাসপুর—ডায়মণ্ডহারবরের অধীন, ইহাতে বড়িসা, রসা, গরিফা ইত্যাদি অবস্থিত।

(৩) মেদন্মল—বারুইপুরের অধীন, ইহার প্রধান প্রধান স্থানের নাম বারুইপুর, বাসরা, মালং, রামনগর ইত্যাদি।

(৪) ইক্তিয়ারপুর—এক্ষণে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই।

(৫) ব্রারিদ হাটি বা বারিজহাটি—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, প্রধান প্রধান স্থানের নাম, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, মগরাহাট ইত্যাদি।

(৬) আজিমাবাদ—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন—প্রধান প্রধান স্থান, রাজহাট, সুলতানগঞ্জ, সাপুর, রাজপুর, মৌখালি, সুলনী ইত্যাদি।

(৭) মুড়াগাছা—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, প্রধান প্রধান স্থান, কলা-

* R. Smyth's Report of the 24 Pergs. P. 1.

গেছিয়া, খামারপুর, পাতরা, তুলন, বৃধগাছি, দুর্গাপুর, দুর্গানগর, গোবিন্দপুর, সিদ্ধেশ্বর ইত্যাদি।

(৮) পেঁচকুলী—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন ; প্রধান প্রধান স্থান, চাঁদপাল, রাজারামপুর, ফল্‌তা ইত্যাদি।

(৯) সাপুর—আলিপুরের অধীন, প্রধান প্রধান স্থান, কৃষ্ণরামপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর ইত্যাদি।

(১০) সানগর—আলিপুরের অধীন, ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ মুড়াগাছা ও অপরভাগ বারিদহাটির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(১১) গড়—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন—প্রধান স্থান রাইপুর।

(১২) খাড়িজুড়ী বা খাড়ী—সাতক্ষীরার অধীন। প্রধান স্থান খাড়ী।

(১৩) দক্ষিণ সাগর—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, আজিমাবাদের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, প্রধান স্থান মধুসূদনপুর।

(১৪) কলিকাতা—ইহা কলিকাতা নগরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। প্রধান প্রধান স্থান, বারাকপুর, দমদমা, নিমতা, বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, এড়িয়াদহ, আগড়পাড়া, খড়দহ, নাটগড়, বেলঘরে, তাড়দহ, তেলিনীপাড়া, ইত্যাদি। উপরোক্ত পরগণা সকল ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

(১৫) পাইকান—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত, সালিখা ও শ্রীরামপুরের অধীন।

(১৬) মানপুর—বর্ত্তমান সময়ে কোন অস্তিত্ব নাই।

(১৭) আমীরাবাদ—ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত, শ্রীরামপুর, হুগলী, পাণ্ডুয়ার অধীন।

(১৮) মহম্মদ আমীনপুর—ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত—শ্রীরামপুর ও পাণ্ডুয়ার অধীন।

(১৯) মলঙ্গীমহল বা নিমক ও মোমমহল, সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান সুন্দরবনের মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

(২০) হাতিয়াগড়—ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ডায়মণ্ডহারবার

অধীন ইহা এক্ষণে দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তরভাগে মথুরাপুর, চাঁদপুর, জগদীশপুর, রামনগর, কাশীনগর, ইত্যাদি ও দক্ষিণভাগে বেলপুকুরিয়া, লক্ষ্মীপুর, বাঁশতলা ইত্যাদি প্রধান প্রধান স্থান আছে।

(২১) ময়দা—ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত, বারুইপুরের অধীন। প্রধান প্রধান স্থান বাঁটরা, তিল্লী, সাহাবাজপুর ইত্যাদি।

(২২) আকবরপুর—এক্ষণে কোন অস্তিত্ব নাই।

(২৩) বেলিয়া—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আমতা, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হরিপালের অধীন।

(২৪) বসন্দরী—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাবড়া জেলার মধ্যে ভাগীরথী ও দামোদরের মধ্যে অবস্থিত। মীরজাফর প্রদত্ত উক্ত চব্বিশপরগণা ব্যতীত মীর মহম্মদ সাদেকর দত্ত সাতাইশ মহালের মধ্যে হাভিলিসহর বা হালিসহর একটি বিস্তৃত পরগণা। ইহা বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া, হুগলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত অংশ নৈহাটি, হালিসহর, ইছাপুর, শ্যামনগর, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান আছে।

কিরূপে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ জেলা চব্বিশ পরগণার উৎপত্তি হইল, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইয়া থাকে। যাহা এক্ষণে বাঙ্গলার সকল জেলার শীর্ষস্থানীয়, তাহার উৎপত্তি জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে, আমরা তজ্জন্য ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিলাম, ভরসা করি, ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে পাঠকবর্গের কৌতূহলের নিবৃত্তি হইবে।

সমসাময়িক ইতিবৃত্তে শিবাজী।

—:o:—

মহারাষ্ট্র-গৌরব ছত্রপতি শিবাজী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ অব্দে পরলোকগত হন। তিনি যে যুগে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা জগতের ইতিহাসে

একটি স্মরণীয় যুগ। ভারতবর্ষে তখন মোগল শাসনকাল। আকবরের উদার-নীতি দ্বারা ভারতের বহুরাজ্যে যে বিরাট সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পৌত্র সাহজাহানের যুদ্ধকৌশলে ক্রমেই প্রবল ও সুবিস্তৃত হইতেছিল। জাহাঙ্গীর উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, তাঁহার শাসনে রাজ্যবৃদ্ধি না হউক, রাজ্যাংশও হস্তচ্যুত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের দেহ-ত্যাগ, সাহজাহানের রাজ্যলাভ ও শিবাজীর জন্মগ্রহণ একই বৎসরে হইয়াছিল। (১৬২৭)। সাহজাহান অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যে এত সুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, সুকীর্ত্তিরাজি রক্ষার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেও রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য হয় নাই। আকবরের সময় হইতেই মোগলকেশরীর লোলুপদৃষ্টি দাক্ষিণাত্যের প্রতি নিপতিত হয়। কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন নাই; সাহজাহান পুনরায় চেষ্টা করিয়া কতকাংশ মাত্র অধিকার করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে সাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গ-জেবই দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ বিজয় করিতে সমর্থ হন। সাহজাহানের সময় মহারাষ্ট্র-শিশু শিবাজী শিরোত্তলন করেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালেই তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশিত হয়। সাহজাহানের রাজত্বের শেষাংশ এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ জগতের ইতিহাসে একটি ঘটনাপূর্ণ এবং সমস্যাপূর্ণ সময়।

ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এই সময় একটি ভীষণ যুগ। মহাবীর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্লসকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া স্বকীয় তত্ত্বাবধানে এক নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু যখন কালের করে শীঘ্রই সে মহাত্মার বিলয় হইল, তখন অল্পদিন মধ্যেই সে নববিধান বিলুপ্ত হইল এবং ভ্রষ্টচরিত্র দ্বিতীয় চার্লসের হস্তে পুনরায় রাজ্যভার ন্যস্ত হইল। রাজার হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইয়া সুবিধা না হওয়াতে যখন পুনরায় রাজার হাতে তাহা প্রত্যর্পিত হইল, তখন রাজা স্বতঃই যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। তখন অরাজকতা, উদ্দামতা, ও নৈতিক অবনতির প্রবলতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ইংরাজভূখণ্ড পরিপ্লাবিত করিল। এইরূপে ইংলণ্ড যখন প্রমোদবিলাসে,

নাট্যরঙ্গে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতভূমি তখন মারহাট্টা ও মোগলের প্রবল রণরঙ্গে যথেষ্ট সজীবতার পরিচয় দিতেছিল। এই যুগেই মহাবল মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। সে শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী যে দিন কার্য্যান্তে অনন্ত নিদ্রায় নেত্র নিমীলিত করিলেন, তখনও জাড্যভাবাপন্ন অচৈতন্য ইংলণ্ড নেত্র উন্মীলন করে নাই।

আকবরের সময়ে মোগলরাজ্যের যশঃপ্রভা বহুদূর বিকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তাহা উন্নতির চরমসীমায় অধিরূঢ় হয়। পূর্ণচন্দ্রই রাহুগ্রস্ত হয়; আওরঙ্গজেবের সময়েই পূর্ণতাপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ফরাসী দেশে এই সময়ে সুবিখ্যাত নরপতি চতুর্দ্দশ লুই রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী কলবার্টের শাসনকৌশলে এই রাজত্বকাল উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে স্পেনরাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া পশ্চিম ইয়ুরোপে বহুবর্ষব্যাপী যে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার সহিত মোগল শাসনকালীয় মহারাষ্ট্রযুদ্ধের তুলনা হইতে পারে। যখন পরাক্রান্ত আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্‌রূপে বীরকেশরী শিবাজীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন, তখন নির্জীব সম্রাট প্রথম লিওপোল্ড জর্ম্মাণদেশের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে যুগে ছত্রপতি শিবাজী স্ববিক্রমে মহারাষ্ট্র-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন, সে যুগে ইংলণ্ড বিলাসবিভ্রাটে অধঃপতিত, জর্ম্মাণি এক দুর্ব্বল নৃপতির হস্তে ন্যস্ত, এবং স্পেনের উত্তরাধিকার লইয়া ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। একমাত্র ফ্রান্সই এই সময়ে উন্নতির শিখরে সমারূঢ়, এবং ফরাসীর গৌরব-প্রতিভা দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইতেছিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষ প্রভৃতি আর্য্যদেশ ভ্রমণার্থ আগমন করেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ফরাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। এই সকল ভ্রমণকারিগণের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ হয়, তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয়।

এই সকল ভ্রমণকারিগণের অধিকাংশই শিবাজীর বলদর্পে যখন সমগ্র দাক্ষিণাত্য আলোড়িত হইতেছিল, তখন তাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষের

নানাস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে শিবাজী সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়। সমসাময়িক ইতিবৃত্তের অন্তর্গত এই সকল কথার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শিবাজীর মৃত্যুর পরে বহুসংখ্যক পণ্ডিতদিগের দ্বারা নানা প্রসঙ্গে শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে; অর্ম্মির মোগলেতিহাস, গ্রাণ্ট ডফ ও ওয়ারিং প্রণীত মারহাট্টা-ইতিহাস, ডৌ প্রণীত হিন্দুস্থান ও ফেরিস্তা প্রভৃতি পুস্তকে শিবাজী সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ যথেষ্ট তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমসাময়িকগণের ইতিবৃত্ত বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদিও সমসাময়িকগণ বিরুদ্ধবাদীদিগের মতদ্বারা বিচলিত হইয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতে পারেন, তবুও একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের বিবরণে তৎসাময়িক অবস্থার যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। আমরা অর্ম্মি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়া সমসাময়িক ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ হইতে শিবাজী সম্বন্ধে যাহা কিছু মন্তব্য বা তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। পরের মন্তব্য প্রদান করিবার সময়ে আমরা নিজের মন্তব্য অপ্রকাশিত রাখাই সঙ্গত মনে করি।

(১) ট্যাভারনিয়র (Tavernier)। ইনি একজন ফরাসীদেশীয় ভ্রমণকারী। ইনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পারিনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছয়বার প্রাচ্য দেশে ভ্রমণার্থ আগমন করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম অভিযান আরম্ভ হয়। ১৬৪০ অব্দে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া বঙ্গদেশস্থ ঢাকা অঞ্চলে উপনীত হন। আরও কয়েকবারে সুরাট, মছলীপত্তন প্রভৃতি স্থানে অবতরণের পর ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে শেষবার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি অতি সংক্ষিপ্তভাবে শিবাজীর ভাগ্যোদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজী অতি অল্প বয়সেই বিজাপুরের রাজার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বহুবার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রাজার মৃত্যুর পর মহিষী এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; তিনি শিবাজীর বিদ্রোহে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। তদ্দার

স্থির হয় যে শিবাজী স্বাধিকৃত প্রদেশের অধীশ্বর থাকিয়া শুধু বিজাপুর রাজের স্বামিত্ব স্বীকার করিবেন। সন্ধির পর রাণী মক্কাতীর্থে গমন করেন। যখন তিনি মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে ইস্পাহানে ট্যাভারনিয়রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ট্যাভারনিয়র শিবাজীর কৃতকার্য্যতা বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে। তিনি বলেন "শিবাজী সাহস ও বিশ্বাসঘাতকতা" দ্বারা মারহাট্টাগণের জন্য দক্ষিণ ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।*

(২) বার্ণিয়ার—ইনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুরাটে পদার্পণ করেন এবং ১৬৬৭ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।† কিন্তু তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁহার আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ যথাক্রমে ১৬৫৮ ও ১৬৬৬ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্ণিয়ারের মতে শিবাজী সতর্ক, দুঃসাহসিক ও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন। সায়েস্তা খাঁ যখন দাক্ষিণাত্যবিজয়ে প্রেরিত হন, তখন তিনি বহু সৈন্যাধিপতি বিজাপুররাজ অপেক্ষা শিবাজীকে অধিকতর দুর্দ্দমনীয় শত্রু বলিয়া মনে করেন। বার্ণিয়ার শিবাজী কর্ত্তৃক সুরাটলুণ্ঠনের এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে একস্থলে লিখিত আছে যে, সুরাটলুণ্ঠন ও সায়েস্তা খাঁর উপর আক্রমণ এই উভয় ব্যাপারে শিবাজীর সহিত যশোবন্ত সিংহের গুপ্ত মন্ত্রণা ছিল।

বার্ণিয়ার বলেন যে সুরাটলুণ্ঠনসময়ে পবিত্রচরিত্র শিবাজী‡ খৃষ্টীয় মিশনরীগণের আবাসগৃহের উপর কোনও আক্রমণ করেন নাই; তিনি বলিতেন, "খৃষ্টীয় মিশনরীগণ উত্তম লোক; তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা হইবে না।" ওলন্দাজদিগের একজন দালাল জীবিতাবস্থায় অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন, এজন্য শিবাজী সেই মৃতব্যক্তির গৃহের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে বারণ করেন।

* "By his valour and treachery he won for the Marhattas the Suzerainty of Southern India". Constables' Oriental Miscellany Vol. I. p. 183.

† Robert Orme's Historical Fragments of the Moghul Empire.

‡ "The holy Sevajee."

শিবাজী দিল্লীতে যাইবার পূর্ব্বে যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রতিভূ হইয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁর স্ত্রী সম্রাট আরঙ্গজেবের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধে সায়েস্তার এক পুত্র নিহত হয়, সায়েস্তা খাঁ স্বয়ং আহত হন এবং সুরাট লুণ্ঠিত হয়। এই সকল কারণে সায়েস্তা খাঁর স্ত্রী শিবাজীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং শিবাজী যখন দিল্লীতে যান, তখন তিনি অবিরত পদে পদে শিবাজীকে অপদস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। এমন কি ৩।৪ জন ওমরাহ সর্ব্বদা শিবাজীর শিবিরে পাহারা দিতেন। এই সকল কারণে শিবাজী কৌশলে রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। যশোবন্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই বিষয়ে শিবাজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন এবং এজন্য তাঁহাকে রাজসরকারে আসিতে নিষেধ করা হয়। * কাহারও কাহারও মত এই যে শিবাজীর পলায়ন বিষয়ে স্বয়ং আওরঙ্গজেবেরও ইঙ্গিত ছিল।

(৩) থিভিনো [Thevenot]—ইনিও একজন ফরাসী পর্য্যটক। ইনি ১৬৬৪ অব্দে প্রথম সুরাটে আসেন এবং তথা হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া মিয়ানা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬৬৭)। অতি অল্প সময়ের অভিজ্ঞতায় থিভিনো এদেশ সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সুলভ নহে। তিনি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবাজী সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) ক্যারি (Carre)—ইনি ফরাসী ডাইরেক্টর জেনারেল কেরণের অনুচররূপে ১৬৬৮ অব্দে সুরাটে আসিয়া তিন বৎসর ছিলেন। ১৬৭২ অব্দে তিনি দ্বিতীয়বার সুরাটে আসিলে কেরণ তাঁহাকে স্যান্ টোমিতে অবরুদ্ধ মঁশিও হে মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তথা হইতে তখন তিনি কার্য্যগতিকে চল দেশে গমন করেন, তখন সেই স্থানে শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সদাচারের সহিত অভ্যর্থনা করেন। ক্যারি দুই খণ্ডে তাঁহার যে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন, তাহার উভয় খণ্ডেই শিবাজীসম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগে তিনি ১৬৭১ ও ১৬৭২ এই দুই বর্ষের শিবাজীর কার্য্যাবলী

* See Bernier's Travels p. 189.

সম্বন্ধে যথেষ্ট সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শিবাজীর চরিত্র ঐকান্তিকভাবে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে গাষ্টাভাস্ এডল্‌ফাস্ ও জুলিয়স্ সীজর প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় বীরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ক্যারির মতে মহাবীর শিবাজী সমস্ত রাজোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

(৫) ডেলন (Dellon)—ইনি একজন ফরাসী চিকিৎসক। ইনি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুরাটে আসেন এবং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে তিনি অধিবাসিগণের আচারপদ্ধতি ও দেশের অবস্থা বিষয়েই বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শিবাজীর কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন গোয়ানগরীতে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখনই শিবাজীর বিষয় অধিক শুনিবার কথা ছিল; অথচ সে সময়ে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

(৬) ডি গ্রাফ্ নামক একজন সার্জন ওলন্দাজ কোম্পানীর অধীনে ১৬৪০ হইতে ১৬৮৭ অব্দের মধ্যে ছয়বার ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বহুল এবং বিবধ বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গদেশে পরিভ্রমণের সময় শিবাজী সম্বন্ধে কিছুই বলিবার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ তখনই তিনি শিবাজীপ্রসঙ্গ প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি শিবাজীর কার্য্যক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তখন তিনি সে প্রসঙ্গ একবার মাত্র উত্থাপিত করিয়াছেন।

(৭) মঁশিও ডি লা হে নামক ফরাসীবীর স্বপ্রণীত জর্ণালে শিবাজীসম্বন্ধে অনেক বিবরণ দিয়াছেন। ত্রিকোণমালী উপসাগরে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে গিয়া ওলন্দাজ নৌবাহিনী দ্বারা বিবিধ প্রকারে প্রতিরুদ্ধ ও বিড়ম্বিত হে অবশেষে করমণ্ডল উপকূলে প্রস্থান করেন এবং তথায় প্রবল আক্রমণে স্থান টোমী অধিকার করিয়া লন। (১৬৭২)। এই স্থান পূর্ব্বে গোলকুণ্ডার মহারাজের অধীন ছিল; তাঁহার সৈন্যদল ওলন্দাজদিগের সাহায্যে এই স্থান অবরোধ করে। মহাবীর হে অমিতবিক্রমে দুই বৎসর কাল এই স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডার সৈন্যদল এই কার্য্যে ব্রতী থাকাতে শিবাজীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

(৮) ১৬৭৭ অব্দে পারিনগরীতে আর একখানি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়। উহা মঁশিও হের সৈন্যদলভুক্ত জনৈক লোকের দ্বারা লিখিত। এই লেখক ওলন্দাজদিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া বাটাভিয়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শিবাজীর কথা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু শিবাজী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কিছুই জানেন না। এমন কি শিবাজীকে তিনি মোগল বাদসাহের আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

(৯) ফ্রায়ার নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক ১৬৭৩ ও ১৬৭৯ অব্দে দুইবার ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৬৮১ অব্দে শেষবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি শিবাজীর কথা অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বত্রই অন্যান্য বিষয়ের সহিত জড়িত ও উহাতে সময়নির্দ্দেশ নাই। শিবাজী মারহাট্টাজাতির প্রতিষ্ঠাতা। সমসাময়িক ভ্রমণকারিগণের বিবরণে শিবাজীর সৈন্যদল কখনও মারহাট্টা বলিয়া উক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে "শিবাজীরদল" (Sevagees) বলিত।

(১০) ডি-অর্লিয়নস্ নামক একজন জেসুইট ১৬৮৮ অব্দে "শিবাজীর ইতিহাস" নামক একগ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত; ইহার কোথায়ও তারিখের নামগন্ধ নাই; শিবাজী সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ নহে এবং তাহা তৎকালে সাধারণের পরিজ্ঞাত ছিল না।

(১১) মনোচি (Manouchi) নামক একজন ডাক্তার সুল্তান মুয়াজিমের সহচর ছিলেন। যখন মুয়াজিম শিবাজীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন, তখন মনোচি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং পরে কেট্রন নামক জনৈক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিককে বহু ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সাহায্য করেন।

শিবাজীর সমসাময়িক পর্য্যটক বা ঐতিহাসিকগণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উপরে প্রদত্ত হইল। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল ঐতিহাসিক শিবাজীপ্রসঙ্গে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভবিষ্যতে বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলীর কীর্ত্তি।*

——o*o——

যে সময় সৈয়দবংশীয় মুসলমান সম্রাটগণ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে চতুর্দ্দিকে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন, তৎকালে গৌড় নগরে "নাশির সাহ" নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নবাব রাজত্ব করিতেন। গৌড়বঙ্গ ও সমগ্র উৎকল প্রদেশ এবং এমন কি আসামের কতকাংশও তাঁহার শাসনাধীন ছিল। দিল্লীশ্বর ও গৌড়েশ্বর উভয়েই সমক্ষমতাপন্ন ছিলেন বলিয়াই গৌড়েশ্বরের জীবদ্দশায় দিল্লীশ্বর গৌড় রাজ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। নাশির সাহ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন।

তখন উড়িষ্যা ও গৌড়বঙ্গে রাজস্বসংগ্রহের কোন সুব্যবস্থাই ছিল না। অধিকাংশ স্থান গর আবাদি, পতিত ভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সুবিধাজনক পথ ঘাটের অভাবে লোকের বড়ই কষ্ট হইত, হিংস্র জন্তু ও দুষ্ট লোকের দৌরাত্ম্যে প্রজা সাধারণ সর্ব্বদাই আশঙ্কায় কাল কাটাইত। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া প্রজারঞ্জক নবাব নাশির সাহ তৎপ্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। নাশির সাহের সভায় রাজনীতিকুশল সচীবের অভাব ছিল না। তিনি তাঁহাদের পরামর্শে ও সহকারিতায় সমগ্র গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে বনকর্ত্তন, ভূমি আবাদ, লোকালয়স্থাপন, জলাশয়খনন, ও পথ ঘাট নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন।

নবাব সাহেবের আদেশে যে সমস্ত কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইয়াছিলেন খাঁ জাহান আলি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহু-

* **Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part. I. No. 11—1867, J. Westland's History of Jessore, এডুকেশন গেজেট, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৬৮ সাল। Stewart's, History of Bengal and বিশ্বকোষ।**

সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, লোক লস্কর ও নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে গৌড় হইতে বহির্গত হইয়া দামোদর ও আমোদর নদদ্বয় মধ্যবর্ত্তী বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মজুরদ্বারা জঙ্গল কাটাইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিয়া খাঁ জাহান নিজ নামানুসারে তাহার নাম জাহানাবাদ রাখিলেন।

জাহানাবাদ সংস্থাপনের পরে রাজস্ব বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংস্করণ সৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে পূর্ব্ব বঙ্গে বাকলাচন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের কার্য্য সমাপন করিয়া ক্রমে তিনি ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে এক দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন স্বয়ং আল্লা আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সৎকার্য্য করিতে অনুমতি করিতেছেন। এই স্বপ্নের পর হইতেই খাঁ জাহানের মন ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সৎকার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এ স্থান তখন ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খাঁ জাহান আলি মজুর দ্বারা ঝাড়ি জঙ্গল কর্ত্তন, কর্ষণ দ্বারা পতিত ভূমি উর্ব্বরা করিয়া নবাব সাহেবের আনুকূল্যে স্থপতিগণ দ্বারা সুরম্য হর্ম্ম ও মসজিদনির্ম্মাণ, বড় বড় জলাশয়খনন ও পথ ঘাট প্রস্তুত করাইয়া সেই ভীষণ জঙ্গলকে সুদৃশ্য স্থানে পরিণত করিলেন এবং এখানে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন।

খাঁ জাহান আলির সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি "ষাটগম্বুজ" নামক বৃহৎ মস্‌জিদ। লোকে ইহাকে "ষাটগম্বুজ" নামে অভিহিত করিলেও ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৭টী গম্বুজ আছে। ৬০টী থাম দশ সারিতে বিভক্ত হইয়া এই মসজিদের ছাদ রক্ষা করিতেছে। ষাট গম্বুজ পূর্ব্বদুয়ারী। মসজিদের সম্মুখভাগে ১১টী দরজা আছে। মধ্যস্থলের দরজাটী প্রকাণ্ড কিন্তু উভয় পার্শ্বস্থিত ১০টী অপেক্ষাকৃত ছোট। দ্বিতীয় ও দশম দরজা দুইটী ইটের গাঁথনী দ্বারা এক ধারে বন্ধ করা। প্রত্যেক দরজার উপরেই খিলানের কাজ। মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়ালেও সম্মুখভাগের অনুরূপ সমসংখ্যক দরজা ও সমানভাবের খিলানের কাজ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ প্রত্যেক দিকেই ৭টী করিয়া দরজা আছে, এগুলির উপরেও একই ভাবের খিলানের কাজ। মসজিদের ৪ কোণে চারিটী বুরুজ ছাদের

উপরস্থিত গম্বুজ হইতে কতকটা উচু হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের বুরুজ দুইটীর মধ্যে ছাদে উঠিবার জন্য দুইটী গোল সিঁড়ি আছে। প্রথম সিঁড়ি দিয়া অনায়াসেই উঠা নামা যায় এবং সেখানে বেশ আলো আছে তাই ইহাকে লোকে 'রোশন মাণিক বা 'আলোক কোঠা' আর দ্বিতীয় সিঁড়ি কিছু খাড়াই রকমের, স্থানটা অন্ধকারময় তাই তাহাকে 'আঁধার মাণিক' বা 'আঁধার কোঠা' বলে। মসজিদের ভিতরকার হলটী দৈর্ঘ্যে ৯৬ হাত, প্রস্থে ৬৪ হাত। এই প্রকাণ্ড হলের ঠিক মধ্যস্থলেই 'উপাসনা বেদী'। এই বেদীতে উপবেশন করিয়াই খাঁ জাহান কোরান শরীফ পাঠ ও উপাসনাদি করিতেন। এখানে সে প্রাচীন ধরণের অদ্ভুত আকারের কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী কোরানাধার ছিল। খাঞ্জালী সাহেব সেই কাষ্ঠাধারের উপর কোরান রাখিয়া তাহা পাঠ করিতেন, আধারটী এখন এখানে নাই। বেদীর দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ গর্ত্ত আছে। ফকীরেরা বলেন যে, খাঞ্জালী সাহেব ঐ গর্ত্তে টাকা কড়ি রাখিতেন। এই হলের এক পার্শ্বেই তাঁহার দরবার বসিত।

'ষাটগম্বুজের' তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বে খাঞ্জালী সাহেবের "রোজা" বা "কবরখানা।" প্রবাদ—খাঞ্জালী সাহেব নিজেই তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া যান। কবরখানার চারিদিকেই প্রাচীরবেষ্টিত। রোজাটী বাহির হইতে দেখিলে সমচতুষ্কোণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভিতরের দিকটা সম-অষ্টকোণের আকার। মন্দিরের চারি দিকেই চারিটী দরজা আছে। তন্মধ্যে উত্তরের দিকের দরজা ইটের গাঁথনি দ্বারা বন্ধ করা। রোজাটী প্রায় ৩০।৩৫ হাত উচ্চ হইবে। ইহাতে একটী মাত্র গম্বুজ ক্রমশঃ সরু হইয়া সগর্ব্বে উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইরা আছে। রোজার ভিতরকার হলের ঠিক মধ্যস্থলেই সাধু খাঞ্জালী সাহেব শয়িত। কবরের উপরেই শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত বেদী। আস্তানার ফকীরেরা প্রত্যহই এই বেদীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বেদীতে আরবী অক্ষরে কয়েক পংক্তি কবিতা লেখা আছে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটীর মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

১। 'ভগবানের প্রেমভিখারী জনৈক সামান্য ভৃত্য এই স্থানে শয়িত আছেন। তিনি ভগবানানুগৃহীত ব্যক্তিগণের পরম বন্ধু, জ্ঞানবান্‌দিগের হিতাভিলাষী, ও ভগবানের অবিশ্বাসীগণের ঘোর শত্রু ছিলেন। তাঁহার নাম আলাঘ খাঁ জাহান আলী ছিল। হিজিরা ৮৬৩ সালের ২৬শে জেলহিজ্জা বুধবার রাত্রে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ভগবানের রাজ্যে গমন করিয়াছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁহার সমাধি হয়।

২। এই সমাধি-মন্দির খাঁজাহান আলীর স্বর্গের উদ্যান। ভগবান তাঁহার শান্তি বিধান করুন।'

সমাধি-মন্দিরের অনতিদূরেই রন্ধনশালা ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। ইহার অনতিদূরেই একটী প্রকাণ্ডগৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাই খাঞ্জালী সাহেবের অতিথিশালা। এখানে বসিয়া প্রত্যহই দীন দুঃখী অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য শত শত লোক পরিতোষরূপে আহার করিত। খাঞ্জালী সাহেব নিজে উপস্থিত থাকিয়াই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহা ব্যতীত খাঞ্জালী সাহেব আর যে সমস্ত মসজিদ, অট্টালিকা, বড় দরগা, ছোট দরগা নামে পীরের আস্তানা ও বৃহৎ তোরণাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকল কালের কঠোর অত্যাচারে ক্রমে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে অতীতের সাক্ষীরূপে পড়িয়া আছে মাত্র।

এই সমস্ত ভগ্ন ও অভগ্ন অট্টালিকা গুলির দক্ষিণ দিকেই খাঞ্জালীর একটী প্রকাণ্ড দীঘি। এই দীঘি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়, তাহার একটী এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

"ভাল পানীয় জলের অভাব হওয়ায় খাঞ্জালী সাহেব দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লোকেরা খনন করিতে করিতে নীচে অনেকদূর গিয়াছে, এমন সময় তাহারা একটী মন্দির দেখিতে পাইল। মন্দিরের দ্বার ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ ছিল। তাহারা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই দ্বার খুলিতে সমর্থ হইল না। এ সংবাদ খাঞ্জালীর নিকট পৌঁছিলে তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দ্বার তখনও রুদ্ধ, কিন্তু খাঞ্জালী সাহেব

হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা আঘাত করিতেই সে দরজা খুলিয়া গেল। তিনি বিস্ময়ে দেখিলেন মন্দিরের মধ্যে একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে এবং তাহারই পাশে বসিয়া দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নিবিষ্টমনে ধূমপান করিতেছেন। খাঞ্জালী সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দীঘির জন্য জল প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন 'আমি নির্জ্জনস্থান দেখিয়া ভৈরব নদের তীরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলাম, এইমাত্র আমার তপঃভঙ্গ হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে মন্দিরটার উপর এত মাটী পড়িয়াছে এও ভগবানের এক খেলা। যাহা হউক, তুমি সৎ উদ্দেশ্যেই লোকের হিতের জন্য এই দীঘি খনন করিয়াছ, ভগবানের কৃপায় ইহা অবিলম্বেই সুন্দর সুস্বাদু পানীয় জলে পরিপূর্ণ হউক।' সন্ন্যাসীর মুখের কথা মুখে থাকিতে না থাকিতেই মন্দিরের নিকট হইতে তীর বেগে জল উঠিতে লাগিল, খাঞ্জালী সাহেব এই ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া অশ্ব ছুটাইলেন, তেজস্বী অশ্বও চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই তাঁহাকে লইয়া দীঘির তীরে পৌঁছিল। দেখিতে দেখিতে দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী হইতেই এই দীঘি জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই খাঞ্জালী সাহেব ইহাকে ঠাকুর দীঘি নামে অভিহিত করেন।"

এই দীঘিতেই খাঞ্জালী সাহেবের "কাল পাড়" ও "ধল পাড়" নামক দুইটী প্রকাণ্ডদেহ পোষা কুম্ভীর ছিল। ধার্ম্মিক খাঞ্জালী সাহেবের কুম্ভীর দুইটীও ধার্ম্মিক ছিল। 'ধল পাড়' ও 'কাল পাড়' অনেক দিন হইল ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখন তাহাদের কয়েকটী বংশধর মাত্র আছে। ইহারা সর্ব্বাংশে 'ধলপাড়' ও 'কালপাড়ের' উপযুক্ত বংশধর। কুম্ভীরগুলির অসাধারণ ধর্ম্ম ও ক্ষমতা দেখিয়া স্থানীয় লোকে তাহাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। স্ত্রীলোকের সন্তান না হইলে কিম্বা কাহারও কোন আপদ বিপদ ঘটিলে তাহারা নানা কামনা করিয়া তাহাদের নিকট কপোত, হাঁস, মোরগ, ছাগলছানা প্রভৃতি মানসিক করে। কামনা সিদ্ধ হইলে মানসিক পশু পক্ষী লইয়া দরগায় উপস্থিত হইলে মসজিদের ফকীর খাঞ্জালীর উদ্দেশ্যে শির্নী দিয়া মানতকারীকে সঙ্গে লইয়া ঘাটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেই কুম্ভীরগুলি তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিয়া

ক্রমে ঘাটের ধারে উপস্থিত হয়। ফকীর কিম্বা মানতকারী তীর হইতে মানসিক পশু পক্ষীকে হাতে ধরিলে কুম্ভীরগুলি তাহাদিগকে আস্তে আস্তে আসিয়া হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া জল মধ্যে নিমগ্ন হয়। কুম্ভীরগুলির আকার দেখিলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সেগুলি কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।

এই দীঘি ব্যতীত 'ঘোড়াদীঘি, পচাদীঘি ও কালাদীঘি' প্রভৃতি আরও অন্যান্য দীঘির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস খাঞ্জালী সাহেব ৩৬০টী মসজিদ ও ৩৬০টী দীঘি খনন করিয়াছিলেন।

খাঞ্জালী সাহেবের অন্যতম কীর্ত্তি দুইটী সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। একটী বাগেরহাটের উত্তর নদীর তীর হইতে ষাট গম্বুজ পর্য্যন্ত ও অন্যটী সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রামের এক প্রসিদ্ধ ফকীরের সহিত দেখা করিবার জন্যই নাকি খাঞ্জালী সাহেব এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ২০ হাত চওড়া ছিল। এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়।

মস্‌জিদ্ ও দীঘিগুলির কিঞ্চিৎ দূরেই নদীর তীরে খাঞ্জালী সাহেবের প্রসিদ্ধ "বাগের" চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই বাগবাটীর আয়তন ন্যূনধিক ২শত বিঘা ছিল। বাগের চতুর্দ্দিকেই ইষ্টক প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। বৎসরের সকল সময়েই বাগানের নানাজাতীয় বৃক্ষ সুগন্ধি ফুল ও সুমিষ্ট ফলভরে অবনত থাকিত। ধার্ম্মিক খাঞ্জালী সাহেব নিজহস্তে এই ফল ও ফুল দীন, দুঃখী, আতুর, অভ্যাগত সমূহের মধ্যে বিতরণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু হায়! কালের কঠোর অত্যাচারে সে বাগের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বাগের একদিকে একটী দীঘির গভীর খাত দৃষ্ট হয়। এখন উহাতে জল নাই বলিলেও চলে, যাহা একটু আছে তাহাও ধাপদলে আচ্ছাদিত, ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অন্যদিকে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটা ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে, লোকে এ স্তূপকে খাঞ্জালী সাহেবের গ্রীষ্মাবাসের ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই বাগের মধ্যেই খাঞ্জালী সাহেব এক হাট বসাইয়াছিলেন, সে বাগ নাই কিন্তু হাট এখনও আছে। সপ্তাহে দুইদিন এই হাট বসিয়া থাকে। বাগের মধ্যে বসিত বলিয়া সাধারণ লোকে এই হাটকে 'বাগের

হাট” নামে অভিহিত করিত। এই হাটের নাম হইতেই মহকুমার নাম বাগের হাট হইয়াছে।

প্রবাদ—বাগের মধ্যে স্থানে স্থানে খাঞ্জালী সাহেব অনেক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও নাকি ভূমি কর্ষণ করিবার সময় লোকে মধ্যে মধ্যে টাকা কড়ি পাইয়া থাকে। এদেশের অনেক লোকই নাকি খাঞ্জালীর ধন পাইয়াই বড় লোক হইয়াছে।*

খাঞ্জালী সাহেব বাস্তবিকই একজন ঈশ্বরচিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষ এজগতে বিরল। তাঁহার দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন, আতিথ্য ধর্ম্ম ও দানশীলতা সম্বন্ধে এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। হিজিরা ৮৬৩ সাল=১৪৫৮ খৃঃ অব্দ। আজ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর অতীত হইল, তিনি দিব্যধামে চলিয়া-গিয়াছেন। কিন্তু এখনও এদেশের হিন্দু মুসল্মান তাঁহার পূতনামশ্রবণে তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে খাঞ্জালী সাহেব এ পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই আজিও তাঁহার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমাতে তাঁহার কবরখানায় একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর এবং এমন কি সুদূর পাবনা হইতেও দলে দলে যাত্রিগণ মেলায় আসিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি সাধারণতঃ এদেশে “পীর খাঞ্জালী” বলিয়া খ্যাত।

খাঞ্জালী সাহেব গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম যায় নাই। তাঁহার নির্ম্মিত অনেক মস্‌জিদ্, অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার “ষাটগম্বুজ,” তাঁহার “সমাধি-মন্দির” আজিও বিদ্যমান।

* এ প্রবাদের কোনও ভিত্তি আছে কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে বাসাবাটী, দশ আনি, হাউলি, কাড়াপাড়া, মঘিয়া, ও বনগ্রাম প্রভৃতি বাগের হাটের নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি স্থানে বহুতর ধনবান্ ব্যক্তির বাস বলিয়াই বোধ হয় লোকে ইহাতে অনেকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয় থাকে।—লেখক।

কালের কঠোর অত্যাচারে ও সাময়িক জীর্ণ সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে শ্রীহীন হইলেও অট্টালিকাদ্বয় এখনও সগৌরবে সার্দ্ধচারিশতাব্দী পূর্ব্বের সেই অতীত যুগের সুণিপণ স্থাপত্যকৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহার পুণ্যময় কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। আজ এই দারুণ নিদাঘে এই ভারতব্যাপী ভীষণ জলকষ্টের দিনে শত শত লোক তাঁহার ঐ খনিত দীঘির জলে পিপাসা মিটাইয়া তাঁহার নামগানে দেশ মাতাইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, খাঞ্জালী সাহেব চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার চিহ্ন, তাঁহার কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান।*

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

জগৎ শেঠ।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাতপচাঁদ।

ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রদ্বয় মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ মুর্শিদাবাদ গদীর অধিকারী হইয়া দিন দিন তাহার উন্নতসাধনে যত্নবান্ হন। ফতেচাঁদের আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র জন্মে, ইঁহারা পিতার জীবদ্দশাতেই এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দচাঁদের মহাতপচাঁদ ও দয়াচাঁদের স্বরূপচাঁদ নামে পুত্র হয়। পুত্রশোকাতুর ফতেচাঁদ পৌত্রদিগকে অবলম্বন করিয়া যেমন দিন দিন শান্ত হইতেছিলেন, তেমনই তাহাদের প্রতি

* বাগের হাটের কীর্ত্তি ব্যতীত চাঁদখালি হইতে কয়েক মাইল দূরে "কপোতাক্ষ নদীর" তীরে "আমাদী" গ্রামে মাটীর নীচে খাঞ্জালী সাহেবের নির্ম্মিত একটী মসৃজিদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা অনেকটা 'ষাটগম্বুজের' ধরণে নির্ম্মিত। "গন্ধকেশবপুরে"ও ইঁহার অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়।

লেখক।

তাঁহার অপরিসীম স্নেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য তিনি দুই জনকেই গদীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে মহাতাপচাঁদ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি গদীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন, স্বরূপচাঁদও তাঁহাকে যথারীতি সাহায্য করিতেন, দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া গদীর উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদাবাদের যে গদীকে ফতেচাঁদ ভারতের বা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় করিয়াছিলেন, মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ তাহাকে কেবল তদবস্থায় রাখেন নাই বরঞ্চ তাহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গদীর অপরিসীম শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যার পর নাই কার্য্যতৎপরতা জানিয়া সময়ে সময়ে মহাতাপচাঁদের সহিত রাজকার্য্যের পরামর্শও করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেও তাঁহার রাজত্ব যেরূপ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি তিলমাত্র বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইতেন না। যদিও মহাতাপচাঁদ প্রভৃতির সুপরামর্শে তিনি দক্ষতাসহকারে রাজ্যশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণে তিনি যারপর নাই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাস্কর পন্তের মৃত্যুর পর কিছুকাল মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ বঙ্গভূমিকে শান্তিলাভের অবকাশ দিলেও মুর্শিদাবাদের রাজসিংহাসনে সে শান্তি কল্যাণচ্ছায়া বিতরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের পর ভীষণ আফগান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ভয়াবহ বিদ্রোহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহার প্রদেশেই ভীষণ আকার ধারণ করে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ অসংখ্য আফগান সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক আফগান কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয় সমর প্রভৃতিতে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে মুস্তাফা খাঁর ক্ষমতা প্রবল হয়। তাঁহার ক্ষমতা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি, তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যপিপাসার

সঞ্চার হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। বাঙ্গলা অপেক্ষা বিহারের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হয়। মুস্তাফা আলিবর্দ্দির নিকট হইতে বিহারের নায়েবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দি তাঁহাকে সময়ে সময়ে আশা প্রদান করেন, কিন্তু মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দির কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া স্বীয় বাহুবলে তাহা অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি নবাবের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিহারাভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে আলিবর্দ্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা এবং সিরাজ উদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদ বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের নিকট হইতে তিনি মুস্তাফা খাঁর অভিপ্রায়ের সংবাদ পাইয়া মুস্তাফা খাঁকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। মুস্তাফা খাঁ পাটনা আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারে উপস্থিত হইয়া জৈনুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন, উভয়ের আক্রমণে মুস্তাফা খাঁকে পরাজিত হইতে হয়, এবং তিনি পরিশেষে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুতে কিন্তু আফগান বিদ্রোহের উপশম হয় নাই। বরঞ্চ তাহা পরিশেষে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সমগ্র বিহার প্রদেশে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিহারে আফগান-বিদ্রোহ কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইলে, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় আবার মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। ভাস্কর পন্তের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া রঘুজী ভোঁসেলা সসৈন্যে নিজেই বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। নবাব আফগান-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় কোনরূপে রঘুজীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রঘুজী সেই সময়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি নবাবের নিকট অনেক টাকার দাবী করিয়া বসেন। নবাব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় রঘুজী প্রথমে উড়িষ্যা অধিকারে কৃতসংকল্প হন। এই সময়ে রাজা দুর্লভরাম উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবিবেচনা ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য সহজে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হইল। দুর্লভরাম বন্দী হইয়া অবশেষে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার পর রঘুজী বিহারে উপস্থিত হইয়া আফগানগণের সহিত মিলিত হন। ইহার পর রঘুজী বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করেন।

রঘুজীর বিহারে অবস্থানকালে নবাব সৈন্যগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আফগান সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করায় নবাব জয়লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি প্রথমে রঘুজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু রঘুজী মীর হাবিবের পরামর্শে অসম্মত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে রঘুজী পরাজিত হইয়া প্রবলবেগে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। নবাবের আদেশানুসারে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ রঘুজীকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। এদিকে নবাব নিজে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ কোন কোন স্থান লুণ্ঠন করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাটোয়ার নিকট তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পরাজিত হইয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর কিছুদিন বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রঘুজীর সহিত যুদ্ধে যে সমস্ত আফগান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ প্রধান। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত সৈনিক কর্ম্মচারীদ্বয়কে অবসর প্রদান করেন। কিন্তু ইহারা পরিশেষে ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ হইতে শান্তিলাভ করিয়া নবাব কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এই অবসরে তিনি স্বীয় দৌহিত্র ও প্রিয়পাত্র সিরাজ উদ্দৌলা ও তাহার ভ্রাতা এক্রাম উদ্দৌলার বিবাহ প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি মহাতাবচাঁদের জগৎ শেঠ উপাধির জন্য বাদসাহ দরবারে চেষ্টা করেন, সম্রাট মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। নবাব তাঁহার নিকট মহাতাবচাঁদের জগৎ শেঠ

উপাধির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। সেই সময়ে মহিমাপুরের শেঠদিগের গদীর উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহাদের গদীতে অনবরত ১০ কোটি টাকার কারবার হইত। সমগ্র ভারতে এমন কি সমগ্র পরিজ্ঞাত জগতে তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী আর কেহ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং বাদসাহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বংশের সম্মানীয় উপাধি যে প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য আহম্মদ সাহের রাজত্বের প্রথমবর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহাতাবচাঁদ বাদসাহ দরবার হইতে 'জগৎ শেঠ' উপাধি ও তদুপযোগী খেলাতাদি প্রাপ্ত হন। যদিও মহাতাবচাঁদ জ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি জগৎ শেঠ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি স্বরূপচাঁদ তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ থাকায়, বাদসাহ-দরবার হইতে তিনিও সম্মাননীয় উপাধিলাভ করেন, বাদসাহ তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রচুর ক্ষমতাশালী নবাব হইলেও তাঁহার রাজত্ব ঘোরতর অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আফগান সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলে তাহারা বিহার প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এক ভীষণ বিদ্রোহের সূচনায় প্রবৃত্ত হয়। এদিকে রঘুজীর পুত্র জনজী সসৈন্যে উড়িষ্যা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করেন। নবাব প্রথমে উড়িষ্যা যাত্রা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনে প্রবৃত্ত হন। জনজী নবাবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তাহার পর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই সময়ে শেঠদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। নবাব তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহারা নবাবের এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, নবাব কদাচ তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বঙ্গরাজ্যের সমুদায় জমীদারগণ শেঠদিগের দ্বারা রাজকোষে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের রাজস্বপ্রদানে কোন ত্রুটি উপস্থিত হইলে, তাঁহারা শেঠদিগের শরণাগত হইতেন। শেঠেরা নবাবের নিকট তাঁহাদের জন্য অনুরোধ করিলে নবাব তৎক্ষণাৎ সেই অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এই সময়ে ইংরেজ প্রভু

বৈদেশিক বণিক্‌গণের সহিতও শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহারাও শেঠদিগের দ্বারা নবাব দরবারে আপনাদিগের আবেদনাদি প্রেরণ করিতেন। নবাবের ক্রোধে নিপতিত হইলে, শেঠদিগের দ্বারাই তাঁহারা তাহা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কাশীমবাজারের ইংরেজকুঠীর কর্ম্মচারিগণের সহিত সৈদাবাদ-খেতাখাঁর বাজারের আর্ম্মেনীয় বণিক্‌গণের বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে সম্ভবতঃ ইংরেজগণ দোষী হইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাদিগকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ করেন ও ইংরেজদিগের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন। ইংরেজেরা এরূপ বিপদে পড়িয়া শেঠদিগের শরণাগত হন। শেঠেরা তাঁহাদিগের জন্য নবাব দরবারে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য আপনারা ৩০ হাজার টাকা ও নবাবের জন্য ৪ লক্ষ টাকা নজর প্রার্থনা করেন। ইংরেজেরা অর্থের পরিমাণ অত্যধিক বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি নবাবের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে তাঁহারা আর্ম্মেনীয় বণিক্‌গণের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। যদিও উক্ত বণিক্‌গণ পরিশেষে ইংরেজদিগের অনুনয়বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি নবাব তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাদিগকে শেঠদিগেরই আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা যে অর্থ প্রদানে সহজে অব্যাহতি পাইতেন, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা শেঠদিগের দ্বারা নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া সে যাত্রা কোনরূপে নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে অব্যাহতিলাভ করেন।* উপরোক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে,

* "[CONSULTATIONS, AUGUST 31, 1749.]

The English trades being stopped and the factory at Cossimbazar surrounded with troops by the Nawab owing to the dispute with the Armenians, the English try through the Seets to propitiate him, but his two favourites demand a large sum of money Rs. 30,000 for themselves and 4 lakhs for the Nawab, at last after much negotiation the

সে সময়ে নবাব দরবারে শেঠদিগের ক্ষমতা কতদূর প্রবল ছিল। কেবল তাহা বলিয়া নহে, নবাব রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ আলিবর্দ্দি খাঁর অশান্তিপূর্ণ রাজত্বে তাঁহাকে নানারূপে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়া শেঠগণ তাঁহাদিগকে সুপরামর্শ ও অর্থ সাহায্য দানে সর্ব্বদাই স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য নবাব তাঁহাদের সকল প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। কেবল নবাব দরবারে নহে, বাদসাহ দরবার পর্য্যন্তও শেঠদিগের ক্ষমতা অপরিসীমরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। যদিও প্রথম হইতেই বাদসাহ দরবারে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি ক্রমে ক্রমে তাহা অধিকতররূপেই বিস্তৃত হয়। মাণিকচাঁদ অপেক্ষা ফতেচাঁদ বাদসাহ দরবারে অধিকতর সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনিই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সম্মান মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ সমভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ফতেচাঁদের উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেইজন্য মহাতাবচাঁদ জগৎ শেঠ ও স্বরূপচাঁদ মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই সময়ে শেঠদিগের গদীতে ১০ কোটী টাকার কারবার চলিতেছিল, এই অপরিমিত অর্থের কারবারে জমীদার; মহাজন, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বণিক্-গণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমে এই সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং পরিণামে এই সম্বন্ধের বলেই ইংরেজেরা অনায়াসে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের ন্যায় ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্ম্মেনীয় প্রভৃতি

Armenians expressing themselves satisfied the Nawab becomes reconciled, but the English got off after paying to the Nawab through the Seets 12,00,000 Rupees"—(Selections from the Unpublished Records. J. Long, p. 19)

বণিক্‌গণও জগৎশেঠের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ নবাবের রাজ্যে যাঁহারা অর্থের সম্বন্ধ করিতেন, তাঁহাদিগকেই শেঠদিগের আশ্রয় লইতে হইত। অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্‌গণের সহিত শেঠদিগের সম্বন্ধ হইলেও, ইংরেজেরাই তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ হন। যদিও অনেক সময়ে ইংরেজ ও শেঠদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের অমিল হইত, এবং ইংরেজেরা চতুরতাক্রমে শেঠদিগের কোন কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না, তথাপি নবাব দরবারে তাঁহাদের ক্ষমতা অপরিসীম জানিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। অন্যান্য বণিক্‌গণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেও ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে সকলকে অতিক্রম করিয়া শেঠদিগের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। ক্রমে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আফগান সেনাপতি সমসেরখাঁ ও সর্দ্দার খাঁ পদচ্যুত হইয়াছিল। ইহারা বিহার প্রদেশে গমন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ এই সকল দুর্দ্ধর্ষ আফগানকে নানা প্রকারে বশীভূত করিতে সচেষ্ট হন। কারণ, মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণে বঙ্গরাজ্য উৎপীড়িত হওয়ায় তিনি নব শত্রু সৃষ্টির অভিলাষী হন নাই। যদিও আফগান-গণ জৈনুদ্দীনের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিল, তথাপি তাহারা মনে মনে বিহার প্রদেশ করতলগত করিতে প্রয়াসী হয়। জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিলে তাহারা তথায় উপস্থিত হয়, এবং সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তাঁহার পিতা ও আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ আফগানগণের হস্তে নিপতিত হইয়া যার পর নাই নির্য্যাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আফগানগণ পাটনা অধিকার করিয়া জৈনুদ্দীনের পরিবারবর্গের অবমাননার একশেষ করে। পাটনার অনেক স্থানে তাহারা লুণ্ঠ-নাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের অত্যাচারে পাটনাবাসিগণ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদিগের ধন সম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহাদের শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে দেশমধ্যে

অরাজকতার আবির্ভাব হয়। আফগানগণের অত্যাচারের জন্য সমস্ত বিহার প্রদেশের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত ও বিহার আফগান-দিগের হস্তে পতিত হওয়ায়, নবাব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। তথাপি তিনি সময় নষ্ট না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আফগানদিগের বলবৃদ্ধি অবগত হইয়া জনজী ও মীর হাবিব তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হন। নবাব বিহারে উপস্থিত হইয়া অদম্য বিক্রমে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারাও বিপুল উৎসাহসহকারে নবাবকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করে। মহারাষ্ট্রীয়রাও এই সুযোগে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নবাব তাহাদিগের আক্রমণে মনোনিবেশ না করিয়া আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্যই উদ্যোগী হন। এই ঘোরতর যুদ্ধে আফগান সর্দ্দার সমসের খাঁ নিহত হইলে, আফগানেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। নবাবের আক্রমণে ক্রমে ক্রমে তাহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণও অবশেষে বিহার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। নবাবের হস্তে আফগানগণের পরিবারবর্গ পতিত হইলে তিনি সসম্মানে তাহাদিগকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সাধু কার্য্যের জন্য নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আফগানগণ তাঁহার কন্যা প্রভৃতির যেরূপ অপমাননা করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে তাহাদের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়, কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের হস্তে পতিত হওয়ায় নবাব তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক এইরূপে নবাবের এক প্রবল শত্রু আফগানগণের এইরূপে ধ্বংস-সম্পাদন হয়। কিন্তু তাঁহার প্রধান শত্রু মহারাষ্ট্রীয়গণ তখনও পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্যে উপদ্রব করিতেছিল। নবাব পরিশেষে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

আফগানগণের ধ্বংস সম্পাদন করিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার যেরূপ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, শেঠগণ তাহার যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের শান্তির জন্য নবাবের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেঠগণ যথাসাধ্য নবাবকে সাহায্য করায় নবাব অর্থাভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জগৎশেঠ যাঁহার প্রধান সহায়, তাঁহার অর্থাভাব ঘটিবার সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। ফলতঃ শেঠদিগের দ্বারা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ স্বীয় অশান্তিপরিপূর্ণ রাজত্বে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দেশীয় কামান

বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে বসুন্ধরা কম্পান্বিতকলেবরা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন আর অসি তরবারির ঝঞ্চনা, তীরের শন শন শব্দ বা শাণিত বর্শার বিদ্যুৎ ক্রীড়া নাই। কামানের অভ্রভেদী গর্জ্জনে ও বন্দুকের মৃদুগম্ভীর আরাবে বর্ত্তমান সময়ে রণক্ষেত্র শব্দায়মান হইয়া থাকে। বিজ্ঞান এ জগতে যতই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ততই কামান, বন্দুক, গোলাগুলি ও বারুদের নানাপ্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের মাক্সিম গন্ মার্টিনি রাইফল্‌, দমদম বুলেট, এবং ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ ও রুষ-জাপান যুদ্ধের লংটম কামান ও সিমুজ পাউডার বিজ্ঞানের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছে। বিজ্ঞানের রাজত্ব যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্রের অদ্ভুত লীলা আমরা দেখিতে পাইব।

যদিও বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্রের অপরিসীম উন্নতি সাধিত হইতেছে, তথাপি বহুদিন পূর্ব্বে এই যুদ্ধাস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। তখন বৈজ্ঞানিক যুগ আরম্ভ না হইলেও বিজ্ঞান জগৎসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যের সহকারীরূপে

চিরবিদ্যমান। এক্ষণে তাহার নিজ যুগে সে যে আরও প্রবল হইয়া উঠিবে ইহাতে সংশয় কি। সাধারণতঃ এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, চীনদেশ হইতে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে আগ্নেয়াস্ত্র ও অগ্নিচূর্ণের আবিষ্কার হইয়াছিল। আগ্নেয়াস্ত্র তৎকালে সাধারণতঃ বৃহন্নালিক (কামান) ও ক্ষুদ্রনালিক (বন্দুক) নামে অভিহিত হইত। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার কেবল কৌশলপূর্ণ হওয়ায়, তাহা দেবতা বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ব্যবহার্য্য ছিল না। অসুর ও দুর্নীত লোকগণ তাহার ব্যবহার করিত। এই জন্যই ক্রমে ক্রমে তাহার বিশেষরূপ ব্যবহার ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয়।

তাহার পর মুসল্মান রাজত্বকালে ইউরোপীয়দিগের আগমনের সঙ্গে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্টুগীজগণ এতদ্দেশে আগমন করেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কামান বন্দুকের প্রচলন হয়। পাঠান রাজত্বকাল হইতেই তাহার স্থচনা ঘটে। পরিশেষে মোগল রাজত্বকালে তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হয়। যে সময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে পাঠান-লক্ষ্মী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মোগল রাজলক্ষ্মী আপনার জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির বিকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গলার রণক্ষেত্র অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের শব্দের সহিত কামান বন্দুকের আরাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য, কেদাররায়, কন্দর্পরায় প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়ায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর নিকটে কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, এবং সেই সেই স্থান হইতে ভূমিকর্ষণকালে অদ্যাপি গোলাগুলি পাওয়া যায়। কেদাররায়ের সহিত মানসিংহের সৈন্যের অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। ইহা মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প রায় বন্দুকসন্ধানে তৎপর ছিলেন, ইহা প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্গদেশে তখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন বিশেষরূপেই আরব্ধ হইয়াছিল।

তাহার পর মোগল রাজত্বকালে ক্রমেই ইহার বহুল প্রচার আরব্ধ হয়। বাদসাহ নবাবগণ ইউরোপীয় গোলন্দাজদিগকে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ইহার ব্যবহার-শিক্ষা সৈন্য মধ্যে প্রচলন করেন। তাহার পর কারখানাদি স্থাপিত হইয়া দেশীয় কর্ম্মকারগণের দ্বারা এই সমস্ত অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বাঙ্গলার স্থানে স্থানে দেশীয় কামানের দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত থাকিয়া বাঙ্গলার পূর্ব্ব শিল্প গৌরবের পরিচয় দিতেছে। নবাব মীরকাসেমের সময় এই সমস্ত কামান বন্দুকাদির নির্ম্মাণ বহুল পরিমাণে হইয়াছিল। তিনি মুঙ্গেরে যে কারখানা স্থাপন করিয়া কামান বন্দুকাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এখনও উধ্‌য়ানালার কুঠীতে তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে কয়েকটী বঙ্গদেশে ব্যবহৃত কামানের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

দলমাদল (বা দলমর্দ্দন)—দুইটি প্রসিদ্ধ কামান। বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত ছিল। পেটা লৌহে ইহাদের কলেবর নির্ম্মিত। অদ্যাপি তাহার একটি জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া আছে। কামানটি দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চ মুখের দিকে ছিদ্রের ব্যাসের পরিমাণ ১১½ ইঞ্চ এবং অবশিষ্ট অংশের ব্যাসের পরিমাণ ১১¼ ইঞ্চ। ওজন ৮ টণ বা ১৬ মণ।* কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুরের রাজগণ এই বৃহৎকায় কামান দুইটি দেবানুগ্রহে লাভ করিয়া-

* "An immense piece of iron ordanance is lying in the jungle inside the fort. It is apparently made of sixty-three hoops or short cylinders of wrought iron, welded together and overlying another cylinder also of wrought iron, the whole being well welded and worked together. The indentutions of the hammers and the joining of the hoops are still visible. Its extreme length is 12 feet 5½ inches, diameter of bore 11½ inches at muzzle and 11¼ throughout the remainder of the length. Taking the specific gravity of iron at 7.788 the weight of this gun would be 159 cwts, 49 lbs., or nearly 8 tons. Tradition has it that a Deota (God) gave this and another similar one to a former Rajah. The fellow to it is said to be somewhere at the bottom of one of the lakes. This gun though exposed to all weathers, is still quite free from rust, and has a black and polished outer surface." (Gastrell's Statistical and Geographical Report of the District of Bancoorah, 1863, p. 16.)

ছিলেন। রাজা গোপাল সিংহের সময় মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্তের আক্রমণকালে এই দলমাদলের অগ্নিক্রীড়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন সেই সময়ে তাহাদিগকে চালিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। উক্ত কামানদ্বয়ের মধ্যে একটি জঙ্গল মধ্যে শায়িত অপরটি দীঘির সলিলগর্ভে চিরনিমজ্জিত।

ঢাকাই তোপ—ঢাকার প্রাচীন দুর্গের নিকট পেটা লৌহে নির্ম্মিত এক বিশালকায় কামান শায়িত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গের ভগ্নাবশেষ সহ কামানটী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। রেনেল সাহেব তাহার যে পরিমাণ ও ওজন লইয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কামানটী ২২ ফুট ১০½ ইঞ্চ। মুখের নিকট ব্যাসের পরিমাণ ২ ফুট ১০ ইঞ্চ ছিল, ওজনে ২৮ টন বা ৭৬২ মণ এবং ৪৬৫ পাউণ্ড বা ৫ মন ৩০ সের ওজনের গোলা ব্যবহৃত হইত।* যৎকালে ঢাকায় বাঙ্গলায় রাজধানী স্থাপিত ছিল, তখন মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রব নিবারণের জন্য এই বৃহৎকায় কামান ঢাকাদুর্গে রক্ষিত হইয়াছিল।

জাহানকোষা—পেটা লৌহে নির্ম্মিত এই বৃহৎ কামানটী ঢাকা দুর্গ হইতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল, এবং তাহা তোপখানা নামক স্থানে স্থাপিত হয়। জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী এক্ষণে মুর্শিদাবাদের তোপখানায় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ কর্ত্তৃক ভূতল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। জাহানকোষা দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত হইবে, বেড় ৩ হস্তেরও অধিক, মুখের বেড়টী ১ হস্তের উপর, অগ্নিসংযোগ ছিদ্রের ব্যাস ১৷৷ ইঞ্চ হইবে।

* "Whole length	...	...	...	12 feet	10½ inches
Diameter at the breech	...	...	...	3	3
———4 feet from the muzzle		...	...	2	10
——— the muzzle		...	...	2	2½
——— of the bore		...	...	1	3⅓

The gun contained 234, 413 cubic inches of wrought iron : and consequently weiged 64, 814 pounds avoirdupois ; or about the weight of eleven 32 pounders. Weight of an iron shot for the gun 465 pounds.

(Renell's Memoi'r of a Map of Hindustan, P. 1. Note.)

ইহার গাত্রে নয়খণ্ড পিত্তল ফলক আছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাহাজাহানের রাজত্বকালে ও ইসলাম খাঁর সুবেদারী সময় জাহাঙ্গীরনগরে দারোগা সের মহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিজরী ১১ই জমাদিয়স্ সানি মাসে নির্ম্মিত হইল।* জাহানকোষা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে আনীত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আসামী তোপ—এই তোপটী এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটীর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাতে স্বর্গদেব জয়ধ্বজ সিংহের নাম খোদিত আছে। জয়ধ্বজ সিংহ আসামের আহমবংশীয় নরপতি ছিলেন। মীরজুম্লার আসাম আক্রমণকালে তিনি তাঁহাকে বাধা প্রদান করায় মীরজুম্লার সৈন্য পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে উক্ত কামান মোগলদিগের নিকট হইতে অধিকৃত হয়, কামানের গাত্রে খোদিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরে আরাকানীরা আসাম হইতে উক্ত কামান লইয়া যায়। প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধের পর ১৮৩৮ খৃঃঅব্দ ইংরেজেরা উহা আনয়ন করেন। †

* পিত্তল ফলকের ফার্সির যে অনুবাদ Major Showers এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে ১৮৪৭ সালের জুন মাসে প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

	Ft.	Incl
"Extreme length	17	8
Depth of bore	15	3
From muzzle to 1st. trunnion	5	0
Space between the 2nd trunnions ...	5	0
From 2nd. trunnion to the breech ...	5	0
Diameter of muzzle	1	9½
Do of Bore	0	6

The Gun Jahan Koosha was constructed at Jahngeernuggur, otherwise called Dhaka, during the Darogaship of Sher Mahammad, and when Hur Bulluah Das was Mushrif (Inspector), and Junar Jun chief Blacksmith in the month of Jumadee-oos-Sunee, in the year 11 corresponding to the year 1047. Weight 212 maunds, the measure 36 dams till sumare, charge of powder 28 seers" (p. 589 & 592)

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (1893).

মুলক ময়দান—ইহাও একটি সুবিশাল কামান! ফরুখ্‌ সেরের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। ফরুখ্‌সের যৎকালে দিল্লীর সিংহাসনের প্রার্থী হইয়া রাজমহল হইতে যাত্রা করেন, সেই সময়ে মুলুক ময়দান শকরী গলির নিকট বসিয়া যায়। আক্রিসিয়ার খাঁ নামক একজন মহাবল পরাক্রান্ত বীর তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া মুসল্‌মান লেখকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।*

নদীয়া তোপ—মুর্শিদাবাদ নিজামতের শেলাখানায় অবস্থিত। এই কামানটির আকার ক্ষুদ্র। দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট হইবে, পিত্তলনির্ম্মিত। একখানি শকটের উপর অবস্থিত, ইহার অগ্রভাগে একটি কুম্ভীরের চোয়ালবিশিষ্ট লম্বকর্ণ মনুষ্য মুখ সংযুক্ত আছে। তোপটিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম খোদিত আছে। তোপটি কিশোর দাস কর্ম্মকারের নির্ম্মিত ও রূপরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খোদিত।† বেভারিজ সাহেব বলেন যে, কলিকাতার কোন গবর্ণর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উক্ত তোপটি প্রদান করিয়াছিলেন। পলাসীর যুদ্ধের পর তাহা মুর্শিদাবাদে নীত হয়: কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিজের আদশে তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। পরে তিনি নবাবকে উপহার প্রদান করিতেও পারেন।

* তারিখি বাঙ্গলা।

† নদীয়া তোপের গাত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

জয়

কালিকা

য ওঁ	তৎসৎ
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ	শ্রীযুক্ত
চন্দ্র রায়	রূপ রা
মহারাজা	ম চট্টো
মহাশয়	পাধ্যায়
শ্রীরাজ	মুদ্রাঙ্কিত

কিশোর দাস কর্ম্মকার॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "শ্রীরাজের" স্থলে "ধীরাজ" পড়িতে চাহেন।

উপরোক্ত তোপগুলি হইতে সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হইলে তাহা দেশীয় কর্ম্মকারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের বঙ্গদেশেই তাহার ঐ সমস্ত নিদর্শন রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ।

—*—

হে শোভনা ! ভারতের বিলাসী রূপসী !
লক্ষ্ণৌ ! এ মর্ত্ত্যে ছিলে অলকার সম !
আজি ম্লান—আভাহারা রূপপূর্ণ শশী,
নাহি সে উজ্জ্বল কান্তি—শোভা নিরূপম !
হরি তব রূপজ্যোতিঃ সন্ধ্যার আঁধার !
ঢেলেছে কালিমা রাশি—সৌন্দর্য্য নাশিয়া ;
কোথা সে প্রমোদকুঞ্জে সঙ্গীত ঝঙ্কার ?
রত্নোজ্জ্বল-দীপাবলী গিয়াছে নিভিয়া।
নীরব সে নাট্যশালা—আনন্দলহরী,
বিচিত্র উদ্যানে কোথা মধুকণ্ঠ রব !
কোথা সে বরাঙ্গী-বৃন্দ যারা প্রাণভরি'
নিয়ত জাগাত হেথা বসন্ত উৎসব !
বিলাস-মদির-স্রোত রোধে কে কোথায় ?
লক্ষ্ণৌ ! কোথা বা তুমি ? বিশ্ব ভেসে যায় !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম

সহযোগী চিত্র।

-০*০

বঙ্গীয়।

ফাল্গুনের ভারতীতে মহর্ষির লোকান্তর গমন একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশালীর শেষ অংশও গবেষণাপূর্ণ। খোজা জাতির ইতিহাস ও ফকীর খয়ের উদ্দীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।

ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে রাজা রামমোহন রায় একটী চিন্তাশীল সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। রামায়ণের রচনাকালে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফাল্গুনের প্রবাসীতে অক্ষয়কুমার দত্ত একটি সুন্দর চিন্তাশীল প্রবন্ধ। কচ্ছপ্রদেশ প্রবন্ধে কচ্ছপ্রদেশের অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

ফাল্গুনের বীরভূমিতে সীতারামের মামুদপুর, ঐতিহাসিক কথা, রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ তিনটিতে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজী।

এপ্রিল মাসের East and West পত্রে Mr. U. B. Nair লিখিত Wellington and the Pyche Rajah একটি গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। Dr. A. H. Keaneএর লিখিত Race and Speech প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

এপ্রিল মাসের Calcutta Reviewএতে E.H. Whinfieldএর লিখিত Was Sufism influenced by Buddhism একটি চিন্তাশীল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। S. Mitra লিখিত Peary Chand Mitra প্রবন্ধটিও সুখপাঠ্য ও অনেক তথ্যে পূর্ণ।

চান্দেরি রাজ্য।

(২)

মাধকর সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সাহ অর্চার রাজা ছিলেন কিন্তু ১৬০৪ (১) সালে তাঁহার ভ্রাতা বীর সিংহ দেব, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইহার পরও রাম সাহ সিংহাসন নিজ অধিকারে রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অবশেষে বন্দীকৃত হইয়া ১৬০৫ সালে আবদুল্লা কর্ত্তৃক সম্রাটসদনে নীত হন। সম্রাটদরবারে তিনি সম্মান ও সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হইলেও, ভাবী গোলযোগ প্রশমনের নিমিত্ত সম্রাট তাঁহাকে বন্দী prisoner করিয়া দিল্লীতে রাখেন। বীরসিংহ দেব ইত্যবসরে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধীশ্বর হন। রাম সাহের অনুপস্থিতকালে তদীয় পৌত্র ভরত সাহ ও তাহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয় ও পাথেরি অধিকার করিয়া বসে। বহু দিবস সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বীরসিংহ তাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ভরতসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া অচিরকালমধ্যে ধামোনি গ্রাস করেন। ১৬০৮ সালে সম্রাট রাম সাহকে মুক্তি দেন এবং বার ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাম সাহবারে রাজধানী স্থাপন করতঃ আত্মীয় স্বজনকে তথায় আহ্বান করেন। তাঁহার এগারোটি পুত্র ও সাতটি পৌত্র ছিল। পুত্রগণের নাম (১) সংগ্রাম সাহ, (২) হরিদাস, (৩) বিথুল দাস, (৪) মোহন রাও, (৫) ত্রিভুবন রাও, (৬) সুজন রাও, (৭) ভোরাত রাও, (৮) মুকত মান, (৯) বলভদ্র, (১০) মুকুন্দ, এবং (১১) কানোয়ারজু। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম সাহ বহুপূর্ব্বে অর্চাতে এক যুদ্ধে নিহত হন। অবশিষ্ট দশ

পুত্র এবং সংগ্রাম সাহের সাত পুত্র বারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সংগ্রাম সাহের পুত্রগণ,—(১) ভরত সাহ, (২) কৃষ্ণ রাও, (৩) রূবা, (৪) কিরাত, (৫) ধারু, (৬) চন্দ্রহাস এবং (৭) মন। এত বড় একটী রাজপরিবার তিন লক্ষ টাকা আয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ১৬১২ সালে রাম সাহের মৃত্যু হইলে পৌত্র ভরত সাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬১৬ সালে তিনি ডেকানের নৃপতি নিয়োজিত চান্দেরির শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি সম্রাটের সেনাপতির সহিত ডেকানের পথে সাক্ষাৎ করিয়া চান্দেরি আক্রমণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। শাজাহান তৎপ্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬১৮ সালে ভরত সাহ স্বরাজ্য চারি অংশে বিভক্ত ও বর্ত্তমান তলবিহাট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুধাই (১) হরষপুর, গোলাকোট (২) এবং কনঘর (৩) উক্ত অংশ চতুষ্টয়। এই সময় তাঁহার রাজ্যের আয় নয় লক্ষ টাকা হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃগণকে এইরূপ অংশ প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—বন্সির (৪) কতিপয় গ্রাম কৃষ্ণ রাওকে প্রদান করেন, ইহার আয় ৭৫০০০ হাজার টাকা। তিনিই তথাকার বর্ত্তমান দুর্গ এবং ললিতপুর সহরে বর্ত্তমান সময়ে মিউনিসিপালিটির স্কুল কর্ত্তৃক অধিকৃত সুন্দরকুপ (৫) সহ রাওর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দেওয়ান রূপকে বীজবোথা পরগণায় (৬) বার হাজার টাকা আয়ের গ্রাম ; দেওয়ান কিরাতকে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা আয়ের কাকারুয়া (৭) চন্দ্রহাসকে বারো হাজার টাকার জমানদনা (৮) দেওয়ান ধারুকে ঐ পরিমাণ আয়ের কারেসূরা (৯) জায়গীর এবং দেওয়ান মনকে বারো হাজার টাকা আয়ের বড়োদা (১০) প্রদান করেন।

(১) এখানে দুই এক বৎসর সময়ের গোলযোগ আছে।

(১) ঝান্সি জেলায় বলারেহাত পরগণায়, ললিতপুরের ১৯ মাইল দক্ষিণে। তথায় চান্দেলদিগের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি এবং একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। (For description see Mukerjee's Reports on the Antiquities of Lalitpur and Cunningham's Archæological Reports). (২) গোয়ালিয়ারস্থ ইছ ঘরের পূর্ব্বভাগের একটী পুরাতন

ভরত সাহের পর দেবী সিংহ ষোড়শ বর্ষ বয়সে (১) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক দিকে যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা অপরদিকে তেমনি জ্যোতিষ, চিকিৎসা, সাহিত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ১৬৬৫ সালে তিনি সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিতে কাবুল যাত্রা করেন, তথায় তিনি ১৫০০ শত অশ্বারোহী এবং তাঁহার দেওয়ান উদিবনকে (২) জন্মের মত রাখিয়া আসেন। বিজয় লক্ষ্মী কিন্তু পরিশেষে সম্রাটেরই অঙ্কগত হয়। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া দেবী সিংহকে বুন্দেলখণ্ডের গারোলা, খেমলাসা, রাহতঘর, এটোয়া, বাসোদা, উদি-পুর, বারসিয়া, ভাল্‌সা, সিরোঞ্জ এবং মালথোন (৩) পরগণা দান করেন। এই সকল দিয়া চান্দেরি রাজ্যের আয় ২৪০০০০০ টাকা হইয়াছিল।

১৬৭৯ সালে দেবীসিংহ বঙ্গদেশে (৪) যুদ্ধ করিয়া সকলকাম হন। তিনি সিংহ সাগর হ্রদ এবং সিংহপুর গ্রাম নির্ম্মাণ করেন। এই জলাশয় ও গ্রামটী চান্দেরির নিকটবর্ত্তী এবং এখনো বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দেবীসিংহ তেলবেহাতে সিংহবান প্রস্তত করেন, এখন তাহার অন্তিম দশা। ১৭১৭ সালে ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি সংসাররঙ্গ মঞ্চের অভিনয় শেষ করিয়া প্রস্থান করেন। সাহজু, সেনাপতি এবং দুর্গসিংহ—তাঁহার এই তিন

মরুপ্রায় দুর্গ। (৩) গোয়ালিয়ারে বেতোয়ারধারে। (৪) ঝান্সি জেলায়, বন্সি পরগণায়, ললিত-পুরের বারো মাইল উত্তরে। (৫) ইহার উপর ১৬২৮ খৃটাব্দের একখানি প্রস্তর ফলক আছে। (৬) তালবেহত পরগণায় (ঝান্সি জেলায়) একটী প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম, ললিতপুরের ১৯ মাইল উত্তরে। বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত আছে। (৭) ললিতপুর পরগণায়। (৮) জমানদনা কালান—ললিতপুর পরগণায়। এখন তাঁহার বংশধরগণের অধিকারে আছে। (৯) কারে সরা কালান—ঐ পরগণান্তর্গত। তাঁহার বংশধরগণের অধীনে এখন আছে। (১০) বড়োদা ডঙ্গ—বনপুর পরগণায়।

(১) ১৬৪৬ সাল।

(২) দেওয়ান বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ।

(৩) মনর জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ।

গারেলা, খেমলানা, এটোয়া এবং মালযোন বর্ত্তমান সময়ে মনর জেলার খোরাই তহসীলে। রহতঘর ঐ জেলার মনর তহসীলে। বাসোদা এবং উদিপুর—বীণার দক্ষিণে। বাসো L. m. রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। বার গিয়া ভুপালের পশ্চিমাংশ।

(৪) সম্রাটের আদেশে।

পুত্র ছিল। উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইবার মানসে তাঁহারা সকলেই দিল্লীতে গমন করেন। তৎকালীন রাজঅভিভাবক পুরহিত বান্নু বলেন যে, সাহাজু, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহা বিশ্বাস না করিয়া ভূতপূর্ব্ব নরপতির সেনাপতি রামগোমত ও রাওহাদাকে আহ্বান করতঃ যথার্থ উত্তরাধিকারী কে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা তদুত্তরে বলে যে, সাহাজু জারজ পুত্র (illegitimate son), সেনাপতি পৌত্র, মৃত রাজা ইহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; দুর্গসিংহই কেবল রাণীর গর্ভজাত সন্তান। তদনুসারে সম্রাট দুর্গকেই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। তিনি সাহাজুকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করতঃ কানজিয়া পরগণা (১) এবং সেনাপতিকে বার হাজার টাকা আয়ের ভালঘর (২) ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ প্রদান করেন কিন্তু দুর্গাসিংহকে তাহাদের উভয়েরই অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এই বণ্টন সময়ে ঔরঙ্গজেব নিজের জন্য বারসিয়া রাখেন এবং যে বীর মারঠাদিগের হস্ত হইতে মালোয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই দস্ত মহম্মদকে উহার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ইনিই পরে ভুপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭২৮ সালে রাজা দুর্গাসিংহ বঘা বানজরাকে (৩) পরাজিত এবং ১৭৩২ সালে শঙ্কর রাও দাক্ষিণাত্য হইতে দশ হাজার অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে চান্দেরি আক্রমণ করিতে আগমন করিলে সিংহপুরের গিরিবর্ত্মে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করতঃ তাঁহার শিবিরাদি লুণ্ঠন করেন।

(১) ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ারের অংশ স্বরূপ ছিল, পরে চান্দেরি অন্যান্য রাজ্যের সহিত পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান সময়ে ইহা খোরাই বঙ্গেলের উত্তর পশ্চিম কোণাংশ হইয়াছে।

(২) খোরাই তহসীলে (ঝান্সি জেলায়), খোরাই হইতে ২০ মাইল।

(৩) এতৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, বাঁকানিরের নিকটবর্ত্তী আশানগরে রাজা সর্প দষ্ট হন। জ্যোতি নামক একজন জৈন গুরু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি তাঁহার প্রজাগণ সহ জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে তিনি আরোগ্য করিয়া দেন। রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে জ্যোতি তাঁহাকে নিরাময় করেন। রাজার অধিকাংশ প্রজা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করে এবং পুনরায় এবপ্রকার বিপৎপাতের আশঙ্কা করিবা তাহারা কোন স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। এমতে তাহারা বনজরা হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বঘা। শুনা যায় তাহার দ্বিসহস্র সশস্ত্র অনুচর এবং এক সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।

দুর্গাসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার পুত্র দুর্জ্জন সিংহ ১৭৩৩ (১) শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় সগর জেলার গোবিন্দ কুন্দলা (২) গারোলা মলথোস, খেমলাসা এবং রহতঘর আক্রমণ করে। ১৭৩৫ সালে মালহর রাও ১০০,০০০ সৈন্যসহ বুন্দেলখণ্ড অবরোধ করেন এবং দুর্জ্জন সিংহকে পরাজিত করিয়া ভীল্‌সা, শিরোঞ্জ, উদিপুর এবং বাঁসোড়া স্বরাজ্যভুক্ত করতঃ প্রান্ত সীমায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নামানুযায়ী উহার মালহর ঘর (৩) নামকরণ করেন।

দুর্জ্জন সিংহের চারিপুত্র,—(১) মানসিংহ, (২) জারোয়ান সিংহ, (৩) কুবা সাহেব এবং (৪) ধীরাজ সিংহ। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মানসিংহ পিতৃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার রাজত্বকালে (৩) পণ্ডিত নরু শঙ্কর দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মুঙ্গাগুলি, সাহারাই, পিপ্রাই, (৪) কানজিয়া এবং ইছাঘর প্রভৃতি প্রায় অর্দ্ধেক দেশ অধিকার করিয়া বসেন। মানসিংহ, ভ্রাতা জারোয়ালকে পালী (৫) সুবা সাহেবকে বামোরি, (৬) এবং ধীরাজ সিংহকে বাণপুর (৭) প্রদান করেন। অনুরুদ্ধ সিংহ এবং হাতী সিংহ—তাঁহার এই দুই পুত্র ছিল।

বানজরা যে রাজ্যে পরে বাসস্থান স্থির করে, তাহার অধিপতিকে খাজানাদিতে কিন্তু বখা ও তাহার অনুচর বৃন্দ তাহাতে সম্মত হয় না। সম্রাট সৈন্য বহুতর তাহাদিগকে আক্রমণ করে কিন্তু এযাবতকাল পর্য্যন্ত তাহারা অপরাজিত ছিল। বখা সম্বন্ধে বহুতর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একটী প্রবাদ এই যে ললিতপুর ও Ozhhar দ্বাদশ খানি গ্রাম বখার হত্যাকারীর পুরস্কারের নমিত্ত অনুমোদিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল।

(১) চান্দেরির রাজগণের সিংহাসন আরোহণের তারিখ যদৃষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত গেজেটিয়ার প্রদত্ত (P'350 ct. seg) তারিখের মিল নাই। যথা,—

রাজার নাম	গ্রন্থকারের মতে	গেজেটিয়ারের মতে
দেবীসিংহ	১৭১৭	১৬৪৬—১৬৬৩
দুর্গাসিংহ	১৭১৭—১৭৩৩	১৬৬৩—১৬৮৭
দুর্জ্জন সিংহ	১৭৩৩—	১৬৮৭—১৭৩৩
মানসিংহ	—১৭৬০	১৭৩৩—১৭৪৬
অনুরুদ্ধ সিংহ	১৭৬০—১৭৭৪	১৭৪৬—১৭৭৪

(২) গোবিন্দ পণ্ডিত নামে সমধিক পরিচিত। ছত্তর শাল যখন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হন, তখন এই মারাঠা অধিনায়ক তাহাকে সাহায্য করেন। উপকারের প্রত্যুপকার

মানসিংহ মাহরোনি (১) দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; ১৭৬০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অনুরুদ্ধ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাও হাতীসিংহ জ্যেষ্ঠের সহকারী স্বরূপ কার্য্য করিতেন। ১৭৭৫ সালে অনুরুদ্ধ রামচন্দ্র নামক একটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিলে, হাতী সিংহ তাহাকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া রাজঅভিভাবক স্বরূপ নিজেই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাণী, দেবরের অভিপ্রায়ে সন্দেহ করতঃ গোপনে ৫০জন বিশ্বস্ত অনুচর সহ পুত্রকে লইয়া অচলঘরে পলায়নপরা হন এবং তথায় চৌধুরী কিরাত সিংহের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৌধুরী তৎক্ষণাৎ জাথ্লোনকে পত্র লিখেন, দেওয়ান ধর্ম্মঙ্গদ সিংহ ৫০০ জন সেনা সহ অচলঘরে উপনীত হন। নিজের সৈন্য ব্যতীত তিনি জমিদারদিগের মধ্য হইতে ৫০ জন অশ্বরোহী এবং চৌধুরীর সিপাহীগণ মধ্য হইতে ১০০ জন সিপাহী সংগ্রহ করতঃ ১০০ জন অশ্বারোহী এবং ছয় শত পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে চান্দেরি গমন করেন এবং হাতী সম্মুখে রামচন্দ্রকে উপস্থিত করান। কিরাত সিংহ রাজপ্রতিনিধি এবং ধর্ম্মঙ্গদ প্রধান সেনাপতি হন। অতঃপর হাতীসিংহ তালবেহাতের দুর্গে যাইয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। রামচন্দ্রের সৈন্যও অবিলম্বে তথায় যাইয়া উপনীত হইল, কয়েক মাসের জন্য রণবাদ্যবাজিয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানে বিজয়লক্ষ্মী বালক রাম-

স্বরূপ ছত্তরশাল তাঁহাকে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। জালাউন, ঝান্সি প্রভৃতি রাজগণের পুর্ব্বপুরুষ।

(৩) গোয়ালিয়রে, সগর জেলার পশ্চিমভাগে বেত্তোয়া তীরে।

(৪) সম্ভবতঃ ১৭৪৮ সালে।

(৫) সাহারাই ও পিপ্রাই দুইই গোয়ালিয়ারের সগর জেলার উত্তরপশ্চিম স্থিত মঙ্গোলিয়ার নিকটবর্ত্তী।

(৬) বলাবেহাত পরগণায় (ঝান্সি জেলায়), ললিতপুরের ১৫ মাইল দক্ষিণে। তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক এখনও ইহা অধিকৃত।

(৭) বামোরাই কালান—ললিতপুর পরগণায়। তাঁহার বংশধরগণ এই গ্রামের অধিকার হারাইয়াছে।

(৮) ললিতপুরের ২২ মাইল পুর্ব্বে ঐ নামের পরগণামধ্যে (ঝান্সি জেলায়)। তাঁহার বংশধরগণের ইহাতে এখন অধিকার নাই।

(১) ঝান্সি জেলায়, ঐ নামের তহশীলের প্রধান স্থান। ললিতপুরের ২৩ মাইল পুর্ব্বে।

চন্দ্রেরই পক্ষপাতী হইল, তিনি পিতৃব্যকে মাসোরা (২) সহিত ষোলখানি গ্রাম প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ সালে রামচন্দ্র দৃঢ়রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৭৮৩ সালে তিনি হাতীসিংহ এবং অপর এক ব্রাহ্মণকে বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। কিয়দ্দিবস পর তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তিনি প্রায়শ্চিত্ত ও করিবার নিমিত্ত ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হইল না। অবশেষে তিনি অযোধ্যায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল গোপনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে দেবপালোয়ার নামক তাহার এক আত্মীয় রাজস্ব আদায় করতঃ কিছু কিছু করিয়া অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিত।

(১) ইতোমধ্যে অড সাহেব চন্দেরি বিজয়ের মানসে সগর হইতে খোরু পান্তের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বুন্দেলাদিগের মধ্যে রাজ-ওয়ারায় (২) রাও উমারাও সিংহ দুই হাজার সৈন্য, জাখ্‌লোনের দেওয়ান চিওর সিংহ দেড় হাজার অচল ঘরের চৌধুরী এক হাজার এবং দুর্জ্জন শাল খিচি পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া মারাঠাদিগের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ললিতপুরে উভয় পক্ষ মিলিত হয়। ললিতপুর এবং পানরির (৩) মধ্যভাগে সমস্ত দিন ধরিয়া রণদামামা বাজিল, চিওর সিংহের পাঁচশত সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি নিজেও আহত হন। যুদ্ধের মীমাংসা না হইতেই উভয় পক্ষ নিবৃত্ত হন।

রাজা রামচন্দ্রের চারি পুত্র ছিল,—পারজোপাল, মার পাহলদ, বয়ান পাল এবং চিত্তর সিংহ। ১৮০২ সালে তিনি পারজোপালকে রাজা মনোনীত করিয়া অযোধ্যা হইতে চান্দেরিতে প্রেরণ করেন। ইনি সমস্ত বুন্দেলদিগকে পরাজিত করেন কিন্তু রাজোয়ারা যুদ্ধে (৪) নিহত হন। মার পাহালদ তৎপরে

(২) মাসোরা খুর্দ্দ—ললিতপুর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে।

(১) ১৭৮৭ সন।
(২) ললিতপুর হইতে তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বে।
(৩) ললিতপুরের দুই মাইল উত্তর পূর্ব্বস্থিত একটী গ্রাম।
(৪) গেজেটিয়ারে প্রকাশ, পরজোপাল নিহত হন কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর, শিল্লাবর্ত্ত সাহেবকে

সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার সময় সিন্ধিয়ার জিয়ান ক্যাপটি ফিনসি নামক একজন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ১৮১১ সালে চান্দেরি আক্রমণ করে। চান্দেরি যাইবার পথে তিনি জিওরা (৫), বন্‌সি, কোতারা (৬), নানোরা (৭), বারেয়ার (৮), রাজোয়াবা, মাহরাণী, জাখলোন, দিওঘর প্রভৃতির জায়গীরদারদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজধানীতে উপনীত হন। রাজা পাহলদ পলায়নপর হন। কিন্তু তাহার ভ্রাতৃদ্বয়, দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং কানোয়ার উমরাও সিংহ এবং জাখলোনের জায়গীরদার সহ তিনমাস দুর্গ রক্ষা করেন। অবশেষে শিনগোর (৯) এক ঠাকুরের প্রতারণায় উহা বিপক্ষীয়দের হস্তগত হয়। তৎপর তালবেহাত আক্রান্ত হয়, তিন মাস অবরোধের পর উহাও শক্রর করায়ত্ত হয়। ১৮১২ সালে সিন্ধিয়া-সেনাপতি ৩১ খানি গ্রাম (১) রাজাকে প্রদান করেন কিন্তু চান্দেরির অবশিষ্টাংশ নিজ অধিকারেই রাখেন। ঐ বৎসর সমস্ত বুন্দেলগণ রাজার সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধিয়ার প্রাধান্য উৎপাটিত করিবার কল্পনা করে এবং সিন্ধিয়া তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেছে অই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র উকীল দ্বারা বান্দার গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের নিকট প্রেরণ করে। উভয়পক্ষের মিলন সংঘটিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত গোয়ালিয়ার হইতে কর্ণেল ফিলোস এবং বান্দা হইতে মীর মুন্সি আগমন করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যাহার বাৎসরিক আয় ১৬৫৬৩১ টাকা, রাজা মার পহ্লাদের থাকিবে, এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হইবে। সেইদিন হইতে পহ্লাদ 'বাণপুরের রাজা' নামে

বলিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে এই যুদ্ধের হতাবশিষ্টদিগের মুখে শুনিয়াছেন যে, পরজোপাল যুদ্ধে আহত হইয়া ১৫।২৯ দিন যন্ত্রনা ভোগ করতঃ ললিতপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তথায় তাঁহার সম্মানের নিমিত্ত দুইটী মুকবারা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (৫) তালবেহাত্ত পরগণায়। (৬) ললিতপুরের ২১ মাইল উত্তরে। (৭) বেতোয়া তীরে, ললিতপুরের ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। (৮) ললিতপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে। (৯) ললিতপুরের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ঠাকুরের নাম—বুদ্ধশিব। গেজেটিয়ারে চান্দোরি লিখিত হইয়াছে তাহা ভুল (I. 352) গ্রন্থকার বলেন, তিনি বাল্যকালে বুদ্ধকে দেখিয়াছেন।

(১) এতন্মধ্যে প্রধান,—কেলগাওন, ললিতপুরের ২৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে।

অভিহিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র মরদান্ সিংহ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিপাহী হাঙ্গসার সময় বিদ্রোহাদলভুক্ত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয় কেবল নিজে বাৎসরিক ৯৬০০ টাকার পেন্সন প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পৌত্র নীরউই সিংহ পাঁচ শত টাকা মাসিক পেনসনের দ্বারা দাতিয়াতে কালাতিপাত করিতেছেন।

রাজা রামসাহের পুত্র সংগ্রাম সাহের সাতপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কৃষ্ণ রাওএর রাজত্ব বিবৃত হইয়াছে। ১৬১২ সালে মহারাজা রামসাহ বারে পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র ভরত সাহ সিংহাসনারূঢ় হন। কৃষ্ণরাও প্রথম রাণীর গর্ভজাত সন্তান কিন্তু বৈমাত্র ভ্রাতারা কনিষ্ঠ হওয়ায় সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যই তিনি রাজার সাহায্যকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভরত সাহের হস্তে চান্দেরি পতিত হইবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণ-মধ্যে 'হক' (স্বত্ব সম্পত্তি) বিতরণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণরাও হক গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া রাজস্ব আদায়ের অছিলায় ললিতপুরে গমন করেন; তথা হইতে তিনি সাজাহানের নিকট প্রতিনিধি দ্বারা প্রার্থনা করিয়া পাঠান যে, রাণীর প্রথমপুত্র বলিয়া তিনি যে হকের স্বত্বাধিকারী তাহা তাহাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। সম্রাট, ভারত সাহকে এক-অষ্টমাংশ রাজ্য কৃষ্ণরাওকে দিতে আদেশ করেন। রাজা তদনুসারে ললিতপুরের উদ্যান এবং রাওর সহ বানৃশিতে ৭৫০০০ হাজার টাকার জায়গীর তাঁহাকে প্রদান করেন। ভরতসাহের দশজন খুল্লতাত এবং চারিজন ভ্রাতা, যাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক্ অংশীদার হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণরাওের অধীন হইলেন। এই সময় হইতে কৃষ্ণরাওের বংশধরগণ বংশি-ওয়ালা' নামে পরিচিত হয়। উহারা দরবারে দক্ষিণদিকে স্থান পাইতেন, এবং রাজাকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণরাও বংশিতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ এবং রাওয়ে একটী কূপ খনন করেন, এখন যেখানে ললিতপুরে মিউনিসিপাল স্কুল। তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—বিষণ রাও, উদিবণ এবং দলীপ নারায়ণ। ১৬৪৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষণরাও পিতৃস্থান অধিকার করে। দিল্লীর সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া উদীবন, চান্দেরির রাজা

দেবীসিংহের সহিত কাবুলে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তথায় তিনি পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর সহিত চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁহার পুত্র মুকুন্দ সিংকে দেওয়ান উপাধিতে ভূষিত করিয়া দুই খানি তরবারি ও একটী অশ্বতর সহ ইটোয়া (১) পরগণায় ৫৮ খানি গ্রাম দান করেন। পিতামহ কৃষ্ণরাওের নিকট হইতে প্রাপ্ত জায়গীর হইতে এই জায়গীয় মুকুন্দ পৃথক করিয়া রাখেন। বিষণরাও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার 'হক' কাড়িয়া লন। মুকুন্দ সিংহ মহারাজা দেবী সিংহের নিকট আবেদন করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হয় যে, প্রার্থনাকারী উক্ত জায়গীর হইতে ৭২০০০ হাজার জায়বীর পাইবেন। (২)

দেওয়ান মুকুন্দ সিংহের দুই পুত্র ছিল,—দল সিংহ এবং নারায়ণজীব। প্রথমোক্তকে তিনি ইটোয়া পরগণা এবং শেষোক্তকে বংশির গ্রাম সমূহ দান করেন। এই বণ্টন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি দিল্লীগমন করেন, তথা হইতে শুভারামের অধিনায়কত্বে সম্রাটসৈন্যের সহিত খান্দাহারে গমন করেন, তথায় ১৭৬০ সালে তিনি নিহত হন। মহারাজা দেবী সিংহ, দানসিংহ ও নারায়ণজীকে দেওয়ান উপাধিতে ভুষিত করিয়া ইটোয়া এবং মাতিয়ার জায়গীরদার স্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৩৫ সালে মলহর রাও হোলকার দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া দানসিংহকে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র ইটোয়া পরিত্যাগ করতঃ দাতিয়াতে প্রস্থান করে। ১৭৩৪ সালে সম্রাট সেনাপতি আবুল ফজল চান্দেরি অবরোধ করায় দাতিয়াতে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে নারায়ণজীরএবং অপর পক্ষের তিনশত সিপাহী মানবলীলা সম্বরণ করে। তাহার পর তৎপুত্র ধর্ম্মঙ্গদ সিংহাসনারূঢ় হন। ইঁহার ছয় পুত্র ছিল, বক্তসিংহ, উমরাও সিংহ, চিত্তর সিংহ, উদির জিত, নৃপৎ সিংহ এবং রাজগীর।

(১) বর্ত্তমান সময়ে সগর জেলায়খোরাই তহশীলের অংশ।

(২) ললিতপুর মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিমে। জাখোলন দ্বিতীয় এবং দাতিয়ার চতুর্দ্দিকে এই দকল গ্রাম অবস্থিত।

ধর্ম্মাঙ্গদ সিংহ জায়গীরের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন করেন এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনমানসে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি জীবিতাবস্থায় জায়গীরের সমুদয় কার্য্যভার চিত্তর সিংহ ও বক্ত সিংহের হস্তে হস্তে ন্যস্ত এবং জাখলোনে রাজধানী মনোনীত করেন। তিনি এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করতঃ দুই তিনটী অনুচর সহ সিদ্ধ গুহে (১) গমন করেন এবং পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ।ইহার অত্যল্পকাল পরে (১৭৯৪ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্রগণ নিজদের মধ্যে জায়গীর বিভাগ করিয়া লন। চিত্তর সিংহ এবং উদয়জিৎ সিংহ ১৲ অংশ এবং দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ ১ অংশ প্রাপ্ত হন। দেওয়ান বক্ত সিংহ নানোরাতে, এবং কানোয়ারে ও উমরাও এবং উদয়জিৎ বড়োদাতে (২) দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ইহাদের এখন জীর্ণাবস্থা। চিত্তর সিংহ জাপরাতে (৩) এক দুর্গ নির্ম্মাণ এবং জাখনলে একটী গণেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও রণকুশল ছিলেন। ১৭৮৫ সালে পেশোয়াদিগের হস্ত হইতে তিনি সাহরাই (৪) ইছাঘর, সারাই চাচোনারা (৫) প্রভৃতি বারটি পরগণা স্ববশে আনয়ন করেন। এই দ্বাদশ পরগণার বাসরিক আয় সাত লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না। পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী এবং দেড় সহস্র সিপাহী নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত। পান্না, দাড়িয়া, ধোলপুর, বজ্রনার (১) প্রভৃতির নৃপতিবৃন্দ বহুবার তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হন। তিনিই ১৭৮৪ সালে সগরের মেরু পান্থের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া চান্দেরি রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৭ সালে উদয়জিৎ এবং ১৮০৮ সালে চিত্তর সিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার

(১) দিওথর দুর্গের নীচের এক পর্ব্বতের একটী গুহা ইহার গাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে ১৩৪৫ সম্বতে (১২৮৮ খৃষ্টাব্দে) সোহানপানের কুকার অধিকারের কথা খোদিত আছে।

(৩) বড়োদা স্বামী, নাতোবার ৩ মাইল পূর্ব্বে। কানোয়ার উমরাও সিংহের বংশধরগণ কর্ত্তৃক এখনো অধিকৃত।

(৪) গোয়ালিয়রে নইসরাইতে গুণর ২৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।

(৫) গোয়ালিয়রে, গুণার ৩৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম।

(১) এখন গোয়ালিয়ারে, তথা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণ।

ভ্রাতা দেওয়ান বক্ত পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। পেশোয়ার এক শাসন কর্ত্তা—মালহর ঘরের দাদু বাবা, ১৭৮১ সালে বৃথা পিপরাই (২) আক্রমণ করেন। ১৭৯৫ সালে সিন্ধিয়ার একদল প্রবল সৈন্য পীরঘাট (৫) হইতে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হয় কিন্তু বক্ত সিংহ কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১৮০০ সালে পেশোয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীরাও বার হাজার সৈন্য লইয়া জাখলোল আক্রমণ করেন। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে, সন্ধ্যার সময় দেওঘর হইতে দেওয়ান চিত্তর সিংহ আগমন করেন; পরে প্রাতঃকালে সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া বাজীরাও টৌরিতে (৪) প্রস্থান করেন।

১৮১২ সালের প্রারম্ভে সিন্ধিয়াসেনাপতি কর্ণেল ফিনর্জ্জই আটদল পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী হইয়া চান্দেরি আক্রমণ করেন। মহারাজ মুর মহাদ প্রতিরোধে অক্ষম হইয়া অম্মিতে পলায়ন করেন, দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ তাহাকে বাধা দেন। সেনাপতি প্রথমে নাইনারা আক্রমণ করেন। বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ ৬০ জন সিপাহীর সাহায্যে আটদিন অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করার পর পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কর্ণেল মিলেজই ১৮১২ সালে দ্বিতীয়বার জাখলোর আক্রমণ করেন। দেওয়ান বক্ত সিংহ সমস্ত দিন তাঁহার বিপক্ষে লড়িয়া সন্ধ্যার সময় দেওঘরে প্রস্থান করেন। আটদিন পর সেনাপতি তথায় তাঁহার অনুসরণ করেন এবং তিন দিনের যুদ্ধের পর বক্ত সিংহকে চান্দেরিতে বিতাড়িত করেন। মুর পহলদ নিজ দুর্গরক্ষার ভার বক্ত সিংহের উপর ন্যস্ত করিয়া অম্মিতে পলায়ন করেন। এক সপ্তাহের অবরোধ পর একজন ঠাকুরের প্রবঞ্চনায় নগর শত্রুর হস্তগত হয়। সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত বক্ত সিংহ চান্দেরি দুর্গে আত্ম রক্ষা করেন, পরে পিপরাতে পলায়নপর হন। সিন্ধি-

(২) এই পিপয়াই পরগণা (ঝান্সি জেলায়); ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল।

(৩) নারাইল নদীতীরে, বনাবেহাত পরগণায় একবারে প্রান্ত সীমায়।

(৪) গোয়ালিয়রে, মানগাওলির ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে এবং দিওমরের সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে।

য়ার সেনাপতি সেখানেও তাঁহাদের অনুসরণ করিল কিন্তু সেই দিবসেই পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পলীতে যাইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তুধাইতে আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎপর সেনাপতি পরাজিত হন। তৎপর তিনি ললিতপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথায় দুইটী দল রাখিয়া নিজে তালবেহাত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮১২ সালে দেওয়ান বক্তসিংহ ললিতপুর আক্রমণ করেন এবং সিন্ধিয়ার সৈন্য বিতাড়িত করতঃ শিবির লুণ্ঠন করেন। তৎপর ফিলজইর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবগত হইবা মাত্র তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তেলতাতে (১) তাহার গতি রোধ করেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার সিন্ধিয়াকে আশ্রয় করায় তিনি জামানদানাতে প্রস্থান করেন। তথায় দুইশত সিন্ধিয়াসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া তিনি কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেন। ১৮১৪ সালে আমরোধে (১) একটী খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেনাপতি চারিদল সৈন্য হারাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সেই বৎসরেই বক্ত সিংহ পীড়িত হইয়া একজন উকীল প্রেরণ করেন, কাজেই উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তাহার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইহার অত্যল্পকাল পরে তেহরিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলে, ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র গম্ভীর সিংহ তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। খুল্লতাত উমারা সিহ তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৮২১ সালে সিয়ামরাও, সিন্ধিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া মালহরঘরের ১৩০০ টাকার আয়ের জায়গীর (Muafi) বাজেয়াপ্ত করেন। গম্ভীর সিংহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন এবং অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সিরামরাওকে আক্রমণ করতঃ ছয়ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর তাহাকে মালহরঘরে বিতাড়িত করেন। গম্ভীর সিংহ এই যুদ্ধে আহত হন। সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার অনেকগুলি ছোটখাট যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত

(১) ললিতপুরের ১৩ মাইল উত্তর।
(২) দেওয়ান বাহাদুরের (গ্রন্থকার) বলিলেন যে, গোয়ালিয়রেরপাত্রহোরের নিকটবর্ত্তী।

হইতে হইতেছে। একদা সিয়ামরাও পরাসরাইতে (১) যুদ্ধার্থে আগমন করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আর একবার তিনি পালী-গ্রাম অবরোধ করেন, পনর দিন যুদ্ধের পর এবারও তিনি পূর্ব্বের নীতি অনুসরণ করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর, কাণীদানে (২) আর একটী যুদ্ধ হয়, সিয়াম পরাজিত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হন। তৎপর মাধোরাও তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করেন। এই নব শাসনকর্ত্তা বিক্রমপুরে (৩) পরাজিত হইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই প্রস্থান করেন। অনতিবিলম্বে তিনি দেওয়ান বাহাদুরকে বুচারাতে (৪) আক্রমণ করেন কিন্তু বিতাড়িত হইয়া চারি মাইল দূরে প্রস্থান করেন। ইহার পর তিনি খণ্ডে (৫) পরাজিত হন। সিন্ধিয়ার অন্যতম কার্য্যকারক লছমনরাও নানোরা আক্রমন করেন, এই যুদ্ধ পনর দিন চলে। গাহোরাতে আর একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, গম্ভীর সিংহ পরাজিত হইয়া দাতিয়াতে পলায়ন করেন। লছমনরাও পুনর্ব্বার দুই দল পদাতিক এবং পাঁচ শত অশ্বারোহী সহ আগমন করেন, দেওয়ান বাহাদুর কতিপয় বুন্দেল সরদারের সাহায্যে তাহার গতিরোধার্থে বহির্গত হন। আট দিন যুদ্ধে উভয় পক্ষের পাঁচ শত সৈন্য হত হয়, সিন্ধিয়া ললিতপুর প্রস্থান করে। অবশেষে সন্ধি সংস্থাপিত এবং 'হক' রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত দেওয়ান বাহাদুর অপরাপর নৃপতি ও জায়গীরদারের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যথা—রাজোয়ারায় রাও, অর্চার রাজা, খানয়াদানার রাও, মুরোয়ার (১) জায়গীরদার, গোরার (২) জায়গীরদার এবং কিনালেয়ানের (৩)

(১) দেওঘরের বিপরীত দিকে, বেত্তোয়ার পশ্চিমতীরে।
(২) বালাবেহাত পরগণায়, দুধায়ের কয়েক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে।
(৩) গোয়ালিয়ারে।
(৪) ললিতপুর হইতে ২৩ মাইল।
(৫) বুচারার উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

(১) ললিতপুর হইতে ৯ মাইল।
(২) গোয়ালিয়রে, চান্দেরি হইতে ৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে।
(৩) ইহা কোথায়, দেওয়ান বাহাদুর তাহা বলিতে পারেন না। বেত্তোয়ার উপর ললিত-পুরের ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমের কিনালোয়ান ইহা নহে।

জায়গীরদার। ১৮১৩ সালের প্রারম্ভে তাহার গারাকোটাতে ফিলডাইএর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ১৮২৮ সালে তিনি জাখলোনে একটী জলাশয় খনন করেন।

১৮২৯ সালে অর্চার নৃপতি বিক্রমজিৎ যখন গোয়ালিয়ারের অংশমত ব্যয়ভার প্রদান করিয়া চান্দেরি পুন প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পুত্র মরদন সিংহকে সেনাপতি এবং রাজোয়ারার উমরাও সিংহ জাখলোনের উমরাও সিংহকে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। দেওয়াল গম্ভীর সিংহ অপর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তেলবেহাত্তের বক্সি বক্র সিংহকে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। প্রথমে বক্সি বক্র সিংহের মাহোয়ানী অবরুদ্ধ হয় কিন্তু দুই একটী কামান সহ সিন্ধিয়া সৈন্যের আগমনে তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া খিরিয়াতে (৪) প্রত্যাবৃত্ত হন। সিন্ধিয়া-সৈন্য তথায় তাহার অনুসরণ করে নাই, কারণ খিরিয়া অর্চা রাজ্যভুক্ত। অতঃপর দেওয়ান বাহাদুর গম্ভীর সিংহ বহুতর ঠাকুর সৈন্য লইয়া কল্যাণপুর (৫) আক্রমণ করেন কিন্তু সহরের পোদ্দারদিগের মুষ্টিমেয় উপহার পাইয়া ললিতপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হন। তিনি ললিতপুর ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করেন এবং জাখোরার নিকট বুরেনরোতে (৬) খেরার নদী তীরে শিবির সংস্থাপন করেন। অপর পক্ষীয় একদল পদাতিক, একদল তীরন্দাজ এবং একদল অশ্বারোহী শিরনিতে (৭) উপনীত হয় দেওয়ান বাহাদুর এক সহস্র সৈন্য সহ তাহাদের সম্মুখীন হন। মরদান সিংহ এই সংবাদ পাইবামাত্র তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করেন কিন্তু সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পরেই সিন্ধিয়া সৈন্য পরাজিত হইয়া শিরনির ভিতর পলায়ন করে। বুন্দেলা সৈন্য তেলবেহাতে দুর্গ আক্রমণ করতঃ সমস্ত দিবা ও রাত্রি গোলা বর্ষণ করে কিন্তু ললিতপুর এবং শিরনি হইতে সিন্ধিয়া সৈন্য সম্মিলিত হইয়া যখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তখন তাহারা

(৪) Orchhaতে, মহারাণী হইতে ৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।
(৫) ললিতপুর পরগণায় ইহার ৮ মাইল পূর্ব্বে।
(৬) জাখেরা হইতে দুই মাইল উত্তরে খেরার নদী তীরের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম।
(৭) জাখেরা হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে।

পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইলনা। বিজরোখাতে বুন্দেলগণ প্রস্থান করিল। এই সময় এজেণ্টের নিকট হইতে গবর্ণনর জেনারেল সংবাদ পান যে, যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং বিবাদ মীমাংসার ভার প্রধান গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮১২ সালে গোয়ালিয়র হইতে কর্ণেল ফিলসই এজেন্সি হইতে মীর মুন্সি, তেথরি হইতে নান্নিহুবাকুর যাইয়া সিন্ধিয়াতে (১) মিলিত হন এবং তথায় বোতাতা সন্ধিপত্র গঠিত হয়। দেওয়ান বাহাদুর গম্ভীর সিংহ এবং কানোয়ার উমরাও সিংহ তাহাদের পূর্ব্ব জায়গীর অধিকার করেন। কর্ণেল কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত নানোরা দুর্গ ১৮৮২ সালে পুনঃ নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৯ সালে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয় এবং সেই বর্ষেই ১১ই চৈত্র তৎপুত্র দেওয়ান বিজে বাহাদুর দলীপ সিংহ তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সুনিপুণ অশ্বারোহী, জ্ঞানী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি গোপালজীর অর্চ্চনা করিতেন। ১৯০৫ সালের ১১ই মাঘে ইং (১৮৪৯) বানপুরে তাঁহার মৃত্যু হইলে দেওয়ান বিচিত্র বাহাদুর মবেত সিং (এই গ্রন্থকর্ত্তা) তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি নাবালক ছিলেন, ১৮৬৪ সালে বিন্দপ্রকাশ নামে এক খানি হিন্দী পুস্তক তিনি সম্পাদন (৩) করেন। এই পুস্তকে যাবতীয় শাস্ত্র ও পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বেদ পাঠার্থিগণের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ১৮৬৫ সালে নানোরের দুর্গ তৎকর্ত্তৃক পুনঃ নির্ম্মিত হয়, ইহা সিন্ধিয়া সৈন্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালে কাররানাতে (২) তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করেন, এবং অল্প দিন হইল সুদোয়াসে (৩) আর একটী জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৭৪ সালে

(১) ললিতপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে। সিন্ধিয়া সৈন্যের মেজর আলেকজেণ্ডার নামে এক কর্ম্মচারীর কয়েকজন আত্মীয়ের সমাধি এই স্থানে আছে। আলেকজেণ্ডারের বংশধরগণ ইহার নিকটস্থ জারিয়া গ্রাম জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিত।

(২) গোয়ালিয়রে, চান্দেরি হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে।

(৩) বেত্তোয়া তীরে, ললিতপুর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে।

জাখোরানে তিনি একটী উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা এখনো বিদ্যমান আছে। ১৮৭৬ সালে নিতচন্দর নামে একখানি পুস্তক সরল হিন্দী ভাষাতে সম্পাদন করেন, ইহা সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী হইয়াছে।

সরকার বাজুহা

বাঙ্গলায় যখন নছরত সাহ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণি-পথের ভীষণ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল গৌরব-রবি ভারতাকাশে সমুদিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া কাল-গ্রাসে পতিত হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুমায়ুনের সময়ে সেরসাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যুদস্ত করিয়া মোগল সিংহাসন কাড়িয়া লয়। সম্রাট হুমায়ূন পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। সেরসাহ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর একবার বাঙ্গলায় ভূমি বন্দোবস্ত হয়। সেরসাহ বঙ্গদেশকে কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গলার রাজকর ও ভূমি বন্দোবস্ত করেন ও প্রদেশে প্রদেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ বর্ত্ম প্রস্তুত হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল কুলতিলক আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরো-হণ করেন। বাঙ্গালা দেশ তখনও পাঠানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতেছিল।

২৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলমারি নামক স্থানে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা দুরীভূত হইলে বাঙ্গলার অংশ আকবর সাহের

শাসনাধীনে নীত হয়। আকবর বাঙ্গালা হস্তগত করিা বিচার, শাসন ও রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ক'রলেন। এই বন্দোবস্তে বিহারে ভীষণ বিদ্রোহের শোচনা হইল। ফলে বাঙ্গলা ও বিহার হইতে আকবর সাহের আধিপত্য তিরোহিত হইল।

যে সময়ে বিহারের বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করিতে-ছিল তখন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অংশে অল্পে অল্পে বারভুঁঞাদিগের শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছিল।

বাঙ্গলার যে বার জন ভৌমিক বা জমিদার * এই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারাই বাঙ্গলার বারভুঁঞা নামে পরিচিত।

এই বারভুঁঞাদের মধ্যে বিক্রমপুরের চান্দরায় কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ-মাণিক, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজী ও খিজিরপরের ঈশা খাঁ এই পাঁচজন পূর্ব্ববঙ্গে ৫টী পৃথক রাজ্য স্থাপন করিয়া ঢাকা, নোয়া-খালি, বাখরগঞ্জ. ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ শাসন করিতেছিলেন। * *

ঢাকার উত্তরস্থিত বিস্তৃত অরণ্যানী প্রদেশ ভাওয়াল বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে এই অরণ্য দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। †

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভাওয়াল প্রদেশে ফজল গাজী স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া পরগণা ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটী পরগণা শাসন করিতে থাকেন। ফজল গাজীর শাসন বুড়ি গঙ্গার উত্তর তীর হইতে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশে ও ও ভাওয়াল অরণ্যের (বর্ত্তমান মধুপুরে গড়) পশ্চিম প্রদেশে ফজল গাজীর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

* "Bhumiks and the Zeminders are the same."

J. Shore's minute 2-4-1788

* * Dr Dise's Barah Bhuyans of Eastern Bengal. (J. A. S. B.)

† do 'Fazul Ghazi of Bhowal.

ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য যখন ফজল গাজীর স্বাধীনতার লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ঢাকার অন্তর্গত খিজিরপুর ও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা ধ্বজা বক্ষে লইবার প্রয়াস করিতেছিল। খিজিরপুরে ঈশাখাঁ তখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত। ডাক্তার ওয়াইজ বার ভৌমিকের মধ্যে ঈশা খাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে-ও ঈশা খাঁ ভৌমিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিম্ন বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। *

বেহারে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দিল্লীশ্বর আকবর সাহ স্বীয় বিশ্বাসী রাজস্ব সচীব টোডর মল্লকে বিদ্রোহ নিবারণ ও রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। (১৫৮০)। টোডর মল্ল বাঙ্গলায় পঁহুছিলে তাঁহার সুবন্দোবস্তে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া যায়। বিদ্রোহ নিবারণের পর তিনি ঈশা খাঁকে ও ক্রমে অন্যান্য ভূঞাদিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গলার ভূমির ও রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হন।

টোডর মল্লের এই বন্দোবস্তই ইতিহাসে "ওয়াসিল তুমার জমা (rent roll of 1582) বলিয়া পরিচিত। টোডর মল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও ১৯ সরকারের অধীন ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগ অনুসারে সরকার বাজুহা নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয় সাধারণতঃ তাহাই হুসেন সাহের সময় নছরত সাহী প্রদেশ নামে কথিত হইত এবং ইংরেজ শাসনে জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত হইতেছে। টোডর মল্ল ৩২টী মহাল লইয়া সরকার বাজুহা গঠিত করেন। নিম্নে সেই ৩২টী মহালের নাম ও তাহাদের রাজস্ব প্রদত্ত হইল।

* The most celebrated of all the Bhueyas however, was Isa Khan Masnad Ali of Khijerpur. He is described by Abul Fazal as the Marzbon—Bhati or Govornor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great Zeminders.

J. Wise

১। আলেপ সাহী	রাজস্ব	৭৬১৬৬৭	দাম * *
২। মমিনসাহী		২২০৭৭১৫	„
৩। হুসেন সাহী		১৮২৭৫৪০	„
৪। বড় বাজু			
৫। মেরাউনা			
৬। খরানা	রাজস্ব	৪১৭৮১৫০	দাম
৭। হেরানা			
৮। সেরালি			
৯। বেসরিয়া বাজু		২৮২০৭৮০	
১০। ভাওয়াল বাজু		১৯৩৫১৬০	
১১। পুখুরিয়া বাজু		১৭১৫১৭০	
১২। দশ কাহনিয়া বাজু		১৬৪৫৬১০	
১৩। সেলিম প্রতাপ বাজু			
১৪। সুলতান প্রতাপ বাজু		৪৬২৫৪৭৫	
১৫। চান্দ প্রতাপ বাজু			
১৬। সোণা ঘুটী বাজু		১৯১০৪৪০	
১৭। সোনা বাজু		১৭০৫২৯০	
১৮। মেলরবস্		১৪৮৪৩২০	
১৯। সায়র জলকর		২৬১২৮০	
২০। সাওজিয়েল বাজু		৪০৫১২০	
২১। জাকর জিয়েল বাজু		৬৫০০৪৭	
২২। কতুর মল বাজু		২৮০৪৩৯০	
২৩। কাটা বাজু		১২৩৭২০	

* * ৪০ দাম = ১টাকা।

২৪।	সিংধা মৈন			
২৫।	মিরহুসেন	রাজস্ব	১৮৬৭৭১৫	দাম
২৬।	নছরত সাহী			
২৭।	সিংনছরত ও জিয়াল			
২৮।	মোবারক ও জিয়াল	„	৪৬৮৭৮০	„
২৯।	হারিয়ল বাজু	„	৩৪৪১৪০	„
৩০।	ইউছি সাহী	„	১৬৭০৯০০	„
৩১।	প্রতাপ বাজু	„	১৮৮১২৬৫	„
৩২।	ঢাকা বাজু	„	১৯০২০২২	„

এই ৩২ মহাল সমন্বিত সরকার বাজুহার সরকারী রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম বা ৯৮৭৯২১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এতৎ ব্যতীত এই সরকার হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৭০০ অশ্বারোহী, ১০ হস্তী ও ৪৫৩০০ পদাতি যোগাইতে হইত। (১) এই সরকারের আয়তন বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ, পশ্চিমে বর্ত্তমান রাজসাহী বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ এবং দক্ষিণে বর্ত্তমান ঢাকা সহরের দক্ষিণ বুড়ি গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (২)।

বাঙ্গলায় অপরাপর সরকার অপেক্ষা সরকার বাজুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং ইহার রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সরকার শত্রু আক্রমণ হইতে নিরাপদ রক্ষার জন্য ব্রহ্ম পুত্র তীরস্থিত একডালা ও এগার সিন্ধুরে দুইটী দুর্গ ছিল।

ঢাকার বর্ত্তমান সদর ষ্টেসন সরকার বাজুহার অন্তর্গত থাকিলেও বর্ত্তমান ঢাকা সাধারণতঃ সরকার সোণারগার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার সোণারগার অধীন ৫২টী মহাল ছিল, ইহার বাদসাহী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম বা ২৫৮২৮৩।/ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত সরকার সোণারগা হইতে দিলীশ্বরকে ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ হস্তী, ও ৪৬০০০ পদাতি প্রদান করিতে হইত।

(১) F. Gladwin's Ayeen Akbory page 468

(২) I. A. S. B. Vol III of 1873

খিজির পুরের ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহা ও সরকার সোণার গাঁ এই উভয় সরকার শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় সরকারের সীমা উত্তর পশ্চিমে ঘোড়া ঘাট হইতে দক্ষিণে পূর্ব্ব দিকে সাগর তীর পর্য্যান্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলে ভাওয়ালের ফজলগাজি ও বিক্রমপুরের চান্দ রায় কেদার রায় প্রভৃতি ও ঈশা খাঁর প্রধান্য স্বীকার করেন।

অতঃপর ঈশা খাঁ খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয় সরকারের শাসন ও রক্ষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। শাসন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া প্রথমই ঈশা খাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কালাগাছিয়া নামক স্থান ত্রয়ে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং একডালা ও এগার সিন্ধুরের প্রাচীন দুর্গ দ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ করেন। এবং কিছু দিন পরে দিল্লীর বাদসাহী রাজস্ব একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলেন।

অচিরে ঈশা খাঁর দুরভিসন্ধি সম্রাট জানিতে পারিলেন। ফলে দিল্লীশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইল।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর রাজধানীতে উপনীত হন। রাজধানীর নিকটেই মোগল সৈন্যের সহিত ঈশা খাঁর একটী যুদ্ধ হয়। ঈষা খাঁ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর রাজধানী হস্তগত করিয়া সাগর তীর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। ঈশা খাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জে আশ্রয় লইয়া সসৈন্যে প্রাণরক্ষা করেন। সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর অনুসরণ করিয়া আসিয়া যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থানে অদ্যাপি তাহার নামানুসারে সাহাবাজ পুর বলিয়া পরিচিত আছে। সাহাবাজপুর হইতে সেনাপতি সাহাবাজ খা দিল্লীতে এই রণ বিজয় বার্ত্তা প্রেরণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আকবর নামা গ্রন্থে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছ। জঙ্গল বাড়ী হইতে প্রকাশিত "মসনদই আলি পুস্তিকা হইতে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল "রণজয় সংবাদ মুন্সি আবুল ফজল সম্রাট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন ঃ—অতিশয় সন্তোষ দায়ক রণজয় সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহ সাহাবাজ খাঁ

ঘোড়াঘাট হইতে মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া সাগরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন"।

সাহাবাজ খা ঈশা খাঁকে পরাজিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ আহ্লাদে রত হইলে সহসা ঈশা খাঁ সসৈন্যে আসিয়া সাহাবাজের শিবির আক্রমণ করিলেন। এইবার অনন্যমনা সেনাপতি পদগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রণেভঙ্গ দিলেন। ঈশা খাঁ পরিত্যক্ত রাজধানী পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন এইবার ঈশা খাঁ ভগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সোনার গায়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডিয় ভ্রমণকারী রলক্কিচ ঈশা খাঁর রাজধানী সোণার গায়ে পদার্পণ করেন।

ঈশা খাঁ সোণার গায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও সরকার বাজুহায় আর একটী নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতে ও আর একটী নূতন বাস স্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী পরগণা (তজ্জা) বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। এই অঞ্চলে লক্ষ্মণ হাজো নামক এক কোচরাজা বর্ত্তমান জঙ্গল বাড়ী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তৎপ্রদেশ শাসন করিত *

যথা সময়ে ঈশা খাঁ এতৎ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ হাজো বা হাজরার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। হাজরা ঈশা খাঁর ভয়ে পলাইয়া গেল। ঈশা খাঁ জঙ্গল বাড়ী অধিকার করিলেন। জঙ্গল বাড়ী স্থান নিরাপদ বলিয়া ঈশা খাঁ স্থানের নাম জঙ্গল বাড়ী রাখিয়া সে স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে, রাঙ্গামাটী ও দশ কাহনিয়াতে (বর্ত্তমান সেরপুর) আরও দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশা খাঁ যখন এইরূপে বল সঞ্চয় করিতেছিলেন সেই সময়ে রাজপুত বীর রাজা মানসিংহ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরিত হইলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন। ঈশা খা তখন সুবর্ণ গ্রামে ছিলেন না।

* লোকপ্রবাদ আজও লক্ষ্মণ হাজোর ভগ্ন দুর্গ জঙ্গল বাড়ীর সন্নিকটে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মানসিংহ সোণারগাঁও হস্তগত করিয়া ডেমরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। ঈশা খাঁ তখন এক ডালার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ ক্রমে একডালা আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ঈশা খা পরাজিত হইয়া এগার সিন্ধুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানসিংহ পশ্চাৎ ধাবিত হন। এগার সিন্ধুরের নিকট ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে উভয় সৈন্যের অস্ত্র পরীক্ষা হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে ঈশা খা জয়লাভ করেন। মানসিংহের জামাতা যুদ্ধ স্থলে হত হন। ২য় দিন উভয় পক্ষে সমভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া যায়। মানসিংহকে নিরস্ত্র দেখিয়া ঈশা খাঁ যুদ্ধে নিবৃত্ত হন ও মানসিংহকে তরবারি সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর প্রদান করেন। ঈশা খাঁর এই অলৌকিক সুজনতায় বিমুগ্ধ হইয়া মানসিংহ ঈশা খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ও ঈশা খাঁকে লইয়া দিল্লী গমন করেন।

দিল্লী হইতে ঈশা খাঁ মসনদ আলি উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বাইশ পরগণার আধিপত্য লইয়া জঙ্গল বাড়ী প্রত্যাগমন করেন।

এই বাইশ পরগণার নাম প্রদত্ত হইল যথা ;—

(১) আলেপ সাহি, (২) মমিন সাহি, (৩) হুসেন সাহি, (৪) বড় বাজু (৫) মেরাউনা (৬) হেরানা (৮) সেরাসি (৯) ভাওয়াল বাজু, (১০) দশ কাহনিয়া বাজু, (১১) সায়র জলকর (১২) সিংধা মৈন, (১৩) সিং নছরৎ ও জিয়েল (১৪) দরজি বাজু, (১৫) হাজরাদি (১৬) জফর সাহি, (১৭) বলদা খাল (১৮) সোনার-গাঁও (১৯) মহেশ্বরদি (২০) পাইট কাড়া (২১) কাটবার, ও (২২) গঙ্গামণ্ডল।

বাদসাহি সনন্দে এই ২২ পরগণা বা মহালকে পরগণা নছরৎ সাহির তপ্পা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত বাইশ পরগণার প্রথমোক্ত পঞ্চদশ পরগণা বাজুহার অধীন. জফের সাহি সরকার ঘোড়া ঘাটের অধীন ও অবশিষ্টগুলি সরকার সোনার গায়ের অধীন ছিল।

যৎকালে ঈশা খাঁ জঙ্গল বাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া দিল্লীশ্বরের

স্থানে এই বাইশ পরগনা শাসন করিতেছিলেন সেই সময় সরকার বাজুহায় উত্তর প্রদেশে সুসঙ্গের রাজা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে ছিলেন। দশ কাহনীয়া সেরপুরের উভয় ভাগ করৈবাড়ী পাহাড় হইতে সুসঙ্গের পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত এই বিশাল পাহাড় রাজ্য—"মুলকে সুসঙ্গ" নামে অভিহিত হইত। সুসঙ্গে তখন রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব। আকবর সাহের মৃত্যুর পর রঘুনাথ মোগল সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করেন ও সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। মসনদ আলি ঈশা খাঁ ও রঘুনাথ সিংহ ব্যতীত সেই সময় সরকার বাজুহায় অন্য কোন শাসন কর্ত্তা ছিলেন অবগত হওয়া যায় না।

ঈশা খাঁর শাসন প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণ রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমি হইতে ক্রমে অল্পে অল্পে এতদ্দেশে আসিতেছিল কিন্তু ইহাদের ক্ষমতা বিস্তারের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এতদ্দেশে ঈশা খাঁর শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমান গণও বহুপরিমাণে এ প্রদেশে আগমন করিতে থাকে ও বিরলবসতি অরণ্য ভূমি জনকোলাহল মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময় বহু পীর ফকির আউলিয়া * এতৎ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক এক স্থানে এক একটী দরগা স্থাপন করিয়াছিল এবং ঈশার খাঁর অধঃপতনের পর ইহারাই ক্রমে ঈশা খাঁর বংশর গণের এক একটী পরগণা করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

এই জন বৃদ্ধি দেখা দিলে এ প্রদেশে আদিম অধিবাসী, কোচ হাজং ও অন্যান্য অশুজ ভূঞাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও অল্পে অল্পে শাসন দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয়, আগন্তুকগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া

* কথিত আছে এই সময় ৩৬০ জন আউলিয়া বা দরবেশ পদ্মা নদী পার হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে আগমন করেন। ইহাদের অনেকে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায় ও আগমন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক এক পরগণা অধিকার করিয়া রাজ্য শাসন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। পাদ্মা নদীর পার হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত স্থানের প্রতি পরগণায় এক এক জন আউলিয়ার সমাধি আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

লন। এতৎ প্রদেশে বহুস্থানে বহু প্রাচীন দিঘী পুষ্করিনী, কোচের দিঘী, হাজোর দিঘী, খোজার দিঘী হোড়ের দিঘী বলিয়া পরিচিত আছে বলা বাহুল্য ঐ সকল স্মৃতি সেই অংগুজ জাতিয় ভূঞা শাসন কর্ত্তাদিগেরই কীর্ত্তি কল্প।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দার অবসানের পর অগুজ জাতিয় দিগের অভ্যুত্থানের বিষয় আর অবগত হওয়া হায় না। ঈশা খাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল অগুজ জাতির প্রভুত্ব এতদ্দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। এই সকলের মধ্যে যে সকল কোচ ও হাজং রাজগণ ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে নেত্র কোণার অন্তর্গত মদন কোচ, সদরের অন্তর্গত বোকাই নগরের বোকাই কোচ ও মধুপুরের বনের পুর বাজার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ; মধুপুরের হুরবাজারের বিশাল ভগ্ন কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদনপুর ও বুকাইনগর মদন কোচ ও বোকা কোচের নামের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিতেছে। ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে এই সকল আদিম অধি-বাসী দিগের প্রভুত্ব লোপ হইয়া গিয়া মুসলমানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

ঈশা খার মৃত্যুর পর তাহার সুবিশাল প্রদেশ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারীতে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে আগত ঈশা খার পরিষদ আসাহেব এবং মজলিশ বংশীয়েরা প্রথমতঃ অনেক জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন তৎপর ক্রমে অন্যান্যেরাও নিজ নিজ সুবিধা মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

ঈশা খার অভ্যুদয়ের পুর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরন্য ভূমি গাজি দিগের হস্তে শাসিত হইতেছিল। ঈশা খার পরাক্রম বিস্তৃত হইলে গাজিগণ নিস্তেজ হইয়া যান ও ঈশা খার অধীনতা স্বীকার করেন। পুনরায় ঈশা খার পতনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই গাজি বংশধরেরা এই বিস্তৃত অরণ্যের দুই দিগ অধিকার করিয়া লন উত্তরে করৈ বাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশ কাহনীয়া বাজু বর্ত্তমান সেরপুর পরগণা ও দক্ষিণে ভাওয়াল বাজু ঈশা

খার বংশধর দিগের হস্তচ্যুত হইয়া গাজিদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে ঈশাখার অধিকৃত ২২ পরগণায় ১১ পরগণা অধিকাংশ বিভিন্ন মুসলমান পীর আমীর উমরাও ও দরবেশ গণ অধিকার করিয়া লন। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মহালের নাম	আধুনিক নাম,	গ্রহিতা,	গ্রহিতার তৎকালিক বাসস্থান
	পরগণা আটিয়া	পীরসাহেন সা	আটিয়া।
১। (বড় নাজু)			
মেরারউন			
খরানা			
হেরানা	পরগণা কাগমারী	পীর সাহজমান	কাগমারী
সেরালি	পরগণা বড় বাজু	(নাম অজ্ঞাত)	বেলকুচি
২। দশ কাহনীয়া বাজু	পরগণা সেরপর	সের আলিগাজি	সেরাপর
৩। আলেপ সাহী	পরগণা আলাপসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা সেরপর
৪। মমিনসাহী	পরগণা ময়মনসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা
৫। ভাওয়াল বাজু	পরগণা ভাও তাপবল ভাওয়াল	ইছলাম খাঁ ও দৌলত গাজী	চৈয়ার
সিং নছরত্ ওজিয়ান	পরগণা নসিরুজিয়াল	মজিদ জালাম	বোয়াইল-বাড়ী
৭। সায়র জলকর মহাল	" জয়ন সাহী	ফতে খাঁ	অজ্ঞাত
	" খালিয়াকুরী	লস্কলিস বংশ	খালিয়াজুরী
৮। হুসেনসাহী	" হুসেন সাহী	ঈশা খাঁর আমলাগণ	বেত্রটী
৯। স্বর্ণগ্রাম			
১০। পাইটকারা	বর্ত্তমানে ভিন্ন জেলার অন্তর্গত		
১১। গঙ্গা মণ্ডল			

কালক্রমে এই সকল মহালের শাসন ভার কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা মল্লিখিত "ময়মনসিংহের বিবরণ" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। *

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ঢাকা নগরীতে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এতদ প্রদেশকেও রাজধানীর ন্যায় শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ও আরাকানেরা এক যোগে দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করে। এবং তাহারা পদ্মানদীর মোহনাস্থিত দ্বীপ সমূহ এবং বেলুহা (১) ও লক্ষ্মীপুর অধিকার করিয়া লয়। এই আক্রমণে সরকার বাজুহার সায়র জলকর মহাল ও সোণা বাজুর বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর দিক হইতে আসামরাজ পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন।

আসামরাজ বাঙ্গালা জয় করিতে পাঁচ শত যুদ্ধ যান সহ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। আসামের সীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর তাহার বিপুল অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কথিত আছে এই আক্রমণে সরকার বাজুহায় ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ গ্রাম ও নগরগুলি জনশূন্য ও ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। এগার সিন্ধুর বাঁকে মুসলমান সৈন্য আসামরাজের গতিরোধ করিলে সে স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আসামরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইসলাম খাঁ আসামরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আসামের বহু দুর্গ হস্তগত করেন ও বহু লুণ্ঠন সামগ্রী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। * এর পর সাহসুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত

* ময়মনসিংহের বিবরণ ১৩—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বেলুহা পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে ও ইংরাজ শাসন প্রারম্ভে ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* The Raja of Assam embarked five hundred boats cn the Brahmaputra and came down like a torrent over Bengal plundering every town and village in his way. The Sabeder went out to meet him with his war-boats armed with cannon. The Assamese could not withstand him.

হইলে ঢাকা হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয় এবং এতৎপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকে। সুজার সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তেও এতৎপ্রদেশ বাজুহা নামে পরিচিত ছিল। সুজার পলায়নের পর মীর জুম্লা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া পুনরায় ঢাকাতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন! এইবার পুনরায় এতৎ-প্রদেশে নূতন বিপদ সূচিত হয়—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ব্রহ্মপুত্রে রণতরী ভাসাইয়া তৎতীরস্থ প্রদেশ ধ্বংস করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও নগর অধিকার করেন। মীর জুম্লা পুনরায় ঢাকা উদ্ধার করেন। মীর জুম্লার পর সায়েস্তা খাঁর সময়েও আরাকাণের মগেরা ঢাকা ও এ প্রদেশের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে। সায়েস্তা খাঁ পর্টুগীজদিগের সাহায্যে মগ নিবারণে কৃতকার্য্য হন ও সন্তুষ্ট হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে ঢাকায় স্থান প্রদান ও (পুনরায়) বাণিজ্য অধিকার প্রদান করেন। পর্ত্তুগীজেরা ঢাকার ফিরিঙ্গি বাজারে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (পুনরায়) ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন এবং ক্রমে বাজুহায় প্রবেশ করিয়াও কয়েকটি কুঠি প্রস্তুত করেন। কুঠিগুলির মধ্যে বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ও বেগুণবাড়ীর বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

১৭০৩। খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব হইয়া রাজধানী মুসুকদাবাদে পরিবর্ত্তন করেন। মুর্শিদকালী খার সময় ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমির তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা ৩৪ সরকার ও ১৬৭০ মহালে

Islam Khan pursued them into their own country and took fifteen forts and much spoil"

Marshman's History of Bengal
Page 34

"He (Rajah of Cooch Behar) seized the part of Assam and sent on army down the Brahmaputra and plundered * * £ £"

বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে পদ্মার পূর্ব্ব তটভূমি ৬টী চাকলায় বিভক্ত। (১) আকবর নগর (২) ঘোড়াঘাট (৩) করিবাড়ী (৪) জাহাঙ্গীর নগর (৫) শ্রীহট্ট (৬) ইছলামাবাদ। সুতরাং এই বিস্তৃত সরকার বাজুহার মহাল এবং পরগণা গুলিও উত্তরে করিবাড়ী পূর্ব্বে শ্রীহট্ট দক্ষিণে—জাহাঙ্গীরনগর ও পশ্চিমে ঘোড়াঘাট—এই পার্শ্ববর্ত্তী চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া হায়। এই বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমান ময়মনসিংহের উত্তরভাগ সেরপুর ও সমঙ্গ চাকলে করিবাড়ী (কবোড়ী) ব্রহ্ম পুত্রের পূর্ব্বে তীর প্রদেশ—জফর সাহ পুখুরিয়া (বাজু), মোলবরন বড়বাজু, আটীয়া, কাগমারী, সুলতান প্রতাপ, আমাপ সিংহ (সাহি), ময়মনসিংম (সাহি) ভাওয়াল (বাজু) প্রভৃতি চাকলে ঘোড়াঘাট : পূর্ব্বভাগে সরাইল, জয়াল সাহি, তরক প্রভৃতি চাকলে শ্রীহট্টের অধীন নীত হয় এবং অবশিষ্ট মহাল চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন থাকে। *

বাঙ্গালার এই প্রদেশ চাকলা ২৫টী জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুর মহাল গুলি নুতন চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলে ও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজার সম্প: জমিদারী ঢাকা জালালপুর দিগরের বা ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্গত ছিল।

সুসঙ্গ ত্রিপুরা মুচা, তেলীয়াজুরী প্রভৃতি ৪জন প্রতি অণ্ড নৃপতির জন্য ৪৯৭৫০ টাকা রাজস্বে ২ পরগণা জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মুর্শিদকুলী খার মৃত্যুরপর ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুজা উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। নবাব, সুজাউদ্দীনের সময় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ঢাকা নেয়াবতের যে ওয়াশীল জমা তুমারি প্রস্তুত হই তাহা হইতে সরকার বাজুহার নির্দ্দিষ্ট জমা ও অন্যান্য আমদামী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* সরকার বাজুহা ও অন্যান্য সরকারের মহাল গুলি এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও সরকার গুলির নাম লুপ্ত হইয়াছিল না।

ঢাকা নেয়াবৎ

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর।

ওয়াসিল জমা তুমারী ১১৩৫ সাল।

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
সরকার বাজু (বাজুহা)	আশাকবাদ	৯০৯১৲
	এব্রাহেমপুর	৪৪৩১৲
	আরঙ্গাবাদ	২১০৲
	এনাএতনগর	১৪৭৫৲
	আইদ গাও	১৩৪৪৲
	আলিপুর	২৩৩৯৲
	বুজোরগমেদপুর	৪৬৪৭৲
	ভাওয়াল	৬৬৫৫২৲
	বাগপাদ সাহী	২৩২৲
	বড়ী সাগরদী—(২৯০০০ কাহনকড়ি)	৭৯৬৲
	বড়বাজু নছরৎ সাহী	১৩৬২৪৬৲
	বড়পুর	১৩৫০৲
	বড়পুর ভেলিয়া	১৩০৲
	চাঁন্দ প্রতাপ	৩৬১৪৫৲
	দার্জ্জিবাজু	৯৫৮৬৲
	ওঙ্কিশঙ্করাবাদ	১০৪৲
	গোবিন্দ পুর	১১৬৬
	হাট হুমেনা বাদ	২৯৲
	হুসেনসাহী চর বাগু	২৯৮৯৪৲
	হাওলী জাহাঙ্গীর নগর	৪১৯৬১৲

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	জাহাঙ্গীর বলদা (city)	১২৩৩৭১৲
	জাহানাধাদ	২০৪২৲
	জোবছোরত বাই	২৬৯১৲
	জানপুর	১৫৫৫৲
	জাকরাবাদ	৪০৲
	খানজান বাহাদুর নগর	৯৲
	খালুনা বাদ	৯০৪৫৲
	কাসিম নগর	৩৭৯৪৯
	কাসিমপুর বাগমারা	৯৮১৲
	কাসিমপুর সবিন বাসিন	২৫৬৪
	কাসিমপুর কল্যানবাড়ী	২০৬৪
	খালিয়া জুরী	২২৬২
	খোদাহুসেন নগর	৯৭২৲
	কাশীপুর	৪৬৩৪৲
	মৌবারফ ও জিয়ান	১৫০১৭৲
	মোকামা বাদ	১৯৪৬৮৲
	মহম্মদপুর	৩১৯২
	মহম্মদনগর বা নরুলহুসেন	৮৪৭৲
	নন্দলালপুর (চাঁন্দপ্রতাপ)	১৫৪৲
	লছির ও জিয়াল	৫৬২৪০৲
	নুর উল্লাপুর	২২৫০০৲
	রায়পুর নন্দলালপুর	৩০৬৪৲
	বসিদপুর	২৩৪৩৲
	বকিয়ানগর	১২৫৲
	সেলিমপ্রতাপা	৬০৩৩৲

সরকার।	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	সেইদপুর	১০৬৲
	সেইকপুর	২০০৩৲
	স্থলতান প্রতাপ	৩৮২২৬৲
	সৈয়দপুর নওয়াবাদ	৭৭৲
	সেরাই মোলিদেহার	৪৩৬৲
	সাসরদি	২৫৪৬৲
	সজাবাদ	৫৮৮৮৲
	সাহাজাদপুর	৫২৪৪৲
	সাহাজানপুর	১৫৮৯৲
	সাহা ও জিয়াল	২১৭২৩৲
	সাইস্তাবাদ	৭২৬৲
	সাহেবা বাদ	১৭৩৫৲
	তালিপাবাদ ও আজিমাবাদ	৩৫৮০৲
	ইউছপ পুর (খাবেলাবাদ)	২৬৯৮,
	জাফর ও জিয়াল	৬৯৮৯৲
	জাহাঙ্গীর নগর বাজারেরপেস্‌কস্‌	৪৮০৯৲
		৭৬৯৫৬১৲

সরকার বাজুর নিম্ন লিখিত মহালগুলি বিভিন্ন চাকলার অন্তর্গত থাকিয়া ক্রমে ঢাকা নেয়াবতের অধীনে নীত হয়।*

চাকলে ঘোড়াঘাট

সরকার বাজুহা

পং আলাপসিং	৪৪৯৫৫৲
পং ময়মনসিং	৪৪৪৭৬৲
আইন মহাল ভাওয়াল	২১৫৲
সরকার ঘোড়াঘাট জফর সাহী	১৭০০৮৲
	১০৬৬৫৪

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক বোধে সরকার বাজুহা ভিন্ন অন্যান্য সরকারের যে সকল স্থানের রাজস্ব ঢাকা নেয়াবতে গৃহীত হইত তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না।

চাকলে শ্রীহট্ট

পং সরাইল (সতর খণ্ডন)	১১১০৮৪৲
পং জয়ান সাহী	৩৩৮২০৲
পং তরপ মোট জমা	
১৬২১৭ মধ্যে	১১৮৩৬৲
	১৫৬৭৪৩৲

চাকলে করৈবাড়ী

সরকার বাজু

পং সেরপুর (দশকাহনীয়া)	১৬৭৫০৲
পং সুসঙ্গ (সম্পূর্ণ)	১৮৮৫০৲
করৈবাড়ী সায়েরি মহাল	১৫০৬৪৲

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করিলে পর ১১৭০ ও ১১৭২ সনে রেজা খা বাঙ্গালার রাজস্ব কর্ম্মচারী হইয়া যে কাগজ পত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে জমিদারী গুলির মালিকের নাম সহ অধীন পরগণার ও মহালের সংখ্যা ও রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন কাগজ পত্র সাধারণের কৌতুহল নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে বোধে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১১৭০ ও ১১৭২ সালের

ঢাকা নেয়াবতের জমাওয়াসিল ময় আবওয়াব।

জমিদারী।	জমিদার।	জমিদারীর সংখ্যা।	মহালের সংখ্যা।	মোটরাজস্ব।
ঢাকার দক্ষিণ পদ্মা ও মেঘনার মধ্যে				
জেলাৎপুর প্রভৃতি	নুরউল্লা ও রুহিতুল্লা	৩	১৮	১৫৩০০৫৲
রাজনগর	লক্ষ্মীনারায়ণ	১	৩৮	৮৮৩৮০৲
চন্দ্রদ্বীপ	রাজা উদয়নারায়	ণ১	২২	৬৮৫০৯৲
আদিলপুর	রমাবল্লভ	৩	৮	১০৬২৭০৲
বুজরক উম্মেদপুর	মহমদ সাদক	১	৮	১০১১৭০

সেলিমাবাদ	জয়নারায়ণ ভবাণীচরণ চৌধুরী	৪	২	৪০১৯০৲
রজাদিকালিকাপুর	কাসিম	১	১	১৮৬৪৩৲
রসুলপুর কার্ত্তিকপুর	আবতুল্লা	৪		৫০৩৮৭৲
এব্রাকপুর সাইস্থানগর	মির আলী	[illegible]	২	২৩১৭৩৲
রামনগর গ	রামদাস সেন		৩	১৩৯৫২৲
বৈকণ্ঠপুর (বিক্রম নছবৎসাহী হইতে খারিজা				
	কীর্ত্তিনারায়ণ			১৭২৬১৲
দক্ষিণ সাহাবাজপুর				
শিবরামপুর গ	ভূষণউল্লা		৩	৭৮১৬৪৲
উত্তর সাহাবাজপুর	শিবরাম ও অন্যান্য	৩	১	১৩৭৭৭৲
সনদ্বীপচর	বক্তিয়ার সিংগণ	৪	১	১৮০৪৭০৲
গুনানন্দী	হরিয়া	৬	১	২৫৬৩৩৲
মেঘনার পূর্ব্বদিকে				
সিংহগাও কাঞ্চনপুর গ Kuoo (see)*			২	২২০২৮৲
টুরা এব্রাহিমপুর গ	বচ্ছুল, কাসিম চদিয়া		২	৩৯৫৮৮৲
মেহার	হিংরাজদোনা		১	৩০৯১৪৲
তুল্লাই	তোতাভৈরম		১	৪০৫১৯৲
সুনদী	সাহারাজচৌধুরী		১	১১১১৮৲
কাসিমপুর মাছুয়াখাল	নরোত্তম		২	৯৮৪৪
হোমনাবাদ	দৌলত জালালবক্স		১	১০৯২৩১
কাদবা আমিরাবাদ	বিজয়নারায়ণ		৩	৩৮৩০১
ভুলুয়া	রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ		১	১৩৫৯৮২৲

* ইষ্টইণ্ডিয়া কোংর সেরেস্তাদার গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণ হইতে এই কাগজ পত্র গৃহীত হইল। অনেক স্থানে মহলের নাম ও মালিকের নাম বুঝা যায় না আমরা যতটা বুঝিতে পারিলাম শুদ্ধ রূপে লিখিলাম যাহা বুঝিলাম না অবিকল উদ্ধৃত হইল।

জুগিদিয়া	রঘুরাম	৩	১	১৭৭৩৭
দাদরী ও আলাহাবাদ	মহমদ অরিয়ত	২	২	৪৮৬৩৮
চুয়া গাও	মধু	৫	১	১৩৪১১
বাবুপুর	উদয়নারায়ণ	১	১	১২৯৮৪৲
গোপালপুর মির্জ্জানগর	সকিয়দ্দিন	২	২	১৫৮৮৯৲
মৈচাইল	নরসিংহ	৪	১	১৪৯২৲
গঙ্গামণ্ডল	মহমদ জাফর	১	৭	১০৩৭২৫৲
পাইট কারা গ	আবদুল হুসেন	২	৪	৯৪৬৩৮৲
নসির ও জিয়াল	কংশ নারায়ণ	৭	১	৪৮০৭০৲
জোয়ান সাহী		১	১	২৩৪০৲
সেরপুর দশকাহনীয়া	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৫১৮৬
ময়মনসিংহ ও জাফর সাহি ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে	প্রেমকৃষ্ণ প্রভৃ			১০৭৪৬৮
আলাপসিংহ পশ্চিমতীরে	হরিরাম			৬৯৩।
সুসঙ্গ (নছরত সাহী)	রতনসিংহ			৩৫১
তরকা				৩০৪০।
বালিরা ও সাতগাও	বেযাজ উদ্দিন			১২৬৫৲
সুরউলাপুর (হুসেনসাহী)	এলেনতান	[illegible]	২৭	১০৪০৬

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ঢাকার উত্তর কাসিমপুর, অসিন, বাসিন,

আ।।জনপুর	ভবাণী প্রসাদ		১২৪
তালিপা বাদ	জিয়া	গ	১০৲
তপানজুপুর (গ কাসিমনগর)	সমসেল উদ্দিন		৩৭
তপাসুলতানাবাদ	হুসেন আলি		১৭
হাবেলী সেলিমাবাদ			১১০৯
হিঃ ।৶ আনা			
আজিমপর গ			১০

তুনকা বাদ (প সিংহের গাঁও)	১	১	২৫১০৪
তনা রণভাওয়াল নী আলাপসিং	১	১	১৪১৭৩
মুজারদি (বড় বাজু) (N. Shahy)			
হাজরাদী ঐ আলাউদ্দীন	১	১	২৩৫৩৩
কুলসি (প সুলতান প্রতাপ) সেনরাম গ	৫	১	১৪৬৪৪
তালুক গোলাম মইষা প জেলালপুর			১৭০৩১
তাং চান্দসিংহ	১	১	১০৬৬৪
তাং মহম্মদ আবরাল (একবাণ) ?	১	১	৮২৩১
তাং সরন্দল	১	১	৮৯৪৭
	১২৬	২০০	২৪৬১৩১৫
কড়ইবাড়ী ও অন্যান্য সায়েরী মহাল।	৫	৮	৪৪৫৬১২
	১৩১	২০৮	২৯০৬৯২৭
নেজামত সেরেস্তা (সৈনিক বিভাগের অধীন)			
বলদা খাল মহম্মদ ইব্রাহেম		৩	১৩৬২২২
সরাইল সতর খণ্ডল মহম্মদ হদ্দি		১	৪০৩২৪
ভাওয়াল ইন্দ্রনারায়ণ		১	৩২০০০
বিক্রমপুর প্রভৃতি রাজারাম		১	২৪৫৬৫
চাঁন্দ প্রতাপ রামমোহন		১	৯৬৯০
তা হরিনারায়ণ (প জালালপুর)	১		১৭২৬৩
সায়েরি মহাল			
তামাকু গাঁজা প্রভৃতি		১৪	১২৬০৯৭
উভয় সেরেস্তার অন্তর্গত	১৩৯	২৪০	৩২৯৩০৯১
মজকুরিতালুকান	২৭৯	১৭৫	৪৩৩৪৯৩
	৪১৮	৪১৫	৩৭২৬৫৮৪

১১৭০ সালে এই জমা ধার্য্য হইয়াছিল। ১১৭২ সনের কোন কোন পরগণার রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন পরগণার কত বৃদ্ধি হইয়াছিল নিম্নে তাহাই কেবল প্রদত্ত হইল।

হুজুরি সেরেস্তা।

সেরপুর দশ কাহনীয়া	৫২৩৯৲
ময়মনসিংহ গ	১১৬৪৲
আলাপসিংহ	৪২০৭৲
হাজবাদী	৪৪৫৫৲

নেজামত সেরেস্তা

বলদাখাল গ	৩৪৮৬৪৲	সবাই গ	৫৬১৮৲

সরকার বাজুহার যে সকল মহাল জমিদারী জালালপুরের অধীন শাসিত হইত না ঐ সকল মহাল স্বতন্ত্র ভাবে মজকুরী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালায় মোট মজকুরী মহালের সংখ্যা ২১টী ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী সরকার বাজুর অন্তর্গত ও সম্বন্ধযুক্ত।

(১) আটীয়া কাগমারী, বড়বাজু হুসেনসাহী * চাকলে ঘোড়া ঘাটের অন্তর্গত তিনটী স্বতন্ত্র জমিদারী পরগণা সংখ্যা ১০ রাজস্ব ৬৭৮৮৩৲

(২) সেল বরস (সরকার বাজুহা) এই পরগণা ১১৩৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহীর জমিদারীভুক্ত হয় পরগণা ১ রাজস্ব ৫৭৪২১৲

(৩) পাতিলাদহ কুন্দি (চাকলে ঘোড়াঘাট) সময়ে রাজসাহীর জমিদারী ভুক্ত হয়। পরগণা ৭ রাজস্ব ৬৭৬৩২৲

* আটীয়া, কাগমারী, বড়বাজু হুশেনসাহী এই ৪টী পরগণা বর্ত্তমান সময়েও ময়মনসিংহ জেলার অধীন আছে। গ্রাণ্ট সাহেব ৪টী পরগণার নাম লিখিয়াও সংখ্যায় তিনটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা উহার লেখা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Ateah Kaugmarry, Berbazoo—Hussen Shahy, in the Chackleh of Ghorahgaut, originally constituting three Zemindaries."

(৪) আলেপসিং এবং মমিনসিং (চাকলে ঘোড়াঘাট) টীকরা নিবাসী মহম্মদ মেন্দির জমিদারি সময়ে জালালপুরের অন্তর্ভূক্ত হয়। পরগণা সংখ্যা ২ ৭৫৭৫৫৲

(৫) পুখুরিয়া এবং জফরসাহী (সরকার বাজুহা) ১১৪১ বঙ্গাব্দের সনন্দানুসারে পুখুরিয়া রাজসাহীর অন্তর্ভূক্ত হয়। জফরসাহি সময়ে জালালপুরের অধীন নীত হয়। পরগণা ৫ রাজস্ব ৫৪৫১৯৲

উপর্য্যুক্ত মজকুরী বিভাগ ১৭২৮ সনে নির্দ্দিষ্ট ছিল অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণের পূর্ব্ব ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায়ের বিভাগ ধার্য্য হয় তাহাতে সরকার বাজুহার ভূমি তিন রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত হয়। (১) জমিদারী রাজসাহী (২) আটীয়াদিগর (৩) জালালপুর ঢাকা আমরা নিম্নে এই তিন বিভাগের জমা জমির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) রাজসাহী—পুখুরিয়া, সেলবরস ইছপসাহী, হারিয়েল, কুতুবমল, প্রতাপ বাজু, সোনাবাজু, হুসেনসাহী, হুসেনপুর প্রভৃতি সহ রাজসাহীর বিস্তৃত জমিদারির পরিমাণ ফল ১২৯০৯ বর্গ মাইল, খালসা জমা ১৩৯৯৪৭০৲ জাগীর ৭৫০০৭৩৲ আবওয়ার ৬০২৪৬৩তৌফির ৮০১৪৭৯৲ বাদ খরচা ৪৪৭১৫৲ মোট ৩৫০৮৭৭০৲।

(২) আটীয়া, বড়বাজু, এবং কাগমারী ৩টী সন্নিকটবর্ত্তি পরগণা। বহুক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হইলে ও প্রধানত ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীন। পরিমাণ ফল ১৬২৯ বর্গ মাইল, খালসা জমা ৪৪৮৭৯৲। জাগীর ৭৫২৮৲ আবওয়াব ৩৪৩৪২৲। তৌফির ২৪২৯৪৲। বাদ খরচা ৩৯৪৲। মোট ১১০৬৪৭৲।

(৩) জালালপুর ঢাকা উপর্য্যুক্ত দুই বিভাগে ভুক্ত মহাল ভিন্ন বাজুহার অন্যান্য যাবতীয় মহাল ও বিস্তৃত চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের সমস্ত, ভূষণা ও যশোহরের ক্ষুদ্র অংশ সহ পরিমাণফল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। খালসা জমা ৮৯৫৩৮৬৲। জাগীর ১২৫৮২০৬৲ আবওয়াব ৩৭৮৮৯১৲ তৌফির ১৩৬৬৮৮৭৲ বাদ খরচ ৯৬৬৪৩৲। মোট ৩৮০১৯২৭৲

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

অম্বরের শিলাদেবী।

জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে যে শিলাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে লইয়া যান। সাধারণতঃ এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে, তিনি বাঙ্গলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী ছিলেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য আমরা জয়পুরে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যাপক ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশজাত আমার পরমাত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তৎসমুদায় প্রকাশ করিলাম। সাধারণে ইহা হইতে সমস্তই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। সম্পাদক

জয়পুর, ৭ই জুন, ১৯০৫।

প্রিয় নিখিলনাথ,

প্রথমতঃ তোমার পত্রখানির অবিকল অনুলিপি লিখিয়া দিলাম কেন না তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহার নকল অবশ্যই রাখ নাই। এ রকম ধরণের সাহিত্য বা ইতিহাস সংক্রান্ত পত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইলে, তোমাদিগের ন্যায় সাহিত্যসেবী-দিগের কৃত সমস্ত ব্যাপারই সাহিত্যেতিহাসের অঙ্গীভূত উপাদান। তাই এস্থলে পত্রখানির অবিকল নকল করিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা উত্থাপিত প্রত্যেক কথার যথাযথ উত্তর লিখিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

Dewanbati

91 Durga Charan Mitter's Street, Calcutta.

11th April 1905.

প্রিয় নবকৃষ্ণ,

অনেক দিন হইল, তোমার কোনই সংবাদাদি পাই নাই। শারীরিক অসুস্থতা ও নানাপ্রকার সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে "তৈলেন্ধন চিন্তয়া" বন্ধু বান্ধবের খবর লওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই। এখন এমনই হইয়াছে যে কোন উপলক্ষ ব্যতীত আর পত্রাদি লিখিতে যেন অবকাশ উঠে না। অথচ সমস্ত সময়ই যে কাজে কাটে তাহাও নহে। যাহা হউক একটা বিষয়ের জন্য তোমাকে পত্রখানি লিখিতেছি। উহা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে। সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তোমাদের কলেজের মেঘনাদ বাবু 'বিদ্যাধর' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাধরের বংশাবলীর একখানি মাড়ওয়ারী দলিলের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে অম্বরের শিলাদেবী কেদার রায়ের ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে কেদার রায় বলিতে চাহেন। তাহা হইলে যে শিলাদেবী যে যশোহরেশ্বরী হন তাহাই মিলিয়া যায়! কিন্তু কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য এক নহেন সুতরাং তাঁহার সে বৃথা। এক্ষণে, তোমাদের ওখানে শিলাদেবী সম্বন্ধে প্রবাদ কি? বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না। একখানি দলিল হইতে এতদিনের প্রবাদটিও উড়িয়া যাইবে ইহাই বা কেমন? আর যদি সেখানে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে শিলাদেবীর কোন সম্বন্ধ থাকার কথা না থাকে, তাহা হইলে সে দলিলখানিই বা অগ্রাহ্য করা যায় কিরূপে? এখানে এ বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতেছে। তুমি উহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবে। এবং উক্ত দলিলের একখানি অবিকল নকল (মাড়োয়ারী ভাষা অথবা যে ভাষায় থাকে) যাহাতে শীঘ্র পাই তাহার চেষ্টা করিবে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন :—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোহরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥"

এখানে শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের দেবী বলিয়া জানা যাইতেছে। প্রবাদও

তাহাই। তবে একটা কথা বলি, ঘটককারিকা, অন্নদামঙ্গল, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য প্রভৃতিতে যশোহরেশ্বরীকে লইয়া যাওয়ার কোনই কথা নাই। তাহা হইলে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যেরই এ প্রবাদেরই বা মূল কি? আবার যে যশোহরেশ্বরী এখানে আছেন তাঁহারই বা স্থাপয়িতা কে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এ সমস্ত গোলযোগে উক্ত দলিলখানিকে একেবারে অমূলক বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার আর এক কথা। ঘটক-কারিকায় লেখা আছে যে, যশোহরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরে কচুরায়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কচুরায় রাজ্য পাইলে সেই যশো-হরেশ্বরীকে কি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? যাহা হউক তুমি ওখানকার প্রবাদ সংগ্রহ করিবে। অন্যান্য অনুসন্ধান করিবে ও উক্ত দলিলখানির মূলের অবিকল অনুবাদ একখানি সত্বর পাঠাইবে। তোমরা সপরিবারে কেমন আছ? আমরা একরূপ আছি। ইতি! পত্রের উত্তর।

আমি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

অম্বরের শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যে আনীত হইয়াছিলেন তৎ-সম্বন্ধে এখানে একটী হিন্দী বা প্রবাদ বাক্য আজ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রচলিত আছে:—

"সাঙ্গানের কা সাঙ্গাবাবা জয়পুরকা হনুমান্
আমের কা সল্লাদেবী লিয়া রাজা মান্॥"

সাঙ্গানের নামক জয়পুর রাজ্যের একটী নগরেস্থিত সাঙ্গাবাবার মূর্ত্তি, জয়পুর নগরের হনুমান মূর্ত্তি (চাঁদপোল গেটের সমীপে স্থিত) এবং আমের বা অম্বর নগরের সল্লাদেবী বা শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত।

আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা, যে অম্বর নগরের শিলাদেবী রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী, এবং প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের পর মানসিংহ ভক্তি সহকারে প্রতাপাদিত্যের অভীষ্টদেবী যশোহরে-শ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি নিজ রাজধানী অম্বর নগরে আনাইয়া তথায় স্থাপিত করেন। কিম্বদন্তী এই যে মানসিংহ স্বয়ং প্রতাপাদিত্য-বিজয় অতীব দুরূহ

ব্যাপার জ্ঞানে উক্ত যশোহরেশ্বরীর আরাধনা করেন এবং দেবী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়া মানসিংহের প্রতি প্রসন্ন হন। এই হেতু প্রতাপাদিত্যের মান সিংহের হস্তে পরাজয় ঘটে।

এখন বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরীই আমেরের "সল্লাদেবী" বা শিলাদেবী কি না? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে ইহার অনুকূলে যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে এবং তৎসমুদয় খণ্ডন করা যাইতে পারে কিনা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতেছি :—

(১) অনুকূল যুক্তি :—

(ক) নামের কতকটা সাদৃশ্য।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয় যশোহরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥

জয়পুরে প্রচলিত নাম "সল্লাদেবী" বা শিলাদেবী ভারতচন্দ্র বর্ণিত "শিলাময়ী" নামের সহিত কতকটা মিল আছে।

(খ) বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল।

কথিত আছে দেবী অকৃপা করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়াছিলেন। দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তিতেও এই ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—অর্থাৎ মূর্ত্তির শিরোদেশ কিঞ্চিৎ বক্র হইয়াছিল। জয়পুরের আমের নগরস্থ শিলাদেবীমূর্ত্তির মস্তক বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ বক্র।

(গ) দেবীমূর্ত্তি রাজামানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত, এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পূজা চলিয়া আসিতেছে, এবং পূজারী বাঙ্গালী।

২। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে

আমেরের শিলাদেবী যশোরেশ্বরী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এখন দেখা যাউক এই সকলের কতদুর খণ্ডন সম্ভবপর।

(ক) নামের কতকটা সাদৃশ্য। 'শিলাময়ী' নামে দেবী মূর্ত্তি যশোর নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত কবিতা হইতে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে যশোরেশ্বরীর নাম "শিলাময়ী"। আমেরের দেবীর নামের সহিত কতকটা মিল আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। "শিলাময়ী" 'সল্লাদেবী' 'শিলাদেবী' নামের কতকটা মিল আছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা "কতকটা" মিলমাত্র এবং সেই নামের দেবী মূর্ত্তি যে অন্য কোন স্থানে থাকিতে পারে না, ইহাও কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়?

(খ) বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল। কি প্রকারের সাদৃশ্য, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের বিপক্ষে বলিবার কয়েকটী কথা আছে।

যেখানে যেখানে এই দেবীর বর্ণনা দেখা গিয়াছে সকল স্থলেই দেবীর "কালী" মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে। কোন কোন স্থলে স্পষ্টই 'কালী' বা "কালিকা" এই নাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

আমার স্বর্গীয় পিতামহের গ্রন্থে :—

"দেবী বরপুত্র রাজা কেবা আঁটে তাহাকে।
যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে॥

অপিচ ভারতচন্দ্রে "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

কিন্তু আমেরের শিলাদেবীর কালী মূর্ত্তি নহে—দুর্গামূর্ত্তি। ইনি অষ্টভুজা। যাঁহারা দেবী দর্শন না করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা, আমেরের শিলাদেবী কালীরূপিণী॥ কিন্তু এটী ভ্রম।

প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবতা কালী মূর্ত্তি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সমাজ নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"প্রতাপের জ্ঞান, নিষ্ঠাবত্তা, এবং ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট ছিল। তিনি কালীর সেবক ছিলেন। কালী সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন প্রতাপের

কালীসাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কথিত আছে যশোহরের (ধূমঘাট) নিকট বন মধ্যে রাজপ্রাসাদ হইতে দৃশ্যমান স্থানে রক্তবর্ণ শিখা গগনাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ প্রত্যাদেশ সূত্রে সেই স্থলে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যশোহরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখেন। প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। এবং দেবীর নিত্য সেবা ও পর্ব্বাহে বহুতর জন সমাগম হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরে প্রতাপ দিন দিন উন্নতি লাভ করায় সাধারণের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রতাপ দেবীর বরপুত্র, এবং প্রবাদ আছে যে যুদ্ধকালে কালী প্রতাপের সেনাপতির কার্য্য করিতেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে উক্ত আছে।

"বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

* * * * প্রতাপ ধূমঘাটে যে গৃহে রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া রাজ কার্য্য করিতেন তাহার সম্মুখ হইতে যশোহরেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গনের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত উত্তরমুখী একটি সরল প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এবং সভাগৃহ হইতে রাজা সর্ব্বক্ষণ দেবীর দর্শন পাইতেন। অতএব দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির নিশ্চয়ই দক্ষিণাস্য ছিল। মন্দির প্রাঙ্গনের নির্ম্মাণ কৌশলেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। প্রবাদ আছে যে বসন্তরায়ের হত্যায় দেবী রাজার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া মন্দির সহ পশ্চিমাস্য হইয়া যান এবং দেবীর অকৃপাহেতু

"বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া,
প্রতাপাদিত্য হারে।"

* * * * * নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাত দিবস পরে দ্বারোদঘাটনের জন্য দেবী রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজা সাত দিবস কাল ইষ্টদেবী সাক্ষাতে বঞ্চিত থাকিতে অসমর্থ হইয়া চতুর্থ দিবসে

দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখিলেন যে কেবলমাত্র দেবীর মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে রাজার ব্যস্ততা-বশতঃ দেবীর মূর্ত্তি পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি লোলবদনা মুখমণ্ডল মাত্র। দেবী জ্বালাময়ী। এজন্য তাঁহার উপরিস্থ ছাদে বর্ত্তমানকালে পাকা রন্ধনশালার উপরিস্থিত "আকাশালোক" (skylight) সদৃশ জ্বালানির্গম পথ নির্ম্মিত আছে। প্রবাদ এই যে প্রতাপ পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ম্মাণের পর রাত্রিতেই সে সমস্ত জ্বালাবেগে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রতাপ পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া যে জ্বালা নির্গমন পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সযত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে। দেবী প্রতিষ্ঠান্তে প্রতাপ দেবীর অধিষ্ঠান স্থানের নাম রাখেন ঈশ্বরীপুরী এবং সেই গ্রামের উপসত্ত দেবীর সেবার্থ অর্পণ করেন। যশোহরেশ্বরীর সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন।"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে কয়েকটী মূল কথা পাওয়া যায়ঃ—

প্রথম—প্রতাপাদিত্যের অভীষ্ট শক্তিমূর্ত্তি "কালী"রূপিনী— "দুর্গা"রূপিনী নহেন। কিন্তু আমেরের অষ্টভুজা শিলাদেবী "দুর্গা"মূর্ত্তি, "কালী"মূর্ত্তি নহেন। পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন জয়পুরে আসিয়া আমেরের দেবী দর্শন করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি মূর্ত্তি দেখিয়াই বলিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে দেবীর কালীমূর্ত্তি—কিন্তু অষ্টভুজা মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন যে উহা দুর্গামূর্ত্তি—কালীমূর্ত্তি নহে। পূজারীরাও তাঁহার সমর্থন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—দেবীর অর্দ্ধ প্রকটিত জ্বালাময়ী মূর্ত্তি। ছাদযুক্ত রুদ্ধ গৃহে অবস্থিতি সম্ভবপর নয় বলিয়া ছাদে জ্বালানির্গমন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই সকল বন্দোবস্ত আমেরে কিছুই নাই। এবং আমেরের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে গঠিত অর্দ্ধ প্রকটিত লোলবদনা নহে।

তৃতীয়—আমাদের যশোহর সমাজের বৃদ্ধ প্রবীন ব্যক্তিরা কেহই জানেন না মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে প্রত্যাগমন কালে যশোহরেশ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি উঠাইয়া আনিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বর নগরে প্রতিষ্ঠিত

করেন। পরন্তু, আজ পর্য্যন্ত যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—তথায় সেবাইতগণ প্রাচীন কালের দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি সমাচারই সকলেই জানেন।

চতুর্থ—দেবীর 'বাম' বা 'বিমুখ' হওয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে দেবীর প্রতাপাদিত্যের প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু কেবল যে মুখ ও মস্তক বক্র হইয়াছিল তাহা নয় পরন্তু প্রবাদ এই যে দক্ষিণাস্য দেবী মন্দিরসহ পশ্চিমাস্য হইয়াছিলেন।

'ঘটককারিকা', 'অন্নদামঙ্গল'।

রামরামবসু :—'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে যে প্রসঙ্গ আদৌ নাই, অদ্যাবধি আমাদের যশোহর বঙ্গজ সমাজে যে প্রসঙ্গের বিষয় প্রাচীন লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রসঙ্গের বা অনুমানের মূল কোথায়। যশোহর সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক স্থানে আজিও যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পুরাতনকালের সেবাইতগণ আজিও পুরাতন দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তবে এ কথা কোথা হইতে আসিল যে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী? অধুনাতন বাঙ্গালী ভদ্র লোক পর্য্যটকগণের এটী অনুমান মাত্র। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও (আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে) এই ভ্রমের প্রচারপক্ষে সহায়তা করিয়াছেন।

এই ধারণা যে সহজেই জন্মিতে পারে তাহার আলোচনা করিতে গেলে (গ) সংখ্যক যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। দেবী মূর্ত্তি অম্বর নগরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত; পুজা পদ্ধতি বঙ্গীয় রীতি অনুযায়িক; এবং পূজারি বাঙ্গালী। এই তিনটী বিষয় হইতে একেবারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে 'শিলাদেবী' প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী। "বিদ্যাধর" প্রবন্ধে মেঘনাথ বাবু উক্ত তিনটী বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তিনটী বিষয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও এই সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা কিরূপে জানা যায়?

বরং সিদ্ধান্ত যে সত্য নয় তাহার অনুকূলে এখানকার দলীলাদিই প্রমাণ্য আমার বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য যে "বংশাবলীর" উল্লেখ করিতেছেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত "বংশাবলী" খানি প্রথমতঃ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও জয়পুর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রাপ্ত হয়েন। এবং তৎসঙ্গে আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে পুরাতন পাট্টা প্রভৃতির দলীলও পান। পরে সেই কাগজগুলি মেঘনাথ বাবু পান। এবং তাহার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া মেঘনাথ বাবু সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং উক্ত "বিদ্যাধর" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রথমতঃ "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মন প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইয়াছে। তিনি এখনও ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। নতুবা—

"কেদারকায়ত=পরতাদীপ=প্রতাপাদিত্য।

এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়" এরূপ লিখিবেন কেন? সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক টিপ্পনী লিখিয়া উক্ত গোলযোগ ঐ ভাবে মিটাইবার পক্ষে বাধা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কেদার কয়েতকে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বার ভুঁয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।"

নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তই সমীচীন। অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় দুইজন পৃথক ব্যক্তি। মেঘনাথ বাবু "প্রতাপাদিত্যবিজয় ও শিলাদেবী আনয়ন ব্যাপার" ঘটিত আখ্যানের কথিত "বংশাবলী" হইতে যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই পত্রের কলেবর পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। উক্ত "বংশাবলীর" বিবরণ যে স্থূলতঃ প্রামাণ্য, তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া এই পত্রের উপসংহার করিব।

রাজস্থানের ইতিহাস ভট্টগ্রন্থ ও চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত। মহাত্মা

টড চারণদিগের যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া গিয়াছেন। টডের পুস্তক অনুসরণ করিয়া এবং চারণদিগের মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চারণবংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি জয়পুর রাজপুত স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার। তাঁহার পুস্তক হইতে এক অংশ উদ্ধার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার হিন্দি ভাষা সহজেই বোধগম্য হইবে। দুই এক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে অর্থও লিখিয়া দিলাম :—

'তখ্‌ত পর বৈঠ্‌ কর সলীমনে অপনা নাম জাহাঙ্গীর রখ্‌খা। উস্‌নে মানসিংজী কো বঙ্গালে কে পূর্ব্বীপ্রান্ত মেঁ জো হিন্দুয়োঁকে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) রাজ্য থে, উন্‌কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংহ জীনে পূর্ব্বী বঙ্গালমে পঁহুচ্‌ কর্‌ পহিলে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রাজ্য পর চড়াই কী জিস্‌কী সেনামে হাথী বহুৎ থে; প্রতাপাদিত্যকে সাথ জো লড়াই হুই, উস্‌মেঁ মানসিংহজীকে ছোটে কঁবর (কুমার) দুর্জ্জনসিংজী কাম আয়ে (মারা পড়েন) ঔর প্রতাপাদিত্যজী জীতা পকড়াগয়া। মানসিংহজী নে উসকো ধীর্জ বন্ধয়া। (আশ্বাস দিলেন, ধীর্জ ধৈর্য্য) ঔর কহা কি আগরে চলকর তুম্হারা রাজ্য তুম্‌ কো হী দিলা দুংগা। পরন্তু দীন প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্‌ কর মার্গমেঁ হী (মার্গ-পথ) কালবশ হুয়া (কাল প্রাপ্ত হইলেন)। মানসিংহজী নে উস্‌কে ভতীজে (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরিরায় কো উস্‌কা রাজ্য দিলায়া।

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুদ্র কী ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্‌ গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হয়) তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি করলেনা; মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া মানসিংহজীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহ কা পাদসেবী বনা কর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে ॥

* * * সল্লাদেবী কো মানসিংহজী বঙ্গালেমেঁ সে লায়েথে। বংশাবলিয়োমেঁ (চারণ দিগ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী) লিখা মই কি দেবী নে মান-

সিংহজী সে কহা থা "মৈঁ তুম্হারে যাঁহা (তোমার স্থানে বা নিকটে) তব তক্ হী রহূংগী জবতক্ তুম ঔর তুম্হারী সন্তান মুঝে নিত্য এক ছাগ কা বলি দেতে রহোগে, জব তক মৈঁ তুম্হারে যহা রহূংগী তব্ তক্ তুম্হারে বা তুম্হারী সন্তানকে রাজ্য কো কিসী প্রকার কা ভয় নহী হৈ।" ইস্ দেবী কা মন্দির আম্বেরকে গড়মেঁ বনা হুয়া হৈ; পূজারী বঙ্গালী হৈ। ঔর অদ্যাবধি নিত্য মূর্ত্তিকে সামনে এক ছাগ কা বলি হোতা হৈ।" (ইতিহাস রাজস্থান, ১০৩।৪ পৃষ্ঠা)

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ মানসিংহের রাজত্বকাল বর্ণনা করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন—

"Oosman, Oomar, Meroo, Hakim Khan, Kutloo Khan, Isa Khan and other Pathans had raised a rebillion in the eastern part of the empire, such as Jagannath Puri &c. Mansingh quelled all these. Now he advanced by sea to the country of Brahmaputra where he defeated the Raja of the land and took the country.

After this he defeated the Kayastha Raja Kaidar Nath (a Shaktik by religion and a favorite of Silla Devi) of Oodey. He then restored his *raj* to him and brought with him the idol of Silla Devi with promises that he would offer the usual sacrifices to it."

আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'বংশাবলীর' উল্লেখ চারণ রামনাথ কৃত পুস্তকে আছে। এবং ঠাকুর ফতেসিংহও "বংশাবলী" অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা শুনা যায়।

এই দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লিখিত আখ্যান অবশ্যই প্রামাণ্য। তবে সকল কথাই যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তাহা বলা যায় না। অন্যান্য কথার আলোচনা এস্থানে না করিয়া মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে প্রতাপাদিত্য বিজয়কালে মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার পাণি

গ্রহণ করিয়া ও তাঁহার ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া সন্ধি করেন, এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

দ্বাদশ ভৌমিকের বৃত্তান্ত সুবিস্তর ভাবে লিখিত হইলে কালে কেদার রায়ের বৃত্তান্তও লিখিত হইবে আশা করা যায়।

আজ এই বিষয়ে আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই।

প্রতাপাদিত্য গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছি এই বিরাট সংবাদ ত তোমার "ঐতিহাসিক চিত্রের" সংবাদ স্তম্ভে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়া দিয়াছ। ঈশ্বরেচ্ছায় সে ইচ্ছা ফলবতী হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু হইবে কি না, "প্রশ্ন ইহাই এখন।"

ভাল কথা, ঠাকুর ফতেসিংহ প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ না করিয়াই তাঁহার রাজ্যকে the country of the Btahmaputra বলিয়াছেন। এই বর্ণনা অতিসংক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে।

"Raja Kaidar Nath of Oodey." এই "উদয় তাহা হইলে কেদারনাথের রাজধানী। এই স্থান কোথায় কোন সন্ধান লইতে পার কি?

চারণ রামনাথ বারেট লিখিয়াছেন—প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র হরিরায়কে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হয়। একথা কতদুর সঙ্গত? কচুরায় "যশোহরজিৎ" উপাধির সহিত রাজ্য পাইয়াছিলেন। এই ত জানি। এই "হরিরায়ের" কথা তাহা হইলে কি ভুল?

ভরসা করি সমস্ত বিষয়ে আলোচনা তোমার দ্বারা অতি পরিপাটিরূপে সম্পন্ন হইবে।

এপ্রেল মাসের পত্রের প্রত্যুত্তর জুন মাসে লিখিতেছি। অপরাধ লইবে না। আমি এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিলাম না, চিন্তা ও অনুসন্ধানে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি, এবং "তৈলেন্ধন চিন্তার" ও পীড়ার যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছি। এখানে প্লেগের নূতন আবির্ভাব হওয়াতে খুব হৈ চৈ হইয়া গেল। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি তোমার—শ্রীনবকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় — জয়পুর ১০ই জুন

প্রিয় নিখিলনাথ—

প্রথম পত্র পাঠাইবার পর, বংশাবলীর মূল পাইয়াছি, তাহা জয়পুর ভাষায় লিখিত। উক্ত বংশাবলী নামক হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মানসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল-বিজয়-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল। ইতি

নবকৃষ্ণ

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহুঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মেঁ বা বণারস কাশীমেঁ জার অমল কীনু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো। পাছে পটনামেঁ জা অমল কীনু ওর উঁঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজীমে পৈঁতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পঠান জগন্নাথজী মাঁহু ছো। জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীস্থঁ জার জগড়ো করি। ফতে পাই। উঁকা সারা রাজ মেঁ অমল কীনু। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধান স্থূ পূজন করায়ো। ওর স্থাপন করা্। ওর পাছে উমর ছা জীঠে গয়া। সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীর্রূ গয়া; ওর মীর্রূস্থঁ জগড়ো করি। মীর্রূ মে অনল কীনু। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ওর কুতল মেঁ অমল কীনু সারী পুরব মেঁ অমল কীনু। অর পুরব মাহুঁ ঈসন খাঁ পঠান ছো। জীস্থঁ জগড়ো কীনু, সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ সমুদ্র পার গয়ো। পাছে উঠা স্থঁ চঢ্যা সো কোম সাটি কা চালা, ব্রহ্মপুত্র গয়া, অর রাজা পরতাপদীপ স্থ জগড়ো কীনু, অর ফতে পাই। অর পরতাপদীপকো গড় ছো জীনেঁ খোস্‌লীনো। অর বেটো দুরজন সিংঘজী মানসিংঘজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রাব পরতাপদীপ্ কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ সরঞ্জাম

ভৌৎ ছো। জীসূঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতা কা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিংহজী পুছী—ইসো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাস্তে হোম উগরৈছু করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন হুই। অর কেদার রাজা সূঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজী হোয় কহসী সো তুজা—জদি জাস্যূ। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী। অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈয়ঁা তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছল লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সবুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছৈ। সো উঁঠা সূঁ কাট লীজ্যো মেহ তোসূঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মানসিংহঘজী কোঠৈ ভেজ্যো সো দীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মঁাগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনূ। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব সূঁ কাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো জী মঁাফক পূজন করূঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজ্যবণ্যো রহসী। অর মেঁভী রহস্যোঁ। জীঁ দিন বলদান রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা সূঁ কূঁচ করি আয়া"।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনী-পুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে

মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টী শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন।* পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরূ গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরূ অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকীম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্ব্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পরতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা"

তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন. "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।

"বংশাবলী" পুঁথির কিঞ্চিৎ পরিচয়"

এই হস্ত লিখিত পুঁথির সঙ্কলয়িতা কে, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থের সূচনায় এইরূপ আছেঃ—"শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীমাতাজী সদা সহায়। অথ কচ্ছবাহা কী বংশাবলী লিখ্যতে॥ দোহা॥

গুরুগণপতি অরু সারদা ইন্‌কো করি প্রণাম

কচ্ছবংসা রাজা ভয়ে কহোস তিনকে নাম"

এইরূপ একটু সংক্ষিপ্ত মঙ্গলাচরণের পর রাজপুতদিগের "কচ্ছাবহ" শাখার রাজগণের ধারাবাহিক বিবরণ আরব্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বা উপসংহারে—কোন স্থানেই সঙ্কলয়িতার নাম, বা গ্রন্থসঙ্কলনের সময় উল্লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের একখানি অবিকল নকল এবং মাড়ওয়ারী ভাষা (জয়পুরী) সহজে বোধগম্য হয় না বলিয়া ইহার একটী আধুনিক হিন্দু অনুবাদ, আমি ২।১ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি

ফল কথা, এই গ্রন্থের জয়পুরী ভাষা এখনকার লোকের নিকট আদৌ দুর্বোধ্য নহে। এমন কি, আমি এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া স্থানীয় চলিত জয়পুরী ভাষা যতটুকু শিখিয়াছি, তাহাতেই ইহা মেটামুটি এক প্রকার সমস্তই বুঝিতে পারি। এবং গ্রন্থের উপসংহারে সম্বৎ ১৮৯১ সালে মহারাজা রামসিংহ রাজা হইলেন, এই সমাচারও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়ে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে বহুকাল হইতে এইরূপ 'বংশাবলী' লেখা চলিয়া আসিতেছে, এবং যাঁহার যাঁহার নিকট এইরূপ 'বংশাবলী' আছে তাঁহারা সকলেই ঐ সকল "বংশাবলীতে" অধুনাতন ঘটনাবলি পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ যে "বংশাবলী" খানি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার ভাষা ও লিখন প্রণালী আধুনিক জয়পুরী ভাষা হইতে কিছুই ভিন্ন নহে।

এ বিষয়ে চারণবংশোদ্ভূত রামনাথ বারেট—যিনি হিন্দীভাষার "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় জয়পুরের

ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ সংগ্রহ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন—এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

"অচরোলকে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী সাহেব সে জয়পুর কা ইতিহাস লিখনে কে লিয়ে এক বহুৎ অচ্ছী বংশাবলী মিলী। দুসরী বংশাবলী জয়পুর কী রাজাজী নরসিংহদাসজী সাহেব নে দী; তীসুরী হুণুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ চারণ বালাবখ্‌সজী নে, চৌথী, বীরদাকে ঠাকুর সাহব কিশোর সিংহজী নে, ঔর, পাঁচব, আম্বেরকে জগৎশিরোমণিজীকে মন্দিরকে পুজারী বসন্তলালজী ব্রাহ্মণ নে দী; ইনমেঁসে প্রথম তীন তো একহী পুস্তক কী পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রতি, অর্থাৎ উন্‌ তীনোমেঁ একসা বৃত্তান্ত থা, কিসী মেঁ কুছ ন্যূনাধিকতা নহী থী। বীরদে ঠাকুর সাহব নোজো বংশাবলী দী, বহ সবসে বিলক্ষণ থী; উসী মেঁ কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনে কা সম্বৎ ৯৩৩ দিয়া হৈ। ইস্‌ বংশাবলীসে ঠিক্‌ ঠিক্‌ মিলতী দুসুরী বংশাবলী পাঠোদাকে ঠাকুর সাহব জুহারসিংহজীকে পাস থী, উস্‌মেঁ ভী কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনেকা সং ৯৩৩ দিয়া হৈ। যেহী দোনো বংশাবলী সত্য প্রতীত হোতী হৈঁ। ইস্‌ বিষয়কা এক নোট ভী জয়পুরকে ইতিহাসকে প্রারম্ভ মেঁ দিয়া হৈ। সো ধ্যান দেনে যোগ্য হৈ। পুজারী বসন্তলালজী কী বংশাবলী মেঁ বহুৎ স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখা হৈ বহ বহুৎ প্রমাণীক প্রতীত হোতী হৈ। ইন সব বংশাবলিয়োঁ কো পরতাল পরতাল কর জয়পুর কা ইতিহাস লিয়া হৈ; ইন্‌ সব সাহিবোঁ কা মৈঁ বহুৎ উপকার মানতা হুঁ। শোক হৈ কি গত গ্রীষ্ম ঋতুমে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী কা শরীর বর্ত্ত গয়া"।

এই গ্রন্থ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এবং মুদ্রাঙ্কনের সময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখন সমাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে এই প্রকারের কয়েক খানি ভিন্ন ভিন্ন 'বংশাবলী' ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে।

১। আচরোনের ঠাকুর সাহেব রঘুনাথ সিংহের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

২। জয়পুরের রাজা নরসিংহ দাস সাহেবের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

৩। হণুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ চারণ বালাবক্সের নিকট একখানি।

৪। বীরদার ঠাকুর সাহব কিশোর সিংহের নিকট ১ খানি।

৫। আমেরের জগৎশিরোমণিজীর মন্দিরের পূজারী বসন্তলালজী ব্রাহ্মণের নিকট একখানি।

৬। পাঠৌদার ঠাকুর সাহেব জুহার সিংহজীর নিকট ১ খানি।

ইহার মধ্যে প্রথম তিন খানি একই জিনিস—ভিন্ন ভিন্ন নকল মাত্র। ৪র্থ এবং পঞ্চম খানিতে স্পষ্ট স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই দুই খানির বিশেষ আদর করিয়াছেন। এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যে 'বংশাবলী' গ্রন্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—উহা সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত তিন খানির অন্যতম। জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহও খুব সম্ভবতঃ এই খানিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

সব গোল চুকিয়া যায় যদি জয়পুর রাজকীয় ইতিহাস লিখন বিভাগ হইতে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এই বিভাগে পুরাকাল হইতে জয়পুরের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে ইতিহাসস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

বীর কাহিনী।

বা

ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ। *

ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের যেরূপ একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, ফরিদপুর সম্বন্ধে কখনও সেইরূপ আশা করা যাইতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাই মোগল আমলের সরকার ফতেয়াবাদ, চাকলে ভূষণা ও চাকলে জাহাঙ্গিরনগরের কিছু কিছু লইয়া ইহার সংগঠন। কোম্পানীর অধিকারের প্রথম সময়ে উহা ঢাকা এবং যশোহরের মধ্যে বিভক্ত হয়; পরে ঢাকা জালালপুর নামে একটা জেলার নামকরণ হইয়া ঢাকাতেই উহার সদর নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঢাকার জন্য একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ও ঢাকা জালালপুরের জন্য একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট কলেক্টার নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুরের মাজেষ্ট্রেটী কালেক্টারী ঢাকা হইতে ফরিদপুর উঠিয়া আইসে, এই সময় চন্দনা নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ যশোহর হইতে খারিজ হইয়া ফরিদপুরে পরিবর্ত্তিত হয়। পদ্মার পূর্ব্বতটবর্ত্তী জাফরগঞ্জ এবং নবাবগঞ্জের থানা কতককাল ফরিদপুরের মধ্যে থাকিয়া পরে ঢাকার অধীনে হয় আবার বাখরগঞ্জের অন্তর্গত গোপীনাথপুরের থানা যশোহর হইতে ভূষণ ও মুকসুদপুর থানাদ্বয় এবং পাবনা হইতে পাংশা খারিজ হইয়া ফরিদপুরের মধ্যে আইসে।

প্রথমতঃ এইরূপেই জেলার সংগঠন হয়, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদারিপুর

* এই প্রবন্ধটী ১৩১২ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সাহিত্যপরিষদে পঠিত হয়।

সবডিভিসন বাখরগঞ্জ জেলা হইতে ফরিদপুরের অধীন হইলে উহা একটী প্রকৃত জেলাতে পরিণত এবং তৎপর হইতেই তথায় একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ নিযুক্ত হয়।

পূর্ব্বে মুনফৎগঞ্জের থানা ঢাকার জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা বাখরগঞ্জ ভুক্ত হইয়া মাদারীপুর সবডিভিসনের মধ্যে যায়। এখন মাদারিপুরের সহ উহাও ফরিদপুরের এলেকা ভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মুনফৎগঞ্জ নামের পরিবর্ত্তে পাংশা ষ্টেসন নাম হইয়াছে।

বলিতে গেলে ভূষণা ও পালং থানাই জেলার প্রাচীন অংশ; যদি কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক বা কীর্ত্তির বিষয় সংগঠিত হইয়া থাকে তবে ঐ দুই ষ্টেসনের অন্তর্গত স্থানেই তাহা অধিক পরিমাণে হইয়াছে। ভূষণার মুকুন্দ রায়, সংগ্রাম সাহ ও সীতারাম রায়ের নাম আজ কাল কে না অবগত আছেন? বিক্রমপুরের কথকাংশ এবং ইদিলপুরের কথকাংশ লইয়া পালং ষ্টেসন, এই বিক্রমপুরের চাঁদরায়, কেদার রায় এবং রাজবল্লভের পরিচয় কাহার অবিদিত? আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই সকল মহাত্মাগণের এবং অপরাপর কতিপয় ঘটনার সজ্ক্ষিপ্ত বীরোচিত ইতিহাস মাত্র এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইলাম। এতৎ সম্বন্ধে অধিক বাক্যবিন্যাস অনাবশ্যক।

আকবর সাহের শাসনের ২৮ বৎসরে (১৫৮৩ খৃঃ) প্রথম আমরা ফতেয়াবাদের নাম প্রাপ্ত হই। এই সময়ে খানি আজাম মীরজা কোকা বাঙ্গলা ও বিহারের বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত ছিলেন। মাশুম কাবুলী ও কতলু লোহানী বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঙ্গার নিকট উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

"রাজকীয় সৈন্য শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া একমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। প্রত্যহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইত, উভয় পক্ষেই যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে বিদ্রোহীদের কোন ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় রাজকীয় সৈন্য জয়লাভ করে। এই সময়ে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কাজীম জাদা নামক কোন নেতা ফতেয়াবাদ হইতে অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ এবং কামান বন্দুক

লইয়া পৌঁছেন, কিন্তু তিনি বিপক্ষের কামানের গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে সাহমলার আজ্ঞাক্রমে কালাপাহাড় তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন"। *

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এক সময়ে ফতেয়াবাদের শক্তি কম ছিলনা, আত্মরক্ষণোপযোগী যুদ্ধ জাহাজ কামান বন্দুক ইত্যাদি তাহারা অপনারাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। ঐরূপ কারিকরের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল, "জাহানকোষা" কামান ঢাকার কর্ম্মকারের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে এই সরকারের ৩১ মহালে ৭৯৬৯৫৬৭ দাম কর আদায় হইত। ৯০০ রণতরী এবং ৫০৭০০ সৈন্য এক প্রকার যাইতে পারিত।

আকবর বাদসাহের রাজত্বে ফরিদপুরের অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় একটী সমরাভিনয় দেখিতে পাই। কেদার রায়ের সহিত মোগল সেনাপতি মানসিংহের এই সঙ্ঘর্ষণ হয়।

বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্ব প্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায় তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রপ্য। ঈশা খাঁ মসনদ আলী সর্ব্ব প্রধান ছিলেন বটে কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায় ভূষণার মুকুন্দরায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। আকবরনামাতে কেদার রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জানিনা প্রতাপাদিত্যের নাম উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি এখন দেখা যায়, যে শীলাময়ী মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে জয়পুর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গেল, তাহাও প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই

* ইলিয়ট ৬৭ পৃষ্ঠা। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, কোনটী বা একেবারে ভগ্ন কোনটীর নাসিকা ও কর্ণ ভগ্ন। উহা বাদসাহের কাণ্ড বলিয়াই শুনা যায়। বোধ হয় এই সুযোগে কালাপাহাড় একবার ফতেয়াবাদ আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিল।

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক কেদার রায় যে একজন প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন ও বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কেদার রায় ও ইশাখাঁ এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই সময়ে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বিপুলবাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মোগল সেনাপতি বাজ বাহাদুর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুর উপনীত হন। কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহের নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। রাজা মান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য বাজবাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করেন বটে কিন্তু তাহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। * সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী শীলাময়ীকে মানসিংহ জয়পুর লইয়া যান এবং স্বয়ং কেদার রায়ের একটী কন্যাকে গ্রহণ করেন †

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বৎসরে ১৬০৩ খৃঃ পুনরায় কেদার রায় মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ইশা খাঁর বিবাদ। ইশা মোগল পদে মস্তক অবনত করিয়াছে,-এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন করিয়া কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণপ্রয়াসে বদ্ধপরিকর। কেদার রায় পাঁচশত জাহাজ সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন, এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু মানসিংহ পুনরায় বহু সৈন্য সহ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন। আকবরনামাতে দেখা যায় কেদার রায় ভয়ানক যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হন—কিন্তু মানসিংহের নিকট আনীত হইবার অল্প-

* ইলিয়ট ১০৬ পৃষ্ঠা বালাম ৩।

† মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্যপারিষৎ পত্রিকা।

কাল পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরভোগ্য সুরলোকে প্রস্থান করেন। *

দেশী প্রবাদ অনুসারে জানা যায় রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণবংশীয় শ্রীমন্তল খাঁর প্ররোচনায় মানসিংহ গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করিয়া সেই পরাক্রমশালী বীরকেশরীকে গোপনে হত্যা করেন। যে স্থানে এই যুদ্ধাভিনয় হয় তাহার নাম নগর ফতেজঙ্গপুর। উহা পালং ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে উত্তরাংশে অবস্থিত।

কেদার রায়ের পরই আমরা ভূষণার মুকুন্দ রায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। আকবরনামাতে ইনি মুকুন্দ জমিদার নামে অভিহিত হইয়াছেন। কুতুলখাঁর আক্রমণ হইতে সলিমাবাদের শাসনকর্ত্তা মীর জানদাদ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবরনামাতে এপর্য্যন্তই পাওয়া যায়। এই সময়ে মুকুন্দ মোগলবাদসাহের অধীন ছিলেন, পরিণামে কিন্তু তিনিও মোগলদ্রোহী হইয়া মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাস্ত ও হত হন।

মুকুন্দ রায়ের পর ভূষণার সংগ্রাম সাহের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হন এবং বাদসাহ আরঙ্গজেবের অধীনে থাকিয়া মাড়োয়ারের রাঠোর এবং সাহাবাজপুরের মগদিগকে দমন করিয়া বাদসাহের নিকট ভূষণাচাকলার অনেক স্থান জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। † পরে তাহার বংশধরগণ বিদ্রোহী হইলে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে, নবাবী সৈন্যসহ ভূষণায় আগমন করিয়া তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সীতারাম রায়ের অমানুষিক বীরত্বের কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। নব্যাবসেনাপতি আবু তোরাব ইঁহার হস্তে নিহত হন। পরে মুর্শিদ

* ইলিয়ট ১১৬ পৃষ্ঠা আকবর নামা।

† কবি কণ্ঠহার কৃত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা, ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর নামা হইতে ধৃত কলিকাতা রিভিউ, মিঃ বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, টড কৃত রাজস্থান দেখ।

কুলি খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তিনি নিহত হন। তাঁহার জন্মস্থান ভূষণার নিকটবর্ত্তী গেপোলপুর গ্রামে, এই হিসাবে ফরিদপুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি সমুদয়ই মামুদপুরে হইত, সেই জন্য যশোহর তাঁহার লীলাক্ষেত্র মাত্র।

ভগবানের রাজ্যে অত্যাচারীর পতন সুনিশ্চয়, তবে দুদিন অগ্রে আর দুদিন পশ্চাতে; ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়, রাজাই হউন প্রজাই হউন, অত্যাচার অবিচার যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই আপনার পতনের পথ সেই কালেই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চনীচ কাহারও এই বিধান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের বিলয়ে রাজতন্ত্রের সংস্থাপন হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দ্বারা আমরা এ বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করিব।

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার ভরদ্বাজ চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাঁহার হস্তেই ঐ জমিদারী ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিলেন। শুনা যায় ইঁহারা সাড়ে সাত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটীর নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল,

একদা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাঁহাদের পদধূলি বাড়ীতে পড়িলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বশ্রেণীয়দিগকে এখন আর তাঁহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্ব কেবল কৌলীন্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এতকাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, এখন আবার তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, আবার পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল, তন্মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতিলাভে অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি ও এক সময় বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনার ও সোমকাটের ভুঞা এবং সরকার। কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে মালখানগরের বসু বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

বসু মহাশয়দের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা উন্নত হইতেছিল, কিন্তু একাকী প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের সহিত এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন যাইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে সুবেদার সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের আবার জমিদার পক্ষ

হইতে তাহাদের বোট ও বাইচের নৌকা ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত হইল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত হইলেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর কাতর ক্রন্দনে, ঘালেব আলিখাঁ ও যশোবন্ত রায় ব্যথিত হইলেন, প্রজারা বলিল যদি অতঃপর আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইহার পর রাজাজ্ঞাও প্রচার হইল, অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবে তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন সংস্রব থাকিবে না। যেমন হুকুম প্রচার অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া স্ব স্ব জমা জোত সম্বন্ধে নবাব সেরেস্তায় নাম পত্তন করিয়া লইল।

সেই দিন হইতে নয়পাড়ার রাজলক্ষ্মী চির অন্তর্হিত হইলেন, এ দিকে বিক্রমপুরের প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনতা লাভের সহিত দিন দিন উন্নতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ বিক্রমপুরের যে এতটা উন্নতি দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ জমিদারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ। দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের রাম রাজ্যের ফল বিক্রমপুরবাসিগণ অদ্যাপি সম্ভোগ করিয়া সেই মহাত্মার আত্মার চির কল্যাণ কামনায় কীর্ত্তিনাশার উভয় তীর হইতে সমভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। আর যে বীরগণের স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগে এই দাসত্বের মোচন, তাঁহারা সমুদয় বিক্রমপুরবাসিগণের নিকট অদ্যাপি দেববৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। অতঃপর আর কোন প্রবল পরাক্রান্ত বীরের বিবরণ ফরিদপুরের কোনস্থানে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তৎপর হইতে ক্রমে পরাক্রমের পরিবর্ত্তে পদলেহনের পালা আরম্ভ, কিন্তু তথাপি একেবারে যে শক্তি সামর্থ্য হীন হইয়া বঙ্গবাসীরা আধুনিক বাবুদের মত "তেড়ি, কোট, চসমা, বুট", অবলম্বনে বীরোচিত গণ্ডুষ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ভাবিবার কথা নয়। তৎসময়েও এমন সকল মহাপ্রাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য পাইলে অম্লানবদনে সমরানলে আপন জীবনাহুতি প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

পরে যদিও রাজশক্তির প্রতিকূলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাহাকেও পদক্ষেপ

করিতে দেখা যায় নাই, কিন্তু স্বার্থসংরক্ষণের জন্য জমিদারে, জমিদারে; প্রজায় জমিদারে; এইকালে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি হইত। "যার লাটি, তার মাটি," এই কথা তৎসময় পর্য্যন্ত সাধারণের বীজমন্ত্র ছিল।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ে এইরূপ একটী ভয়ানক দাঙ্গা বা যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে, যাহাতে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ স্বীয় স্বীয় শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে জীবনদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

মহারাজা রাজবল্লভ যে সকল জমিদারী তাঁহার জীবিতাবস্থায় অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম সময় পর্য্যন্তও তাবৎ সম্যক নিষ্কণ্টক হয় নাই। বর্ত্তমান মাদারিপুরের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুর পরগণার নাম তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কার্ত্তিকপুরবাসী মুসলমান জমিদারেরা বহুকাল পর্যান্ত ঐ পরগণা বেদখল রাখেন। পরে রাজা গোপালকৃষ্ণের সময়ে ঐ পরগণা হস্তগত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন হয়।

রাজপক্ষ হইতে দ্বি সহস্র সৈনিক কার্ত্তিকপুরের দিকে অগ্রসর হয়; এই সৈন্যগণ যথায় বিশ্রাম করিয়া প্রথম আক্রমণের পরামর্শ করে, তাহার নাম হয় "যুক্তিওলা।" ঐ স্থানটী এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্যামাই বাঘ নামক কায়স্থজাতীয় এক রাজকর্ম্মচারী এই দলের নেতা ছিল। এদিকে মুন্সীদের পক্ষেও প্রায় ঐ পরিমাণের লোক, রাজপক্ষকে বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকে।

রাজপক্ষীয়েরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া কার্ত্তিকপুর বেষ্টন করিয়া ফেলিল; এই সময়ে মুন্সী ইমামদ্দীন কার্ত্তিকপুরের জমিদার ছিলেন। মুন্সী তৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে রাজপক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করেন, তাহারা বলে অদ্য দিন ভাল নয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চয়, কিন্তু মুন্সী সাহেব তাহা কোনমতেই মানিলেন না, তদ্বংশীয়া একটী বীরললনা এই সময় উপস্থিত হইয়া, সৈন্যাধ্যক্ষকে যথোচিত কটুবাক্য বলিতে লাগিল, তাহাদের আর সহ্য হইল না; তাহারা এই বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিল, হয়ত অদ্য রাজসৈন্য সম্যক্ হত করিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, অন্যথায়

আমাদের এমন একজনও থাকিবে না, যাহাদের নিকট তোমরা, জয় পরাজয়ের সংবাদ অবগত হইতে পারিবে।

প্রাতঃ সময় এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ দিবারাত্রি উভয় পক্ষের সমভাবে অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা চলিয়াছিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী রাজপক্ষের অঙ্কশায়িনী হওয়ায়, প্রতিপক্ষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। উভয়পক্ষের প্রায় সহস্র লোক হতাহত হইল। সম্মুখবর্ত্তী যমুনা নদীর নীল জল রক্তিমাভা ধারণ করিল, এই ভয়াবহ যুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গের বহু হিন্দু মুসলমান বীর স্ব স্ব প্রাণান্ত করিয়া স্ব স্ব পক্ষের কল্যাণসাধনে ও প্রতিপক্ষের জীবনহননে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সাম্রাজ্যের রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে এইটী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত। বাঙ্গালীর বীরত্বের একটা দৃষ্টান্ত বহুযুগ পর্য্যন্ত লোকসমাজের অন্তঃস্তলে চিরনিবদ্ধ থাকিত, ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিত। যেরূপ গভীর বিক্রম এই সময় উভয় পক্ষ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, চাঁদরায়ের পতনের পর এতদঞ্চলে আর তদনুরূপ হইয়া উঠে নাই। শুনিয়াছি এরূপ বহু ছিন্নমস্তক সংগৃহীত হইয়া রায় গোপালকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করা হয়। রায় বাহাদুর ঐ মুণ্ডনিচয় একত্রিত করিয়া তদুপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রণদক্ষিণা নামে কালী সংস্থাপন করেন। লেখক স্বয়ং ঐ মঠ এবং কালীর ঘট সন্দর্শন করিয়াছেন।

যৎকালে ঐ দাঙ্গা হইয়া বহু লোকক্ষয় হয় তৎসময় দেশের রাজা কোম্পানি বাহাদুর, তাঁহারা এই সংবাদ অবগত হইয়া মূল বিবরণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে তাঁহাদের মতে রায় গোপালকৃষ্ণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ হয় যে, তাঁহাকে আড়াই ঘণ্টা কয়েদ থাকিতে হইবে, অবশ্য এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। কিন্তু দেশীয় জমিদারগণমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই দিন সকলেই বিবেচনা করিলেন যে, দেশের মাটী বা মনুষ্য আর তাহাদের আয়ত্ত নহে, সমুদয় কোম্পানি বাহাদুরের। জমিদারের মানসম্ভ্রম আর থাকে না। এমনকি প্রতি পক্ষ মুন্সী ইমামদ্দীনের নিকট তাহার কর্ম্মচারিগণ বড়ই সন্তোষের সহিত এই ঘটনা

প্রকাশ করিলেন। ভাবিলেন এজন্য তাঁহারা নিশ্চয় পুরস্কৃত হইবেন। কিন্তু ফল বিপরীত ফলিল। 'ইমামদ্দীন' শুনিবামাত্র কি রাজা বাহাদুরের জেল! তবেত আর মানসম্ভ্রম থাকিবে না, এই কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি যে পতিত হইলেন তাহাতেই তাঁহার মহাপতন হইল। কোথায় শত্রুর মর্য্যাদার হানি শুনিয়া হৃষ্ট হইবেন, না, তাহাই তাঁহার মনোকষ্ট ও মৃত্যুর কারণ হইল। যাঁহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে তিনি মানীর মানের যে পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? *

বোধ হয় যাঁহারা কোম্পানির রাজত্বপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাদের মনে বিশ্বাস ছিল, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা সসম্মানে এবং বিষয় সম্পত্তি লইয়া ইংরাজ আমলে সুখে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহাদের অত্যাচার অবিচারের দিন রাজস্থানীয় কোম্পানি বাহাদুর কোন লক্ষ্যই করিবেন না। কিন্তু পরিণামে তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ আপনাদের ভ্রম অচিরেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল বিষয় ভাবিয়া সেই মহাভাগ মুসলমানবীর এই অধঃপতিত নরক স্থান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর হইতেই দিন দিন কোম্পানীর পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেশীয় লাঠিয়ালগণও তৎপোষক জমিদারগণ মেলেরিয়াপ্রপীড়িত রোগীর ন্যায় ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল, ক্রমশ সহ্য করাইয়া ইংরাজাধিকারের শত বৎসর পর যে কালে নূতন পেনালকোড জারি হইল তৎসময় হইতেই, বঙ্গ-মাতার বীরসন্তানেরা ত্রাহি রবে, শড়কী, বর্শা, তীর, তলোয়ার, পরিত্যাগ করিয়া দিব্য সভ্য বাবু সাজিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সেইদিন হইতেই কার্য্য মুখে চলিতে আরম্ভ হইল। যাহা হউক কিন্তু নীলকরপ্রপীড়িত কৃষকগণের উৎসাহ ও কার্য্যকলাপসন্দর্শনে তৎকালে মনে হইয়াছিল সেই

* বহুদিন গত হইল ঢাকা গেজেটে একজন লেখক এই বৃত্তান্ত অবতারণা কালে রাজপক্ষের স্থলে মুন্সী পক্ষের জয়ের ঘোষণা করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি সম্যক্ ঘটনা অবগত না হইয়াই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস, মহারাজ রাজবল্লভের জীবন-চরিত ৫৪ পৃষ্ঠা

সময় পর্য্যন্ত বঙ্গমাতার সন্তানেরা বীররসের নেশা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে এই জেলার ইদিলপুরের চৌধুরীরা কতককাল সজীবতা-বস্থায় কালকর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর রাজকর বার বার বন্ধ করিয়াও তাঁহারা পর্য্যুদস্ত হন নাই। কত বার তাহাদের জমিদারী বাজেআপ্ত করা হয় কিন্তু কোনমতেও সরকার বাহাদুরের কর আদায়ের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। পরে যখন কলিকাতাবাসী মোহিনীমোহন ঠাকুর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঐ পরগণা নিলাম খরিদ করেন, তিনি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে উহা দখল করিতে পারেন নাই। উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহুলোক হতাহত হয়। সদরলণ্ডের * রিপোর্টে জানা যায় "যখনই নিলাম খরিদ্দারগণ পরগণা দখল করিতে অগ্রসর হন, তখনই চৌধুরীরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাধা দেওয়াতে ভয়ানক দাঙ্গা হয়।" পরে কিন্তু ইংরাজের আইনের কাছে চৌধুরীদের জোর জবর আর টিকিল না।

নড়ালের বাবুদের নাম বঙ্গবিশ্রুত, বাবু রামরতন রায়ের লাঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। এই রায় বংশস্থাপয়িতা কালীশঙ্কর সরকার জমিদারী করিয়া যান বটে, কিন্তু তৎসমুদয় তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলা বিধান হয় নাই। রামরতনের প্রথম সময়ে তেলীহাটী পরগণার ২২ বাইশ তালুকদার একত্র দলবদ্ধ হইয়া, জমিদারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। তাহারা বলিত নাটোরের রাজা পরগণার প্রকৃত মালিক, কালীশঙ্কর বেনামদার মাত্র, আমরা তাহাকে খাজনা দিব না। উভয় পক্ষের লাঠির চোটে তেলীহাটী উৎসন্ন যাইতে বসে, পরে বুদ্ধিমান রামরতন রায় লাঠী চালান।অপেক্ষা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া উক্ত উপায় অবলম্বনে পরে কৃতকার্য্য হন। এই বাইশ তালুকদারের মধ্যে উজানীর রাজবংশ, নারাণপুরের

* বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ সদার লণ্ড রিপোর্ট, ১৮৬৭ সনে যাহা ঢাকার কমিশনার নিকট প্রেরণ করেন।

মুসলমাম মুন্সীরা প্রধান তালুকদার ছিলেন। খান্দার পাড়ার রায়গণ এবং ডাকরীর সমদ্দারেরা ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন; জমিদারের পক্ষ জয়ী হইলে, একটী গ্রাম্য গীত রচিত হয়। উহার একটী পদ এইরূপ—যথা,—

"রাজা হাতী মুন্সী ঘোড়া নারাণ রায় কুক্কুর।
বাঁশবনে ফেউ ফেউ করেন সমদ্দার ঠাকুর॥"

এইরূপ আর একটী বিরোধের বিবরণ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। মাদারিপুরের ঘাটমাঝি প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে জালালপুর জমিদারের অধীন ছিল। তাঁহাদের কর্ম্মচারী রতিরাম দাস ও রামদাস কালক্রমে ঐ জমিদারী মধ্যে এক প্রকাণ্ড তালুক করিয়া ফেলে। এজন্য জমিদারের সহিত তাঁহাদের মনান্তর হয়। জমিদার মেঘামিয়া রতি রায়ের তালুক লুণ্ঠন করিতে গমন করায় একটা দাঙ্গা হয়, উহাতে জমিদার হত হন; রতিরাম এই অবসরে জমিদারের অধীনস্থ অনেক প্রজার বাড়ী ও ঘাটমাঝি প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া আনেন। তৎ সম্বন্ধে এই গ্রাম্য কবিতাটী শুনা যায়; যথা—

"মেঘা মিয়া চেঁগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝী লুঠিয়া নিল বুড়া রতি রাম॥"

পরে মেঘামিয়ার স্ত্রী, রতিরামের আত্মীয় তিতুরাম মিত্র ও ভীমদাস দ্বারা কৌশলে রতিরামকে হস্তগত করিয়া প্রাণদণ্ড করে। এই বিশ্বাসঘাতকদ্বয়ের বংশধরগণ আজও জমিদার দত্ত লাখরাজ ভোগ করিতেছে।

অতঃপর আমরা নীলকর ও ফরাজী সম্প্রদায় ঘটিত দুইটী বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে এই ক্লান্তিকর বিষয় হইতে মুক্তিপ্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

ঠিক একই সময়ে ফরিদপুর জেলা দুইটী ঘটনায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। উহার একটী ফরাজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় লাভ দ্বিতীয়টী নীলকর সাহেবদের অত্যাচার।

ফরাজী সম্প্রদায়ের নেতা হাজী সরিতুল্লা সাহেবের জন্মস্থান শিবচর থানার অন্তর্গত দৌলতপুর; সরিতুল্লা শিক্ষা লাভ জন্য মক্কা গমন করিয়া ২০ বৎসর

পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা পদ্মা কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া তৎসঙ্গে লীন হয়। ওয়াহেবি সম্প্রদায়ের সহিত বহু কাল পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়া তাহাদের রীতিনীতি শিক্ষার ফল ও তদ্ধর্ম্ম দেশ মধ্যে প্রচার এবং সুন্নত ও বিবাহাদির ব্যয় সংক্ষেপ ভাবে সম্পাদন করার জন্য উপদেশ দান করিয়া অনেক মুসল্‌মানকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হাজি সাহেবের মৃত্যুর পর তৎ সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহার পুত্র দুধুমিয়াকে দলের নেতৃত্বপদ প্রদান করিয়া ক্রমে তিনি একটী সম্পত্তি ক্রয় করায় তজ্জন্য তাঁহাকে সময় সময় নানারূপ দাঙ্গা হাঙ্গামাতে জড়িত হইতে হইত। পাচবরের সেন বাবুদের সহিত এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক দাঙ্গা হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী ঘটনায় লুঠ, হত্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমায় তাঁহার কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই বৎসর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বিদ্রোহের সময়, গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাঁহার মত ক্ষমতাশালী লোককে মফস্বল রাখা নিরাপদ সম্ভব নয় বলিয়া কলিকাতায় আবদ্ধ রাখা হয়। বিদ্রোহ অবসান পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইয়াছিল, পরে মুক্তিলাভ করেন। আবার তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের মকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কারাদেশ হয়, পরে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা চলিয়া যান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

এস্থলে তাঁহার সময়ের একটী ভীষণ হত্যার ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

তৎসময়ে মিঃ ডুলহস পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপন করিয়া, নীলের দাদনে প্রজাকুলকে আকুল করিয়া তুলেন। তাঁহার কুঠীর দেওয়ান কালীপ্রসাদ কাঞ্জীলাল মুনফৎগঞ্জ থানার অন্তর্গত কুঠী সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কালীপ্রসাদ, প্রজা ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রতি বড়ই অত্যাচার করিতেন। এজন্য সমুদয় প্রজা ও ফরাজী একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করে। জানা যায় তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় নৌকাযোগে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত কাসকাঠীর দক্ষিণাংশে সমুদ্রের নিকট

কোন স্থানে লইয়া যাইয়া হত্যা করা হয়। এজন্য দুধুমিয়ার দলের বিরুদ্ধে এক মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল. তাহার জন্য তাঁহার কারাদেশ হয়। *

এই সময়েও তৎপর বহুবৎসর ব্যাপী ফরিদপুরে নীলকর সাহেবেরা ভয়ানক অত্যাচার করেন। তন্মধ্যে বেলেকাদীর অন্তর্গত জঙ্গলগড়ের বিবরণ উল্লেখ যোগ্য। যশোহরের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুরের নীলকর মিঃ ডুরেণ্ড ফরিদপুরের অন্তর্গত (পূর্ব্ব পাবনার অন্তর্গত জঙ্গল গড়ে নীল দাদন প্রদান জন্য উপস্থিত হন। প্রজারা কোন মতেও তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, সাহেব নিজ লোক দ্বারা বীজ বপন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ঘটনায় প্রজা সাধারণ একমতাবলম্বী হইয়া সাহেবের কার্য্যে বাধা প্রদান ও তাহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় করে।

এই সময় পাবনার অধীনে কুমারখালি সবডিভিসন, সাহেব তত্রস্থ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেটকে এ বিষয় জানাইয়া তদন্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন অধিকাংশ হাকিম নীল করদের পিতামাতা ছিলেন, জয়েণ্ট সাহেব, দরখাস্ত পাইয়াই জঙ্গলগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। এত তাড়াতাড়ি ইহা ঘটিল যে সঙ্গী পুলিশ পর্য্যন্ত তৎসহ গমন করিয়া উঠিতে পারিল না।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশমাত্র চারিদিকে প্রকাশ হইল যে, নীলকর সাহেব পুনরায় বপন করিতে আসিয়াছে। তৎসময় আবার যাবতীয় প্রজা একত্রিত হইয়া সাহেবকে আক্রমণ করিল; সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন তিনি মহকুমার হাকিম, কিন্তু কেহই তাঁহার সে কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহার উপর লাঠি চালাইতেই পুলিস দলবল লইয়া উপস্থিত হইল, তথাপি কোন প্রজা ভীত না হইয়া যাহাকে পাইল তাহাকেই মারপীঠ করিতে লাগিল; প্রজাদের প্রথম বিবেচনার ত্রুটিতে বিষময় ফল ফলিল। জয়েণ্ট সাহেব দলবল লইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

* মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং ইঃ হুইস ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর ফরিদপুর ঢাকা কমিশনার নিকট যে ১৮৬৭ সনের ৪ঠা এপ্রেল তারিখ যে রিপোর্ট করেন তাহা দেখ।

মাজিষ্ট্রেট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পথিমধ্যে নীলকর সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বলিতে হইবে না যে ডুরেণ্ড সাহেব চালাকী করিয়া হাকিম বাহাদুরকে পাঠাইয়া নিজে মন্দ ভাবে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় নীলকর ডুরেণ্ড তাহাকে বুঝাইলেন যে, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, অতএব পল্টন না আসিলে তাহারা কখনও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। অচিরে এই বৃত্তান্ত কলিকাতায় জানান হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তথা হইতে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য কুমারখালীতে প্রেরণ করিলেন।

সমাগত সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যসহ জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট ও নীলকর সাহেব জঙ্গলগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; প্রজারা উহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। ক্রমে গ্রাম ঘেরাও হইলে যে কালে বন্দুকের গুড় গুড় শব্দ হইয়া উঠিল তখন গ্রামবাসীরা বুঝিল এবার আর তাহাদের পরিত্রাণ নাই। এক জাতি হইলে সকলেই যে এক ধর্ম্মাবলম্বী বা একতাবলম্বী হইয়া থাকে তাহা কখনও মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। একই পরিবারে পিশাচ ও দেবতার অধিকার রহিয়াছে, একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া, মাধবী লতা ও বেতস পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বেলেকান্দী কনসারনের জার্ডিন স্কীনারের মেনেজার মিঃ বাটারাবি অচিরে এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গলগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সম্মুখে ভয়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে বুঝাইলেন, যাহারা বিদ্রোহী বলিয়া পরিচিত, তাহাদের এমন কোন বল নাই যে তাহারা কোন প্রকারেও কোম্পানী বাহাদুরের প্রতি অসম্মান করিতে পারে, তবে সাময়িক গোলযোগ এইরূপ অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। গোলাগুলি চালাইবার কোন আবশ্যক নাই। মাত্র জনকতক সিপাহী গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেই যাহাকেই হউক বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে। কার্য্যে তাহাই হইল, এই উপায়ে লোকজন ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য বিচার গুণে কেহ বা অল্প কেহ বা যাবজ্জীবনের জন্যও দ্বীপান্তরিত হয়। তন্মধ্যে রাজচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর অধিক মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, সে সামর্থ্যও আমাদের নাই। একমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কএকটী বীরচিত্র এই স্থানে প্রদর্শিত হইল। পাঠক মহোদয়গণ দেখিবেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সিংহ না হউন, ব্যাঘ্র পদবী হইতে কিরূপে মার্জ্জারে পরিণত হইয়াছিলেন *, আর আমরাও এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কিরূপ মূষিকভাবাপন্ন হইয়া ঘৃণিত জীবনভার বহন করিতেছি। ইহা বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

হাজি মহম্মদ মসিন। †

বাঙ্গলার নবাব খাঁ আজিম মির্জ্জা কোকের রাজত্বকাল হইতেই জেলা যশোহরের সদর ষ্টেসনের এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত চাঁচড়া গ্রামে রায় উপাধিধারী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রাজাদিগের বাস। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথেয়তা প্রভৃতি রাজোচিত সদ্‌গুণে চাঁচড়ার রাজগণ যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ সুপরিচিত।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভবেশ্বর রায় হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শুকদেব বার আনা ও কনিষ্ঠ

* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় ফরিদপুরের পূর্ব্ব কাহিনী সম্বন্ধে যে একটী সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সে কালের বাঙ্গালীদের বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। এইরূপে বাঙ্গালার সকল জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার বা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইতে পারে। বাঙ্গালী যে চিরকাল এরূপ ভীরু ও অকর্ম্মণ্য ছিল না ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কাপুরুষ মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইতিহাস তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কথা বলে।

(সম্পাদক)

† সেনহাটী পীতাম্বর লাইব্রেরীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র শ্যামসুন্দর চার আনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। উভয় ভ্রাতায় বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোন দিন সামান্য কথান্তরও হয় নাই। উভয়ে সুখে ছিলেন। সন ১১৫২ সালে রাজা শুকদেব রায়ের মৃত্যু হইল—তৎপুত্র নীলকান্ত রায় এক আনার মালিক হইয়া বসিলেন। জমীদারী হাতে পাইয়া নীলকান্ত প্রথমেই ছলে বলে, কৌশলে পিতৃব্য রাজা শ্যামসুন্দরের বিষয় টুকু কাড়িয়া লইলেন—দুর্ব্বল শ্যামসুন্দর প্রবল সরীক নীলকান্তের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাবের শরণাপন্ন হয়েন। আলিবর্দ্দি খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। সন ১১৬৫ সালে এই মুর্শিদাবাদেই রাজা শ্যামসুন্দরের মৃত্যু হয়। * তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্রও তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল সুতরাং শ্যামসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাব মিরজাফর আলি খাঁ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে নবাবের দরবারে আগা আহম্মদ মোতাহর নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন—নবাব তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। আগা আহম্মদ তাঁহার কন্যা মনুজান বিবিকে হুগলীনিবাসী শলা উদ্দিন মহম্মদ খাঁর সহিত বিবাহ দেন। রাজা শ্যামসুন্দরের চার আনা অংশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে আগা আহম্মদ উপযুক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে নবাবের নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি লইয়া কন্যা মনুজান বিবিকে যৌতুক দিলেন। মনুজান বিবি সন ১২১০ সালে পরলোক গমন করেন। মনুজানের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অন্তে ফারাজ অনুসারে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হাজি মহম্মদ মসিন উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন।†

হাজি মহম্মদ মসিন অর্থশালী, দানশীল, মিতাব্যয়ী ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার নিজের যে অর্থ ও সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তাঁহার আবশ্য-

* Records of the Chanchara Roy.

† হাজি মহম্মদ মসিন মনুজান বিবির বিমাতার পূর্ব্বস্বামী ফয়েজুল্লার ঔরসজাত পুত্র—আগা আহম্মদের পুত্র নহেন। লেখক

কীয় ব্যয় ও দাতব্য সঙ্কুলান হইয়া যাইত। তাঁহারও কোন সন্তানসন্ততি এবং নিকট কিম্বা দূর আত্মীয় ছিল না—সুতরাং উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত মনুজান বিবির সম্পত্তি হইতে বার্ষিক মাত্র ১২৮৫৲ টাকা লাভের সম্পত্তি নিজে রাখিয়া অন্যান্য স্থাবর, অস্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে ও লোক হিতার্থে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যু অন্তে এই উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি কাহার দ্বারা কি ভাবে পরিচালিত হইবে—লভ্যাংশই বা কি ভাবে ব্যয় হইবে ইত্যাদি স্থির করিয়া সন ১২১৩ সালে এক তৈনতনামা সম্পাদন করেন ঐ তৈনতনামা পার্শি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি উহা এখনও হুগলী ইমামবাড়ীর দপ্তরখানায় আছে। তৈনতনামার নকল ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ হুগলী ইমামবাড়ীর প্রাচীর গাত্রে খোদিত আছে। তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

"আমি, হাজি মহম্মদ মসিন, পিতার নাম হাজি ফয়েজুল্লা, পিতামহের নাম হাজি ফলজুল্লা সাকিম বন্দর হুগলী। সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে, স্থির চিত্তে ও ধীর বুদ্ধিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক একরার করিতেছি যে, আমার কোন সন্তান সন্ততি কিম্বা শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী হইতে পারে এমত কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব না থাকায় এবং সৎকার্য্য ও হজরৎ অর্থাৎ আমাদের কৌলিক কার্য্য মহামুদ মোস্তাফা প্রভৃতির ফাতেহা করা আবশ্যক বোধ করায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত সৈয়দপুর ও শোভনালী নামক পরগণার জমীদারী, হুগলী মোকামের ইমাম বাড়ী, এমাম বাজার, হাট এবং ইমাম বাড়ীর দ্রব্য সামগ্রী যাহা আমি এ যাবৎ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, তাহা নিম্নলিখিত মত ব্যয়ার্থে ওয়াকফ অর্থাৎ উৎসর্গ করিলাম।

—সেখ মহামুদ সাদকের পুত্র রজবাণী সেখ ও আহমদ আলী খাঁর পুত্র সাকেরআলী খাঁ, উভয়েই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক। আমি ইহাদিগকে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির মোতওল্লি নিযুক্ত করিলাম। ইহারা উভয়ে ঐক্য থাকিয়া পরামর্শসহকারে এক যোগে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। উৎসর্গীকৃত মহালে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া যাহা লভ্যাংশ থাকিবে

মোতওল্লিদ্বয় তাহা সমান নয় অংশ করিবেন। প্রথম অংশ মহামুদ মোস্তাফা ও তদ্বংশীয়গণের ফতেহা, মহরম ও অন্যান্য ধর্ম্মসঙ্গত পরবের খরচের জন্য এবং ইমামবাড়ী ও কবরের মেরামত খরচের জন্য ব্যয় করিবেন। ২ অংশ মোতওল্লিদ্বয় আপনাদিগের খরচের জন্য তুল্যাংশ লইবেন। বক্রী ৪ অংশ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তির নাম আমার দস্তখতি ও মোহরাঙ্কিত ফর্দ্দে লিখিত হইল তাহাদিগকে দিবেন। দৈনিক খরচ, সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মাসেহারা এবং পেয়াদা পাইকগণের বেতন ইত্যাদি যাহা এখন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আমার মৃত্যু অন্তে মোতওল্লিদ্বয় বিবেচনা মত স্থিরতর রাখিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন সময় মোতওল্লি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অশক্ত হয়েন তাহা হইলে মোতওল্লিদ্বয় উভয়ে বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত লোককে মোতওল্লি স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন—এই মর্ম্মে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৩ সাল তারিখ ৮ই বৈশাখ।"

এই তৈনতনামা সম্পাদনের পর হাজি মহম্মদ প্রায় ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন, ততদিন মোতওল্লিদ্বয় ইষ্টেটের সমস্ত কার্য্যই তৈনতনামানুসারে যথানিয়মে বিশেষ সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সন ১২১৯ সালেই মসিনের মৃত্যু হইল অমনিই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিশেষ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যে কোন উপায়ে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মোতওল্লিদ্বয়ের লাভ সুতরাং অবৈধ উপায় অবলম্বন ও আবশ্যক মত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। তৈনতনামায় যেরূপ খরচের ব্যবস্থা ছিল তাহারও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া লইলেন সময়ে এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের কথা গভর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর হইল—দয়ালু গভর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সন ১২২১ সালে এই ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের ভার, ১৮১০ খৃঃ ১৯ আইন বিধান মতে, রেভিনিউ বোর্ডের হস্তে অর্পিত হইল। কিন্তু ইহাতেও মোতওল্লিদ্বয়ের চৈতন্য হইল না বরং তাঁহাদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেখিয়া শুনিয়া সন ১২২৩ সালে গভ-

র্ণমেণ্ট সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মোতওল্লিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্থান একজন মাত্র নূতন মোতওল্লি নিযুক্ত করিলেন—অন্যতম মোতওল্লি স্থলে যশোহরের কালেক্টর এজেণ্ট স্বরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। * ইষ্টেটের কাজ এই ভাবেই চলিল।

এদিকে গভর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্য রদ ও রহিত করিবার জন্য পদচ্যুত মোত-ওল্লিদ্বয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমা অনেক দিন চলিল—উভয় পক্ষেরই অর্থ ও সময় নষ্ট হইল। অবশেষে সন ১২৪২ সালে দেশের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান আদালত ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুকূলেই ডিক্রী দিলেন।

উল্লিখিত মোকর্দ্দমা বিচারাধীন থাকা সময়ে মসিন ফণ্ডে বিস্তর টাকা জমিয়া গিয়াছিল। লর্ড মেটকাফ্ তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল—তিনি তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমস্ত নগদ সম্পত্তি সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ ও অন্যান্য হিতজনক কার্য্য ব্যয় করাই স্থির করিলেন। তদনুসারে সন ১২৪৩ সালে ১৬ই শ্রাবণ মসিন ফণ্ডের টাকার সাহায্যে চুঁচড়ায়—"College of Mahammad Mohsin"—স্থাপিত হইল। † কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফণ্ড হইতে বার্ষিক প্রায় ৫০০০০৲ টাকা খরচ হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর এই ভাবেই কাজ চলিল। কিন্তু মসিন ফণ্ডের এত টাকা প্রধানতঃ মুসলমানের হিতার্থে ব্যয় না হইয়া কলেজে জাতি নির্ব্বিশেষে খরচ হইতেছে দেখিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন।—"কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অতি সামান্য অতএব মসিন ফণ্ডের টাকার দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া সাধারণ মুসলমানদিগকে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করা আবশ্যক"—এইমর্ম্মে মুস-

* ১৮৮২ খৃঃ খুলনায় স্বতন্ত্র জেলা স্থাপিত হইলে তখন হইতে যশোহরের কালেক্টরের পরিবর্ত্তে খুলনার কালেক্টর এজেণ্টের কার্য্য করিতেছেন।

† "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক", ১ম ভাগ।

লেখক।

লমান সম্প্রদায় হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ হইল। এই আবেদন পত্র বড়লাট সাহেবের নিকট পৌঁছিল—তিনি বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর আর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের পরামর্শে সন ১২৮০ সালে কলেজ হইতে মসিন ফণ্ডের সাহায্য উঠাইয়া লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রার্থনা মতে হুগলী, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি মুসলমান প্রধান স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন। College of Mahammad Mahsin "হুগলী কলেজ" নামে পরিবর্ত্তিত হইল।

উল্লিখিত মাদ্রাসা স্থাপন করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে—সন ১২৭৪ সালে সেই ফণ্ডের অর্থ সাহায্যেই যশোহর জেলার (বর্ত্তমানে খুলনা জেলার) অন্তর্গত মসিনের জমিদারীভুক্ত দৌলতপুর নামক স্থানে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার জন্য একটী মাইনর স্কুল ও ব্যাধিক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজাবর্গের চিকিৎসার জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ইহার ৮ বৎসর পরে সন ১২৮২ সালে উক্ত মাইনর স্কুলটী এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে।*

চিকিৎসালয়, স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মাদ্রাসা ও অন্যান্য কলেজ ও স্কুলে গুণানুসারে মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ফণ্ড হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কলেজ ও অন্যান্য স্কুলে মুসলমান ছাত্রদিগের দুই তৃতীয়াংশ ও ইংরাজী স্কুলের মুসলমান মৌলবীদিগকে সম্পূর্ণ বেতনও এই ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক মসিন ফণ্ড হইতে বৎসর বৎসর অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইতেছে। †

* The annual Report of the Daulatpur H. E. School, for the yea 1904-5.

† "খুলনাবাসী" ১ম বর্ষ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

কৃষ্ণরাজ উদেয়ার।

কৃষ্ণা ও কাবেরীর সলিলবিধৌত হইয়া যে মহিসুর রাজ্য দক্ষিণ ভারত-বর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদরূপে বিরাজ করিতেছে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার সূচনা হয়। যাদববংশীয় বিজয়রাজ দ্বারকা হইতে মহিসুরের নিকটে আসিয়া অবস্থিতি করেন, ও বিজয়নগরের রাজবংশের অধীনে সর্দ্দার নিযুক্ত হন। বিজয়রাজের বংশ প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারা ১৫২৪ খৃঃ অব্দে পুরগিরি নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও তাঁহাদের কুলদেবতা চামুণ্ডার আশ্রয়স্থল মহিষাসুরের নামানুসারে উক্ত দুর্গের মহিষাসুর আখ্যা প্রদান করেন। মহিষাসুর হইতে ক্রমে উক্ত স্থানের মহিসুর নামকরণ হয়। বিজয়রাজবংশীয় রাজ উদেয়ার * ১৬১০ খৃঃ অব্দে বিজয়নগররাজের প্রতিনিধির হস্ত হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন বিচ্ছিন্ন করিয়া লন ও বর্ত্তমান মহিসুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন তাঁহাদের রাজধানী হইলেও উক্ত রাজ্য মহিসুর রাজ্য বলিয়াই কথিত হইত।

রাজ উদেয়ারের পর ছিক্কাদেবরাজ উক্ত বংশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ছিক্কা দেবের পর আর দুই জন মাত্র উক্ত বংশের রাজা হইয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে

* উদেয়ার শব্দ কানাড়ী "উদেয়" বা প্রভু শব্দের গৌরবাত্মক বহুবচন।

তাঁহাদের বংশের লোপ হওয়ায় তাঁহাদের নিকট আত্মীয় চামরাজ মহিসুরে:
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দী হওয়ায় ১৭৩৪ খৃ
অব্দে মহিসুর রাজবংশের এক দূর আত্মীয় ছিক্কাকৃষ্ণরাজ মহিসুরের রাজছত্র
মস্তকে ধারণ করেন। ছিক্কাকৃষ্ণরাজের রাজত্বসময়ে দাক্ষিণাত্যে এক মুসল্
মান বীর ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ
হায়দরআলি। হায়দর আপনার প্রতিভা ও শক্তিবলে দাক্ষিণাত্যের অনেব
স্থানে বিজয়লাভ করিয়া মহিসুরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত আরম্ভ করেন,
ছিক্কাকৃষ্ণরাজ তাঁহার সে কঠোর দৃষ্টিতে উত্তক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেে
১৭৬৩ খৃঃ অব্দে বেদমুর নামক স্থানে হায়দর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার
ক্ষমতা ও ধন সম্পত্তি সমস্ত অপহরণ করিয়া লইলেন। মহিসুর রাজ্য করায়ত্ত
করিয়া হায়দর দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠেন। ক্রমে ব্রিটিশরাজের সহিত
তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। মান্দ্রাজ
গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনায় দাক্ষিণাত্যের দুই মুসলমান শক্তি ইংরেজের প্রতি
বিরক্ত হইয়া উঠে ও তাহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাহাদের সঙ্গে যোগদানের
জন্য আহ্বান করে। হেষ্টিংস কৌশলপুর্ব্বক নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে
হস্তগত করিয়া ফেলেন। কিন্তু হায়দর বিদ্যুদ্‌বেগে ইংরেজ রাজ্যে ধাবিত
হন। পিলোরি নামক স্থানে কর্ণেল বেলির অধীন একদল ইংরেজ সেনাকে
ভূতলশায়ী করিয়া হায়দর মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ধাবিত হন। তাহার পর সার
আয়ার কুট ও কর্ণেল পিয়ার্স হায়দরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধ শেষ
হইতে না হইতে হায়দরের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার পুত্র টিপুসুল্‌তান ইংরেজ
দিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। টিপুসুল্‌তানও অধিক দিন স্থির ভাবে
অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। তিনিও পরে সন্ধিভঙ্গ করিয়া ইংরেজদিগের
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং
ইংরেজ সেনা লইয়া নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত
হইলে টিপু অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি মনে মনে ইংরেজ

দিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। টিপু ফরাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হন, ও তৃতীয় বার আবার মহিসুর যুদ্ধ আরব্ধ হয়। সে সময়ে লর্ড ওয়েলসলি গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া জেনারেল হারিসকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। টিপু সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আশ্রয় লন। ব্রিটিস সেনা ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিলে টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার রাজ্য অবশেষে ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্তে পতিত হয়।

মহিসুর রাজ্য হস্তগত করিয়া লর্ড ওয়েলসলি ইহাকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবেন কি পুনর্ব্বার ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহারই বিবে-চনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি সমগ্র মহিসুর রাজ্যকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত না করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। অবশিষ্ট অংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বিভক্ত হইবার কথা হয়। এই স্বতন্ত্র রাজ্যে আবার কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহারও এক সমস্যা উপস্থিত হয়। টিপু জীবন বিসর্জ্জন দিলেও তাঁহার পুত্রগণ জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের হস্তে কি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের হস্তে মহিসুর রাজ্য অর্পিত হইবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া লর্ড ওয়েলসলি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের হস্তেই মহিসুর রাজ্য অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যদিও টিপুর হস্ত হইতে মহিসুর রাজ্য লওয়ার জন্য তাঁহারা টিপুর পুত্রদের হস্তে উক্ত রাজ্য অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, তথাপি টিপুর সহিত ফরাসীদের গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য তাঁহারা তাঁহার পুত্রগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ চিরদিনই ইংরেজদিগের মিত্র ছিলেন। তাঁহারা কখনও তাঁহাদের সহিত বিরোধ বা তাঁহাদের শত্রুগণের সহিত যোগদান করেন নাই। তাঁহারা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, টিপুবংশীয় ও তাঁহাদের মিত্র ইংরেজদের চিরশত্রু ফরাসীদিগের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ হওয়ায় তাঁহাদিগকেই মহিসুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই

কর্ত্তব্য।* অবশেষে তাহাই স্থির হয়, এবং তাঁহারা প্রাচীন রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ অরকোতারার চামরাজের পুত্র কৃষ্ণরাজকে মহিসুরের সিংহাসন প্রদান করেন। টিপুর পুত্রেরা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রথমে বেলোর পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

* আমরা এস্থলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেস্‌লির নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি।

"It would certainly have been desirable that the power should have been placed in the hands of one of Tiphoo's sons ; but the hereditary and intimate connection established between Tiphoo and the French, the probability that the French may be enabled to maintain themselves in Egypt, and the perpetual interest which Tiphoo's famlly must;feel to undermine and support a system which had so much reduced their partimony and power, precluded the possibility of restoring any branch of the family of the late Sultan to the throne, without exposing us to the constant hazard of internal commotion, and even of foreign war.

"Between the British Government and this family (the old Hindoo house of Mysore) an intercourse of friendship and kindness had subsisted in the most desperate crisis of their adverse fortunes."

"They had formed no connection with your enemies. Their elevation would be a spontaneous act of your generosity, and from your support alone could they ever hope to be maintained upon the throne, either against the family of Tiphoo Sultan, or against any other claimant. They must naturally view with an eye of jealousy all the friends of the usurping family, and consequently be adverse to the French, or to any other states connected with that family in its hereditary hatred of the British Government.

"In adition to these motives of policy, moral consideration and sentiments of generosity and humanity, favoured the restoration of the ancient family of Mysore. Their high birth, the antiquity of their legitimate title, and their long and unmerited suffereings rendered their peculiar objects of compassion and respect ; nor could it be doubted that their government would be both more accepted and more indulgent than that of the Mahommedan usurpers, to the mass of the inhabitants of the country composed almost entirely of Hindoos."

মহিস্থর রাজ্যের বন্দোবস্তেয় জন্ম জেনেরাল হারিস, কর্ণেল ওয়েলসলি হেনরি ওয়েলসলি, লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল কার্কপ্যাট্রিক এবং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল বেরিয়োজকে লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়। টিপুর পুত্রগণকে বৃত্তিদান করিয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুন বেলোরে প্রেরণ করা হয়। কৃষ্ণরাজ উদেয়ার মহিস্থরের রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪ বৎসর মাত্র ছিল। ৩০এ জুন জ্যোতিষিগণের মতে শুভদিন থাকায় কৃষ্ণরাজ সেই দিন অভিষিক্ত হন। শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গপ্রাকার হইতে তাঁহার অভিষেকের ঘোষণাস্বরূপ তোপধ্বনি হয়। প্রধান সেনাপতি তাঁহার হস্তে রাজ্যের মোহর প্রদান করেন। টিপুর রাজস্বমন্ত্রী পুর্ণিয় নামক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রাজ্যের দেওয়ান, কর্ণেল বেরিক্লোজ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ও কর্ণেল ওয়েলসলি শ্রীরঙ্গপত্তনের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণরাজকে মহিস্থর রাজ্যের মধ্যাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বিভাগের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু মহারাষ্টীয়েরা তাহাদিগের অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। মহিস্থর-রাজের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যরক্ষার সন্ধিও স্থির হয়। মহিস্থর রাজ্যের বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং সেই টাকা দিতে না পারিলে কোম্পানী তদনুযায়ী রাজ্যের কতকাংশও লইতে পারিবেন বলিয়া স্থির হয়। এইরূপে কৃষ্ণরাজ উদেয়ার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি শিশু হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহিস্থর রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ণিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে মহিস্থর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহারই হস্তে মহিস্থর রাজ্যের বন্দোবস্ত ভার অর্পিত হয়। পূর্ণিয়া দক্ষতাসহকারে তাহা পালন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৮১১ খৃঃ অব্দে তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি পুর্ণিয়ার হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেই রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি যৌবনস্থলভ চাঞ্চল্যের জন্য সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে সক্ষম হন নাই। ক্রমে কতকগুলি লোক তাঁহার

বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার বিপক্ষে নানা দোষের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করে। মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা সার টমাস মনরো ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মহিসুরে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সতর্ক করিয়া আসেন। কিন্তু যাহারা রাজার বিরোধী হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ব্যাপার গুরুতর করিয়া তুলে। অবশেষে ১৮৩০ খৃঃ অব্দে কতকগুলি লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, একদল ইংরেজ সৈন্য তাহার নিবারণের জন্য প্রেরিত হয়। ইহার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে মহিসুর রাজার শাসনভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করিলে রাজা, শান্ত-ভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৮১১ খৃঃ অব্দের ৩১এ মার্চ্চের রাজ্যভার অর্পণ করেন। তাঁহাকে মাসিক ৭০ হাজার টাকা বৃত্তি ও রাজস্বের পঞ্চমাংশ ও বৎসরে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা স্থির হয়। রাজা তাঁহার নামে রাজকার্য্য পরিচালনায় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিরেক্টরগণ তাহাতে সম্মত হন নাই।

মহিসুর রাজ্যশাসনের ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বিগত গোলযোগের অনুসন্ধানের জন্য একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করেন। উক্ত সমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া জানিতে পারেন যে, রাজার নামে অনেক মিথ্যা অত্যাচার সৃষ্ট হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার কিছু কিছু দোষ ছিল সত্য, কিন্তু তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা ততোধিক দোষী নহেন। অনুসন্ধান-সমিতির মন্তব্য পাঠ করিয়া উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজাকে পুনরায় রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিবার জন্য ডিরেক্টরগণকে লিখিয়া পাঠান, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হন নাই। তাঁহারা যাহা গ্রাস করিয়াছেন তাহা আর উদ্গার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অগত্যা জেনেরাল কুবন মহিসুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ১৮৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহিসুর রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উক্ত রাজ্য শাসন করিয়া-ছিলেন। এইরূপে মহিসুর রাজ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ইংরেজের দ্বারা

শাসিত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান কালে যদিও তাহার নামে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রোছে, তথাপি তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতেই চালিত হইয়া থাকে। তাহার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইয়া কোনরূপ কার্য্য করিবার অধিকার নাই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেরই এইরূপ অবস্থা।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড লরেন্স পর্য্যন্ত কৃষ্ণরাজ প্রত্যেক গবর্ণর জেনেরলের নিকট হইতে রাজ্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পাষাণদেবতার ন্যায় তাঁহাদের বধির কর্ণে তাঁহার আবেদন পৌঁছায় নাই। অবশ্য তাঁহার কোন দাবী ছিল না সত্য, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সুবিচার হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না। মাকু´ইস অব ওয়েলসলি কোন গূঢ় উদ্দেশের জন্যই হউক বা নিজ উদারতা গুণেই হউক, যখন টিপু সুলতানের হস্ত হইতে গৃহীত মহিসুর রাজ্যের কতকটা অস্তিত্ব রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সে ইচ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু তাহার অন্যথা হওয়ায়, আমাদের মনে এরূপ হয় যে, নিজাম, মহারাষ্ট্রীয় ও ফরাসীদিগের ভয়ে তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহিসুর রাজ্যকে আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। যখনই তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা আর সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপে ভারতের অনেক রাজ্য ও প্রদেশ তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। অবশ্য তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষ করায়াত্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু একটা সাধুতার ভাণ করিয়া তাঁহারা কেন যে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা দুষ্কর। কৃষ্ণরাজ ক্ষুণ্ণ মনে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ৭১ বৎসর বয়সে এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি চামরাজ উদেয়ারকে দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। তাহার পর চামরাজ মহিসুরের রাজা বলিয়া কথিত হন।

"ফারদুষী ও সুলতান মামুদ" *

পারস্য কাব্যকাননের অধীশ্বর মহাকবি ফারদুষী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মাসাদের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র তূস্ পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ফারদুষীর বাল্য জীবনী আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, তবে বাল্যকাল হইতেই যে তিনি দেশভ্রমণে অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহার চরিতাখ্যায়ক মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সময় এবং সুবিধা পাইলেই তিনি বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ভুলিয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই-রূপে বাল্যকাল হইতেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিয়া লোকচরিত্র সম্বন্ধে ফারদুষীর মোটামুটী একটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দেশের প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য, উপন্যাস ও ইতিহাস চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। কাব্য ও ইতিহাসেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। আবার ইতিহাসের মধ্যে তিনি পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়াই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন।

এই সময় গজনবী সুলতান মামুদ পারস্য দেশ জয় করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। সুলতান মামুদ অর্থলোভী হইলেও বিজিত দেশের প্রাচীন গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগী ও যত্নশীল ছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণের গোড়ামী ও ধর্ম্মান্ধতায় পারস্যসাম্রাজ্য তাহার প্রাচীন যশঃ, গৌরব ও কীর্ত্তি হারাইয়া অধঃপতনের শেষ সীমায়

* Introduction to Shahnamah, col.—Kennedy on Persian Literature Malcolm's Persia, Elphinstone's History of India, occasional notes on Indian History by Sir William Jones and Prof. E. B. Cowell, "সাহিত্য", কার্ত্তিক, ১৩০১ and "ভারতী", কার্ত্তিক, ১৩০৮।

উপনীত হইয়াছে। বিজিত পারস্যের এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বিজয়ী সুলতানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তিনি বহুমূল্য পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিকি (Dakiki) নামক দেশের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান কবিকে পারস্যদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের শাসনকর্ত্তা ও বীরগণের কীর্ত্তি কাহিনী অবলম্বনে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাকাব্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাকাব্যের সহস্র শ্লোক রচনা করিতে না করিতেই নিজ ভৃত্যের গুপ্ত আঘাতে কবিবর ডাকিকি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ডাকিকির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহাকবি ফারদুষী লোক পরম্পরায় সুলতান মামুদের বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতার কথা অবগত হইয়া গজনীর রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই নিজ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়া সুলতান ও অমাত্যবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। অর্থলোভী হইলেও সুলতান মামুদ কাব্যামোদী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ফারদুষীর গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ডাকিকি-আরব্ধ মহাকাব্য লিখিবার ভার অর্পণ করেন। ফারদুষীও রাজাজ্ঞায় নূতন উৎসাহে ও নবোদ্যমে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে যতটুকু রচনা করিতেন পরদিন রাজসভায় তাহা সুলতান ও অমাত্যবর্গকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সুলতান ও তাঁহার রচনা শুনিয়া প্রত্যেক দিনই তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপে পূর্ণ ৩০ বৎসরের বিপুল যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে মহাকবি ফারদুষী তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিরাট কীর্ত্তি স্বরূপ 'সাহনামা' নামক মহাকাব্য রচনা করিলেন।

'সাহনামা' ষষ্ঠী সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সুমার্জ্জিত। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচকগণও গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পারস্য ভাষায় ইহার ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাকাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অতি বিরল। গ্রন্থে প্রাচীন পারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং কবি যে ইচ্ছা করিয়াই অতি সাবধানে আরবী শব্দ

পরিত্যাগ করিয়াছেন গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে পাঠক মাত্রেরই তাহা উপলব্ধি হইবে।

'সাহনামা' রচনা সম্পূর্ণ হইলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় গ্রন্থ সমভিব্যাহারে ফারদুষী সুলতানের সভায় উপস্থিত হইলেন। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবিবরকে একটী করিয়া (সুবর্ণ মুদ্রা (Gold Dirhem) প্রদান করিবেন সুলতান এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈর্ষাপ্রণোদিত দুষ্টবুদ্ধি অমাত্যগণের কুমন্ত্রায় সুবর্ণমুদ্রা স্থলে প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবিবরকে একটী করিয়া রজত মুদ্রা প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন। স্বভাব তেজস্বী ফারদুষী সুলতানের এই অসাধু ব্যবহারে বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ঘৃণা-ভরে রাজদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া সুলতানের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মভূমি তুস্‌পল্লীতে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সম্রাটের ব্যবহারে ফারদুষী মর্ম্মান্তিক আহত হইয়াছিলেন। সুলতানের এই নীতি বিগর্হিত, জঘন্য আচরণের কতকটা প্রতিশোধ দিবার মানসে তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবিতার উপসংহার ভাগে সুলতান মামুদের নৈতিক চরিত্র, বংশ ও পিতৃপুরুষের উপর তীব্র আক্রমণ ছিল। ফারদুষী প্রেরিত এই কবিতা পাঠ করিয়া সম্রাটের চক্ষু ফুটিল--তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কবির সহিত তিনি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মনে করিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবিবরের নিকট তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ষষ্ঠী সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য বহুবিধ উপহার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায়! কবিবর আর তাহা ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। রাজ ভৃত্যগণ যখন সুলতান প্রেরিত এই বহুমূল্য অসংখ্য উপহার লইয়া কবির গৃহ-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই কবির অনুচরগণ অন্য দ্বার দিয়া তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল। ফারদুষীর একমাত্র দুহিতাও পিতার ন্যায় তেজস্বিনী ছিলেন, তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজপ্রেরিত সেই বহুমূল্য উপঢৌকন গ্রহণে সম্মত হন নাই, কিন্তু পরে সুলতানের

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতার প্রিয় জন্মভূমি তুস্‌পল্লীর অধিবাসিবর্গের জলকষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। নিজে কপর্দ্দক মাত্রও রাখিলেন না।

ফারদুষী প্রণীত মহাকাব্য সাহনামা বর্ত্তমানে প্রাচ্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিরাট্ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি কখনও সর্ব্বসাধারণ্যে ইহা পারস্য ভাষার পঠিত হয় তবেই ইহার যোগ্য সমাদর হইবে এবং তখন ইহা যে আমাদের আদি কবি ভারতের শিরোচূড়ামণি বাল্মীকির রচনা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

যদি সুলতান মামুদ উপযুক্ত সময় স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেন—যদি তাঁহার অসাধু ব্যবহারে ভগ্নাশ হইয়া ফারদুষীকে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতে না হইত তবে প্রাচ্য সাহিত্যাধিষ্ঠাত্রীর কমনীয় অঙ্গে সাহনামার ন্যায় আরও দুই একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অলঙ্কার শোভা পাইত না এ কথা কে বলিতে পারে? *

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

(বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ Elphinstione' প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সাহায্য লইয়াছি। প্রবন্ধ লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে আমাদের জনৈক বন্ধু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানে প্রকাশিত ফারদুষী বিষয়ক বিবরণটীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। Elphiotne প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণের অনেক স্থলেই মিল নাই। কবিরা নিরঙ্কুশ, কিন্তু ঐতিহাসিকের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের——পথ তত সুগম নহে। বাঙ্গালীর নিজের কিছুই নাই, ইতিহাস লিখিতে হইলে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাকে বিদেশী বিধর্ম্মী লেখকের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া—পরের মুখে ঝাল খাইয়া—নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হয়। এমত অবস্থায় একজনকে উপেক্ষা করিয়া অপরের মতাবলম্বী হওয়ার সাধ্য

আমাদের নাই। Elphinstone প্রদত্ত বিবরণের পার্শ্বে "বিশ্বকোষের" বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় হইলাম। শেষের ভার দশের উপর——

"Perceiving that the ancient renown of Persia was on the point of being extinguish, owing to the bigotry of his prede-cessiors, Mahmud early held out rewards to any one who would embody in historical poems the achievements of her kings and heroes previous to the Mahamedan conquest. Dakiki, a great poet of the day, whom he had first engaged in this undertaking, was assassinated by a servant before he had finished more than one thousand complete. When the fame of Mahmud's liberality fortunately attracted Ferdousi to his court. By him was this great work completed."

Elphinstone's History of India.

"পারস্যের শাসনীয় রাজ যজদেজার্দ কৈমুর বংশ হইতে খুস্‌রো বংশ হইতে রাজগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদ্যম ও তত্ত্বাবধানে "সিয়ার উল্‌মুল্ক" বা "বস্তান নামা" নামে একখানা ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ যখন পারস্য রাজ্য বিদলিত করিবার চেষ্টা করেন তৎকালে যজ দেজার্দের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শাসন বংশীয় জনৈক রাজা ডাকিকি নামক একজন কবিকে ঐ মহাগ্রন্থ উদ্ধার করিবার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সেই কবি হাজার শ্লোক লিখিবার পরেই তাহার কৃত দাসের হস্তে কালকবলে পতিত হন। তৎপরে এই গ্রন্থ উদ্ধারের কেহই চেষ্টা করেন নাই। অবশেষে ঘটনাক্রমে সুলতান মামুদের হস্তে এক খণ্ড "বস্তাননামা" পতিত হয়। তিনি সেই গ্রন্থ হইতে সাতটী বিষয় লইয়া সাতজন কবিবে এক এক খানি কবিতা পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। ফারদুষী এই সময় স্বীয় জন্ম ভূমি তুষনগরে ছিলেন। তিনি কবি ডাকিকির চেষ্টা ও সুলতান মামুদের মহদভিপ্রায় শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি সৌভাগ্য ক্রমে একখানা বস্তান নামা * হাতে পাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত পুস্তক খানি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে জুহাক্ ও ফার-

হুনের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি খণ্ড কাব্য প্রকাশ করিলেন। এই খণ্ড কাব্যের সুখ্যাতি সুলতান মামুদের কর্ণ গোচর হইল। তিনি ফারদুষীকে আহ্বান করিলেন। ফারদুষী গজনীতে আসিলেন। সুলতান কবিবরকে বস্তাননামা অবলম্বনে আপন পূর্ব্ব পুরুষ গণের অনুপম কীর্ত্তি কবিতায় গ্রথিত করিতে করিলেন।"

বিশ্বকোষ।

"Ferdousi lounched a bitter satire at Mahmud. The Satire, however, has survived. It is to it, we owe the knowledge of Mahmud's base birth be."

Elphinstone's History of India.

"উজীরের পরামর্শে সুলতান এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন—কবি উজীরের উদ্দেশ্য এক বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া মাজন্দরাণ দেশে পলাইয়া গেলেন।"

বিশ্বকোষ।

সংক্ষিপ্ত সিরাজজীবন

মুর্শিদাবাদে—সিরাজের প্রথম জীবন

(১)

ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ, প্রশান্ত চরিত,
আলিবর্দ্দী বহুগুণে ছিল গুণান্বিত।
দুষ্ট সরফরাজ খাঁ ত্যজিল জীবন,
বিষম সমরক্ষেত্রে—গিরিয়া প্রান্তরে।
তাহার যতেক ধনরত্ন সিংহাসন,
অবশেষে বিরজিল আলিবর্দ্দীকরে।
অপুত্রক আলিবর্দ্দী জগতে প্রচার
ঘেসেটী আমিনা নামে দুই কন্যা তাঁর।

(২)

পাটনা শাসনভার আলি যেই দিন
লভিল আপন করে, জন্মিল সে দিন
—জৈনুদ্দীন ঔরসেতে, আমিনা উদরে
সিরাজ নামেতে শিশু সুন্দর গঠন।
প্রবাল গঞ্জনা পায় যার ওষ্ঠাধরে
খঞ্জনলাঞ্ছিত যার যুগল নয়ন
গোলাপ সুন্দর শিশু তুলনা বিহীন
প্রতিপচ্চন্দ্রের সম বাড়ে দিন দিন।

(৩)

আলিবর্দ্দী দিব্য মূর্ত্তি সে শিশু রতনে,
দেখিয়া পরমানন্দে ভাসে মনে মনে।
একে অপুত্রক, তাহে সদৃশ কুমার
—দৌহিত্র সিরাজ—তাই হৃদয়শোণিত,
জীবন সহায়, নেত্রমণি সম তার।
তবে কেন না হইবে আলিবর্দ্দী চিত
বৎসহারা গাভী প্রায় ক্ষণ অদর্শনে!
স্নেহ ভালবাসা সম কি আছে ভুবনে?

(৪)

লালিত পালিত শিশু সোহাগে আদরে—
যখন সে যাহা চায় তাই পায় করে
চন্দ্র সূর্য্য তারাদল গ্রহ উপগ্রহ
পারে না লভিতে শুধু এই ধরাতলে।
যার আছে আলিবর্দ্দী সম মাতামহ
কিসের অভাব তার অবনীমণ্ডলে?
"আদুরে গোপাল" সম সিরাজ হৃদয়
গঠিত হইল শিশু, সতত নির্ভয়।

(৫)

শৈশবে বিলাস বীজ উপ্ত হৃদে যার
বড়ই দুর্দ্দশা ঘটে ভবিষ্যতে তার,
বাল্যকালে শিশুচিত গড়িবে যেমন
তেমতি পাইবে তার পুন পরিণাম
কেবল শিক্ষার ভেদে শিশুর জীবন
কখন নরক তুল্য কভু স্বর্গ ধাম।

অসঙ্গত স্নেহ দান শাসন অভাব
সিরাজ লভিল শেষে অসৎ স্বভাব।

(৬)

কুসঙ্গি জুটিল ক্রমে সিরাজ সহিত
ধীরে ধীরে,——
যৌবন সুলভবৃত্তি হইল স্ফূরিত
সাধিতে পাশব কার্য্য ব্যস্ত অনুক্ষণ
মানসে নাহিক জ্ঞান তার হিতাহিত
পশুতুল্য বন্ধু সহ সদা বিচরণ
বিলাস বাসনা স্রোতে অঙ্গ ঢালি দিল
অবিরাম সেই নীরে ভাসিতে লাগিল।

(৭)

অবিবেক, ধন, আর প্রভুত্ব যৌবন,
প্রত্যেক অনর্থ মূল বলে মহাজন।
চারিটী একত্র যথা হয় সম্মিলন
কি অনর্থ ঘটে তথা ভাব দেখি মনে।
অনর্থ সাগরে আজি তাই সন্তরণ
দিতেছে সিরাজ তার মিত্রগণ সনে।
সঙ্গোপনে বন্ধুসহ কুকার্য্য সাধন
করিয়া সিরাজ কাল কাটে অনুক্ষণ।

(৮)

ক্রমে মাতামহ কাছে সতত তাহার
বসতি অন্যায় বলি মানসে সঞ্চার।
আলিবর্দ্দী কাছে তাই সিরাজ গমন
করিল একদা ইষ্ট করিতে সাধন—

কহিল তাহারে সব খুলি নিজ মন
আমি তব উপযুক্ত দৌহিত্র রতন
আমোদ প্রমোদ করা মোর সর্ব্বক্ষণ
উচিত তোমার পাশে নহে কদাচন।

(৯)

স্বতন্ত্র প্রমোদশালা আমার কারণ
কর্ত্তব্য নির্ম্মাণ করা তোমার এখন।
দৌহিত্রের কথা শুনি মাতামহ চিত
প্রসন্ন প্রফুল্ল ভাব করিল ধারণ,
যেমন সুন্দর যুবা দেহ বীরোচিত
পরিপক্ক বুদ্ধি তার হয়েছে এখন
এইরূপে সিরাজের স্মরি গুণ যত
দৌহিত্র প্রস্তাবে আলি হইল সম্মত।

হীরাঝিলের প্রাসাদে—সিরাজের যৌবনাবস্থা

(১০)

গঙ্গার পশ্চিম তীরে সিরাজ কারণ
নির্ম্মিত প্রমোদশালা মানসমোহন
অট্টালিকা প্রান্তে ঝিল হইল খনন
প্রথিত উভয় পার্শ্বে ইষ্টক যাহার—
"হীরাঝিল" নাম যার বিদিত ভুবন
সৌন্দর্য্যে অতুল ভবে সম নাহি আর
চন্দ্রকরে কি মাধুরী স্বচ্ছ ঝিলনীর
ধরিয়া করিত চিত্ত দর্শক অধীর

(১১)

নর্ত্তকী, গায়িকা, আর সহ বন্ধুগণ
ঝিলনীর বক্ষতরী করি আরোহণ
যখন সিরাজ সুখে করিত ভ্রমণ
ঝিলের কতই শোভা হইত বর্দ্ধন।
শীকার তল্লাস ব্যাঘ্র করে যথা বনে
সিরাজ প্রমোদশালে তথা সঙ্গী সনে
পরনারী অঙ্কগতা বলে কিম্বা ধনে
করিয়া কাটায় কাল মদিরাসেবনে।

(১২)

নিত্য নব রূপবতী বার নারীগণ
সিরাজ আদেশে তথা করিত গমন।
এই হিরাঝিলে ফৈজীরূপ সুধাপানে
সিরাজ পাগল হয়ে ছিল একদিন
একদিন লুৎফুন্নেসা সহ এই স্থানে
সিরাজ আমোদ ভোগ কত নিশিদিন
—কাটায়েছে ; যাপিয়াছে বিলাস জীবন
সে সুখের হীরাঝিল কোথায় এখন !

(১৩)

নৃত্যগীতে যে প্রাসাদ সদা মুখরিত
দুর্গন্ধ মদিরা গন্ধে চৌদিক পূরিত
কত কুলললনার সতীত্ব রতন
একদা যে প্রাসাদেতে হয়েছে বিলীন
কোথা সেই পাপ পুরী রয়েছে এখন
কালের প্রবাহে এবে অস্তিত্ব বিহীন

একদিন বঙ্গভূমি নামেতে যাহার
—কাঁপিয়াছে ; আজি নাহি চিহ্ন মাত্র তার !

মুর্শিদাবাদে—সিরাজের রাজত্বকাল

(১৪)

পাণ্ডু শোথে ক্লিষ্ট আলি ত্যজিল জীবন
সিরাজ রাজ্যের ভার করিল গ্রহণ।
রাজ্য মাঝে রাজশক্তি করিলা বিস্তার
দিনে দিনে অর্থ চিন্তা বাড়িল রাজার
অত্যাচার উৎপীড়ন কমিল না তার
সদা ভীত চিত্ত যত রাজা জমীদার—
সিরাজ ইংরাজদ্বেষী অনেকেই কয়
আবাল্য তাঁহার মিত্র কভু যারা নয়।

(১৫)

ইতিহাসে সুবিখ্যাত ঢাকার নবাব
রাজবল্লভের নহে সামান্য প্রভাব
অর্থ পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া সিরাজ
লভিতে তাহার অর্থ করিল গমন
রাজপুত্র কৃষ্ণদাস নিকটে ইংরাজ
নবাবের ভয়ে শেষে লইল শরণ।
তাহাতে উদিল ক্রোধ ইংরাজ উপরে
সিরাজ খুঁজিল পন্থা প্রতিশোধ তরে।

(১৬)

ইংরাজ সিরাজ আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন
রাজপুত্র কৃষ্ণদাসে রক্ষিয়া যখন,

তখনি নবাব আজ্ঞা করিল প্রচার
"ইংরাজ সত্বর দুর্গ ফেলহ ভাঙ্গিয়া
তোমরা করিছ এবে যাহার সংস্কার।"
ইংরাজ অন্যায় আজ্ঞা দিল উড়াইয়া
ক্রোধেতে উন্মত্ত হয় নবাব তখন
কাশিমবাজার কুঠী করিল বেষ্টন।

(১৭)

তারপর কলিকাতা করি আক্রমণ
অন্ধকূপে ইংরাজেরে করিল ক্ষেপণ
বায়ু জল অভাবেতে ছটফট প্রাণ
অকালে ইংরাজ যত ত্যজিল জীবন
নিত্য নব অত্যাচার করিয়া সাধন
সিরাজ লোকের হল অপ্রিয় ভাজন
সে কারণ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জনগণ
সিরাজ অনিষ্ট হেতু সবে দিল মন।

(১৮)

ইতিহাসে যারে কয় কুবের সমান
জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া সম্মান
জগৎশেঠের নাম খ্যাত চরাচরে।
রাজার রাজত্ব, জমীদারের সম্মান
নবাবের সিংহাসন ছিল যাঁর করে
সিরাজ করিয়াছিল তার অপমান
কিরূপে সে হতভাগ্য রাখিবে জীবন
একবার তার লাগি করেনা চিন্তন।

(১৯)

দীর্ঘশ্মশ্রু সমন্বিত বণিক্ প্রধান
উমিচাঁদ রাজ যোগ্য লভিত সম্মান
শত সৌধ বিভূষিত রাজপুরী যার
নয়নরঞ্জন জনগণ মনোরম
পুষ্পরাজি সুশোভিত উদ্যান যাহার
দেখিলে নন্দন বলি মনে হত ভ্রম
সশস্ত্র প্রহরীদল সদা সিংহদ্বার
রক্ষিত, ভূষিত হয়ে আদেশে যাহার।

(২০)

ইংরাজ কুঠীতে আর নবাব দরবারে
সমান সম্মান দান করিত যাহারে
সেও রুষ্ট অসন্তুষ্ট সিরাজ আচারে
তাই মিলি গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত সুজন
নবাব সিরাজ রাজ্য চ্যুত করিবারে
করিল মনন দুর্ভাগ্য অতুল
ইতিহাসে যার দোষ ঘোষে অনিবার।

(২১)

সিরাজের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
মন্ত্রণার স্থল হল শেঠের ভবন
গভীর রজনীকাল সুপ্ত ধরাতল
নীরব অবনী স্তব্ধ জীব সমুদায়
বহুজন পরিপূর্ণ মন্ত্রণার স্থল
নীরবতা ভঙ্গ তবু নাহি দেখা যায়
বহু তর্ক বিতর্কের পর নিরূপণ
হইল, মিরজাফর পাবে সিংহাসন।

(২২)

কেহবা সত্তর লক্ষ, কেহ কোটী মান্,
কেহ পাবে ত্রিশ লক্ষ যুদ্ধ অবসান
কালনেমী করেছিল যথা লঙ্কা ভাগ
সেইরূপ সেনাপতি ক্লাইব কেশরী—
নবাবের ধনরত্ন করিল বিভাগ
ভাঙ্গিল বিরাট সভা চলিল শর্ব্বরী
বঙ্গলক্ষ্মী সিরাজের গৃহ তেয়াগিল
ইংরাজের প্রতি তাঁর করুণা হইল।

পলাশীর যুদ্ধে—সিরাজ।

(১)

দ্বাবিংশ রজনী জুন্ নিশীথ মেদিনী
ঘনঘোর অন্ধকার
মেঘাচ্ছন্ন চারিধার
হেনকালে পলাশীতে ব্রিটীশবাহিনী—

(২)

"লক্ষবাগ" নামে খ্যাত রসাল কানন
ব্রিটীশের সেনাদলে
ক্লান্ত দেহ আর্দ্র জলে
আম্রকুঞ্জতলে করে আশ্রয় গ্রহণ*

* The whole army reached Plassey grove after a great fatiguin march and through a whole night's rain (—Ive's Journal).

(৩)

তেজ নগরের নাম জানে বহু জনে
তাহার প্রান্তরে ধীরে
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তীরে
আছিল সিরাজ সেনা শিবির স্থাপনে

(৪)

নবাবের রণভেরী বাজিয়া উঠিল
বহু দূরে শব্দ তার
পশিতেছে অনিবার
সেই শব্দে শত্রুগণ হৃদয় কাঁপিল।

(৫)

এইবার নিকটেতে শত্রু সেনাগণ
বুঝিয়া ক্লাইব মনে
সারা রাতি জাগরণে
কাটাইল চিন্তাবৃত চিত্তে সর্ব্বক্ষণ।

(৬)

সাত পাঁচ মনে মনে ক্লাইব গণিল
কিরূপে সম্মুখ রণে
নবাব সৈন্যের সনে
যুঝিব ইহাই তাঁর মানসে উদিল।

(৭)

সময় সুযোগ বুঝি চোর একজন
সহসা কৌশল করি
শিবিরে প্রবেশ করি—
সিরাজের ফর্শী লয়ে করে পলায়ন।

(৮)

সুপ্তোত্থিত জন প্রায় সিরাজ তখন
পশ্চাতে ছুটিল তার
ধরিতে না পারি আর
শিবিরে ফিরিল পুনঃ হয়ে ক্ষুণ্ণ মন

(৯)

অলক্ষিতে আর্ত্ত স্বরে সিরাজ তখন
বলে "মরি নাই হায়!
তথাপি মৃতের প্রায়!
ইহারা সকলে মোরে করিছে গণন!*

(১০)

পোহাইল বিভাবরী উদিল দিনেশ
নবাবের মুখশশী
মলিন করিল পশি
চিন্তানল, হৃদয়েতে নাহি সুখলেশ।

(১১)

জাফর লতিফ রায়দুর্লভের সেনা।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ফিরে
ব্যূহ রচি ধীরে ধীরে—
বেষ্টিতে রসালকুঞ্জ করিল সূচনা (†)

* The soldier slept, but few of the officers and last of all the commander. (Orme ii 172),

† At day break of the 23rd, the nabab's army was perceived marching out of their lines towards the grove which we were in possession of; their intention seemed to surround us (Ive's Journal).

(১২)

সরসীর তীরে মীরমদন রহিয়া—
কামানে আগুন দিল
মহাশব্দে বাহিরিল
একটী লোহিত গোলা ভীষণ হইয়া—

(১৩)

তখনি সে গোলাঘাতে গোরা একজন
শমন ভবনে হায়—
জনেক মৃতের প্রায়
আহত সমর স্থলে হারায়ে চেতন। (*)

(১৪)

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান পীড়নে
ছুচারি নবাব সৈন্য
না দেখি উপায় অন্য
একে একে গেল সবে সমন সদনে।

(১৫)

অর্দ্ধ ঘণ্টা মাঝে গোরা সৈন্য ত্রিশজন
মৃত্যুর ক্রোড়েতে যবে
শুইয়া পড়িল সবে
ক্লাইবের রণসাধ মিটিল তখন।

(১৬)

ইংরাজের ত্রিসহস্র সেনা মুষ্টিমেয়
ভাবিল যে কতক্ষণ

† (Orme vol. ii 175).

শত্রুগণ সহ রণ
করিব ; যাহারা যুদ্ধে ভীষণ অজেয় !

(১৭)

ইংরাজ কামান দুটী বাহিরে রাখিল
লইয়া চারিটী আর—
আম্র কুঞ্জে অন্ধকার—
ক্লাইভ আদেশে সবে লুকায়ে বসিল।

(১৮)

নবাবের ব্যূহসজ্জা, সমর কৌশল,
নিরখি ক্লাইভ মন
কাঁপিতেছে অনুক্ষণ
ক্রোধে বর্ষে উমিচাঁদে বাক্য হলাহল।

(১৯)

অপাত্রে বিশ্বাস মোরা করিয়া স্থাপন
বড়ই কুকাজ হায় !
করিয়াছি প্রাণ যায়—
কিরূপে জিনিব মোরা বলহ এখন।

(২০)

কিবা স্থির হয়েছিল মন্ত্রণা ভবনে ?
"একটা সামান্য রণ
করি তার পরক্ষণ
মনস্কাম পূর্ণ হবে" ভাব দেখি মনে ?

(২১)

নবাবের সেনাদল পলাশী প্রাঙ্গনে
লুকাইয়া বাহুবলে

রবে মাত্র যুদ্ধস্থলে
বিপরীত সব কথা দেখিয়ে এখন।

(২২)

উমিচাঁদ নম্রভাবে কহিল তখন
"যুদ্ধ করে অনিবার
মীরমদনের আর
মোহনলালের সেনা কর দরশন।"

(২৩)

"প্রভুভক্ত সেনাপতি এরা দুই জন
প্রাণপণে এ দু'জনে
পরাস্ত করহ রণে
আর কেহ করিবেনা অস্ত্রসঞ্চালন।"

(২৪)

"দেখ দেখি মীর্জাফর সহ সৈন্যগণ
ইয়ারলতিফ বীর
সসৈন্যে রয়েছে স্থির
রায় দুর্লভের সেনা অটল কেমন!"

(২৫)

চিত্রার্পিত সম অই সেনাপতিগণ
নিজ নিজ সৈন্যচয়—
সহিত দাঁড়ায়ে রয়—
আশ্চর্য্য কৌতুক যেন করিছে দর্শন। *

* "Mirza afer Khan, * * * contented himself withstanding at a distance with the troops under his command, exactly, like one who had come only to see the engagement although his sole air was to effect Siraj-ud-daulah's downfall". (The Sir Mutakherin English Translation Vol. ii Page 231).

(২৬)

মীরমদনের সেনা আকৃতি ভীষণ
সুধীরে সম্মুখে আসি
ভুজবল সুপ্রকাশি
বিপুল বিক্রমে করে গোলা বরিষণ—

(২৭)

তখন ক্লাইভ বীর মন্ত্রণা কুশল
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে—
পশিল মন্ত্রণা ঘরে—
জিজ্ঞাসিতে মিত্রগণে সমর কৌশল

(২৮)

সমর সভায় এই হল নিরূপণ
আজিকে ইংরাজগণে
মিলি এই আম্রবনে
লুকাইয়া কোনরূপে বাঁচাও জীবন

(২৯)

ধূমরাশি অকস্মাৎ ছাইল গগন
আষাঢ়ের মেঘ তায়
কিছু নাহি দেখা যায় —
মধ্যাহ্ন নিশীথকাল দিন দরশন

(৩০)

নব মেঘে আচম্বিতে বারি বরিষণ
হইল ভিজিল তায় —
মীরমদনের হায়—
কামান, বারুদ, আদি যুদ্ধে প্রয়োজন

(৩১)

অতীব উদ্যমে বীর যুদ্ধ আয়োজন
করিতেছে এক মনে
সহসা অশুভক্ষণে
আসিল একটী গোলা দৈববিড়ম্বন

(৩২)

সেই ভীম গোলাঘাতে ছিন্ন উরুস্থল
মীরমদনের হায়—
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়—
ফুরাইল সেই সঙ্গে সিরাজের বল।

(৩৩)

ধরাধরি করি সেই বীর কেশরীরে
লয়ে যত সৈন্যগণ
ত্যজিয়া বিষম রণ
উপনীত একেবারে সিরাজ শিবিরে।

(৩৪)

লুকায়েছে আম্রবনে শত্রু সেনাগণ
কহিল তথায় গিয়া
মীরমদনের হিয়া—
কম্পিত মৃত্যুর কোলে করিয়া শয়ন—

(৩৫)

মীরমদনের মুখে নবাব যখন
শুনে সেনাধ্যক্ষগণ
কেহনা করিছে রণ
দাঁড়ায়ে করিছে সবে আমোদ দর্শন।

(৩৬)

একাকী মোহনলাল যুঝিতে লাগিল,
আহত বীরের কথা
শুনিয়া সিরাজ ব্যথা
দেখিল নবাব আজি ব্যাকুলিত মন

(৩৭)

মীর্জাফর সহ পুত্র, পাত্র মিত্রগণ
ধরিয়া শাণিত অসি
সিরাজ শিবিরে পশি *
দেখিল নবাব আজি ব্যাকুলিত মন

(৩৮)

মীরজাফরের চিন্তা দূরে পলাইল
নাহিক বন্ধন ভয়—
তথায় ঘাতক চয়—
তার তরে সুসজ্জিত নাহিক দেখিল।

(৩৯)

সিরাজ কিরীট খুলি সম্মুখে জাফর
আকুল হৃদয়ে তারে
বলিল সে বারে বারে
তুমি মাত্র এ মুকুট রক্ষণে তৎপর।

* At last he came accompanised by his son Miran, alias Mir Mohammad Sudy-Khan by Ihaden-hussain-Khan and by a numerous body of his friends and followers well armed (The S. Mutakherin P. 232).

(৪০)

আলিবর্দ্দী নাহি এবে তুমিই প্রধান
পূর্ণ কর যার স্থান
বিপদে করহ ত্রাণ—
রাখহ সম্ভ্রম, প্রাণ রাজোচিত মান।

(৪১)

কৃত্রিম বিশ্বস্তভাবে মীর্জাফর কয়
মুকুটে কুর্ণিশ করি—
বক্ষোপরি হস্তধরি
"ভয় নাই শত্রু জয় করিব নিশ্চয়।

(৪২)

"আজি দিবা হইয়াছে দেখি অবসান
যুদ্ধ করি সারাদিন
সিপাহীরা বলহীন
আজিকে শিবিরে তারা করুক প্রস্থান।

(৪৩)

"প্রভাতে আবার যুদ্ধ হবে সংঘটন"
সিরাজ বলিল তায়—

* He (Siraj ud-daulah) even took his turban from off his head, and placed it before the General to whom he addressed those very word, * * I took up to you as to the only one present alive of that venerable personage; * * * I recommend myself to you, to be care of the conservation of my honour and life.

"ঘটিবে যে নিরুপায়
নিশায় শিবির শত্রু করিলে বেষ্টন।

(৪৪)

সগরবে মির্জাফর বলিল যখন
"ঘটিবে যদি বা হেন
আমরা রয়েছি কেন ?"
সিরাজের মতি ভ্রম ঘটিল তখন।

(৪৫)

সিরাজ আদেশ দিল যত সৈন্যগণে
"মীর্জাফরে বিশ্বাসিয়া—
আপনা ভুলিয়া গিয়া—
"ক্ষান্ত হও শিবিরেতে যাও সর্ব্বজনে"

(৪৬)

না শুনে মোহনলাল আদেশ তখন
তাহার সেনানীচয়—
রণমত্ত সে সময়
অদম্য সাহসে শত্রু করি আক্রমণ

(৪৭)

সিরাজ মোহনলাল্ বলিল সম্ভ্রমে
"দুই চারি দণ্ডে আর—

* "That the day was now drawing to its end ; and that there remained no itme for attack sent a counter order to the troops that are advancing said he, recall those engaged ; and tomorrow with the blessing of God I will join all the troops together and provide for the engagement, Siraj-ud-daulah observed, that they might be attacked by the enemy in the night. This also the general took upon himself to provide against and he promised that the enemy would not form a night attack (S. M. Page 233).

রণসিন্ধু হব পার—
অনুচিত ক্ষান্ত, এবে রণে কোন ক্রমে।

(৪৮)

"পদ মাত্র যদি মোরা পশ্চাদ্‌গমন
করি তবে এই ক্ষণ—
সর্ব্বনাশে সংঘটন—
হইবে জানিও মোর অব্যর্থ বচন।"

(৪৯)

"ফিরিব না কোন ক্রমে করিব সমর—'
মোহনলালের বাণী—
মনে দৃঢ় অনুমানি—
শিহরিল সেনাপতি দুষ্ট মীর্জাফর।

(৫০)

নবাবে তুষিল শঠ বিবিধ বিধানে
নবাব সরল মনে
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে
শিবিরে ফিরিতে পুন, ক্ষান্ত যুদ্ধদানে।

(৫১)

অলঙ্ঘ্য প্রভুর বাক্য বলিয়া তখন
যদিও অনিছা ছিল
তবু যুদ্ধ তেয়াগিল
মোহনলালের চক্ষু লোহিত বরণ—

(৫২)

মীর্জাফর করেছিল যা কিছু মনন
পরমেশ পূরাইল
ক্লাইবে সংবাদ দিল
"লুকায়ে থাকার আর নাহি প্রয়োজন।"

(৫৩)

এক্ষণ অথবা নিশি তৃতীয় প্রহরে
লভিবে নিশ্চয় জয়
মানসে না করি ভয়
আক্রমণ কর যদি শিবির উপরে।

(৫৪)

সময় সুযোগ বুঝি বৃটিশ বাহিনী
ধীরে ধীরে বাহিরিল
আম্রবন তেয়াগিল
রণবাদ্যে যুদ্ধস্থল কাঁপায় মেদিনী।

(৫৫)

দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সহ সৈন্যগণ
রণভূমি তেয়াগিয়া
হস্তী পৃষ্ঠে আরোহিয়া
সিরাজ রক্ষিতে রাজ্য করিল গমন।

(৫৬)

বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর্জাফর
সময় বুঝিয়া মনে
ইংরাজ সেনানী সনে
যোগদান করিবারে হল অগ্রসর ।

(৫৭)

পাঁচটা বাজিয়া গেল তবু সমভাবে
যুদ্ধ চলে অনুক্ষণ
ক্রোধে ভঙ্গ দিল রণ
নবাবের সেনা, দেখি জাফর স্বভাবে

(৫৮)

বৃটীশ বাহিনীগণ সদর্পে তখন
শূন্য শিবিরের পানে
অগ্রসর যুদ্ধ দানে
নবাব সিরাজে সবে করিতে নিধন।

(৫৯)

শিবির সিরাজ শূন্য দেখি সৈন্যগণ
আনন্দে প্রফুল্লমন
কাঁপাইয়া আম্রবন
ভীম রবে জয় বাদ্য করে ঘন ঘন।

(৬০)

জানিল বৃটীশ জয় পলাশী প্রান্তর
জয় ঘোষে সর্ব্বস্থান
চিন্তা, ভয়, তিরোধান
হইল সকল প্রজা প্রফুল্ল অন্তর।

(৬১)

জয়ের নিশান তুলি ইংরেজ তখন
ক্লাইভ সৈন্যের সনে
মীর্জাফর সিংহাসনে
বসাইতে রাজধানী করিল গমন।

(৬২)

মুরশিদাবাদে পশি দেখে মীরজাফর
নাহিক সিয়াজ আর
শূন্য রাজাসন তার
সস্ত্রাক পলায়ে গেছে কোথা রাজ্যেশ্বর—

(৬৩)

নাহিক রাজ্যের শোভা রাজ্যলক্ষ্মী হীন
চারিদিকে শোভা হীন
পশুপক্ষী প্রাণিহীন
হয়ে যেন যাপিতেছে সবে নিশি দিন।

(৬৪)

সুদূর সমুদ্র পারে জ্বলিছে কেবল
একটী উজ্জ্বল আলো
নগরী করিয়া আলো
নাচায়ে পবিত্র করে যেন জলস্থল।

(৬৫)

নিরূপিত দিনে সিংহাসনে আরোহণ
করিয়া মীরজাফর
চারিদিকে বহুচর
পাঠাইল সিরাজেরে করিতে বন্ধন।

জাফরাগঞ্জে—সিরাজের শেষ জীবন।

(১)

পলাশীর রণবহ্নি হইল নির্ব্বাণ
নবাবের পরাজয় ঘোষিল সকলে
তবু না ত্যজিল আশা সিরাজের প্রাণ
জয়াশা মানসে তার জাগে পলে পলে।
কিন্তু হায় অবশেষে সকলি অসার;
সিরাজ শত্রুর হস্তে পেলনা নিস্তার।

(২)

একদিন যেই স্থানে সিংহপরাক্রম
প্রকাশিয়া ছিল বীর নবাব সিরাজ
তথায় সে বন্দী বেশে আজি দস্যুসম
জুলাই দ্বিতীয় রাত্রে নিশীথ বিরাজ
গলদশ্রু আঁখি দেহ শৃঙ্খলিত তার—
শশী বিনিন্দিত মুখ শোভার আধার।

(৩)

ললিত লাবণ্যময় দেহ অনুপম
মলিন হয়েছে এবে নিগ্রহ কারণ,
সিংহের কুমার আজি শৃগালের সম
সহস্র বৃশ্চিক তারে দংশে অনুক্ষণ।
বিধাতার ভাগ্য লিপি কে পারে খণ্ডিতে ?
নিজ কর্ম্ম ফল জীব ভুঞ্জে পৃথিবীতে !

(৪)

জাফ্রাগঞ্জ রাজ সৌধকক্ষ তমোময়
বন্ধুহীন, মিত্রহীন সেই কারাগার
দেখিলেই মনে হয় যেন যমালয়,
সিরাজ একাকী যথা ফেলে অশ্রুধার।
চৌদিকে আমিত্র তার করিছে ভ্রমণ
পিঞ্জরে আবদ্ধ আজি সিংহের নন্দন।

(৫)

মাতামহ আলিবর্দ্দী নাহি তথা আর
নাহিক জননী তথা আমিনা বেগম
নাহি মাতামহী তার স্নেহের আধার
নাহিক লুৎফুন্নেসা ভার্য্যা প্রিয়তম,
অরণ্যে ব্যাধের করে বিহঙ্গ যেমন
তেমতি সিরাজ আজি ব্যাকুলিত মন।

(৬)

ভাবনা সাগরে আজি সিরাজ মগন
জীবনের যত কাজ ভাবে মনে মনে
কভু হাসে কভু করে অশ্রু বরিষণ
যেমতি পাগল কভু বিরস বদনে ;
স্মরি পূর্ব্ব সুখ ফাটে সিরাজ হৃদয়—
রাজা হয়ে কারাদুঃখ জীবনে কি সয় ?

(৭)

সিরাজের আয়ুদিবা ক্রমে অবসান
সহসা মৃত্যুর ক্ষণ হল উপনীত
সিরাজ বধের আজ্ঞা করিল প্রদান
মীরণ—জাফরপুত্র নিষ্ঠুর দুর্নীত।
আসিল ঘাতকবৃন্দ মীরণ আদেশে,
সেই সৌধ কারাগারে রাক্ষসের বেশে।

(৮)

শুনিয়া সিরাজহত্যা একে একে সবে
প্রদর্শিল পৃষ্ঠদেশ আজ্ঞাকারী জনে,
কিন্তু হায় অর্থ ব্যয়ে কোন কার্য্য করে ?
অসম্পন্ন চিরকাল থাকে এ ভুবনে ?
সামান্য মানব হত্যা—সিরাজ জীবন,
অর্থ বিনিময়ে হয় অসাধ্য সাধন।

(৯)

উপনীত মহম্মদী বেগ অবশেষে—
সিরাজ অন্নেতে যার পুষ্ট কলেবর
দুরাত্মা পশিল কক্ষে ঘাতকের বেশে—
প্রচণ্ড মুরতি সেই মুক্ত-অসিকর—
দেখিয়া ঘাতক দেহ কাঁপে থর থর—
সিরাজ পাগলসম ব্যাকুল অন্তর।—

(১০)

এতক্ষণ কত আশা হৃদয়ে তাহার—
ক্ষণে ক্ষণে খদ্যোতের প্রায় সমুদিত—

* At last, one Muhamedy-beg accepted the commission, which so many had rejected with indignation. This man who had been fed in the house of Siraj-ud-daulah's father, and in that of Aly-verdy Khan's consort. See Scotts' History of Bengal Page 372 (S. M. Page 242).

ইহার অপর নাম "লাল মহম্মদ"।

† "—No—they are not,—and I must die—to alone for Hossain-culi-Khan's murder's (S. M.—Page 242).

মুহূর্ত্ত মাঝেতে হায় সকলি অসার—
সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তার হল প্রবাহিত
কেমনে জীবন রবে ভাবিল তখন
অন্য চিন্তা ত্যজিয়াছে সিরাজের মন।

(১১)

ক্রমশঃ বাড়িল তার মনের আবেগ
কম্পিত অধর "ওষ্ঠে আর্ত্ত কণ্ঠে আর—
সিরাজ বলিল, কেরে মহম্মদী বেগ?
তুমি! তুমি! তুমিই কি শেষে তীক্ষ্ণধার—
অসি করে আসিয়াছ বধিতে আমায়?
ভবে নিমখারামীর দিতে পরিচয়? (*)

(১২)

"কেন? কেন? কেন? তুমি বলিতে কি পার
সুবিস্তৃত জন্মভূমে নিভৃত আলয়ে—
সামান্য অশন আর বসন আমার—
অদানেতে অপারগ ইহারা নির্ভয়ে?
কিছুই চাহি না শুধু চাহিতেছি প্রাণ—
ভিক্ষা চাই দাও মোরে রাখহ সম্মান।"

(২) যে স্থানে সিরাজের অন্নদাস মহম্মদী বেগ তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়াছিল সে স্থান অদ্যাপি "নিমখারাম দেউড়ী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(১৩)

দুর্ভাগ্য সিরাজ হায় হয়েছে এখন
নতুবা ঘাতকে কেন প্রাণ ভিক্ষা চায়
কালি যার প্রতাপেতে ফাটিত গগন
আজি তার দুরবস্থা পদরেণু প্রায়,
কালের কুটিল চক্র কে ভেদিতে পারে
অহঙ্কার, ধন মদ অসার সংসারে।

(১৪)

পুরক্ষণে আত্মগর্ব্বে সিরাজ হৃদয়
টলিল, ঘাতকে কয় ত্যজি নম্র ভাব—
না—না—মোর আর বাঁচা উচিত ত নয়
এখনি জগতে হোক আমার অভাব।
জগতের শত্রু বলি খ্যাত যেই জন
ক্ষমার অযোগ্য ভবে নিশ্চয় সেজন।

(১৫)

এখনো লিখিত আছে উজ্জ্বল মসীতে
করেছি কুকাজ যত ভবে অনুষ্ঠান
"বধেছি হোসেনকুলী সুতীক্ষ্ণ অসিতে
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক বিধান"।
লও অসি দাও গলে ঘাতক প্রধান
হউক এ বঙ্গভূমি শান্তিময় স্থান।"

(১৬)

পরক্ষণে চাহি লাল মহম্মদ পানে
নিরাশ কটাক্ষে দৃষ্টি করিয়া ক্ষেপণ
"এস—রহ—রহ তৃষ্ণা হর বারিদানে"
বলিল সিরাজ হয়ে পিপাসু বদন।
শুনে কি কৃতঘ্ন হন্তা কাতরোক্তি তার
পাপিষ্ঠ ঘাতকে বলে সিরাজ আবার।

(১৭)

"তিষ্ঠ লাল মহম্মদ তিষ্ঠ কিছুক্ষণ,
অন্তিম দেবতা কাছে আমি একবার
জীবনের শেষ কাজ করি সম্পাদন,
তাহাতে তোমারো পুণ্য হইবে অপার।
কে শুনিছে সে সদয় সিরাজবচন
পুণ্যময় ইচ্ছা তার হলোনা পূরণ !

(১৮)

দিল বাধা না হইতে শেষ উপাসনা
প্রহারি সিরাজ গলে অসি তীক্ষ্ণ ধার,
দারুণ আঘাত লভি মরম বেদনা
রুধিরাক্ত কলেবরে ছুটি চারি ধার
ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে কক্ষের উপর
ঘাতক প্রহারে অসি তবু নিরন্তর।

(১৯)

মহম্মদীবেগ হয়ে উন্মত্তের প্রায়
পুনঃ পুনঃ সিরাজেরে করে খড়্গাঘাত
তথাপি অতীব কষ্টে সিরাজ তাহার
কহিল করুণ কণ্ঠে জুড়ী দুটী হাত
ছিড়েছে মরম গ্রন্থি ফুরায়েছে আশ
নাহিক হৃদয়ে আর কোনরূপ ত্রাস

(২০)

"আর না—হোসেনকুলী—আর না—আর না! *
তব আত্মা শান্তি লাভ করুক এখন!!"
বলিয়া নীরব যুবা ফুরাল বাসনা
শত্রুর সকল আশা হইল পূরণ।
বদনের শেষ কথা বদনে রহিল!
পাপপূর্ণ ধরাধাম সিরাজ ত্যজিল।

(২১)

নরে যথা নর রক্ত নাহি করে পান
হিংসা দ্বেষ নাহি যথা চির শান্তিময়—

* "Enough,—that is enough—I am done for—and Hosein-culi-Khan's death revenged. On uttering word he fell on his face returned his soul to its Maker, and engaged out of this valley of miseries by wading through his own blood (S. M.— Page 242).

তথায় সিরাজ আজি করিল প্রস্থান
ভুলিয়া ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব তুচ্ছ প্রাণ ভয়
সিরাজ বিহনে ধরা হইল নীরব—
রাজ অন্তঃপুরে উঠে শুদ্ধ হাহারব।

লুৎফুন্নেসা-সমীপে সিরাজ।

(১)

অশান্তির নিকেতন সংসার মাঝারে
প্রিয়তমা পত্নী মাত্র সুখের আধার
সে সুখে বঞ্চিত করে জগদীশ যারে
তার সম দুরদৃষ্ট কেবা আছে আর ?

(২)

তরুণ অরুণ যথা প্রভাত গগনে
সুনীল অম্বরে যথা তারকার রাশি
শারদ চন্দ্রমা যথা মানবনয়নে
সরসীর বুকে যথা কমলের হাসি।

(৩)

মানবের প্রিয়তমা রমণীবদন
ততোধিক সুখ কর মানসমোহন,

ঐশ্বর্য্য সম্পদ কিম্বা সুখের সদন
প্রিয়ম্বদা নারী তুল্য নাহি কোন ধন।

(৪)

চির অশান্তির অঙ্কে করিয়া শয়ন
মানসে কতই কষ্ট করিত বিরাজ,
কিন্তু লভি অদ্বিতীয় রমণী রতন
হৃদয়ে অমূল্য সুখ পাইত সিরাজ।

(৫)

ললিত লাবণ্যময় পত্নীদেহ তার
অধরে মধুর হাসি হেরিয়া নয়নে,
পরাণপাগলকারী শকতি অপার
সিরাজ আপনা ভুলি রহিত সেক্ষণে।

(৬)

লুৎফুন্নেসা সিরাজের প্রীতির আধার
স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, সৌন্দর্য্যের খনি
তাই বলি নবাবের হৃদয় আগার—
অধিকার পেয়েছিল নারীচূড়ামণি।

(৭)

সুবিস্তৃত লোচনের প্রকৃতি চঞ্চল
শত চক্ষে হেরিয়াও সিরাজের আশ
মিটিত না, মনে হ'ত হেরি অবিরল
মনের বাসনা কভু হয়নি বিনাশ।

(৮)

অশান্তি সাগর পারে অবসর ক্ষণে
আসিয়া সিরাজ যবে লভিত বিরাম
(লুৎফুন্নেসার পার্শ্বে বসি মনে মনে)
ভাসিত শান্তির স্রোতে সুখের বিরাম।

(৯)

স্বর্গ সুখে বিমোহিত সিরাজের মন
হৃদয়ে কতই আহা ছুটিত তখন
যাহা কিছু মনোদুঃখ দূরে পলায়ন
করিত, শোভিত হৃদে নন্দনকানন।

(১০)

পতিভক্তি রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
তাহে দেহ বিভূষিত লুৎফুন্নেসার—
পতি মাত্র রমণীর জগতের সার—
জানিত লুৎফুন্নেসা রূপের আধার।

(১১)

রাজরাণী ছিল যবে তখনো যেমন
ভিখারীর পত্নী সাজি নহে ভিন্ন মন
স্বামী সুখে সুখী আর দুখে দুখী মন
অদ্বিতীয় লুৎফুন্নেসা মাঝেতে ভুবন।

(১২)

অপ্সরানিন্দিত-রূপা সিরাজ মহিষী
একমাত্র কন্যা রত্ন রাখি অঙ্কস্থানে,
বৈধব্য দুর্দ্দশা লভি সারা দিবানিশি
কাঁদিত নিয়ত দুঃখে কাতর পরাণে।

(১৩)

ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবার্চ্চনা করি সমাধান
স্মরিয়া পতির মুখ কাঁদিয়া অধীর
অনাথার নিত্য ক্রিয়া সমাধি উদ্যান
গমন করিয়া পূজা করিত স্বামীর।

(১৪)

স্বর্ণ রৌপ্যময় পুষ্পান্বিত কৃষ্ণবাস
সিরাজ সমাধি ছিল যাহে আবরিত,
প্রত্যহ প্রদীপ জ্বালি তার তমোনাশ
করিতেন লুৎফুন্নেসা ভক্তি পূর্ণচিত।

(১৫)

এখনো সমাধিক্ষেত্র করিলে দর্শন
খোসবাগ উদ্যানেতে করিয়া গমন
লুৎফুন্নেসা পতিভক্তা ছিল যে কেমন
বুঝিবে তাহার স্বামী ছিল কিবা ধন।

(১৬)

দেখিবে সে পতিব্রতা কোথায় শায়িতা
সুখে দুখে যাহা ছিল একমাত্র ধন
লভিয়াছে সেই পদ হইয়াও মৃতা,
ভবে রাখিবার তরে স্বামী নিদর্শন।

(১৭)

একদিন ক্রীতদাসী ছিল যেই নারী
কাটায়েছে আলিবর্দ্দী-আলয়ে জীবন
কে জানিত এত গুণ হৃদয়েতে তারি
রয়েছে অদৃশ্য ভাবে বিশ্ববিমোহন।

(১৮)

রামসীতা চিত্র সম সুধা প্রদায়িনী
আদর্শ যবন-নারী তুল্য আর নাই
লুৎফুন্নেসা, সিরাজ অদৃষ্ট-কাহিনী
ইতিহাসে সুশোভিত রয়েছে সদাই।

লেখকের এক দিনের স্মৃতি।

সমাধি-কাননে—সিরাজ।

আলিবর্দ্দী নবাবের কীর্ত্তির নিশান
বিখ্যাত শ্মশানভূমি "খোসবাগ" হায়।
কলস্বনা প্রবাহিনী, ত্রিতাপহারিণী,
কলুষনাশিনী মর্ত্তে মাতা ভাগীরথী
চলিতেছে দ্রুতপদে পূর্ব্বেতে যাহার,
প্রশান্ত চরণতল করিয়া চুম্বন!—
জাগায়ে প্রাচীন স্মৃতি ভাবুকের মনে!
এখনো দাঁড়ায়ে আছে অচল অটল
বাঙ্গলার রাজধানী ছিল কোন দিন
মুর্শিদাবাদ—এই বিজ্ঞাপন তরে।
নিরখিলে যার পানে শান্তিবারিকণা
বরষে নীরবে ধীরে শান্তিহীনমনে
বিজড়িত, তার সনে সিরাজের নাম।
অনল প্রবাহ নাহি বহে সে শ্মশানে
অহরহঃ প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন।
চাহিলে কাননপানে চিন্তারত চিতে,
মানবের মনে হয় বৈরাগ্য সঞ্চার!
কত কথা মনে পড়ে আপনা হইতে
যবনের অত্যাচার অবিচার গাথা
নবাবের প্রতিকূলে যত ষড়যন্ত্র
পলাশীর যুদ্ধগাথা বিষাদ কাহিনী
অবশেষে দুর্ভাগ্যের বিনাশ ব্যাপার।

মধুকর গায় সদা তথা গুণগান
প্রস্ফুটিত ফুলমধু সেবি মনোসাধে ;
বিহঙ্গের "কল" গানে মুখরিত সদা
সে অপূর্ব্ব উপবন ; হৃদয়ের জ্বালা
দূরীভূত কিছুক্ষণ রহিলে তথায়।
সুশীতল পবনের চির বাসস্থান
সুন্দর উদ্যান বানরের ক্রীড়া ভূমি
ভাবিলে নয়নে হয় অশ্রুর সঞ্চার।
সমাধি মন্দির মাঝে পশিলে সহসা
লোমাঞ্চিত কলেবরে ভয়ের সঞ্চার।
মধ্যস্থলে আলিবর্দ্দী আদর্শ নবাব
দক্ষিণে মহিষী তাঁর প্রাণ প্রিয়তমা
পূর্ব্ব পার্শ্বে পত্নীসহ দুর্ভাগ্য সিরাজ
চিহ্নহীন, অবিখ্যাত নগণ্যের প্রায়
মৃত্তিকার সনে মিশি রয়েছে শায়িত

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* লেখকের সহিত আমাদের সকল স্থলে ঐক্য নাই। ঐ, সং

রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরী। *

বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রান্তব্যাপী যে সুবিশাল অরণ্যাণী আজ "সুন্দরবন" নামে পরিচিত হইয়া লোকের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিন উহাই বহুধনজনপূর্ণ সুরম্য হর্ম্ম্যমালাবিভূষিত মহাসমৃদ্ধিশালী খণ্ড খণ্ড রাজ্যরূপে বিরাজিত ছিল। কালপ্রভাবে মহামারী, ঝটিকাবর্ত্ত, জলপ্লাবন ও ভূকম্পন প্রভৃতি আধি ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া, দাক্ষিণ্য ও শান্তির কেন্দ্রস্থান সেই সুশোভন জনস্থলী ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া বর্ত্তমানে 'ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র' প্রভৃতি শ্বাপদ সমূহের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কৌশলী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান যুগে সুন্দরবনের অনেকটা স্থান আবাদ হওয়ায় ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধিজ্ঞাপক বহু নিদর্শনাদি ক্রমেই লোক-লোচন-সমীপবর্ত্তী হইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিষ্টার টিলম্যান হেঙ্কন নামক একজন অদ্ভুতকর্ম্মা ইংরাজ পুরুষ যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন।

* Hunter's Statistical account of Bengal, Vol. II, J. Westlands' History of Jessore, বঙ্গীয় বৈশ্যবারু-জীবি সমিতির তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী, ও সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্গীয় সমাজ"।

লেখক—

হেঙ্কনের কৃত আবাদই বর্ত্তমানে "ডেমারাইলের আবাদ" নামে খ্যাত। এই আবাদের অন্তর্গত উস্কা অঞ্চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ, ভূ প্রোথিত মন্দির, জলাশয়, কূপ, রাজপথ ও গড় প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও কিম্বদন্তীসমূহ এ গুলিকে রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরির রাজ্য ও রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

রাজা বুদ্ধিমন্ত নবশাখের অঙ্গীভূত বারুজীবিজাতীয় ও দত্তবংশোদ্ভব ছিলেন। কথিত আছে ইনি বঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। কোন একটী বিশেষ যুদ্ধে জয়লাভ করায় নবাব ইঁহার উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'খাঁ চৌধুরি' উপাধি সহ একটী বিশাল জায়গীর প্রদান করেন। নবাব প্রদত্ত উপাধি ও জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমন্ত যমুনাতীরে রাজধানী স্থাপনান্তর তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বুদ্ধিমন্ত কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা রাজত্ব করিয়াছিলেন বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, তবে তিনি যে একজন ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত ও বিশাল রাজ্যের মহা প্রতাপশালী অধীশ্বর ছিলেন, আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীন জন প্রবাদ উভয়েই অবিসংবাদে তাহা প্রমাণ করিতেছে।

রাজা বুদ্ধিমন্তের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার নির্ম্মিত "নবরত্ন বিষ্ণু মন্দির।" নবরত্ন আগা গোড়া ইষ্টক নির্ম্মিত ও দক্ষিণ দ্বারী। ক্ষীণ স্রোতা স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী ইহার পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। মন্দিরটী উচ্চতায় ৯০, দৈর্ঘে ৩০, এবং প্রস্থে ২৯ হাত হইবে। সম্মুখে দরজার উপরিভাগে দেওয়ালের গায়, দক্ষিণে গরুড়ের মস্তকোপরি কৃষ্ণ বলরামের প্রতিমূর্ত্তি ও বামে নারদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রতিমূর্ত্তি গুলির উপরে, ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৪০ হাত উর্দ্ধে একখানি প্রস্তর ফলকে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক ও অব্দাব্দ লিখিত আছে :—

"শাকের দশমাসুজি বাণে * * বিতে।
মঠোঽয়ং সোপান শ্রীকৃষ্ণেন কৃত ময়া॥" *

১৬০৪।

"নবরত্ন বিষ্ণুমন্দির" নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটী জন প্রবাদ শুনা যায়—আমরা নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম:—

রাজা বুদ্ধিমন্ত, রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের পাদপদ্ম দর্শন আকাঙ্খায় স্বদল বলে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইলেন। তখন দেশে রেলগাড়ী কিম্বা ষ্টীমার ছিলনা; সুতরাং কতকদূর নৌকা পথে যাইয়া পরে স্থল পথে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিনের বেলায় পথ চলিতেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইলেই নিকটবর্ত্তী সরাই কিম্বা চটীতে গিয়া আশ্রয় লইতেন! এই সময়ে একদিন রাত্রিযোগে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যেন শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে সারথি রূপে যাহারা আমার দর্শন পায় নাই, তাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্যই আমি এই কলিযুগে জগন্নাথ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীক্ষেত্র ধামে অবস্থান করিতেছি। তুমি উক্ত যুদ্ধে বাদ্যকর থাকিয়া দামামা ধ্বনিতে সর্ব্বদা আমাকে বিশেষ বিরক্ত করিয়াছিলে বলিয়া তখন আমি তোমাকে দেখা দেই নাই—শ্রীক্ষেত্রেও দেখা দিব না। তবে এযুগে তোমার ভক্তি দেখিয়া আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি তাই প্রকারান্তরে তোমাকে দর্শন দিব। তুমি রাজধানীতে ফিরিয়া যাইয়া "নবরত্ন বিষ্ণু মন্দির" প্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহাতে আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন কর। প্রতি রথযাত্রার সময় তুমি বিগ্রহের উৎসব করিও, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তোমাকে দর্শন দিব।"

এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বুদ্ধিমন্ত স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন

* জল ও বায়ুর অত্যাচারে প্রস্তর ফলকের অনেক স্থল অস্পষ্ট হওয়ায় শ্লোকের সম্যক পাঠোদ্ধার করা গেল না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল।

লেখক—

এবং অতি সত্বর এক সুদৃশ্য বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন করণান্তর রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে বিগ্রহে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

বুদ্ধিমন্তের প্রতিষ্ঠিত সেই বিগ্রহটী এখন আর নবরত্ন মন্দিরে নাই। সুন্দরবন আবাদ সময়ে মন্দির আবিষ্কৃত হইলে স্বপ্নযোগে বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া টাকী নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দ রাম রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ বিগ্রহটী নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। আবাদ হইতে বিগ্রহটী লইয়া আসিবার সময় আঘাত লাগিয়া বিগ্রহের কোন অঙ্গহানি হইয়াছিল। শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া গোবিন্দ রাম এইরূপ অঙ্গহীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। এমন সময় তিনি রজনীযোগে স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন যে, "পুত্রাদির অঙ্গহানি হইলে পিতা যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, তুমিও আমাকে পুত্রস্থানীয় জ্ঞান করতঃ আমার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া চৌধুরী মহাশয় বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে মহা সমারোহে বিগ্রহটীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতঃ উহার উপযুক্ত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গোবিন্দ রামের বংশধরগণই বিগ্রহের সেবা ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বিষ্ণু মন্দিরের ১ মাইল উত্তরে বাঁকড়া নামক গ্রামে মাটীর নীচে আর একটী মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা একটী শিব মন্দির। মন্দিরের ভিতর ৮ হাত মাটীর নীচে কষ্টি পাথর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ শিব লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া লিঙ্গ মূর্ত্তিটী এই ভাবে মাটীর নীচে পড়িয়া আছে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, উহা এখনও এত সুন্দর ও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে যে, দেখিলেই সদ্য নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। জন প্রবাদ এ মন্দির ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহকেও রাজা বুদ্ধিমন্তের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

যমুনা নদীর পর পারে বিষ্ণু মন্দিরের পশ্চিমে বহুদূর ব্যাপী একটা ইষ্টকস্তূপ দৃষ্ট হয়। লোকে বলে, ইহাই রাজা বুদ্ধিমন্তের খোষ বাগ বা উদ্যান বাটিকার ভগ্নাবশেষ।

রাজধানী ও রাজবাটীর অনতিদূরেই রাজা বুদ্ধিমন্তের সৈন্যাগার বা দুর্গ স্থাপিত ছিল। সৈন্যাগার ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানই বর্ত্তমান সময় "হেস্কন গঞ্জ" বা "হিঙ্গল গঞ্জ" নামে অভিহিত হইতেছে। দুর্গের পশ্চিম দিকে যমুনা নদী ও অন্য তিন দিকে সুগভীর গড় খাই দ্বারা বেষ্টিত ছিল। গড়খাইর সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

সুন্দরবনের অনেক স্থলেই এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান কিন্তু একটু আয়াস স্বীকারে তাহা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে ?

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন।

জগৎশেঠ।
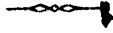
অষ্টম অধ্যায়।

মহাতপচাঁদ।

আফগান-বিদ্রোহ শান্ত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা কিন্তু সহজে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে নাই। যদিও আফগানগণের ধ্বংসের পর জনজী নাগপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা একেবারে বঙ্গরাজ্য হইতে অপসৃত হয় নাই। মীর হাবিব তাহাদিগের নেতা হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিল। রঘুজী ভোঁসেলা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিম্বজীকে অনেকগুলি সেনাসহ মীর হাবিবের সহিত যোগদানের জন্য পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দী খাঁ কিছুকাল মুর্শিদাবাদে শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি একদল সেনা বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি মেদিনীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হন। মীর হাবিব তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। মীর হাবিব নবাবের আগমন অবগত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে ও একটি দুর্গম জঙ্গলময় স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। নবাব এক দল সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে, তাহাদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া কটক অভিমুখে পলায়ন করে, এবং নবাবও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। নবাব কটকের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব তাহা-

দিগের কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যকারী সারন্দাজ খাঁ প্রভৃতির নিকট হইতে বারাবতী দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তাহার পর তিনি কোন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রতি কটকের ভার অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলে সংবাদ আসিল যে, মীর হাবিব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা কটকে উপস্থিত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে আহত ও বন্দী করিয়া কটক অধিকার করিয়াছে। সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব আর কটকে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া মুর্শিদাবাদেই চলিয়া আসেন।

উড়িষ্যায় মীর হাবিবের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনর্ব্বার উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি কাটোয়া ও বর্দ্ধমান অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ও সিরাজউদ্দৌলাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ দেন। সিরাজউদ্দৌলা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বালেশ্বর বন্দরে উপনীত হন। তাহার পর সিরাজউদ্দৌলা মেদিনীপুরে আগমন করেন। তাঁহাদের মেদিনীপুর অবস্থান কালে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য পথ দিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নবাব তাহা শ্রবণ করিয়া মেদিনীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া পরে তথা হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুসরণ করিলে তাহারা আবার মেদিনীপুরের অভিমুখে গমন করে। নবাব বর্দ্ধমানে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন।

সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মেহেদিনেসার খাঁ নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজকেই পাটনা বা আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জানকীরাম তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদিনেসার সিরাজকে স্বয়ং পাটনা শাসনের ভার লইবার জন্য উত্তেজিত

করিলে, সিরাজ কতকগুলি সেনা লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনাভিমুখে অগ্রসর হন। মেহেদিনেসার তাঁহার সৈনাপত্য গ্রহণ করে। নবাব এই সংবাদ পাইয়া মীরজাফর খাঁ ও দুর্ল্লভরামের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের ভার দিয়া নিজে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন। রাজধানীতে পৌছিয়া তিনি জানকীরামকে সংবাদ পাঠান যেন সিরাজের কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হয়। জানকীরাম কৌশলপূর্ব্বক মেহেদীনাসের খাঁকে হত করিলে ও সিরাজকে অক্ষত রাখিলে, নবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়।

তাহার পর নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনের জন্য পুনর্ব্বার যাত্রা করেন। তিনি বর্দ্ধমান উপস্থিত হইলে মীরজাফর ও রায়দুর্ল্লভ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সকলে মিলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। দুই একটি যুদ্ধের পর মীর হাবিব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা পলাইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার পর নবাব পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। উভয় পক্ষ এইরূপে ক্রমাগত রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পরে মীর হাবিব মীরজাফর খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। সন্ধিতে নবাব সুবর্ণরেখার পর পার হইতে সমস্ত উড়িষ্যা মীর হাবিবের হস্তে ছাড়িয়া দেন, মীর হাবিব, তাঁহার ও রঘুজীর কর্ম্মচারীরূপে উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিয়া উক্ত প্রদেশের আয় রঘুজীকে প্রদান করিবার জন্য আদিষ্ট হন। মেদিনীপুর উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মীর হাবিব কিছুকাল উড়িষ্যায় নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করিলে পর, জনজী কটকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত হিসাব পত্র দাবী করিয়া বসেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা হইলে, মীর হাবিব জনজীর আদেশে নিহত হয়। তাহার পর নবাব ও রঘুজীর পক্ষ হইতে একজন কর্ম্মচারী উড়িষ্যায় নিযুক্ত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্তগত হয়, ইহার পর হইতে বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার অবসান ঘটে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নবাবের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, এবং জগৎশেঠ তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর অর্থ ব্যয় হওয়ায় নবাব অর্থসংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, জমীদারদিগের প্রতি কোনরূপ আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন না করিলে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে। অনন্তর তাহাই নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই সময়ে অন্যান্য সুবায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ প্রদান করিবার জন্য অতিরিক্ত কর আদায় হইত। নবাব জমীদারদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের উপর চৌথ স্থাপন করেন। যদিও গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ জমীদারগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবাবের সেনারক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই। গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ জমীদারগণের রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই। অথচ তাঁহারাও তাহাদিগের জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারাও বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নবাবের সৈন্যরক্ষার প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত চৌথ প্রদান করিতে বাঙ্গলায় কোন জমীদারই আপত্তি করেন নাই। নবাব জমীদারদিগের নিকট হইতে ১৫ লক্ষের উপর চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। চৌথ আদায় করিয়া তাহার বিশেষরূপ ফল লাভ হয় নাই, কারণ, পরে উড়িষ্যা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তদ্ব্যতীত নিজামত কেল্লার সংস্কার ও সিরাজদ্দৌলার মনসুর গঞ্জের প্রাসাদ রক্ষার জন্য ও আহুক ও নজরানা মনসুরগঞ্জ নামেও দুইটি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় জমীদারেরা তাহাতেও কোনরূপ আপত্তি করে নাই এইরূপে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ শূন্য রাজকোষ পূরণের কিঞ্চিৎ উপায় করিয়াছিলেন।

নবাবের অর্থনাশের উপায় হইলে, জগৎশেঠ অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করেন। যদিও তাঁহার অপরিমিত অর্থ থাকায় তিনি নবাবকে অর্থ

সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের গদী, ও কারবার রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাদের গদী হইতে বাঙ্গলার অধিকাংশ জমীদার, ও ব্যবসায়িগণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে অনেক জমীদারের ক্ষতি হওয়ায় ও ব্যবসায়ীদিগের কারবার সুচারুরূপে চালিত না হওয়ায় তাহাদেরও অনেক ক্ষতি হইতেছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের গদী লুণ্ঠিত হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। একবার মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের গদী লুণ্ঠনও করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে শেঠগণ নবাবের সেনারক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা তজ্জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নবাব ক্রমাগত তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করায় জমীদারদিগের প্রতি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপনে ইচ্ছুক হন, এবং তজ্জন্য জগৎশেঠেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাহার পর উক্ত কর স্থাপিত হইলে, জগৎশেঠের নিকট হইতে তাঁহাকে আর অধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। তথাপি সময়ে সময়ে যে অর্থের প্রয়োজন না হইত, এমন নহে। শেঠগণও তাহা প্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যাহা হউক, এইরূপে তাঁহাদের ভারের কিছু লাঘব হওয়ায়, শেঠগণ আপনাদের কার্য্যপরিচালনের কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহাদের কারবার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে অনেক জমীদারের ধনসম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, তাহাদিগকে রাজস্বগ্রহণে ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগৎশেঠের গদী ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। কাজেই তাঁহাদিগকে শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। শেঠেরাও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া রীতিমত সুদ গ্রহণ করায় তাঁহাদের কারবার দিন দিন বর্দ্ধিতহারেই চলিতে থাকে। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকগণের নানা প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। দেশীয় কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, শিখ ব্যবসায়িগণ ব্যতীত, তাতার ও মোগলগণ এবং ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ,

দিনেমার, আর্ম্মনীয়গণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া নানাবিধ বাণিজ্যে লিপ্ত হইত। বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছিল। ইংরেজদিগের কলিকাতা, ফরাসীদিগের চন্দননগর, ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া, দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর ও আর্ম্মনীয়দিগের সৈদাবাদ প্রধান স্থান ছিল। তদ্ভিন্ন, কাশীমবাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কুঠী স্থাপিত হয়, এই সমস্ত বাণিজ্যের জন্য রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে তুতের ও কার্পাসের চাষ নষ্ট হওয়ায় ব্যবসায়ের যার পর নাই ক্ষতি হয়। কৃষকদিগকে পুনর্ব্বার চাষের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে দাদন দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায়, তাহাদিগকে শেঠদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে শেঠদিগের কারবার দিন দিন উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইতে থাকে। তাহাদের গদীতে বার কোটি টাকার কারবার চলিতেছিল। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, জগৎশেঠের ও নবাবের অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ ও রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। নবাব তাঁহাদের সহিত দুই ঘণ্টাকাল এই সমস্ত বিচারের পরামর্শ করিতেন।* প্রত্যহই ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাজ্যশাসনসম্বন্ধে জগৎশেঠের কিরূপ সংস্রব ছিল। প্রাত্যহিক কার্য্য

* "The learned men being departed, the chiefs of offices, the general intelligencers, and the rich banker Djagat-seat with some others, attended, and read or mentioned the news of every part of Hindia; or they reported such statements and revenue matters, as had remained from the morning audience; and this second audience likewise took up two full hours." (Mutaqherin vol I, P. 687).

ব্যতীত নবাব সময়ান্তরেও অনেক বিষয়ে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং নবাব দরবারে চিরদিনই শেঠদিগের সমভাবে সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া নবাব জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তভাবে কাটাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যদিও বাহিরের অশান্তি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সংসার মধ্যে ঘোরতর অশান্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে পুত্রসম প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা ঘোরতর ঈর্ষ্যানল প্রজ্বালিত করিয়া নবাবের সংসারকে ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসিটি বেগম সিরাজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গও সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির বিরোধী হইয়া উঠেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবার কিছু পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে একটি শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। হোসেন কুলীখাঁর হত্যাকেই আমরা সেই ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। হোসেনকুলী ঢাকার নায়েব সুবা নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর সহকারী ছিলেন। তাঁহার সহিত নওয়াজেসের পত্নী ঘসিটি বেগম ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হওয়ায়, আলিবর্দ্দী খাঁর বেগমের পরামর্শে সিরাজ তাহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন। তাঁহার আদেশে হোসেন কুলী নিহত হয়। হোসেন কুলীর হত্যায় অনেকে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহাকে সিরাজের একটি গুরুতর কলঙ্ক বলিয়া মনে করি না। কারণ, তিনি স্বীয় জননীর ধর্ম্মধ্বংসকারীকে হত্যা করিয়া আপনার পরিবারকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দ্দী খাঁর মহীয়সী বেগম তাহাতে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দীরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

অনেকে বিশেষতঃ নবাবের পরিবারস্থ সকলে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়। অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত

হইতে আরম্ভ হইলে, নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাহারই কিছু পরে সৈয়দ আহম্মদ খাঁও তাঁহার অনুসরণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে অধীর হইয়া নবাব নিজেও পীড়িত হইয়া পড়েন, ক্রমে তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিলে নবাব চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করেন। অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার মাতার সমাধি-ক্ষেত্র খোসবাগে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি তথায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। যিনি মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্যকে রক্ষা করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ যে শোকাচ্ছন্ন হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। শেঠগণও আপনাদের একমাত্র সহায় হারাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অন্তিমসময় উপস্থিত, এই কথা প্রচারিত হইলে, রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন যে, সিরাজের হস্তের সহিত তাঁহাদের হস্ত মিলাইয়া নবাব সিরাজকে তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। কিন্তু নবাব ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর যদি তাহাকে তাহার মাতামহীর সহিত তিন দিন সদ্ভাবে কাটাইতে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমরা বা অপর যে কেহ আপনাদের জন্য কিছু আশা করিতে পার"। * অবশ্য এই প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে জগৎ শেঠও

* "It is reported that on it becoming public that Aly-verdy-Khan was drawing to his end, some of the principal persons of the city, fearful of what might happen after his decease, requested to be recommended to Seraj-ed-daulah, by putting their hand within his : the old man smiled at the request, and said, "*if you perceive after my death that he has been for three days together upon good terms with his grand-mother then you as any others may have a chance for yourselves.*" So well did he know the man's character." (Mutagherin vol. I, P. 682).

একজন ছিলেন। আমরা মুতাক্ষরীণকারের এরূপ উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। কারণ আমরা জানিতে পারি যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজ-উদ্দৌলাকে মৃত্যুকালে অনেক উপদেশ দিয়া যান। তিনি তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন। তাহার পর ইংরেজদিগের সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে অমূল্য উপদেশ দিয়া যান। অতএব তিনি যে সিরাজ-উদ্দৌলাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিতেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, সিরাজ তিন দিন পর্য্যন্ত কেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাতামহীর উপদেশে চালিত হইয়াছিলেন। মাতামহীর সহিত কখনও তাঁহার অসদ্ভাব ঘটে নাই। সেইজন্য মুতাক্ষরীণ-কারের উক্ত উক্তি জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্তিতে সিরাজের প্রকৃত চরিত্র বুঝা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থানেই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজদিগের সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছি। কারণ, সেই উপদেশের জন্যই সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিবাদে জগৎশেঠ প্রভৃতি লিপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। সুতরাং পরবর্ত্তী অধ্যায় বিশদভাবে বুঝিবার জন্য এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে এইরূপ বলিয়া যান যে, "ইংরেজদিগের ক্ষমতা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তুমি প্রথমে তাহাদিগকে দমন করিবে। ইংরেজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয়েরা তোমাকে আর অধিক কষ্ট প্রদান করিবে না। তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সেনা রাখিতে দিও না। তাহা করিতে দিলে তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে আমি তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম। ইংরেজদিগকে দমন করিবে। তাহাদের অভিসন্ধি হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমার রাজ্য বিপদ-সঙ্কুল হইবে। তাহারা অল্পদিন হইল আঙ্গিয়ার রাজ্য অধিকার করিয়াছে।

তোমার রাজ্যেরও সেইরূপ দশা করিবে। তাহারা আমাদের সঙ্গে কেবল অর্থের জন্য যুদ্ধ করে, ন্যায়ের জন্য নহে। ইউরোপীয়গণ এখানে কেবল ধনলাভের উদ্দেশে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের রাজাদের মধ্যে বিবাদের ভাণ করিয়া বাদসাহের রাজ্য অধিকার ও অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি আপনারা বণ্টন করিয়া লয়। রাজ্য ও ধনলিপ্সা খৃষ্টানদিগের অন্তরের সামগ্রী, এবং প্রাচ্যদেশে তাহাদের কার্য্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরের কোনরূপ নীতি তাহারা মান্য করিয়া চলে না। তাহারা অনন্ত জীবন বা অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিশ্বাস করার ভাণ করে, তাহারই বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে। তুমি ইংরেজদিগকে দাসানুদাসের অবস্থায় পরিণত করিবে। তুমি কদাচ তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। দিলে রাজ্য তোমার থাকিবে না তাহাদেরই হইবে। যাহারা আপনাদিগের উল্লিখিত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষমতা ও কৌশল চালনা করিতেছে, তাহাদিগকে কেবল বলের দ্বারাই দমন রাখিতে হইবে।" *

* "My son, the power of the English is great ; reduce them first ; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers ; if you do, the country is not yours. I would have freed you from this task, if God had lengthened out my days.—The work, my son, must now be yours. Reduce the English first ; if I read their designs aright, your dominions will be most in danger from them. They have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the samething to you : they make not war among us for justice, but for money. It is their object ; all the Europeans come here to enrich themselves ; and, on pretence of private eontests between their kings, they have seized the country of the King, and devided the goods, of his people between them. Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed over all the East, how little they regard the express precepts they have received from God. They believe not that life and immortality which is brought to

সিরাজউদ্দৌলা এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদারম্ভ হয়। জগৎশেঠ প্রভৃতিও সেই বিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

---

light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers ; if you do, the country will be theirs, not your's. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say, is the law of the most high, are only to be restrained by force."

চচ ও আরবীয়দিগের সিন্ধু অধিকার।

দিওয়াইজের পুত্র সিহারসের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। সিহারস প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তিও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল না। এই সময়ে পারস্যদেশ হইতে নিমরজাধিপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সিহারসের সৈন্যগণ পলায়ন করে; কিন্তু সিহারস সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। পারসীকগণ লুণ্ঠনাদি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সিহারসের পুত্র রায় সাহসী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই সময়ে শিলাইজের পুত্র চচ নামক এক ব্রাহ্মণ মালিক সাহসী রায়ের প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত হন। রাণী চচের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সাহসী রায়ের মৃত্যু হইলে চচ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। পরে রাণী সুভান দেওর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চচ তাঁহার ভ্রাতা চন্দরকে আনাইয়া তাহাকে তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়া আলোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

চচ বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। জাপুর রাজকে যুদ্ধে নিহত করেন। সিক্কা, মুলতান প্রভৃতি জয় করিয়া কাশ্মীরের সীমান্ত পর্য্যন্ত সসৈন্যে গমন করেন। কাশ্মীররাজের সহিত তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ কার্য্য শেষ করিয়া আলোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। চচ অনেক দিন স্বরাজ্যে না থাকায় অনেক করদ রাজগণ তাঁহাকে আর কর দিবেন না এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু চচ কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া এইরূপ ভাব দেখিয়া বুদাপুর ও শিওয়িস্তানের দিকে যাত্রা করিলেন। বুধপুরের অধিপতি কোটাল বিন ভাণ্ডারগু ভাণ্ডর

পুত্রকে পরাস্ত করিয়া শিওয়িস্তানে গমন করিয়া তথাকার অধিপতি মাট্টাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পুনরায় তাহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন এবং তথায় নিজের একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে রাখিয়া আসেন।

ব্রাহ্মণাবাদের অধিপতি অঘম লোহান তাঁহাকে কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় চচ ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অনেকে নিহত ও আহত হইল তখন অঘম পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়াদিলেন। চচ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। এই দুর্গাবরোধ এক বৎসর কাল ছিল।

অঘম কনৌজাধিপতি রাসলের পুত্র শতবানকে সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই অঘমের মৃত্যু হইল। বুধ নৌবিহার মন্দিরের উপাসক বুধরাখু নামক ব্যক্তি অঘমের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাহারই উপদেশে অঘম চচের হস্তে দুর্গ পরিত্যাগ করেন নাই। অঘমের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র সরবন্দ রাজ্যের শাসন ভার পাইলেন। এই খবরে বুধরাখু স্বীয় মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। সরবন্দ দুর্গদ্বার চচকে খুলিয়া দিলেন। বুধরাখুর বিষয় শুনিয়া চচ তাঁহাকে বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চচ সরবন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অঘমের স্ত্রীকে নিজে বিবাহ করিলেন এবং সরবন্দের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যার বিবাহ দিলেন। ইহার পর চচ বুধরাখুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার মন্দিরের দিকে যাত্রা করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বুধরাখু আসনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে মৃত্তিকা লইয়া মূর্ত্তি রচনা করিতেছেন। বুধরাখুর পশ্চাতে এক ভীষণ ছায়া মূর্ত্তি চচের নয়নগোচর হইল, ইহাতে চচ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করা দূরে থাকুক কিরূপে বুধরাখুকে তুষ্ট করিবেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং সাওয়ান্দশীতে যে জীর্ণ বুধ নৌভিহার মন্দির ছিল উহার সংস্কার করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণাবাদের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া কিরমান অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সেখান হইতে কামরান ও আরমাবেল হইয়া আলোরে প্রত্যাগমন করেন এবং ৪০ বৎসর রাজত্বের পর চচের মৃত্যু হয়।

চচের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা চান্দর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে চচের পুত্র দাহির আলোর অধিকার করিলেন ও চন্দরের পুত্র রাজ ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিলেন; কিন্তু এক বৎসর পরেই রাজের মৃত্যু হওয়ায় চচের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ষিয়া ভগ্নী মাঞ্জি বাইকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণাবাদে রহিলেন। ভগ্নী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া বর্ষিয়া ৭০০ শত অশ্বারোহী ৫০০ শত পদাতিক সঙ্গে দিয়া ভগ্নীকে ভ্রাতা দাহিরের নিকট ভাটিয়া রাজের সহিত বিবাহ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দাহির জ্যোতিষীগণের নিকট শুনিলেন যে বুইয়ের স্বামী হিন্দ ও সিন্দুদেশের রাজা হইবে। ইহা শুনিয়া দাহির নিজেই ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। বর্ষিয়া ইহা শুনিয়া দাহিরকে শাস্তি দিবার ইচ্ছায় আলোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু আলোরে আসিয়া বর্ষিয়ার মৃত্যু হইল। দাহির সমগ্র সিন্দুদেশের রাজা হইলেন। এই সময়ে ইরাক ও মাকারনের শাসন কর্ত্তা হাজাজ তাঁহার এক নিকট আত্মীয় মহম্মদ কাসিমকে সিন্দু আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দেন। কাসিম দেবল অধিকার করিয়া সীগুয়ীস্তান যাত্রা করেন। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং কাসিম যুদ্ধে জয়ী হন।

নিরুন পর্ব্বতদুর্গ অতিক্রম করিয়া মিহরান নদীতীরে আসিয়া কাসিম সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং তথা হইতে দাহিরের নিকট দূত প্রেরণ করেন, দূত ফিরিয়া আসিলে তিনি একজন সেনাপতিকে ৬০০ অশ্বারোহীর সহিত দাহিরের পুত্র যুকির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যাহাতে যুকি পিতার সহিত যোগ দিতে না পারেন ইহাই উদ্দেশ্য। এই সময়ে হাজাজ ২০০০ দুই সহস্র সৈন্য কাসিমের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। মিরবানের তীরে দুই পক্ষে ৫ দিন ধরিয়া যুদ্ধ হওয়ার পর দাহির যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড ও পাতাকা কয়েকটী কাসিম হাজাজের নিকট প্রেরণ করেন। হাজাজ তাহা পুনরায় খলিফ ওয়ালিদের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাণী মাঞ্জি বাই দুর্গ অধিকৃত হইলে, অগ্নি-

কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। কাসিম দুর্গস্থ প্রায় ৬০০০ সৈনিকের প্রাণ বধ করেন ও অপর দাস দাসী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে সপুত্র পরিবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। দাহিরের পুত্র জয়সিয় (জয়সিংহ) পলায়ন করিয়া জয়ধুর ও পরে তথা হইতে কাশ্মীর রাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছু দিন পরে জয়সিয় কুরজ রাজ দারোহর রায়ের নিকট গমন করেন। সেখানে দারোহর রায়ের ভগ্নী জানকী জয়সিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রাত্রিকালে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জয়সিয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ক্রোধে প্রাতঃকালে স্বীয় ভ্রাতার নিকট জয়সিয় তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন। দারোহর রায় জয়সিয়কে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবেন এরূপ ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু একটী ভৃত্যের সাহায্যে এবিষয় জানিতে পারিয়া জয়সিয় তথা হইতে পলায়ন করেন ও জালন্ধরের সীমান্তে কসর নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

এদিকে কাসিম দাহিরের দুর্গ অধিকার করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে তথায় পাইলেন না। কিন্তু পরদিবস তাঁহার সৈন্যগণ প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহাদের মধ্যে অনেককে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন এবং যাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহাদের উপর অধিক করের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে একজন স্ত্রীলোক দাহিরের অপর স্ত্রী লাদিকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কাসিম স্ত্রীলোকটীর নিকট লাদিকে ক্রয় করিয়া নিজে বিবাহ করিলেন। এবং লাদির দুই অবিবাহিতা কন্যাকে খালিফের নিকট প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সিন্ধুদেশে আরবীয়দিগের অধিকার হইল।

দাহিরের কন্যাদ্বয়কে খালিফ সম্মুখে আনয়ন করাইয়া উহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উহারা উত্তর করিল সূর্য্যাদেও ও পরমলদেও। কনিষ্ঠাকে তিনি সম্মুখ হইতে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং অপরটীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। সে উত্তর করিল যে, "আমরা আপনার নিকট প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে সেনাপতি মহম্মদ কাসিমের নিকট তিন দিবস ছিলাম।

অতএব আমরা আপনার উপযুক্ত হইতে পারি না। ইহা আপনাদের রীতি হইতে পারে, কিন্তু সম্রাটদিগের এরূপ রীতি গর্হিত।” ইহা শ্রবণে খালিফ ক্রোধান্ধ হইয়া কাসিমের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন যে, তুমি আপনাকে একখণ্ড চর্ম্মে অপরের দ্বারা আবৃত করাইয়া আমার নিকট প্রেরিত হইবে। কাসিম আজ্ঞাপত্র প্রাপ্তিমাত্র সকলকে বলিলেন যে, আমাকে চর্ম্মে আবৃত কর। তাহাই করা হইল। চর্ম্মাবৃত হইয়া কাসিম দুইদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার চর্ম্মাবৃত দেহাবশেষ খালিফের নিকট প্রেরিত হইল। তখন খালিফ দাহিরের কন্যাদ্বয়কে ডাকাইয়া সেই দেহ দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, দেখ আমার অনুজ্ঞায় কাসিম আপন প্রাণ দান করিয়াছে। তখন দাহিরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছেন। খালিফ ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া কন্যাদ্বয়কে একটী প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া উহার দ্বার ইষ্টকদ্বারা চিররুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। *

চচ ও তাঁহার ভ্রাতা চন্দর

রাজ

বর্ষিয় দাহির মাক্রিবাই

(স্ত্রী বাই ও লাদি)

জয়সিয় যুকি সূর্য্যাদেও পরমলদেও

(কন্যা) (কন্যা)

“৬৪১ খৃষ্টাব্দে চচবংশীয় এক ব্যক্তি সিন্ধু প্রদেশে ব্রাহ্মণ রাজ্য স্থাপন করেন তাহারও পূর্ব্ব হইতে চচ জনপদের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশ রাজত্ব করিতেন, একজন চচ ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। কাহারও মতে ইনিই প্রথম চতুরঙ্গ খেলা বাহির করেন।

চচবংশ ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৩৭ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আরবীয়গণ এই বংশ উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। এই উপলক্ষ করিয়া ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় “চচ নামা” নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ নামে এক ব্যক্তি “তারিখ-উল্‌-হিন্দ্ ও সিন্দ্” নাম দিয়া এই গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। বিশ্বকোষ।

মহম্মদ কাসিমের এই ভীষণ মৃত্যুসম্বন্ধে অনেক গীতিকাব্য ও কবিতা প্রচলিত আছে। *

* Elliot's History of India, Chachnama, হইতে সংগৃহীত।

"Buddhism, which prevailed all through Sind and the mountainous districts to the west, had given place to Brahmanism about the middle of the 7th century, when the Brahman Chach usurped the throne of Sind.

*   *   *   *

It was not until two unsuccessful attempts had been made to reach Debal that Hajjaj, the governor of Trak and Makran, appointed his relative, the boy-general Mahommed Kasim to the command of a fresh force, with the conquest of Sind in immediate view, but with the ulterior object of reaching China from the Indus.

*   *   *   *

With a force of 6000 picked cavalry, 6000 camelmen and 3000 baggage animals, Mahomed Kasim traversed Makran, sending at the same time five Catapults by sea for the purpose of reducing Debal. He passed through Mukran from West to East, destroying the Buddhist city of Armail (Las Bela) Mounte and finally captured Debal on the 1st May 712. From that point his onward progress was triumphant * * * He extended his conquest northward to the borders of Kashmir, and Established an Arab dynasty in Sind which lasted for three centuries. * * These three centuries of Arab occupation of the Indus valley mark the Zenith of Arab ascendancy in Asia."—Col Sir T. H. Holdich in the Euc. Brittanica.

(মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী)

(১)

মতিঝিল ।*

মুর্শিদাবাদের নাম ইতিহাস খ্যাত,
সুদূর ইংলণ্ডঃ কিবা পৃথিবী বিখ্যাত ।
প্রাচীন কাহিনী তার করিতে প্রচার,
প্রবাহিতা ভাগীরথী, পূর্ব্বতীরে যার,—
জীর্ণদেহে শোভিতেছে দেখ "মতিঝিল"
(অশ্বের পাদুকাকৃতি ত্রিধারে সলিল)

পূর্ব্বশোভা তিরোহিত ঝিলের এখন,
একদা যাহার দৃশ্যে ভুলেছে ভুবন ।
নাহিক সুনীল এবে ঝিলের সলিল,
শৈবাল, শাদ্বলে পূর্ণ হইয়াছে ঝিল ;

* মতিঝিল এক্ষণে মুর্শিদাবাদ সহরের ১ মাইল অন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে রহিয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এস্থান ভাগীরথীর গর্ভে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের স্রোত রুদ্ধ হইয়া অশ্বপাদুকাকার-ঝিল বা বদ্ধ বিলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার গর্ভে যথেষ্ট পরিমাণে মতি পাওয়া যাইত বলিয়াই ইহার নাম "মতিঝিল" হয়।

তবুও কমল হাসে তুলি নিজ শির,
ধীরে যারে তালে তালে নাচায় সমীর,
"গুন্ গুন্" রব তুলি ভ্রমরনিচয়,
ঝিলের প্রাচীন কথা পরস্পরে কয় ;
কোথাও জলের পাখী করি কল গান,
শ্রবণে বরিষে সুধা জুড়ায় পরাণ ;
নব দূর্ব্বাদল শোভে ঝিল তীরদেশে,
সাজায়ে প্রকৃতি অঙ্গ মনোহর বেশে।
সুদীর্ঘ পাদপরাজি ঝিল তীরোপরে,
নীর মাঝে নিজাকৃতি দরশন করে,
পূর্ব্বের সৌভাগ্য স্মরি কভু হাহাকারে,
"শন্ শন্" শব্দ করি সে দুঃখ প্রচারে !
রাখাল গোপাল ল'য়ে বসিয়া ছায়ায়,
মনসুখে হাসে খেলে, কভু গীতি গায় ;
রজনীতে ঝিলনীর কত শোভা ধরে,
চন্দ্রকর বায়ু সনে যখন বিচরে।

স্বভাব শোভায় পূর্ণ এবে ঝিলকায়,
ভগ্নস্তূপে পরিণত প্রাসাদ তথায় ;
চিন্তারত চিতে ঝিল করিলে দর্শন,
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ করে অশ্রু বরিষণ !

আলিবর্দ্দী ভ্রাতুষ্পুত্র জামাতৃরতন—
নোয়াগেস মহম্মদ, করিয়া যতন,
হেথায় করিয়াছিল, মস্‌জিদ ভবন,
মাদ্রাসা, অতিথিশালা, প্রাসাদ, তোরণ,

মনোজ্ঞ কানন ছিল চারিদিকে যার,
গঙ্গাবারি স্পর্শে পূত প্রাচীর যাহার,
অসিত মর্ম্মরযুত সে তোরণ দ্বার,
দেখিলে অলকাভ্রান্তি হইত সবার,
অর্দ্ধভগ্ন, লতাগুল্মে আবৃত এক্ষণে!
অশ্রু আসে যার প্রতি চাহিলে নয়নে!
গঙ্গা আর পদ তার চুম্বন না করে!
দূরে গিয়া দুঃখ গায় কুল কুল স্বরে!

কতই বিলাসদ্রব্য রম্য হর্ম্ম্য মাঝে!
শোভিয়াছে একদিন মনোহর সাজে!
ত্রিদিব সমান ছিল যে গৃহ নিচয়,
এখন পশিতে তথা মনে হয় ভয়!
লক্ষনর পদরজে, একদা যে স্থান,
পবিত্র হইত সদা জগত প্রধান,
সপ্ত ত্রিংশ সহস্র রজত মুদ্রারাশি,
গ্রহণ করিত যথা দীন দুঃখী আসি,
মাসে মাসে এইমুদ্রা কে বিলাতে পারে?
ধন্য নোয়াগেস তুমি দয়ালু সংসারে!

একদিন নোয়াগেস যে প্রাসাদতলে
গায়িকার * গীতসুধাপানে, নেত্রজলে,

* ভগবাই নাম্নী জনৈক নর্ত্তকীর সহিত এই মতিঝিলের প্রাসাদে নোয়াগেস্ মহম্ম প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং অনেক সময় মধ্যে মধ্যে তিনি উক্ত বাইজীসহ এই প্রাস কালাতিপাত করিতেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকে।

ভাসিয়া আবদ্ধচিত, প্রেমের বন্ধনে!
রসাতলে সে ভবন দেখে সর্ব্বজনে!
নোয়াগেস্ প্রণয়িনী ঘেসেটী বেগম,
একদা রহিত যথা পারিজাত সম,
কি যাতনা আজি তথা শৃগাল বানর!
অনায়াসে ক্রীড়া করে বাঁধি নিজঘর!
একদিন যে প্রাসাদে ইংরাজ রাজন্,
"পুণ্যাহ" করিয়াছিল লইয়া স্বজন!
কত আড়ম্বর হায়! হইয়াছে যথা,
বিজন বিপিন এবে কিছু নাহি তথা!
একদিন শ্বেতাঙ্গেরো প্রিয়বাসস্থান
যে স্থান আছিল, তাহা বিজন শ্মশান!
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন আর যাহার নির্ম্মাণ
ঘটায়েছে কত রাশি অর্থতিরোধান!
এবে তার এই দশা ভাবিলে নয়নে,
অশ্রুপাত নাহি করে বল কোন্ জনে?
স্বর্গ করিয়াছে আজি নরকে গমন!
জগতের কিবা রীতি দেখ জনগন!

কি ছার এ মতিঝিল প্রাসাদ ভবন!
পরিণাম লয় তরে বিশ্বের সৃজন!
কাননে কুসুম হাসে কদিনের তরে?
সহসা তাহার শোভা বল কেবা হরে?
দিব্যকান্তি জন মূর্ত্তি সংসারে যাহার!
কে করে হরণ বল জীবন তাহার?

সংসারের মায়া চক্রে পড়ি জীবগণে!
নিজের গৌরব রাশি ছড়ায় ভুবনে!
বৃথা ক্ষণেকের তরে সুন্দর আকার!
দেখিয়া মোহিত বিশ্ব রূপেতে তাহার!
কালচক্রে নিষ্পেষিত কিন্তু সে যখন!
কিছুই তাহার আর রহেনা তখন!
তাই আজি "মতিঝিল"—কীর্ত্তি নোয়াগেস্
গৌরব বিচ্যুত দেহ, পেয়েছে এবেশ!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপসংহার

আমরা আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই যে, এক বৎসরের লীলাখেলার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপসংহার হইবে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রথমে বড়ই আশান্বিত হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি দক্ষ কর্ণধার ছিলেন, তথাপি ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজকে চালিত করিতে পারেন নাই। সে বড় জাহাজ মনে করিয়া আমরা একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা একটি বৎসরও সুচারুভাবে ভাসিয়া যাইতে পারে নাই। কোনরূপে তাহাকে একটি বৎসর চালাইয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপসংহার করিতে হইল। বঙ্গদেশে নব ঐতিহাসিক চর্চ্চায় সাধারণের কিছু কিছু অনুরাগ দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজ না হউক, অন্ততঃ ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গি খানিও ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, বাঙ্গলার সকল নদনদীতে যেমন বারমাস জল থাকে না। সাহিত্য জগতেরও কোন কোন নদনদীও সেইরূপ। এ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-নদ বারমাস জলে পূর্ণ থাকে না। কাজেই ঐতিহাসিক ডিঙ্গীও তাহাতে বারমাস ভাল করিয়া ভাসিতে পারে না। কিছুদিন পরে তাহাকেও চড়ায় লাগিতে হয়। ঐতিহাসিক জাহাজের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশের পর সঞ্জীবনী বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে এরূপ পত্রের অধিক দিন স্থায়িত্ব হইবে কিনা সন্দেহ। সঞ্জীবনী বহুদর্শিনী। তিনি পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে আমরাও তাহাই বুঝিতে পারি। বঙ্গীয় পাঠকগণের ঐতিহাসিক চিত্রে

া কে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য সাধারণের
চেষ্টা করিয়া নাটকউপন্যাসের জলপ্লাবন হইতে তাঁহাদিগকে ফি
নাই। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখকগণ এই উদ্দে
জন্য চেষ্টা করিয়াও পদতল ডুবাইবারও জল পান নাই।
থাকিলে, কখনও কোন পত্র সুচারু রূপে চালিত হইতে পারে
লেখকগণ সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন
বিনিময় কৈ? এদেশে সম্পাদক বা গ্রন্থকার সাধারণের
ও অর্থ দুই ব্যয় করিবেন এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদের নাই।
পরিশ্রমের ফল অল্পদিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। সাধারণের
অভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয়
সংহার করিতে হইল। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে
ইহার তৃতীয় পর্য্যায়ও আরব্ধ হইতে পারে।